ভারতের ইতিহাসকথা

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ মধ্যযুগ

ডক্টর কিরণচন্দ্র চৌধুরী, এম. এ., এল. এল.-বি., ডি. ফিল্
কলিকাতা স্কটিশ চার্চ কলেজের ইতিহাস বিভাগের প্রধান অধ্যাপক

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

ভারতের ইতিহাসকথা—২য় খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের সুযোগ উপস্থিত হওয়ায় বইখানির আদ্যোপান্ত পরিবর্তন ও পরিমার্জন করা সম্ভব হইল। আশা করি ইহাতে বইখানির উৎকর্ষ আরও বৃদ্ধি পাইবে। ইতি—

কলিকাতা,
১২ই ডিসেম্বর, ১৯৬০

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠাঙ্ক

মানচিত্রের তালিকা

ভারতের ইতিহাসকথা

[দ্বিতীয় খণ্ড ঃ মধ্যযুগ]

সূচনা

(Introduction)

মুসলমানদের ভারতে আগমন (The Advent of the Muslims in India) ঃ ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মোহম্মদের মৃত্যুর প্রায় এক শতাব্দীর মধ্যে আরবের মুসলমান রাজ্য এক সর্বগ্রাসী শক্তি লইয়া চতুর্দিকে বিস্তারলাভ করিতেছিল। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের প্রারম্ভেই আরব সাম্রাজ্য আটলান্টিক মহাসাগর হইতে ভারতের সিন্ধু প্রদেশের সীমা এবং কাস্পিয়ান সাগর হইতে মিশরের নীলনদ অঞ্চল পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চল অধিকার করিয়া লইয়াছিল। স্পেন, পোর্তুগাল, ফরাসী-দেশের দক্ষিণের কতকাংশ, আফ্রিকা মহাদেশের সমগ্র উত্তর উপকূল, নীলনদের অববাহিকা অঞ্চল, আরব, মেসোপটামিয়া, সীরিয়া, পারস্য, আফগানিস্তান, বেলুচিস্তান, অক্ষুনদীর উপত্যকা অঞ্চল প্রভৃতি ছিল তখন আরব সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। ৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রাঙ্কোনিয়া (ফরাসী-জার্মান) রাজ্যের চার্লস্ মার্টেল (Charles Martel)-এর হস্তে টুয়র্স্ (Tours)-এর যুদ্ধে মুসলমান শক্তি পরাজিত না হইলে সমগ্র ইওরোপে মুসলমান শাসন ও ইসলাম ধর্ম বিস্তৃত হইত সেবিষয়ে সন্দেহ নাই।

আরব সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি

ঐ সময়ে সিন্ধুদেশের রাজা ছিলেন দাহির। জাতিতে তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ। আরব সাম্রাজ্যের সীমা তখন দাহির-এর রাজ্যের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তারলাভ করিয়াছে। তখন এক সামান্য ঘটনার সূত্রে সিন্ধুদেশের সহিত আরবদের যুদ্ধ শুরু হয়। সিংহলের রাজা তাঁহার রাজ্যে বাণিজ্য-ব্যপদেশে অবস্থান-কালীন যে-সকল আরব বণিকের মৃত্যু ঘটিয়াছিল তাহাদের অনাথিনী

কয়েকটি কন্যাকে জাহাজে করিয়া আরব সাম্রাজ্যের পূর্বাংশের শাসনকর্তা হজ্জাজের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। সিন্ধুরাজ্যের দেবল বন্দরে সেই কয়টি জাহাজ জলদস্যুদের দ্বারা লুণ্ঠিত হয়। কাহারো কাহারো মতে সিংহলের রাজা স্বয়ং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া আরবের খলিফার (Caliph) নিকট আটটি জাহাজপূর্ণ নানা দ্রব্যাদি উপঢৌকন প্রেরণ করিয়াছিলেন। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ এই কাহিনী বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে করেন না।* যাহা হউক, সিংহল হইতে প্রেরিত জাহাজগুলি লুণ্ঠিত হইলে হজ্জাজের ক্রোধের সীমা রহিল না। তিনি প্রথমে ওবেদুল্লা এবং পরে বুদাইল নামে সেনাপতিকে পর পর দুইটি অভিযানে দেবলের জলদস্যুদিগের সমুচিত শিক্ষাদানের জন্য প্রেরণ করিলেন। উভয় অভিযান-ই বিফল হইলে এবং ওবেদুল্লা ও বুদাইল দুইজনই নিহত হইলে হজ্জাজ ইম্‌দাদ্‌-উদ্দিন মোহম্মদ-বিন্‌-কাশিমকে তৃতীয় অভিযানের সেনাপতি করিয়া প্রেরণ করিলেন। জলপথে নানাপ্রকার আক্রমণাত্মক অস্ত্রশস্ত্রসহ অপর এক সেনাবাহিনী মোহম্মদের সাহায্যার্থে প্রেরণ করা হইল (৭১১)। এই যুদ্ধে আরবগণ 'বলিস্ত' (*Balista*) নামে একপ্রকার প্রস্তর নিক্ষেপক কামান ব্যবহার করিয়া সুরক্ষিত দেবল বন্দরটির ধ্বংস সাধন করিয়াছিল। যুদ্ধে জয়ী হইয়া মোহম্মদের আদেশে সতর বৎসরের অধিক বয়স্ক পুরুষ মাত্রকেই হত্যা করা হইল। তিনদিন ধরিয়া লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ডের পর যাবতীয় হিন্দু স্ত্রী-পুরুষকে ইসলামধর্ম গ্রহণে বাধ্য করা হইল। তারপর দেবলে এক কঠোর সামরিক শাসনের ব্যবস্থা করিয়া মোহম্মদ সমগ্র সিন্ধুদেশ জয়ে প্রবৃত্ত হইলেন।

সিন্ধুদেশের রাজা দাহিরের সহিত আরবদের সংঘর্ষ

মোহম্মদ-বিন্‌-কাশিমের দেবল বন্দর অধিকার

---

* "The king of Ceylon was sending to Hajjaz, the viceroy of the Eastern provinces of the Caliphate, the orphan daughters of Muslim merchants who had died in his dominions, and his vessels were attacked and plundered by pirates off the coast of Sind. According to a less probable account, the king of Ceylon had himself accepted Islam, and was sending tribute to the commander of the Faithful". *The Cambridge History of India. vol., III*, pp. 2-9.

নিরূণ, সেওয়ান প্রভৃতি দুর্গ জয় করিয়া মোহম্মদ রাওর নামক স্থানে সিন্ধুর রাজা দাহিরের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। এই যুদ্ধে দাহির পরাজিত ও নিহত হইলেন (জুন ২০, ৭১২)। দাহিরের অন্যতমা পত্নী রাণীবাঈ নিজ পরিচারিকাগণসহ অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া মুসলমানদের হস্তে বন্দিনী হওয়ার ভয় হইতে পরিত্রাণ পাইলেন। ইহার পর বাহমনাবাদ নামক দুর্গ জয় করিতে গিয়া সেখানের হিন্দুদের সহিত মোহম্মদ-বিন্-কাশিমের এক ভীষণ যুদ্ধ শুরু হয়। এই দুর্গ রক্ষার জন্য বহুসংখ্যক হিন্দু প্রাণদান করিয়াও মোহম্মদকে প্রতিহত করিতে পারিল না। বাহমনাবাদ আরবদের অধীন হইল। বাহমনাবাদের পর আলোর জয় করিয়া মোহম্মদ মুলতানের দিকে অগ্রসর হইলেন। এখানেও এক দারুণ যুদ্ধ সংঘটিত হইল। বহুসংখ্যক হিন্দুর প্রাণনাশ করিয়া এবং ততোধিক সংখ্যক নরনারীকে দাসত্ব গ্রহণে বাধ্য করিয়া মোহম্মদ মুলতান শহরটি দখল করিলেন (৭১৩)। এইভাবে ৭১৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মোহম্মদ সিন্ধু ও পাঞ্জাবের সিন্ধু উপত্যকাস্থ অঞ্চলটি অধিকার করিলেন। সিন্ধুরাজ্য জয় করিয়াই মোহম্মদ ক্ষান্ত হইলেন না, তিনি পার্শ্ববর্তী অপরাপর ভারতীয় রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করিতে লাগিলেন।

রাওর-এর যুদ্ধে দাহির-এর পরাজয় (জুন ২০, ৭১২)

সমগ্র সিন্ধুদেশ মোহম্মদের করতলগত

পরবর্তী শাসক জুনিয়াদ (Guniad) মোহম্মদ অপেক্ষাও অধিকতর দৃঢ়-প্রতিজ্ঞভাবে রাজ্যবিস্তারে মনোযোগী হইলেন। আরবদের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, জুনিয়াদ মরমদ, (Marwar ?), অল্-মন্দল (Mandor ?), দহনজ, বরওয়াজ (Broach), উজ্জয়ীন, মালিভ (Malwa), বহরিমদ, অল্‌জুজ (Gurjara) প্রভৃতি দেশের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন। সমসাময়িক সংস্কৃত লিপি হইতেও জানা যায় যে, আরবগণ সিন্ধু, কুচ্, সুরাষ্ট্র, চকটক (রাজপুতানার চাপ নামক অঞ্চল), মালব ও ভিন্‌মালের পার্শ্ববর্তী গুর্জর অঞ্চল দখল করিয়াছিল। কিন্তু দক্ষিণে চালুক্যবংশ, পূর্বে প্রতিহারগণ ও উত্তরে কার্কটগণের হস্তে আরব আক্রমণ প্রতিহত হইয়াছিল।

মোহম্মদের পরবর্তী শাসক জুনিয়াদের রাজ্যবিস্তার

আরব আক্রমণ প্রতিহত

মোহম্মদ-বিন্-কাশিম সিন্ধু জয় করিয়া প্রথমে সেখানে এক অত্যাচারী

শাসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ধর্মের ক্ষেত্রে তিনি প্রথমে চরম অসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমেই তিনি তাঁহার এই ধর্মান্ধ, অত্যাচারী নীতি পরিবর্তন করিয়া ধর্মপালনের স্বাধীনতা, হিন্দুদের মন্দির ও খ্রীষ্টানদের গির্জা প্রভৃতি যাহাতে ধর্মান্ধ মুসলমানগণ কর্তৃক আক্রান্ত না হইতে পারে সেই ব্যবস্থা অবলম্বন করেন।

আরব শাসনের প্রকৃতি

বিজিত রাজ্যকে তিনি কতকগুলি জেলায় বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেক জেলায় একজন সামরিক কর্মচারীকে শাসনকার্যের দায়িত্ব অর্পণ করেন। সরকারী কর্মচারীদিগকে তাহাদের কাজের পরিবর্তে জমি জায়গীর হিসাবে দেওয়া হইত। কোন কোন ক্ষেত্রে অর্থদ্বারাও বেতন দেওয়া হইত। মসজিদ ও মুসলমান ধর্মজ্ঞানীদেরও সরকারী জমি ভোগ করিতে দেওয়া হইত।

শাসনব্যবস্থা

রাজস্বের প্রধান উৎস ছিল অ-মুসলমানদের নিকট হইতে প্রাপ্ত জিজিয়া কর ও জমির খাজনা। উৎপন্ন ফসলের এক-চতুর্থাংশ হইতে দুই-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত জিজিয়া কর আদায় করা হইত। বিচারের কোন সুবন্দোবস্ত ছিল না। স্থানীয় জমিদার বিচারকার্য নিষ্পন্ন করিতেন। হিন্দু প্রজাবর্গের বিচার করিতেন কাজি। মুসলমান আইন-কানুন অনুসারেই হিন্দুদেরও বিচার করা হইত। হিন্দুদের ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয়ে অমানুষিক কঠোর দণ্ডবিধির ব্যবস্থা ছিল। সামান্য চুরির অপরাধে দোষী ব্যক্তির পরিবারের সকলকে আগুনে পোড়াইয়া মারা হইত। হিন্দুদের মধ্যে পরস্পর বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার হিন্দু পঞ্চায়েতের উপর ন্যস্ত ছিল।

রাজস্ব

বিচারব্যবস্থা

চালুক্য, প্রতিহার ও কার্কটদের অবিরাম যুদ্ধ এবং আরব অধিকৃত দেশ-সমূহের আভ্যন্তরীণ স্বার্থ-দ্বন্দ্ব অল্পকালের মধ্যেই আরব আধিপত্য বিস্তারের পথ রুদ্ধ করিল। তদুপরি আরব খলিফার রাজনৈতিক দুর্বলতার সুযোগে সিন্ধুপ্রদেশের আরব নেতৃবৃন্দের মধ্যে অন্তর্বিরোধের সৃষ্টি হইল। শিয়া-সুন্নী ধর্মদ্বন্দ্ব রাজনৈতিক বিবাদ-বিসম্বাদের পরিপূরক হইয়া উঠিল। এই আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার সুযোগ লইয়া ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মোহম্মদ ঘুরী সমগ্র সিন্ধুদেশ জয় করিয়া আরব আধিপত্যের বিলোপ সাধন করিলেন।

সিন্ধুদেশে আরব শাসনের অবসান

ভারতে আরব অধিকার অতি ক্ষুদ্র অংশেই বিস্তারলাভ করিয়াছিল। রাজনৈতিক গুরুত্বের দিক দিয়া বিচার করিলে আরব অধিকার ভারত ইতিহাসের এক অতি অকিঞ্চিৎকর ঘটনা বলিয়া বিবেচনা করাই যুক্তিযুক্ত হইবে। ইংরেজ ঐতিহাসিক টড্ (Tod) তাঁহার 'রাজস্থানের ইতিহাস' (Annals and Antiquities of Rajasthan) গ্রন্থে আরব অধিকারের যে গুরুত্ব বর্ণনা করিয়াছেন, আধুনিক ঐতিহাসিক মাত্রেই তাহা অযৌক্তিক বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। স্টেন্‌লি লেনপুল (Stanley Lane-Poole) আরব অধিকারকে ফলাফলবিহীন এক অকিঞ্চিৎকর ঘটনা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন,* কিন্তু বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক দিক হইতে আরব অধিকার সম্পূর্ণ বিফল হইয়াছিল বলা চলে না। আরব অধিকৃত সিন্ধুদেশের বিভিন্ন অংশ কতকগুলি বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন ভারতীয় হিন্দুদের সহিত পাশাপাশি বসবাসের ফলে আরবগণ হিন্দু দর্শন, আয়ুর্বেদশাস্ত্র, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, সঙ্গীত, চিত্রশিল্পের জ্ঞান অর্জন করিয়াছিল। আরবদের মাধ্যমেই এই সকল বিষয়ের জ্ঞান ইওরোপীয় দেশে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। জনৈক আরব পণ্ডিত আবু মা'-শর বাণারসে আসিয়া দীর্ঘ দশ বৎসর জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। ভারতীয় হিন্দুসঙ্গীতজ্ঞ, চিত্রশিল্পী, রাজমিস্ত্রী প্রভৃতির অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় পাইয়া আরবগণ চমৎকৃত হইয়াছিল। আরব ঐতিহাসিক তবরি (Tabari)'র বর্ণনা হইতে জানা যায় খলিফা হারুন্ এক কঠিন রোগে আক্রান্ত হইলে একজন ভারতীয় হিন্দু চিকিৎসক তাঁহাকে রোগমুক্ত করিয়াছিলেন। শাসন-সংক্রান্ত কার্যাদিও আরবগণ ব্রাহ্মণদের নিকট হইতে শিখিয়াছিল। মনসুর যখন বাগদাদের খলিফা তখন ভারতীয় পণ্ডিতদের রচিত বহুগ্রন্থ ভারতীয়দের সাহায্যে আরবী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। ব্রহ্মগুপ্ত রচিত ব্রহ্মসিদ্ধান্ত ও খণ্ড-খাদ্যক নামক দুইখানি জ্যোতির্বিদ্যা-বিষয়ক গ্রন্থ এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য। গাণিতিক সংখ্যা-সম্পর্কে জ্ঞানও আরবগণ হিন্দুদের নিকট হইতে লাভ

আরব শাসনের ফলাফল

আরবদের উপর ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব

* "......an episode in the history of India and Islam, a triumph without result." Stanley Lane-Poole.

করিয়াছিল। এই কারণে আরবগণ 'সংখ্যা'কে 'হিন্দসাস্' (Hindasas) বলিত। আরবদেশের বহু শিক্ষার্থী ভারতবর্ষে আসিয়া ভারতীয় শাস্ত্রাদি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করিতেন, এবং বহু ভারতীয় পণ্ডিতকে তাঁহারা বাগদাদে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। বহু ভারতীয় চিকিৎসক বাগদাদের হাসপাতালে চিকিৎসক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আরব্য সাহিত্য, স্থাপত্যশিল্প ও সুকুমারশিল্প ভারতীয় প্রভাবের ফলে চরম উৎকর্ষ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।*

সিন্ধুদেশের হিন্দু জনসংখ্যার একাংশকে বলপূর্বক ইস্লাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু বৃহত্তর জনসমাজ বা তাহাদের ধর্ম, শিল্প, শিক্ষা, ভাষা বা সংস্কৃতির উপর আরবগণ কোন প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হয় নাই।

ভারত-ইতিহাসের উপাদান (মধ্যযুগ) (Sources of Medieval Indian History) :

ভারতের মধ্যযুগ তথা মুসলমান আমলের ইতিহাস রচনার উপকরণের প্রাচুর্য ঐতিহাসিককে বিভ্রান্ত করা বিচিত্র নহে। ঐ যুগের ইতিবৃত্ত-লেখক সুলতানদের সভাকবি, বিদেশী বণিক, পর্যটকদের পরস্পর-বিরোধী উক্তির মধ্য হইতে প্রকৃত সত্য নিরূপণ করাই হইল মধ্যযুগের ভারত-ইতিহাস রচয়িতার গুরু দায়িত্ব। অবশ্য প্রাচীন যুগের ন্যায় এই যুগের ইতিহাস রচনায় পরোক্ষ তথ্যাদির উপর নির্ভর করিতে হয় না। মধ্যযুগের ইতিহাস রচনার তথ্যাদিকে প্রধানতঃ পাঁচ ভাগে ভাগ করা চলে, যথা : (১) সরকারী দলিলপত্র, (২) সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের রচনা, (৩) বিদেশী পর্যটক ও বণিকদের বিবরণ, (৪) মুদ্রা ও শিল্প নিদর্শন, (৫) হিন্দু লেখকদের রচনা।

ঐতিহাসিক উপকরণের প্রাচুর্য

(১) সরকারী দলিলপত্র (State Papers) : সুলতানি ও মোগল আমলের সরকারী দলিলপত্রাদি ঐ সময়ের ইতিহাস রচনার অতিশয় নির্ভর-

* "It was India, not Greece, that taught the Islam in the impressionable years of its youth, formed its philosophy and esoteric religious ideals and inspired its most characteristic expression in literature, art and architecture." *Aryan Rule in India*, Havell, p. 256.

যোগ্য উপকরণ, সন্দেহ নাই। বিশেষভাবে মোগল আমলে সরকারী কাগজপত্র সংরক্ষণের বন্দোবস্ত ছিল। কিন্তু এই সকল দলিলপত্রের অধিকাংশই পরবর্তী কালের যুদ্ধবিগ্রহের ফলে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। মোগল সম্রাট আকবরের গ্রন্থাগারে চব্বিশ হাজার পাণ্ডুলিপি ছিল, কিন্তু এগুলির একটিও রক্ষা পায় নাই। যাহা হউক, যাহা কিছু সরকারী ও বেসরকারী দলিলপত্র পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে ঐ যুগের ইতিহাস রচনার মূল্যবান উপকরণ সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়াছে।

সরকারী দলিলপত্রের অধিকাংশ বিনাশপ্রাপ্ত

(২) সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের রচনা (Writings of the Contemporary Historians) : (ক) অল্‌বেরুণী (Alberuni) নামে জনৈক মুসলমান পণ্ডিত প্রথমে গজনীর সুলতান মামুদের রাজসভায় ছিলেন। কিন্তু সুলতান মামুদ কর্তৃক পাঞ্জাব অধিকৃত হইলে তিনি গজনী হইতে পাঞ্জাবে চলিয়া আসেন। ভারতবর্ষে আসিয়া তিনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন এবং হিন্দু দর্শনশাস্ত্রে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি 'তহ্‌-কক্‌-ই-হিন্দ্‌'* (*An Enquiry into India*) নামে একখানি অতি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে ভারতীয় দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিতশাস্ত্র, রসায়ন বিদ্যা, ভূগোল প্রভৃতির এক অতি মনোজ্ঞ বর্ণনা রহিয়াছে। সমসাময়িক হিন্দুসমাজের রীতিনীতি, আচার-আচরণ প্রভৃতি সম্পর্কেও তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। অল্‌বেরুণী ভগবদ্‌গীতার দার্শনিক প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন।

অল্‌বেরুণী

(খ) মিন্‌হাজ-উস্‌-সিরাজ (Minhaj-us-Siraj) এবং হাসান নিজামীর (Hasan Nizami) রচনা হইতে দাস রাজবংশের রাজত্বকাল সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্যাদি সংগ্রহ করা যায়। মিন্‌হাজ-উস্‌-সিরাজ নাসির উদ্দিন মোহম্মদের অধীনে এক উচ্চ রাজকর্মচারিপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার 'তবকৎ-ই-নাসিরী' নাসির-উদ্দিনের রাজত্বকালের এক অতি মূল্যবান ঐতিহাসিক রচনা।

মিন্‌হাজ-উস্‌-সিরাজ ও হাসান্‌-নিজামী

---

* "The title of the book is *Kitabun fi Tahqiq-i-ma li-l-Hind*" Sachau, Text, Pref. p. IV, and p. 1. vide : Elliot & Dowson : *History of India as told by her own Historians, vol. II (Reprint), p. 777.*

(গ) আমীর খুস্রু বা খুস্রভ (Amir Khusrav) ছিলেন গিয়াস-উদ্দিন বলবনের আমলের শ্রেষ্ঠ কবি ও সাহিত্যিক। পরবর্তী কালে তিনি আলা-উদ্দিন খল্জীর সভাকবির পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনা হইতে কেবল তাঁহার কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় এমন নহে, ঐ যুগের ইতিহাস রচনায়ও তাঁহার গ্রন্থাদির যথেষ্ট গুরুত্ব রহিয়াছে।

আমীর খুস্রু

(ঘ) মোবারক শাহ্ ও মোহম্মদ-বিন্-তোঘলক-এর আমলের একজন অতি সুদক্ষ শাসনকর্তা আইন্-উল্-মুল্ক (Ain-ul-Mulk) ইসলামধর্ম ও মুসলমান আইন-কানুন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন। 'মুনসাৎ-ই-মহরা' (Munshat-i-Mahra) নামে একখানি গ্রন্থে তিনি ফিরুজ তোঘলকের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে এক বিশদ বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন।

আইন্-উল্-মুল্ক

(ঙ) জিয়া-উদ্দিন বর্ণী (Zia-ud-din-Barni) সুলতানি আমলের আরম্ভ হইতে ফিরুজ তোঘলকের রাজত্বকালের প্রথম ছয় বৎসর পর্যন্ত ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করিয়া গিয়াছেন। ফিরুজ তোঘলকের রাজত্বকাল সম্পর্কে তাঁহার রচিত 'তারিখ-ই-ফিরুজশাহী' (Tarikh-i-Firuz Shahi) একটি অতি মূল্যবান গ্রন্থ। ইসামি রচিত 'ফতোয়া-উস্-সালাতিন' (Futuh-us-Salatin) একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ভারতের একটি সুন্দর ইতিহাস-কাব্য।

জিয়া-উদ্দিন বর্ণী

(চ) ফিরুজ শাহের স্ব-রচিত 'ফতোয়াৎ-ই-ফিরুজশাহী' (Futuhat-i-Firuz Shahi) গ্রন্থে ফিরুজশাহের শাসনব্যবস্থার একটি ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায়। ইহা ভিন্ন ফিরুজশাহের রাজত্বকাল সম্পর্কে শাম্স্-ই-সিরাজ, আইন-উল্-মুল্ক, আমির খুস্রু, এহিয়া-বিন্-আহমদ, আজ-উদ্দিন খলিদ খানি প্রভৃতি লেখকদের রচনা হইতেও নানাবিধ মূল্যবান তথ্যাদি পাওয়া যায়।

ফতোয়াৎ-ই-ফিরুজশাহী, শাম্স-ই-সিরাজ, আইন্-উল্-মুল্ক, এহিয়া-বিন্-আহমদ, আজ-উদ্দিন

(ছ) বাবর-এর জীবনস্মৃতি (Memoirs), জাহাঙ্গীর-এর জীবনস্মৃতি, হুমায়ুনের অনুচর জৌহর রচিত 'তজকিরাৎ-উল্-ওয়াকিয়াৎ' (Tajkirat-ul-wakiat), গুল্‌বদন বেগম রচিত 'হুয়ায়ুননামা' প্রভৃতি গ্রন্থ হইতেও প্রচুর ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করা যায়।

বাবর ও জাহাঙ্গীরের জীবনস্মৃতি, জৌহর ও গুল্‌বদন-রচিত গ্রন্থাদি

(জ) সমগ্র মুসলমানযুগের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ছিলেন ফেরিস্তা (Ferishtah)। তিনি মোগল সম্রাট আকবরের সভার সভাসদ্ ছিলেন। তিনি মোগল যুগ ও মোগল যুগের পূর্ববর্তী কালের ইতিহাস রচনা করিয়া গিয়াছেন।

ফেরিস্তা

(ঝ) আকবরের রাজত্বকাল সম্পর্কে বিশদ এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনা আবুল ফজল-এর 'আইন-ই-আকবরী' (Ain-i-Akbari) ও 'আকবরনামা' (Akbarnama) নামক গ্রন্থদ্বয় হইতে পাওয়া যায়। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালের ইতিহাস রচনায় এই দুইখানি গ্রন্থ অপরিহার্য বলা যাইতে পারে। বদাউনীর (Badauni) 'মুন্তাখাব্-উৎ-তোয়ারিখ' (Muntakhab-ut-Tawarikh) ও নিজামউদ্দিন আহ্‌মেদ রচিত "তবকত-ই-আকবরী' (Tabaqat-i-Akbari) সমসাময়িক ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আবুল ফজল ও বদাউনী

(ঞ) 'আলমগীরনামা', 'পাদশাহীনামা' নামে দুইখানি ঐতিহাসিক গ্রন্থে শাহজাহান ও ঔরঙ্গজেব-এর রাজত্বকালের তথ্যাদি সন্নিবিষ্ট আছে। 'মাসির-ই-আলমগীর' ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালের একখানি নির্ভরযোগ্য ইতিহাসগ্রন্থ। কাফি খাঁ রচিত 'মুন্তাখাব-উল্-লুবাব্' (Muntakhab-ul-Lubab) গ্রন্থ হইতে ঔরঙ্গজেবের আমলের বহু মূল্যবান গোপনীয় তথ্যাদি পাওয়া যায়।

আলমগীরনামা, পাদশাহীনামা; কাফি খাঁ

(৩) বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ (Accounts of Foreign Travellers) : সুলতানি ও মোগল আমলে বহু বিদেশী পর্যটক ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের অনেকেই সমসাময়িক রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক, ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের রচনায় স্বভাবতই মধ্যযুগের ভারত-ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ পাওয়া যায়। (ক) ইতালীয় পর্যটক মার্কো পোলো (Marco Polo) ত্রয়োদশ শতাব্দীর

শেষভাগে দক্ষিণ-ভারতের তামিল রাজ্যে আসেন। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে তদানীন্তন দক্ষিণ-ভারতের সমৃদ্ধি সম্পর্কে কতক মূল্যবান তথ্য সন্নিবিষ্ট আছে। (খ) সুলতানি আমলের সর্বাপেক্ষা খ্যাতনামা বিদেশী পর্যটক ছিলেন আফ্রিকাবাসী ইবন্ বতুতা (Ibn Batuta)। ইঁনি চতুর্দশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি মোহম্মদ-বিন্-তোঘলকের অধীনে রাজকর্মচারী হিসাবে কিছুকাল কাজও করিয়াছিলেন। ইবন্ বতুতা মোহম্মদ-বিন্-তোঘলকের আমলের একখানি নিখুঁত ইতিবৃত্ত রচনা করিয়া গিয়াছেন। জিয়া-উদ্দিন বরণীর বর্ণনার সহিত ইবন্ বতুতার বর্ণনার যথেষ্ট সামঞ্জস্য আছে। আলা-উদ্দিন-এর কথা বলিতে গিয়া ইবন্ বতুতা তাঁহাকে দিল্লীর সুলতানদের শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইবন্ বতুতা বাংলাদেশের ঐশ্বর্য ও জমির উর্বরতা সম্পর্কেও উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। (গ) মাহুয়ান (Mahuan) নামে জনৈক চীনদেশীয় পর্যটক পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে আসিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণনা হইতে সে সময়কার বাংলাদেশের ঐশ্বর্য ও প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্যের কথা জানিতে পারা যায়। তিনি বাংলাদেশে প্রস্তুত সামগ্রীর ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। (ঘ) মধ্যযুগে ইতালীয় পর্যটক নিকোলো কন্টি (Nicolo Conti), পারসিক পর্যটক আব্দুর্ রজাক, রুশ পর্যটক আথেনেসিয়াস্ নিকিতিন (Athanusius Nikitin), পোর্তুগীজ পর্যটক পায়েজ (Paes) ও নুনিজ (Nunitz) প্রভৃতি বিদেশী পর্যটকগণ দক্ষিণ-ভারতে আসিয়াছিলেন। ঐ সময়কার দক্ষিণ-ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ইঁহাদের বর্ণনা হইতে জানিতে পারা যায়। (ঙ) মোগল যুগে জেসুইট্ ধর্মযাজকগণের (Jesuit missionaries) রচনা, র‍্যাল্ফ্ ফিচ্, টমাস রো, টেভারনিয়ে, বার্ণিয়ে ক্যারেরি, টেরি, পার্কাস্, মানুচি প্রভৃতি ইওরোপীয় পর্যটকদের বর্ণনা হইতে সমসাময়িক রাজনৈতিক ইতিহাস, জনসাধারণের অবস্থা, ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতি প্রভৃতি নানাবিষয় সম্পর্কে জানা যায়।

মার্কো পোলো

ইবন্ বতুতা

চীনা পর্যটক মাহুয়ান

নিকোলা কন্টি, আব্দুর রজাক, নিকিতিন, পায়েজ ও নুনিজ

জেসুইট্ যাজকগণ, ফিচ্, রো, টেভার্নিয়ে, বার্ণিয়ে, টেরি, পার্কাস্ ও মানুচি প্রভৃতি

(৪) মুদ্রা ও শিল্প নিদর্শন (Coins and Monuments) :

সুলতানি ও মোগল যুগের স্থাপত্যশিল্প ও ললিত কলার বহু নিদর্শন আজও বিদ্যমান। এগুলি হইতে ঐ যুগের ভারতীয় স্থাপত্য ও অপরাপর শিল্পকলার উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়। সুলতানি আমলের স্থাপত্যশিল্পে হিন্দু ও মুসলমান শিল্পকৌশলের সংমিশ্রণের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সুলতানি ও মোগল আমলের মুদ্রাগুলি ঐ যুগের মুদ্রানীতি ও ধাতুশিল্পের পরিচয় দিয়া থাকে।

মুদ্রা, স্থাপত্য ও শিল্পকলা

(৫) হিন্দু লেখকদের রচনা (Writings of Hindus) :

মোগল আমলে রচিত মারাঠা ইতিহাস গ্রন্থের মধ্যে 'সভাসদ্ বখর' নামক গ্রন্থখানি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শিবাজীর সমসাময়িক জনৈক ঐতিহাসিক এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছিলেন। সুজন রায় ভাণ্ডারি রচিত 'খুলাসাৎ-উৎ-তোয়ারিখ্' (Khulasat-ut-Twarikh) নামক গ্রন্থে গজনীবংশের শাসনকাল হইতে দিল্লী সুলতানের প্রথম দিকের ইতিহাস বর্ণিত আছে। রাজপুত চারণদের চারণগীতি রাজপুত ইতিহাস রচনার সহায়ক। টড্-এর 'রাজস্থানের ইতিহাস' (Annals and Antiquities of Rajasthan) প্রধানতঃ রাজপুত চারণদের রচনার উপর নির্ভর করিয়াই রচিত হইয়াছে। এই কারণে টডের গ্রন্থখানি নির্ভুল ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত হয় না। এই চারণদের রচনা এবং টডের 'রাজস্থানের ইতিহাস'-এর মধ্যে কতক কতক ঐতিহাসিক বৃত্তান্তও রহিয়াছে। শিখদের 'গ্রন্থসাহেব' ও অপরাপর ধর্মগ্রন্থাদি হইতে শিখধর্মের উৎপত্তির ইতিহাস সম্পর্কে জানা যায়।

মারাঠা, রাজপুত ও শিখদের রচনা

মুসলমান আক্রমণকালে উত্তর-ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি (Political Condition of Northern India on the eve of the Muslim Invasion) :

গজনীর সুলতান মামুদ যখন ভারত অভিযান শুরু করেন তখন বিন্ধ্য-পর্বতের উত্তরস্থ সমগ্র ভূভাগ কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল। স্বভাবতই সুলতান মামুদ তথা অপর কোন মুসলমান আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে

মুসলমান আক্রমণকালে
ভারতবর্ষ
(একাদশ শতক)
০ ৩৫০ ৭০০
মাইল
ঘুর
পেশোয়ার
গজনী
কার্কট
কাংড়া
শতদ্রু নং
সিন্ধু নং
তোমর
চৌহান
দিল্লী
গঙ্গা নং
কনৌজ
মথুরা
প্রয়াগ
চন্দেল্ল
কাশী
গঙ্গা নং
পাল
ব্রহ্মপুত্র নং
অনহিলবার
পরমার
উজ্জয়িনী
কলচুরি
চালুক্য
নর্মদা নং
সোমনাথ
তাপ্তী নং
যাদব
মহানদী
গোদাবরী নং
চালুক্য
কাকতীয়
কৃষ্ণা নং
চোল
পাণ্ড্য
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর

দণ্ডায়মান হইবার মতো প্রথম পর্যায়ের কোন হিন্দু রাজশক্তি তখন ছিল না। চন্দ্রগুপ্ত, অশোক, কণিষ্ক, সমুদ্রগুপ্ত বা হর্ষবর্ধনের ন্যায় কোন শক্তিশালী রাজাও তখন উত্তর-ভারতে ছিলেন না।

সুলতান মামুদের আক্রমণকালে উত্তর-পশ্চিম ভারতে শাহিবংশের হিন্দু রাজা জয়পাল রাজত্ব করিতেন। তাঁহার রাজ্যসীমা চিনাব নদী হইতে কাবুলের লঘ্‌মান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। শাহিরাজ্যের রাজধানী ছিল উদ্‌ভাণ্ডপুর (বর্তমান উন্দ্‌)। আজমীর ও দিল্লীতে তখন চৌহান বংশ রাজত্ব করিতেছিল। কনৌজ তখন ছিল গাহ্‌ড়বাল বংশের অধীনে; আর বুন্দেলখণ্ডে চন্দেল্ল বংশ, মালব দেশে পরমার বংশ, গুজরাটে চালুক্য বংশ, বুন্দেলখণ্ডের দক্ষিণে ডাহল রাজ্যে চেদীবংশ, বাংলাদেশে পালবংশ ও কাশ্মীর রাজ্যে কার্কট বংশ রাজত্ব করিতেছিল।

প্রথম অধ্যায়

ভারতে মুসলমান শক্তির উত্থান

(Rise of the Muslim Power in India)

গজনী বংশ (The Ghaznavids):

দশম শতকের শেষ-ভাগে গজনীর তুর্কী মুসলমানদের ভারত আক্রমণ

অষ্টম শতকে সিন্ধুদেশে আরব আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে উহার কোন গুরুত্ব ছিল না, ইস্‌লাম ধর্মও সিন্ধুদেশের সীমা অতিক্রম করিয়া ভারতীয় ধর্ম-জীবনকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। ইস্‌লাম ধর্মের বিস্তৃতি সিন্ধুদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল। দশম শতকের শেষভাগে গজনীর তুর্কী মুসলমানদের ভারত আক্রমণের সময় হইতেই ভারতবর্ষে মুসলমান আধিপত্য স্থাপনের এবং ইস্‌লাম ধর্ম-বিস্তারের যুগের সূচনা হইয়াছিল বলা যাইতে পারে।

দশম শতকের মধ্যভাগে আফগানিস্তানের সুলেমান পার্বত্য অঞ্চলে আল্‌প্তিগীন নামে জনৈক ভাগ্যান্বেষী তুর্কী মুসলমান কর্তৃক গজনী রাজ্য

প্রতিষ্ঠিত হয়। আল্‌প্তিগীন প্রথম জীবনে একজন ক্রীতদাস ছিলেন। স্বীয় প্রতিভাবলে তিনি পারস্যের সামানিদ বংশের (The Samanids) অধীনে প্রাদেশিক শাসনকর্তার পদে উন্নীত হন। সামানিদ সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল বোখারা। সামানিদ সম্রাটদের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া আল্‌প্তিগীন গজনীতে এক স্বাধীন রাজ্য স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন। আল্‌প্তিগীনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ইশাক্ সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু অতি অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে আল্‌প্তিগীনের একজন বিশ্বস্ত ক্রীতদাস বক্তিগীন গজনীর সিংহাসন প্রাপ্ত হন। বক্তিগীনের পরবর্তী আমীরের নাম ছিল পীরাই। ৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে পীরাই সিংহাসনে আরোহণ করিবার অব্যবহিত পরে উত্তর-পশ্চিম ভারতে শাহিবংশের রাজা জয়পাল সীমান্তবর্তী গজনীরাজ্যের শক্তিবৃদ্ধি বাঞ্ছনীয় নহে মনে করিয়া উহা আক্রমণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার এই আক্রমণ বিফলতায় পর্যবসিত হইল।*

গজনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা: আল্‌প্তিগীন

ইশাক্, বক্তিগীন ও পীরাই

জয়পাল কর্তৃক গজনী আক্রমণ

৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দে পীরাই জনসাধারণ কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইলে আল্‌প্তিগীনের ক্রীতদাস ও জামাতা সবুক্তিগীন গজনীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। তিনি অবশ্য মুখে সামানিদ বংশের সম্রাটদের আনুগত্য স্বীকার করিলেন, কিন্তু কার্যতঃ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করিতে লাগিলেন। শাহিবংশের রাজা জয়পাল বণিক ও পর্যটকদের মুখে সবুক্তিগীন কর্তৃক তাঁহার রাজ্যের সীমান্ত দেশের কতক অঞ্চল অধিকারের কথা শুনিয়া সবুক্তিগীনকে শাস্তিদানের জন্য অগ্রসর হইলেন (৯৭৯)। ঘুজাক্ (Ghuzak) নামক স্থানে জয়পাল সবুক্তিগীনের

জয়পাল কর্তৃক দ্বিতীয়বার গজনী আক্রমণ (৯৭৯)

---

* "Pirai succeeded in 972, whose reign of five years is remarkable for the first conflict in this reign between Hindus and Muslims, the former being the aggressors. The raja of the Punjab, whose dominions extended to the Hindukush and included Kabul, was alarmed by the establishment of a Muslim kingdom to the south of the great mountain barrier and invaded the dominion of Ghazni, but was defeated." *The Cambridge History of India, Vol. III.* p. 11.

সেনাবাহিনীর সম্মুখীন হইলেন। কিন্তু এক দারুণ তুষারপাতের ফলে উভয়পক্ষের মধ্যে এক যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল।* এই ঘটনার সাতবৎসর পর (৯৮৬) সবুক্তিগীন নিজ সামরিক শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়া জয়পালের রাজ্য আক্রমণ করিলেন এবং বহুসংখ্যক লোককে বন্দী হিসাবে ও প্রভূত পরিমাণ অর্থ লইয়া গজনীতে ফিরিয়া গেলেন। ইহার দুই বৎসর পর (৯৮৮) সবুক্তিগীন পুনরায় জয়পালের রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে কাবুল ও উহার নিকটবর্তী কতক অঞ্চল সমর্পণে বাধ্য করিলেন। ইহার অল্পকালের মধ্যেই সবুক্তিগীনের মৃত্যু হইল (৯৯৭)। সবুক্তিগীন ভারতবর্ষের দিকে বেশিদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু তিনি ভারত-অভিযানের ইঙ্গিত রাখিয়া গেলেন। তাঁহার পুত্র মামুদ সবুক্তিগীনের এই ইঙ্গিত অনুসরণ করিয়া বারবার ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে অভিযানে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

সবুক্তিগীন কর্তৃক জয়পালের রাজ্য আক্রমণ (৯৮৬); দ্বিতীয় আক্রমণ (৯৮৮)

সবুক্তিগীনের মৃত্যু: মামুদের সিংহাসন লাভ

সুলতান মামুদ (Sultan Mahmud): সিংহাসন আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে মামুদ পিতা সবুক্তিগীনের নীতি অনুসরণ করিয়া সামানিদ বংশের আনুগত্য স্বীকার করিলেন, কিন্তু অল্পকালের মধ্যে সামানিদ সম্রাটপদ লইয়া স্বার্থান্বেষী কর্মচারীদের মধ্যে আত্মকলহ দেখা দিলে মামুদ নিজেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তিনি খলিফা অল্-কাদের বিল্লাহ্-এর নিকট হইতে 'ইয়ামিন্-উদ্-দৌলা' ও 'আমিন-উল্-মিলাত' উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। মামুদ গজনীবংশের চিরাচরিত রীতি ত্যাগ করিয়া নিজেকে 'আমীর'-এর পরিবর্তে 'সুলতান' বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তারপর তিনি পৌত্তলিক হিন্দুগণ অধ্যুষিত ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে প্রবৃত্ত হইলেন। ১০০০ হইতে ১০২৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রায় প্রতি বৎসরই সুলতান মামুদ ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে অভিযানে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

'ইয়ামিন্-উদ্-দৌলা' ও 'আমিন্-উল্-মিলাত' উপাধি লাভ

* "Two years after his (Sabuktigin's) accession Jaipal, raja of the Punjab, again invaded the kingdom of Gazni from the east, but terms of peace were arranged." *Ibid.* p. 12.

তিনি মোট কতবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন সে বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতানৈক্য রহিয়াছে। সার্ হেন্‌রী ইলিয়ট (Sir Henry Elliot)-এর মতে সুলতান মামুদ মোট সতরবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন।* আধুনিক ঐতিহাসিকগণ সার্ হেন্‌রী ইলিয়টের মত-ই গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করেন।

মোট সতরবার ভারতবর্ষ আক্রমণ

সুলতান মামুদ ১০০০ খ্রীষ্টাব্দে খাইবার গিরিপথের সীমান্তবর্তী কয়েকটি শহর আক্রমণ করেন। এই অভিযানের ফলে তিনি কয়েকটি জেলা ও কয়েকটি দুর্গ দখল করিতে সক্ষম হন। নব-বিজিত স্থানে তিনি একজন শাসক নিযুক্ত করিয়া পর্যাপ্ত পরিমাণে ধনদৌলত লইয়া স্বদেশে ফিরিয়া যান।

প্রথম অভিযান (১০০০)—সীমান্তবর্তী শহরের বিরুদ্ধে

প্রথম অভিযানের অল্পকালের মধ্যেই (১০০০) সুলতান মামুদ দশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যসহ 'ধর্মের ধ্বজা উড্ডীন করিবার এবং ন্যায়, সত্য ও সুবিচার প্রভৃতির প্রাধান্য স্থাপনের জন্য' জয়পালের বিরুদ্ধে অভিযানে অগ্রসর হইলেন।† জয়পালও সামরিক প্রস্তুতিতে পশ্চাদ্‌পদ হইলেন না। পেশওয়ার-এ উভয় পক্ষের সৈন্যদের মধ্যে এক ভীষণ যুদ্ধ হইল। পনর হাজার হিন্দুসৈন্য এই যুদ্ধে প্রাণ হারাইল। মামুদ যুদ্ধে জয়ী হইলেন। জয়পাল তাঁহার পনর জন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ও অসংখ্য অনুচরসহ সুলতান মামুদের হস্তে বন্দী হইলেন। জয়পালের গলা হইতে বহুমণি-মুক্তা-খচিত হার মামুদের আদেশে কাড়িয়া লওয়া হইল। জয়পাল

দ্বিতীয় অভিযান (১০০০)—জয়পালের বিরুদ্ধে

* "The following is Sir H. M. Elliot's arrangement :
1. Frontier towns, A.D. 1000 ; 2. Peshwar and Waihind, 1001 ; 3. Bhira (Bhatia), 1004 ; 4. Multan, 1006 ; 5. Against Nawasa Shah, 1007 ; 6. Nagarkot, 1008 ; 7. Narain, 1009 ; 8. Multan, 1010 ; 9. Ninduna, 1013 ; 10. Thanesvar, 1014 ; 11. Lohkot, 1015 ; 12. Mathura, Kanauj, 1018 ; 13. The Rahib, 1021 : 14. Kirat, Lohkot, Lahore, 1022 ; 15. Gwalior, Kalinjar, 1023 ; 16. Somnath, 1025-26 ; 17. The Jats, 1026-27 ; 18. *Mediaeval India under Mohammedan Rule*, Lane-Poole, pp. 18-19, Foot-note.

† "......For the purpose of exalting the standard of religion, of widening the plain of right, of illuminating the words of truth and of strengthening the power of justice." Vide, *History of Mediaeval India*, Ishwari Prasad, p. 80.

আড়াই লক্ষ দিনার (dinars) ও দেড় শত হাতী মুক্তিপণ হিসাবে দিতে স্বীকৃত হইলে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া স্থির হইল। কিন্তু মুক্তিপণের সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ যোগাড় করা সম্ভব না হওয়ায় কয়েকজন প্রতিভূর বিনিময়ে জয়পাল ও তাঁহার অনুচরবর্গকে মুক্তি দেওয়া হইল। মামুদ স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই জয়পালের পুত্র আনন্দপাল প্রতিশ্রুত মুক্তিপণের অবশিষ্টাংশ আদায় করিয়া দিয়াছিলেন।* সুলতান মামুদের হস্তে বন্দী হওয়ার অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া জয়পাল রাজ্য-ভার নিজ পুত্র আনন্দপালের হস্তে সমর্পণ করিয়া জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

জয়পালের জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রাণত্যাগ: আনন্দপালের সিংহাসন লাভ

১০০৪ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান মামুদ তাঁহার তৃতীয় অভিযানে ঝিলাম নদীর তীরবর্তী 'ভীর' (Bhira) নামক শহরটি জয় করিলেন। তারপর তিনি মুলতান জয় করিবার উদ্দেশ্যে চতুর্থ অভিযানের জন্য প্রস্তুত হইয়া পাঞ্জাব অঞ্চলের রাজা আনন্দপালের রাজ্যের মধ্য দিয়া সসৈন্যে যাইবার প্রস্তাব করিলেন। মুলতান রাজ্যের অধিপতির সহিত আনন্দপালের মিত্রতা ছিল, ইহা ভিন্ন মামুদ ছিলেন তাঁহার পিতৃশত্রু। স্বভাবতই তিনি তাঁহার রাজ্যের মধ্য দিয়া মামুদকে সসৈন্যে যাইবার অনুমতি দিলেন না। ফলে, মামুদ আনন্দপালের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। কিন্তু মুলতান নিজ প্রাধান্যাধীনে আনিতে মামুদকে বেশি বেগ পাইতে হইল না। মুলতানের রাজা আবুল ফতা দাউদ্ বাৎসরিক করদানে স্বীকৃত হওয়ায় সুলতান মামুদ মুলতানের অবরোধ উঠাইয়া লইলেন।

তৃতীয় অভিযান (১০০৪)—ভীর নামক শহরের বিরুদ্ধে: চতুর্থ অভিযান (১০০৬)—মুলতান-এর বিরুদ্ধে

* "A treaty was made, by which he agreed to pay 250,000 *dinars* as ransom and to give fifty elephants, and his son and grandson as hostages for fulfilling the conditions of peace." Vide, *History of Mediaeval India*, Ishwari Prasad, p. 80 কিন্তু *Cambridge History of India*-তে বলা হইয়াছে:

"......Jaipal was permitted to ransom himself for a large sum of money and a hundred and fifty elephants, but as the ransom was not at once forthcoming was obliged to leave hostages for its payment. His son Anandapal made good the deficiency and the hostages were released before Mahmud returned to Ghazni."—*The Cambridge History of India, Vol. III*, p. 14.

ইতিমধ্যে কাশগড়ের রাজা গজনীরাজ্য আক্রমণ করিয়াছেন সংবাদ পাইয়া মামুদ ভারতবর্ষে তাঁহার বিজিত স্থানগুলি নওয়াজ শাহ্-এর শাসনাধীনে স্থাপন করিয়া গজনীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। নওয়াজ শাহ্ ছিলেন জাতিতে হিন্দু, তাঁহার নাম ছিল সেবকপাল। মামুদ ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবার সঙ্গে সঙ্গে নওয়াজ শাহ্ ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া সুলতান মামুদের আনুগত্য অস্বীকার করিলেন। কিন্তু মামুদ অল্পকালের মধ্যেই নওয়াজ শাহ্‌কে পরাজিত ও বন্দী করিতে সমর্থ হইলেন। নওয়াজ শাহ্‌কে জীবনের অবশিষ্ট কাল কারাগারে কাটাইতে হইল।

চতুর্থ অভিযান (১০০৭)—নওয়াজ শাহ্-এর বিরুদ্ধে

১০০৮ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান মামুদ আনন্দপালের বিরুদ্ধে অভিযানে অগ্রসর হইলেন। আনন্দপাল মামুদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে পূর্ব হইতেই সন্দিহান ছিলেন। তিনি জানিতেন যে, তাঁহার রাজ্যের মধ্য দিয়া সসৈন্যে যাইবার অনুমতিদানে অস্বীকৃত হওয়ার কথা সুলতান মামুদ ভুলিবার পাত্র নহেন। আনন্দপালও সেজন্য গোয়ালিওর, কালিঞ্জর, কনৌজ, দিল্লী ও আজমীর-এর রাজগণের সহিত সম্মিলিতভাবে সুলতান মামুদের আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। কাশ্মীরের পাদদেশে বসবাসকারী দুর্ধর্ষ খোকর জাতির (Khokars) সাহায্যও আনন্দপাল লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

পঞ্চম অভিযান (১০০৮)—আনন্দপালের বিরুদ্ধে

পেশওয়ার ও উন্দ্-এর মধ্যবর্তী অঞ্চলে উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ বাধিলে প্রথমেই ত্রিশ হাজার খোকর সৈন্যের আক্রমণে সুলতান মামুদের সেনাবাহিনী বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। মামুদের অসংখ্য সৈন্য প্রাণ হারাইল। এমতাবস্থায় মামুদ যুদ্ধে পৃষ্ঠভঙ্গ দেওয়াই যখন স্থির করিয়াছেন তখন এক আকস্মিক ঘটনার ফলে তিনি যুদ্ধে একপ্রকার পরাজিত হইয়াও জয়লাভ করিলেন। আনন্দপালের জয়লাভ যখন নিশ্চিত তখন যে হাতীর উপর চড়িয়া তিনি যুদ্ধ করিতেছিলেন সেই হাতী ভয় পাইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলাইয়া গেল। আনন্দপাল যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিতেছেন মনে করিয়া তাঁহার সেনাবাহিনীও যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিতে লাগিল। সুলতান মামুদ সুযোগ পাইয়া পলায়মান হিন্দুবাহিনীর আট হাজার সৈন্যের প্রাণনাশ করিলেন। এইভাবে যুদ্ধে

তাঁহারই জয় হইল। তিনি নগরকোট বা কাংড়া দুর্গের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই দুর্গ সর্বাপেক্ষা অধিক সুরক্ষিত ছিল বলিয়া বহু হিন্দুরাজা ও অর্থশালী ব্যক্তি সেখানে তাঁহাদের মণি-মুক্তা ও ধনরত্ন জমা রাখিতেন। সুলতান মামুদ অতি সহজেই দুর্গ টি জয় করিয়া সেখান হইতে অভাবনীয় পরিমাণ ধনদৌলত লইয়া গেলেন। এই দুর্গের অভ্যন্তরে একটি মন্দির ছিল উহা হইতে তিনি প্রভূত পরিমাণ সোনা ও রূপা লুণ্ঠন করিলেন। লুণ্ঠিত দ্রব্যাদির মধ্যে ত্রিশ গজ দীর্ঘ ও পনর গজ প্রশস্ত একটি রৌপ্য নির্মিত গৃহ ছিল। এই গৃহের অভ্যন্তরে দুইটি স্বর্ণ ও দুইটি রৌপ্য নির্মিত স্তম্ভের সাহায্যে একটি চাঁদোয়া খাটান ছিল। মামুদ এই চারিটি স্তম্ভ লইয়া গিয়াছিলেন। ফেরিস্তা-এর বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, কাংড়া দুর্গ হইতে মামুদ মোট সাত লক্ষ দিনার, সাত শত মণ সোনা ও রূপার পাত, দুইশত মণ খাঁটী সোনা, দুই হাজার মণ রূপা ও কুড়ি মণ মণি-মুক্তা লইয়া গিয়াছিলেন। কাংড়া হইতে লুণ্ঠিত সোনা, রূপা ও মণি-মুক্তা গজনী রাজ্যে লইয়া গেলে সেখানে সমবেত বৈদেশিক দূতগণ বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়াছিলেন।

কাংড়া দুর্গ লুণ্ঠন

হিন্দু রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযানের ফলে যে বিশাল পরিমাণ ধনদৌলত সুলতান মামুদের হস্তগত হইয়াছিল তাহাতে তাঁহার অর্থগৃধ্নুতা আরও বৃদ্ধি পাইল। তিনি হিন্দুমন্দির আক্রমণ ও হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি ভাঙিবার জন্য আরও উৎসুক হইয়া পড়িলেন। তিনি 'গাজী' (Victor) ও 'বাত্-শিকান্' (Idol-breaker) উপাধিতে নিজেকে ভূষিত করিলেন।

সুলতান মামুদের 'গাজী' ও 'বাত্-শিকান্' উপাধি গ্রহণ

সুলতান মামুদের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য অভিযান হইল থানেশ্বর আক্রমণ। ইহা ছিল তাঁহার দশম অভিযান (১০১৪)। মামুদ এই অভিযানের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন সংবাদ পাইয়া থানেশ্বর-রাজ গজনীতে এক দূত প্রেরণ করিয়া বাৎসরিক পঞ্চাশটি হাতী করদানের প্রস্তাব জানাইলেন। মামুদ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন এবং কালবিলম্ব না করিয়া থানেশ্বরের দিকে অগ্রসর হইলেন। থানেশ্বর-এ উপস্থিত হইয়া তিনি সেখানকার বিখ্যাত হিন্দু মন্দিরটি অরক্ষিত অবস্থায় পাইলেন। সুতরাং একপ্রকার বিনা বাধায়ই তিনি মন্দিরস্থ বিগ্রহাদি চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া সেখানকার যাবতীয় ধনরত্নাদি লুণ্ঠন করিলেন।

দশম অভিযান (১০১৪)—থানেশ্বরের বিরুদ্ধে

তারপর তিনি দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইতে চাহিলে তাঁহার অনুচরগণ প্রথমে পাঞ্জাব জয় করিয়া ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে একটি সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের প্রয়োজন একথা স্মরণ করাইয়া দিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিলেন।

১০১৮ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান মামুদের দ্বাদশ অভিযানে কনৌজ ও মথুরা লুণ্ঠিত হইল। কনৌজের রাজা রাজ্যপাল বিনাযুদ্ধে মামুদের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন।* সুলতান মামুদ কনৌজের সাতটি দুর্গ একে একে জয় করিয়া সে-গুলির অভ্যন্তরস্থিত যাবতীয় ধনরত্নাদি লুণ্ঠন করিলেন। ইহা ভিন্ন বহু সংখ্যক লোককে তিনি বন্দী হিসাবে লইয়া গেলেন। শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র লীলাক্ষেত্র মথুরা নগরীর দশ হাজার ছোট-বড় মন্দির লুণ্ঠন করিয়াও মামুদের অর্থগৃধ্নুতা তৃপ্ত হইল না। মথুরা নগরীর মধ্যস্থলে নির্মিত মন্দিরটি স্থাপত্য ও শিল্পের এক অতি অপূর্ব নিদর্শন ছিল। সুলতান মামুদ এই মন্দিরটির সৌন্দর্য দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, ইহা নির্মাণে অন্তত দুইশত বৎসর লাগিয়া থাকিবে, কিন্তু তাঁহারই আদেশে হিন্দু শিল্প ও স্থাপত্যের এই বিস্ময়কর নিদর্শনটি ভস্মীভূত করা হইয়াছিল। তাঁহার বর্বরতায় হিন্দু-স্থাপত্যের এক অমূল্য সম্পদ বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। এই মন্দিরের যাবতীয় ধন-রত্নাদি ও স্বর্ণ-নির্মিত বিগ্রহাদি মামুদ লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। এই সকল বিগ্রহের মধ্যে পাঁচটি ছিল পাঁচগজ উচ্চ। এই পাঁচটি বিগ্রহের চক্ষু ছিল অতি মূল্যবান্ মণি দ্বারা তৈয়ারী।

দ্বাদশ অভিযান (১০১৮)—কনৌজ ও মথুরার বিরুদ্ধে

এদিকে কনৌজ-রাজ রাজ্যপাল সুলতান মামুদের সহিত যুদ্ধ না করিয়া অপমানজনকভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রতিবেশী রাজগণ কালিঞ্জরের চন্দেল্ল বংশের রাজা গোণ্ড-এর নেতৃত্বে তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন।† রাজ্যপাল তাঁহাদের হস্তে পরাজিত ও নিহত হন। প্রতিবেশীরাজগণ তাঁহার পুত্র ত্রিলোচন পালকে কনৌজের সিংহাসনে স্থাপন করেন। সুলতান মামুদ রাজ্যপালকে নিজ আশ্রিত রাজা বলিয়া বিবেচনা করিতেন। স্বভাবতই তিনি চন্দেল্লরাজ গোণ্ডকে উচিত শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার রাজ্য

* Vide Ishwari Prasad : *History of Medieveal India* p.p. 90-91.

† *Idem.*

আক্রমণ করেন। গোণ্ড এক বিশাল সেনাবাহিনীসহ মামুদকে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, ত্রিলোচন পালও তাঁহার সাহায্যার্থে অগ্রসর হইলেন।

পঞ্চদশ অভিযান (১০২৩)—গোয়ালিওর ও কনৌজের বিরুদ্ধে

কিন্তু শেষ পর্যন্ত গোণ্ড সুলতান মামুদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করা সম্ভব হইবে না বিবেচনা করিয়া রাত্রির অন্ধকারে নিজ সেনাবাহিনীর অজ্ঞাতে পলায়ন করিলেন। মামুদ সহজেই চন্দেল্লরাজ্যের সেনাবাহিনীকে বিধ্বস্ত করিয়া ৫৮০টি হাতী ও প্রভূত পরিমাণ ধনরত্ন লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন। পরবৎসর (১০২১-২২) তিনি গোয়ালিওর জয় করিয়া পুনরায় চন্দেল্লরাজ্যের প্রধান দুর্গ কালিঞ্জর-এর দিকে অগ্রসর হইলেন। চন্দেল্লরাজ গোণ্ড এইবার পূর্বাহ্নেই মামুদের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইলেন এবং প্রভূত পরিমাণ ধনরত্ন দান করিয়া মামুদের আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। এই সূত্রে গোণ্ড কর্তৃক সুলতান মামুদের নিকট লিখিত পত্রখানির চাটুবাক্যাদিতে মামুদ খুব প্রীত হইয়াছিলেন বলিয়া নিজাম-উদ্দিন ও ফেরিস্তার গ্রন্থে উল্লিখিত আছে।

সুলতান মামুদের অভিযানগুলির মধ্যে সোমনাথের মন্দির লুণ্ঠন সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। এই মন্দিরের ঐশ্বর্যের সংবাদ পাইয়া সুলতান মামুদ ইহা লুণ্ঠনের জন্য কৃতসংকল্প হইলেন। সোমনাথের মন্দিরটি কাথিয়াবাড়ের পশ্চিম উপকূলে নির্মিত। বর্তমানে ইহা জুনাগড়ের অন্তর্ভুক্ত। ১০২৫ খ্রীষ্টাব্দে

ষোড়শ অভিযান (১০২৫-২৬)—সোমনাথের মন্দির লুণ্ঠন

সুলতান ত্রিশহাজার অশ্বারোহী ও অসংখ্য মুসলমান স্বেচ্ছাসেবক * সঙ্গে লইয়া মুলতানের পথে আজমীরে উপস্থিত হইলেন। আজমীর শহরটি লুণ্ঠন করিয়া মামুদ গুজরাটের দিকে অগ্রসর হইলেন। ১০২৬ খ্রীষ্টাব্দে মামুদ তাঁহার বিশাল বাহিনীসহ সোমনাথের মন্দিরের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চতুর্দিক হইতে বহু সংখ্যক রাজপুত যোদ্ধা ও রাজগণ সোমনাথের মন্দির রক্ষার্থে অগ্রসর হইলেন। গুজরাটের রাজা ভীমও তাঁহার সেনাবাহিনীসহ আসিয়া যোগ দিলেন। এক ভীষণ যুদ্ধের পর মামুদই জয়ী হইলেন। প্রায় পাঁচ হাজার হিন্দু সোমনাথের মন্দির রক্ষার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়াও উহা রক্ষা করিতে পারিল না। মন্দিরের পূজারী ও বহু ব্রাহ্মণকে মামুদ হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। মামুদের আদেশে মন্দিরটি অপবিত্র

* হিন্দুমন্দির লুণ্ঠনে মামুদ বহু সংখ্যক মুসলমান স্বেচ্ছাসেবকের সাহায্য পাইয়াছিলেন।

করিয়া মন্দিরস্থ বিগ্রহটি ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল। এই মন্দির হইতে দুইকোটি স্বর্ণমুদ্রা ও বিগ্রহের অলঙ্কারাদি হইতে প্রভূত পরিমাণ মণি-মুক্তা তিনি লইয়া গিয়াছিলেন। অনহিলবার-এর রাজা সোমনাথের মন্দির রক্ষার্থে যুদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া মামুদ অনহিলবার আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর জাঠগণের আক্রমণে স্থলতান মামুদ যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। জাঠগণকে এজন্য শাস্তিদানের উদ্দেশ্যে তিনি ১০২৭ খ্রীষ্টাব্দে (মার্চ মাস) তাঁহার সপ্তদশ এবং সর্বশেষ অভিযানে অগ্রসর হন। জাঠগণ প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়া মামুদের হস্তে পরাজিত হইলে মামুদ স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন। তিন বৎসর পরে (১০৩০) মামুদের মৃত্যু হইল।

সপ্তদশ ও সর্বশেষ অভিযান (১০২৭)—জাঠদের বিরুদ্ধে

স্থলতান মামুদের অভিযানের প্রকৃতি (The Character of Sultan Mahmud's Invasions): স্থলতান মামুদের অভিযানগুলিতে ভারতবর্ষে স্থায়ী রাজ্য স্থাপনের উদ্দেশ্য পরিলক্ষিত হয় না। স্থায়ী রাজ্য স্থাপন তাঁহার পরিকল্পনার বহির্ভূত ছিল। ভারতের রাজনৈতিক অনৈক্য যেমন তাঁহার অভিযানগুলির সাফল্যের সহায়ক হইয়াছিল তেমনি এই রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতাই তাঁহার ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য বিস্তারের বাধা সৃষ্টি করিয়াছিল। কারণ একটি যুদ্ধে জয়ী হওয়ার অর্থ ছিল একটি ক্ষুদ্র রাজ্য অধিকার করা। এইভাবে ভারতবর্ষের ব্যাপক কোন অংশ জয় করা স্থলতান মামুদের যেমন উদ্দেশ্যও ছিল না, তেমনি জয় করাও সম্ভব ছিল না। দুর্ধর্ষ রাজপুত জাতিকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিয়া ভারতবর্ষ জয় করা গজনীর সামরিক শক্তির বহির্ভূত ছিল।*

স্থায়ী রাজ্য স্থাপন মামুদের পরিকল্পনা-বহির্ভূত

ডক্টর স্মিথের মতে স্থলতান মামুদ ঐ সময়কার ধর্মান্ধ ও দুর্ধর্ষ তুর্কী মুসলমানদের নেতৃস্বরূপ ছিলেন। পৌত্তলিকদের হত্যা করা তাঁহার ও তাঁহার অনুচরবর্গের যেমন কর্তব্য ছিল তেমনি হত্যাকাণ্ডে তাহাদের আনন্দও ছিল প্রচুর।

ধনরত্ন লুণ্ঠন, পৌত্তলিকদের হত্যা ও দেবমন্দির ধ্বংস—প্রধান উদ্দেশ্য

* "...An occupation of India was beyond the means of the forces of Ghazni." *Mediaeval India under Mohammedan Rule*, Lane-Poole, pp. 28-29.

ধনরত্ন লুণ্ঠন, পৌত্তলিকদের হত্যা ও তাহাদের দেবমন্দির ও বিগ্রহাদির ধ্বংস-সাধন—এই সব উদ্দেশ্য লইয়াই সুলতান মামুদ ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন।

সংকীর্ণ, স্বার্থপর ও ধর্মান্ধ নীতি

বিজয়গৌরব বা ধর্মপ্রচার মামুদের অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল না, এই কারণেই বিজয়ীর উদারতা তাঁহার আচরণে পরিলক্ষিত হয় না। আনন্দপালের মণি-মুক্তা-খচিত হার বলপূর্বক কাড়িয়া লওয়া, হিন্দুস্থাপত্যের অপূর্ব নিদর্শন মথুরার বিখ্যাত মন্দিরটির বিনাশসাধন প্রভৃতি তাঁহার সংকীর্ণ, স্বার্থান্বেষী ও ধর্মান্ধ নীতিপ্রসূত বলা বাহুল্য।

সুলতান মামুদের সাফল্যের কারণ (Causes of Sultan Mahmud's success):

সুলতান মামুদের সামরিক প্রতিভা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও ধর্মান্ধতা

সুলতান মামুদের অভিযানগুলির সাফল্যের পশ্চাতে কতকগুলি বিশেষ কারণ ছিল। প্রথমতঃ, সুলতান মামুদ নিজে একজন অসাধারণ সমরকুশলী অধিনায়ক ছিলেন। তাঁহার এই সামরিক প্রতিভার সহিত উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও ধর্মান্ধতার সংমিশ্রণের ফলে তিনি এক দুর্ধর্ষ যোদ্ধায় পরিণত হইয়াছিলেন। তাঁহার তুর্কী অনুচরগণও ছিল ধর্মান্ধ ও পরধর্ম অসহিষ্ণু। স্বভাবতই পৌত্তলিক হিন্দুদের হত্যা এবং হিন্দুমন্দির লুণ্ঠনে তাহারা অত্যধিক উৎসাহী ছিল। দ্বিতীয়তঃ, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা ও রাজগণের মধ্যে সহযোগিতার অভাব সুলতান মামুদের সাফল্যের অন্যতম কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ধর্মের নামে লুণ্ঠনের লিপ্সায় ঐক্যবদ্ধ মামুদের

ঐক্যের অভাব

দুর্ধর্ষ অনুচরবাহিনীর বিরুদ্ধে রাজনৈতিকক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন, প্রাকৃতিক কারণে স্বভাবত দুর্বল ভারতবাসী আঁটিয়া উঠিতে পারে নাই।* ভারতবাসী মধ্য-এশিয়াস্থ পার্বত্য অঞ্চলের তুর্কী

* "Internal division had proved the undoing of India again and again and sapped the power of mere numbers, which alone could enable the men of the warm plains to stand against the hardy mountain tribes and the relentless horsemen of the Central Asian steppes. To the race and climate, was added the zeal of the Muslim and the greed of the robber. The mountaineers were poor as they were brave, and covetous as they were devout." *Mediaeval India under Mohammedan Rule*, Lane-Poole, p. 22.

আক্রমণকারীদের তুলনায় দৈহিক শক্তিতে দুর্বল হইলেও কেবলমাত্র সংখ্যাধিক্যের দ্বারাই তাহাদের জয় নিশ্চিত ছিল। কিন্তু সেজন্য প্রয়োজন ছিল ঐক্যবদ্ধতার। এই ঐক্যের অভাব হেতুই অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক তুর্কী অশ্বারোহীর আক্রমণ প্রতিহত করা ভারতীয়দের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। তৃতীয়তঃ, যুদ্ধকৌশলেও ভারতীয়দের তুলনায় সুলতান মামুদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার্য। হিন্দুদের চিরাচরিত হস্তীবাহিনীর ব্যবহার যুদ্ধে পরাজয়ের অন্যতম কারণ ছিল। বিজয়ের মুহূর্তে আনন্দপালের হস্তীর যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ সম্মিলিত হিন্দুবাহিনীর পরাজয়ের একমাত্র কারণ ছিল।

যুদ্ধে হস্তীবাহিনী ব্যবহার

সুলতান মামুদের চরিত্র ও কৃতিত্ব (Character and Estimate of Sultan Mahmud) : সুলতান মামুদের রাজসভার কবি ও ঐতিহাসিকদের রচনা হইতে তাঁহার চরিত্র সম্পর্কে একটি সম্পূর্ণ ধারণা লাভ করা যায়। এই সকল রচনায় সুলতানের গুণাবলী সম্পর্কে প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অতিশয়োক্তি করা হইয়াছে বটে, তথাপি বিভিন্ন কবি ও লেখকের রচনার একটি নিরপেক্ষ তুলনামূলক বিচারে মামুদের চরিত্রের দোষগুণ উভয়ই বুঝিতে পারা যায়। মামুদ ছিলেন বুদ্ধিমান, ধর্মভীরু, শিল্প ও সাহিত্যানুরাগী। সাধারণতঃ তিনি ছিলেন, ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচারের পক্ষপাতী, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য নীচতার আশ্রয় গ্রহণেও কুণ্ঠিত ছিলেন না। তাঁহার ধর্মপরায়ণতা কোন কোন ক্ষেত্রে ধর্মান্ধতায় পর্যবসিত হইত, আবার অর্থের বিনিময়ে তিনি নিজ ধর্মান্ধতা ত্যাগ করিতেও দ্বিধা করিতেন না। গজনীর রাজসভার ঐতিহাসিক ইবন্‌-উল্‌-আথির মামুদের অর্থগৃধ্নুতার কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতের হিন্দুমন্দির ধ্বংস করা অথবা মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ভিন্ন সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচারের পশ্চাতে সুলতান মামুদের ধর্মান্ধতা ও অর্থগৃধ্নুতা সমপরিমাণে বিদ্যমান ছিল। তিনি ছিলেন ক্ষণক্রোধী, মিত্র হিসাবে তিনি ছিলেন অবিশ্বস্ত।* কিন্তু তিনি যে একজন বিচক্ষণ ও

তাঁহার চরিত্র

* "......(he was) fickle and uncertain in temper and more notable as an irresistible conqueror than as a faithful friend and magnanimous foe." *History of Persian Literature*, Quoted by Ishwari Prasad, p. 105.

অনন্যসাধারণ সমরকুশলী সেনানায়ক ছিলেন সেবিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই।

সুলতান মামুদের কৃতিত্ব বিচার করিতে গিয়া অনেকে তাঁহার ভারত অভিযানগুলির সাফল্য, পারস্য ও মধ্য-এশিয়ার রাজগণের বিরুদ্ধে তাঁহার সামরিক সাফল্য প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া থাকেন। এগুলি তাঁহার অসাধারণ সামরিক প্রতিভার পরিচায়ক সন্দেহ নাই, কিন্তু পৃথিবীর অপরাপর বিজয়ী বীরগণ সাম্রাজ্য বিস্তারের অথবা ধর্ম-প্রচারের উদ্দেশ্য লইয়াই বিজয় অভিযানে অগ্রসর হইয়াছিলেন, কেবলমাত্র লুণ্ঠনই উহার উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু সুলতান মামুদের ক্ষেত্রে পৌত্তলিক হিন্দুদের হত্যা ও হিন্দু দেব-দেবীর মন্দির লুণ্ঠন করার পশ্চাতে তাঁহার ধর্মান্ধতা অপেক্ষা অর্থগৃধ্নুতাই ছিল অধিকতর শক্তিশালী অনুপ্রেরণা। পৌত্তলিক হিন্দুদের হত্যা ও হিন্দুমন্দির লুণ্ঠনের প্রস্তাবে পার্বত্য অঞ্চলের ধর্মান্ধ ও দুর্ধর্ষ মুসলমান স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করা তাঁহার পক্ষে সহজ হইয়াছিল। চন্দেল্লরাজ গোণ্ড-এর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযানের কালে তাঁহাকে উপযুক্ত পরিমাণ ধনরত্ন উৎকোচ দান করিয়া নিরস্ত করা সম্ভব হইয়াছিল। ইহা হইতে বিজয়গৌরব বা পৌত্তলিকদের শাস্তিদান অপেক্ষা অর্থলোলুপতাই যে তাঁহাকে অধিকতর প্রভাবিত করিয়াছিল তাহা বুঝিতে পারা যায়। অর্থ-লুণ্ঠনের আনুষঙ্গিক রীতি হিসাবেই তিনি হিন্দুমন্দির অপবিত্রীকরণ ও হিন্দু দেব-দেবী চূর্ণ করিবার পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের হিন্দুমন্দিরে ও দেব-দেবীর মূর্তিতে ধনরত্ন যদি একেবারেই না থাকিত তাহা হইলে সুলতান মামুদ কেবল ধর্মের নামে এতগুলি অভিযানে অগ্রসর হইতেন কিনা সন্দেহ। সুতরাং বিজয়ী বীর হিসাবে সুলতান মামুদের মর্যাদা খুব বেশি তাহা বলা যায় না। তাঁহার ভারতীয় অভিযান মোটেই ইস্‌লাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ছিল না। উপরন্তু তাঁহার নিষ্ঠুরতা, হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠন তদানীন্তন ভারতবাসীর মধ্যে ইস্‌লাম ধর্মের প্রতি এক বিরুদ্ধ মনোভাবের সৃষ্টি করিয়াছিল। ভারতবাসীর দৃষ্টিতে মামুদের অসংখ্য হিন্দুমন্দির ও পবিত্র স্থান অপবিত্রীকরণ ও লুণ্ঠন এক অতি নীচ ও বর্বর মনোবৃত্তির পরিচায়ক। ইহা ভিন্ন মামুদের সামরিক পদ্ধতিতে কোন নূতনত্ব পরিলক্ষিত হয় না। বিভিন্ন

কৃতিত্ব : বিজয়ী বীর

অর্থলোলুপতাই অভি-যানের মূল কারণ

জাতির সৈনিকদের—যথা, আরব, তুর্কী, আফগান ও হিন্দু লইয়া গঠিত বাহিনীকে তিনি নিজ সংগঠনী শক্তির সাহায্যে একক-অধিনায়কত্বাধীনে স্থাপন করিয়াছিলেন। এইরূপ ব্যবস্থা তাঁহার পূর্বে আরও বহুদেশে অনুসৃত হইয়াছিল।

মামুদের সাহিত্য ও শিল্পানুরাগ

সুলতান মামুদ নিজেও একজন কবি ও সাহিত্যানুরাগী ছিলেন বলিয়া কথিত আছে। নিজে অবশ্য তিনি নিরক্ষর ছিলেন। তিনি সাহিত্য ও ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা-সভায় যোগদান করিতেন। তাঁহার রাজসভা 'শাহ্‌নামা' রচয়িতা ফিরদৌসী, দার্শনিক ফারাবী, ঐতিহাসিক উৎবী, আখ্যানরচয়িতা বৈহাকি, কবি আন্‌সারি, নিযুকিরি, দকিকি, উজারী, ফল্‌রুকি ও আসৃউজী, আসদীতুসী, প্রভৃতি মনীষিগণ দ্বারা অলংকৃত ছিল। অল্‌বিরুণীও কিছুকাল তাঁহার সভায় ছিলেন। মামুদ গজনীতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। সমসাময়িক চারি শত কবি, সাহিত্যিক ও গজনী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ উজারীকে তাঁহাদের গুরু বলিয়া মানিতেন। ভারত হইতে লুণ্ঠিত ধনরত্ন তিনি গজনী নগরীর সৌন্দর্যবর্ধনে মুক্তহস্তে ব্যয় করিয়াছিলেন। একটি বিশ্ববিদ্যালয় ভিন্ন তিনি একটি যাদুঘর ও একটি গ্রন্থাগারও স্থাপন করিয়াছিলেন। সুলতান মামুদ নিজ রাজ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার উৎসাহেই গজনী নগরীতে বহু সংখ্যক সুন্দর গৃহাদি নির্মিত হইয়াছিল এবং গজনী প্রাচ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নগরীতে পরিণত হইয়াছিল। ভারত-ইতিহাসে মামুদের স্থান নির্ধারণে তাঁহার উপরি-উক্ত কার্যকলাপের কাহিনী অবান্তর বলা চলে। কিন্তু এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, তাঁহার শিল্পানুরাগ নীচ স্বার্থপরতা ও সংকীর্ণতাদোষে দুষ্ট ছিল। তাঁহারই আদেশে হিন্দু স্থাপত্য

সমালোচনা

শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন মথুরা নগরীর কেন্দ্রস্থ মন্দিরটি ভস্মীভূত করা হইয়াছিল। শিল্পানুরাগের এইরূপ অভিব্যক্তি ইতিহাসে বিরল। সাহিত্যানুরাগেও তিনি তাঁহার সংকীর্ণতার পরিচয় দান করিয়াছেন। ফিরদৌসীকে ষাট হাজার স্বর্ণমুদ্রা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়া 'শাহ্‌নামা' রচনা করাইয়া তিনি তাঁহাকে স্বর্ণমুদ্রার পরিবর্তে রৌপ্যমুদ্রা দিয়াছিলেন। ফিরদৌসী এই কারণে অসন্তুষ্ট হইয়া সুলতান মামুদকে ব্যঙ্গ করিয়া কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন অল্‌বিরুণীও

সুলতানের ব্যবহারে সন্তুষ্ট ছিলেন না; তিনি গজনী ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে চলিয়া আসিয়াছিলেন। সুতরাং সুলতান মামুদের সাহিত্য ও শিল্পের পৃষ্ঠ-পোষকতার অন্তরালে আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা-ই ছিল প্রধান, ইহা অনস্বীকার্য।

শাসক হিসাবে সুলতান মামুদ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। প্রজাবর্গের ধন-প্রাণ রক্ষা ও বিচারকার্যে ন্যায় ও সততা রক্ষা করিয়া তিনি প্রজাবর্গের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন। তাঁহার উৎসাহে ব্যবসায়-বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ব্যবসায়িগণ বাণিজ্য সামগ্রী লইয়া যাহাতে নিরাপদে যাতায়াত করিতে পারে সেজন্য তিনি উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন নূতন আইন প্রবর্তন বা শাসন-পদ্ধতির কোনপ্রকার উন্নয়ন সাধন করিবার মত মৌলিক প্রতিভা তিনি প্রদর্শন করেন নাই।

প্রজাবর্গের ধন-প্রাণ রক্ষা, ন্যায় বিচার, ব্যবসায়-বাণিজ্যের উৎসাহদান

সুলতান মামুদ একাধারে দুর্ধর্ষ সামরিক নেতা, সুদক্ষ শাসক, শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ও সুবিচারক ছিলেন। কিন্তু ভারতীয়দের দৃষ্টিতে তিনি অর্থগৃধ্নু, দেব-দেবীর মন্দির লুণ্ঠনকারী হিসাবেই পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ভারত অভিযানের বিশেষ কোন স্থায়ী ফল ছিল না। বারবার ভারতবর্ষে প্রবেশ ও স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের ফলে পাঞ্জাব অঞ্চলে তাঁহার আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল, কিন্তু ইস্‌লামের প্রচার বা অপর কোন শিক্ষণীয় বিষয় তিনি ভারতীয়দের সম্মুখে স্থাপন করিতে পারেন নাই। ভারতের ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া নিজ দেশে সাহিত্য ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতায় উহা ব্যয় করিলেও ভারতীয়দের দৃষ্টিতে তিনি নিছক লুণ্ঠনকারী ভিন্ন আর কিছুই নহেন। ডক্টর স্মিথ্ যথার্থই বলিয়াছেন যে, ভারতীয়দের দিক হইতে বিচার করিলে সুলতান মামুদ ছিলেন একজন 'bandit operating on a large-scale.'

ভারতীয়দের দৃষ্টিতে সুলতান মামুদ

সুলতান মামুদের ভারত অভিযানের ফল (The Results of Sultan Mahmud's Invasions) :

সুলতান মামুদের ভারত অভিযানগুলি প্রধানতঃ লুণ্ঠনের উদ্দেশ্য-প্রণোদিত

হইলেও সেগুলির কতক স্থায়ী ফলও যে ছিল না, এমন নহে। প্রথমতঃ, পাঞ্জাবের মধ্য দিয়া বারংবার সসৈন্যে যাওয়া-আসার ফলে পাঞ্জাবের অধিকাংশ স্থানেই তাঁহার অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, সুলতান মামুদের ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠন ভারতের হিন্দুরাজগণ তথা হিন্দু জনসাধারণের মনে এক দারুণ ভীতির সঞ্চার করিয়াছিল। এজন্য পরবর্তী কালে মুসলমানদের ভারত আক্রমণে সাফল্যলাভ বহুল পরিমাণে সহজ হইয়াছিল। তৃতীয়তঃ, সুলতান মামুদ যে পরিমাণ ধনরত্ন উত্তর-ভারতের রাজ্যগুলি হইতে লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন তাহার ফলে উত্তর-ভারতীয় রাজ্যগুলির অর্থ নৈতিক ভিত্তি শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। চতুর্থতঃ, তাঁহার সতরটি অভিযানের ফলে উত্তর-ভারতের রাজ্যগুলির সামরিক শক্তিও বিধ্বস্ত হইয়াছিল এবং এই কারণেই এই সকল রাজ্যের পক্ষে পরবর্তী মুসলমান আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার শক্তি হ্রাস-প্রাপ্ত হইয়াছিল। পঞ্চমতঃ, হিন্দুদের মন্দির অপবিত্রীকরণ, বিগ্রহাদির ধ্বংসসাধন প্রভৃতির দ্বারা মামুদ ভারতবর্ষে ইস্‌লাম ধর্ম প্রবর্তনে বাধা সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

পাঞ্জাবের অধিকাংশ স্থানে তুর্কী আধিপত্য

পরবর্তী কালে মুসলমান আক্রমণের পথ প্রস্তুত

উত্তর-ভারতীয় রাজ্যগুলির অর্থ নৈতিক দুর্বলতা,

উত্তর-ভারতীয় রাজ্যগুলির সামরিক শক্তি বিধ্বস্ত, ইস্‌লাম ধর্ম প্রবর্তনে বাধার সৃষ্টি

সুলতান মামুদের পরবর্তী গজনী রাজগণ (The Ghaznavids after Sultan Mahmud) :

সুলতান মামুদের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার লইয়া তাঁহার দুই পুত্র মাসুদ ও মোহম্মদের মধ্যে তীব্র গৃহবিবাদ দেখা দিল। শেষ পর্যন্ত মাসুদ জয়ী হইয়া ভ্রাতা মোহম্মদের চক্ষু দুইটি উৎপাটন করিয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিলেন। মাসুদের রাজত্বকালে (১০৩০-১০৪০) কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া গজনীর অধীন পাঞ্জাবে বিভেদ ও অরাজকতা দেখা দিল। অল্পকালের মধ্যে মাসুদ সল্‌জুক তুর্কীদের হস্তে পরাজিত হইয়া পাঞ্জাবের দিকে পলাইয়া আসিবার পথে নিজ সেনাবাহিনী কর্তৃক বন্দী হইলেন এবং তাঁহার

মাসুদ ও মোহম্মদের গৃহবিবাদ

অন্ধ ভ্রাতা মোহম্মদ গজনীর আমীর পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। মাসুদকে মোহম্মদের সম্মুখে বন্দী অবস্থায় উপস্থিত করা হইলে মোহম্মদের পুত্র তাঁহাকে হত্যা করিলেন। কিন্তু ইহাতেই গৃহবিবাদের অবসান ঘটিল না। মাসুদের পুত্র মাহুদ্ পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য মোহম্মদ ও তাঁহার পুত্রকে পরাজিত করিলেন এবং নিজে গজনীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। শাসক হিসাবে মাহুদের অকর্মণ্যতা এবং পরবর্তী রাজগণের ক্রমবর্ধমান দুর্বলতা গজনী রাজ্যের পতনের পথ প্রশস্ত করিয়া দিল। এক দিকে সল্‌জুক তুর্কীদের আক্রমণ, অপরদিকে ঘুর রাজ্যের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে গজনীর নিরাপত্তা রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে (১১৭৩) গিয়াস-উদ্দিন মোহম্মদ ঘুরী গজনীরাজ্য জয় করিয়া গজনীবংশের শাসনের অবসান ঘটাইলেন।

মাসুদ ও মোহম্মদের পুত্রদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা

গিয়াস-উদ্দিন ঘুরীর হস্তে গজনীবংশের শাসনের অবসান

ঘুরবংশ* (The House of Ghur) ঃ

গজনী ও হিরাটের মধ্যবর্তী পর্বতসঙ্কুল স্থানে ঘুররাজ্য অবস্থিত ছিল। কোন কোন ঐতিহাসিকের যথা, লেন-পুল (Stanley Lane-Poole) ঘুর-বংশকে আফগানজাতিসম্ভূত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ ঘুরবংশকে পূর্বাঞ্চলীয় পারসিক জাতি বলিয়া মনে করেন।† ১০১০ খ্রীষ্টাব্দে ঘুরদলপতিগণ গজনীরাজ্যের (সুলতান মামুদের) আনুগত্য স্বীকার করিতে বাধ্য হন। কিন্তু সুলতান মামুদের পরবর্তী দুর্বল গজনীরাজগণের আমলে ঘুর দলপতিগণ গজনীরাজ্যের প্রতি তেমন আনুগত্য প্রদর্শন করিতেন না। ক্রমে তাঁহারা শক্তি সঞ্চয় করিয়া

ঘুররাজ্যের অবস্থান

---

* Usually written *Ghor*, but Ghūr is correct. Vide, *Cambridge History of India, Vol. III* p. 16, Foot-note.

† 'They have usually been described, on insufficient grounds as Afghans, but there is little doubt that they were, like the Samanids of Balkh, Eastern Persians.' *Ibid*, p. 38.

'The petty chiefs of Ghur, of eastern Persian extraction were originally feudatories of Ghazni.' *Advanced History of India*, p. 276.

গজনীরাজগণের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রসর হন। এই সূত্রে ঘুরবংশের কুতব্-উদ্দিন ও তাঁহার ভ্রাতা সৈফ্-উদ্দিন গজনীরাজ বাহ্‌রাম শাহের হস্তে পরাজিত ও নিহত হন। নিহত ভ্রাতৃদ্বয়ের অপর এক ভ্রাতা আলা-উদ্দিন হুসেন গজনীরাজ্য আক্রমণ করেন এবং গজনীর যাবতীয় প্রাসাদ ও হর্ম্যাদি ভস্মীভূত করিয়া ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। গজনীরাজ্য ধ্বংস করিয়া আলা-উদ্দিন 'জাহানসুজ্' (*World Burner*) উপাধি ধারণ করেন।

গজনীরাজ্যের সহিত ঘুররাজ্যের সংঘর্ষ

এই ঘটনার অল্পকাল মধ্যেই গজনীরাজ্য পুনরায় 'গাজ্' নামে তুর্কী জাতির এক দল কর্তৃক আক্রান্ত হয়। বাহ্‌রামের অকর্মণ্য, দুর্বল পুত্র খুস্‌রু শাহ্ গজনীরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া পাঞ্জাবে পলাইয়া গেলেন। সুলতান মামুদের বিস্তীর্ণ রাজ্যের মধ্যে একমাত্র পাঞ্জাব তখনও গজনীর অধীন ছিল। গজনীরাজ্য কয়েক বৎসর 'গাজ্' তুর্কীদের অধীনে ছিল বটে, কিন্তু ঘুরবংশের গিয়াস-উদ্দিন মোহম্মদ তাহাদিগকে গজনী হইতে বিতাড়িত করিয়া গজনীরাজ্য ঘুরবংশের শাসনাধীনে আনয়ন করিলেন (১১৭৩)। গিয়াস-উদ্দিন তাঁহার ভ্রাতা মুইজ্-উদ্দিন মোহম্মদ-বিন্-সামকে গজনীর শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। ইনিই ভারত-ইতিহাসে মোহম্মদ ঘুরী নামে প্রসিদ্ধ।

গজনীরাজ্যের পতন : মোহম্মদ ঘুরী গজনীর শাসনকর্তা নিযুক্ত

মোহম্মদ ঘুরী (Muhammad Ghuri) : মুসলমান শাসনের ইতিহাসে ভ্রাতৃ-বিরোধ, হিংসা-দ্বেষ ও ভ্রাতৃ-হত্যার মর্মান্তিকতার পার্শ্বে মোহম্মদ ঘুরী ও তাঁহার ভ্রাতা গিয়াস-উদ্দিনের পরস্পর প্রীতি স্বভাবতই পাঠকদের যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময়ের উদ্রেক করে। গিয়াস-উদ্দিন তাঁহার জীবদ্দশায় ভ্রাতা মোহম্মদ ঘুরীর অকপট আনুগত্য লাভ করিয়াছিলেন। মোহম্মদ ঘুরী ক্ষমতাবান শাসক ও সমরকুশলী নেতা হইয়াও ভ্রাতার অধীনতা স্বীকার করিয়া চলিতেন।

গিয়াস-উদ্দিন ও মোহম্মদ ঘুরীর ভ্রাতৃপ্রীতি

মোহম্মদ ঘুরী উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি ছিলেন। স্বভাবতই ভারত-বিজয় ছিল তাঁহার জীবনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। ১১৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মোহম্মদ ঘুরী তাঁহার সর্বপ্রথম ভারত-অভিযানে অগ্রসর হন। ঐ সময়ে মুলতানে ইস্‌লাম্ ধর্মের

মোহম্মদ ঘুরীর প্রথম ভারত-অভিযান (১১৭৫)

ইস্‌মাইলিয়া সম্প্রদায়ের প্রাধান্য ছিল। ইস্‌মাইলিয়া সম্প্রদায় ইস্‌লামধর্মী হইলেও তাহারা খাঁটি ইস্‌লাম ধর্মমত মানিয়া চলিত না বলিয়া গোঁড়া মুসলমানগণ তাহাদিগকে বিধর্মী বলিয়া মনে করিত। মোহম্মদ ঘুরী প্রথমেই এই সকল 'বিধর্মী'দের কেন্দ্রস্থল মুলতান জয় করিলেন।

মুলতান অধিকার

তারপর মোহম্মদ ঘুরী উচ্ দুর্গটি অবরোধ করিলেন। তথাকার রাণীর বিশ্বাসঘাতকতায় ঘুরী অতি সহজেই উচ্ দখল করিলেন (১১৭৫-৭৬)। এই ঘটনার দুই বৎসর পর গুজরাট আক্রমণ করিয়া মোহম্মদ ঘুরী সর্বপ্রথম পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। গুজরাটের বাঘেলা বংশের রাজা ভীম-এর রাজধানী অন্‌হিল্‌বার দখল করা দূরের কথা, সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইয়া তিনি মরু অঞ্চলের মধ্য দিয়া প্রত্যাবর্তনের পথে তাঁহার অবশিষ্ট সৈন্যবাহিনীর অধিকাংশই হারাইলেন।

উচ্ দুর্গ জয়: গুজরাটের রাজা ভীমের হস্তে পরাজয়

কিন্তু মোহম্মদ ঘুরী দমিবার পাত্র ছিলেন না। পরবৎসরই (১১৭৯) তিনি পুনরায় এক সৈন্যবাহিনী গঠন করিয়া পেশওয়ার আক্রমণ করিলেন এবং গজনীবংশের শেষ সুলতান খুস্‌রভ্ মালিকের অধিকার হইতে পেশওয়ার জয় করিয়া লইলেন। ১১৮১ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ ঘুরী জম্মুর রাজা বিজয়দেবের সাহায্য লইয়া গজনীরাজ্যের শেষ অধিকারটুকু—লাহোর দখল করিলেন। খুস্‌রভ্ মালিক মোহম্মদ ঘুরীর হস্তে বন্দী হইলেন। ঘুরী শিয়ালকোট-এ একটি সুদৃঢ় দুর্গ স্থাপন করিয়া খোকর জাতির আক্রমণ হইতে বিজিত রাজ্যের নিরাপত্তা বিধান করিলেন। খুস্‌রভ্ মালিকের শেষ পরাজয় ও বন্দী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গজনীবংশের ভারতীয় রাজ্যের অবসান ঘটিল। পাঞ্জাব মোহম্মদ ঘুরীর অধিকারে আসার ফলে ভারতবর্ষের অপরাপর অঞ্চল জয়ের পথ তাঁহার নিকট উন্মুক্ত হইল। কিন্তু তাঁহার এই অগ্রগতির পথে বাধা আসিল রাজপুতজাতি হইতে।

পেশওয়ার জয় (১১৭৯): শিয়ালকোটের দুর্গ নির্মাণ

তরাইনের প্রথম যুদ্ধ : The First Battle of Tarain

১১৯০-৯১ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে মোহম্মদ পৃথ্বীরাজের

রাজ্যের ভাতিন্দা নামক স্থান দখল করিলেন। ভাতিন্দা জয় করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের কালে তিনি সংবাদ পাইলেন যে, পৃথ্বীরাজ বিশাল সেনাবাহিনীসহ মোহম্মদ ঘুরীকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইতেছেন। তিনি স্বভাবতই পৃথ্বীরাজকে প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনী প্রস্তুত করিতে লাগিলেন।

পৃথ্বীরাজের হস্তে ঘুরীর শোচনীয় পরাজয় (১১৯১)

উত্তর-ভারতের হিন্দুরাজগণ তাঁহাদের পরস্পর বিভেদ ভুলিয়া গিয়া বিদেশী শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। একমাত্র কনৌজের গাহ্‌ড়বালরাজ জয়চাঁদ এই সম্মিলিত বাহিনীতে যোগদান করিলেন না। সমসাময়িক মুসলমান ঐতিহাসিকদের রচনায় জয়চাঁদকে তদানীন্তন ভারতের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। টডের মতে পৃথ্বীরাজ জয়চাঁদের অমতে তাঁহার কন্যা সংযুক্তাকে বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি পৃথ্বীরাজের উপর বিরূপ ছিলেন এবং এই কারণেই তিনি যুদ্ধে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত রহিলেন। থানেশ্বরের নিকটে তরাওরী (Tarāorī) বা তরাইন নামক স্থানে উভয়পক্ষে এক তুমুল যুদ্ধ হইল। ঘুরীর সেনাবাহিনী সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হইল এবং ঘুরী স্বয়ং এই যুদ্ধে ভীষণভাবে আহত হইয়া সৈন্যসহ স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন। পৃথ্বীরাজ মোহম্মদ ঘুরীর অনুচর জিয়া-উদ্দিনের নিকট হইতে ভাতিন্দা পুনর্দখল করিলেন। কিন্তু পরাজিত শত্রুকে ভারতের সীমার বাহির পর্যন্ত পশ্চাদ্ধাবন করার প্রয়োজন উপলব্ধি না করায় ভবিষ্যতে ঘুরীর আক্রমণের পথ উন্মুক্ত রহিয়া গেল।

তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ, ১১৯২ (The Second Battle of Tarain):

মোহম্মদ ঘুরী নিজ কর্মকেন্দ্র গজনীতে পৌঁছিয়া পৃথ্বীরাজকে পরাজিত করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। তাই পরবৎসরই ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে এক বিশাল বাহিনী লইয়া তিনি পুনরায় তরাইনের প্রান্তরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আফগান, তুর্কী ও পারসিক জাতির মিলিত সেনাবাহিনীর সংখ্যা ছিল এক-লক্ষ কুড়ি হাজার, অশ্বারোহীর সংখ্যা ছিল বার হাজার।* পৃথ্বীরাজের নেতৃত্বে হিন্দুরাজগণের মিলিত বাহিনী পূর্বাহ্নেই তরাইনের প্রান্তরে মোহম্মদ ঘুরীর বিশাল বাহিনীর প্রতীক্ষায় উপস্থিত

ঘুরীর বিশাল সেনাবাহিনী

*Vide, Lane-Poole p. 52; *Camb. Hist. of India Vol. III.* p. 40.

ছিল। তরাইনের প্রথম যুদ্ধেই (১১৯১) মোহম্মদ ঘুরী পৃথ্বীরাজের যুদ্ধকৌশলের পরিচয় পাইয়াছিলেন। তাই তিনি এইবার এক নূতন কৌশলে যুদ্ধ করিয়া পৃথ্বীরাজকে পরাজিত করিতে সঙ্কল্প করিলেন। সমস্ত দিন ধরিয়া যুদ্ধের পর সূর্যাস্তের পূর্বে মোহম্মদ ঘুরীর শ্রেষ্ঠ বার হাজার অশ্বারোহী হিন্দুবাহিনীর উপর অতর্কিতে ঝাঁপাইয়া পড়িল। বীরত্বের দিক দিয়া হিন্দু-বাহিনী মুসলমান সৈন্য অপেক্ষা কোন অংশেই কম ছিল না। কিন্তু তাহাদের চিরাচরিত যুদ্ধরীতি, হস্তীবাহিনীর ব্যবহার প্রভৃতি, এবং সর্বোপরি সম্মিলিত বাহিনীর পরিচালনার জন্য সম্পূর্ণ কেন্দ্রীভূত একক-অধিনায়কত্বের অভাবের ফলে শেষ পর্যন্ত মোহম্মদ ঘুরীর-ই জয়ে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটিল। পৃথ্বীরাজ শত্রুহস্তে ধৃত ও নিহত হইলেন।

তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে ঘুরীর জয়লাভ

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ এক যুগান্তকারী ঘটনা। এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে মুসলমান অধিকার প্রায় দিল্লীর উপকণ্ঠ পর্যন্ত বিস্তৃত হইল। হান্সি, সামান, গুহরাম, বাকুহরাম, ও অপরাপর কয়েকটি সুরক্ষিত দুর্গ মোহম্মদ ঘুরীর নিকট আত্মসমর্পণ করিল। আজমীর রাজ্য মোহম্মদ ঘুরী ও তাঁহার সেনাবাহিনী কর্তৃক বিধ্বস্ত হইল। আজমীরের হিন্দুমন্দির ও স্থাপত্য শিল্পের অন্যান্য নিদর্শন ধূলিসাৎ করিয়া মোহম্মদ ঘুরী সেই স্থলে মসজিদ ও ইস্‌লাম ধর্মের শিক্ষাকেন্দ্র নির্মাণ করিলেন। আজমীর নগরটি বাৎসরিক করদানের শর্তে পৃথ্বীরাজের পুত্রের শাসনাধীনে রাখা হইল। পরবর্তী কালে পৃথ্বীরাজের আত্মীয়গণ মুসলমানদের হাত হইতে তাঁহাদের রাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে চেষ্টা বিফল হইয়াছিল।

তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের ফলাফল

তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া মোহম্মদ ঘুরী কুতব-উদ্দিন নামে এক বিশ্বস্ত অনুচরকে ভারতীয় বিজিত রাজ্যের শাসন-কর্তা নিযুক্ত করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন। ১১৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কুতব-উদ্দিন দিল্লী জয় করিলেন এবং ক্রমে গোয়ালিওর, অন্‌হিল্‌বার, কনৌজ প্রভৃতি অধিকার করিয়া মুসলমান অধিকৃত রাজ্যের বিস্তার সাধন করিলেন। কুতব-উদ্দিন তাঁহারই অনুচর ইখ্‌তিয়ার-উদ্দিন-বিন্‌-বখ্‌তিয়ার

মোহম্মদ ঘুরীর ভারত ত্যাগ: কুতব-উদ্দিনের রাজ্যবিস্তার

খল্‌জীকে বাংলা ও বিহার জয় করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। বাংলা ও বিহার তখন সেনবংশীয় লক্ষণ সেনের অধীনে ছিল। বৃদ্ধ লক্ষণ সেন ইখ্‌তিয়ার-উদ্দিনকে বাধা দিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি নিজ রাজধানী নদীয়া ত্যাগ করিয়া পূর্ববঙ্গে চলিয়া গেলেন। সেখানে বহুকাল ধরিয়া তাঁহার বংশধরগণ মুসলমান আক্রমণ প্রতিহত করিয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

ইখ্‌তিয়ার-উদ্দিনের বিহার ও বাংলা জয়

১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে মোহম্মদ ঘুরীর ভ্রাতা গিয়াস-উদ্দিনের মৃত্যু হইলে মোহম্মদ ঘুরী গজনী, ঘুর ও দিল্লীর সুলতান হইলেন। ইহার পূর্বাবধি মোহম্মদ ঘুরী তাঁহার ভ্রাতা গিয়াস-উদ্দিনের অধীনে গজনীর শাসনকর্তার কাজ করিতেন। সিংহাসন আরোহণের দুই বৎসর পর মোহম্মদ ঘুরী মধ্য-এশিয়াস্থ খারিজমের শাহের হস্তে পরাজিত হইলে তাঁহার ভারতীয় সাম্রাজ্যে এক বিদ্রোহ দেখা দিল। গজনীর সুলতান বংশের জনৈক কর্মচারী মুলতান দখল করিয়া লইলেন। পাঞ্জাবের খোকর জাতি ঘুরীর আনুগত্য অস্বীকার করিয়া স্বাধীন হইয়া গেল। এই সংবাদ পাইয়া মোহম্মদ ঘুরী সসৈন্যে পুনরায় ভারতবর্ষে আসিলেন। অমানুষিক অত্যাচার করিয়া তিনি এই বিদ্রোহ দমন করিলেন। পর বৎসর নিজ রাজধানীতে প্রত্যাবর্তনের পথে এক আততায়ীর হস্তে তিনি নিহত হন (১২০৬)।

মোহম্মদ ঘুরীর শেষবার ভারত আগমন : তাঁহার মৃত্যু (১২০৬)

মোহম্মদ ঘুরীর কৃতিত্ব (Estimate of Muhammad Ghuri) : মোহম্মদ ঘুরী ছিলেন অনন্যসাধারণ সামরিক প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি যেমন ছিলেন একজন বীর যোদ্ধা তেমনি ছিলেন দুর্ধর্ষ সমরবিজয়ী নেতা। ভ্রাতা গিয়াস-উদ্দিন-এর অধীনে শাসক হিসাবে তিনি তাঁহার কর্মজীবন শুরু করিয়া নিজ প্রতিভাবলে এক বিশাল সাম্রাজ্য গঠনে সমর্থ হইয়াছিলেন। ভ্রাতার প্রতি আনুগত্য, নিজ আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা প্রভৃতি গুণাবলী তাঁহাকে সমসাময়িক মুসলমান রাজগণের বহু উর্ধ্বে স্থাপন করিয়াছিল। তাঁহার চেষ্টায়-ই ভারতবর্ষে স্থায়ী মুসলমান রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। তরাইনের প্রথম যুদ্ধে পরাজিত হইয়াও তিনি পরাজয় স্বীকার করেন নাই, পর বৎসর ঐ একই প্রান্তরে তিনি হিন্দুদের

সামরিক প্রতিভা

সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করিয়া উত্তর-ভারতে মুসলমান রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার ভারত-আক্রমণের পশ্চাতে ধর্মান্ধতার প্রভাব যে একেবারে ছিল না এমন নহে। আজমীরের হিন্দু মন্দিরগুলি ধ্বংস করিয়া সেই স্থলে মসজিদ নির্মাণ তাঁহার পরধর্মের প্রতি অসহিষ্ণুতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ সন্দেহ নাই। তথাপি তিনি তাঁহার ধর্মান্ধতা দ্বারা নিজ রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি আচ্ছন্ন হইতে দেন নাই। তিনি গজনীরাজ্যের শাসক নিযুক্ত হইয়া-ই ভারত বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিয়াছিলেন এবং মৃত্যুর পূর্বে উত্তর-ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করিয়া সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিয়াছিলেন।

মুসলমান সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন

উচ্চাকাঙ্ক্ষা : সাফল্য

সুলতান মামুদ ও মোহম্মদ ঘুরীর তুলনা (Sultan Mahmud and Muhammad Ghuri Compared) : সুলতান মামুদের প্রসিদ্ধির তুলনায় মোহম্মদ ঘুরী প্রায় অখ্যাত রহিয়া গিয়াছেন একথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুলতান মামুদের ভারত-অভিযান এবং সামরিক দুর্ধর্ষতার দিক দিয়া বিচার করিলে মোহম্মদ ঘুরীর ভারত-অভিযান অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক। সুলতান মামুদ যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজয় বরণ করেন নাই, কিন্তু গুজরাট জয় করিতে গিয়া এবং তরাইনের প্রথম যুদ্ধে মোহম্মদ ঘুরী শোচনীয় পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সুলতান মামুদ শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম প্রভৃতির পৃষ্ঠপোষকতার দ্বারা অক্ষয় কীর্তি অর্জন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এ বিষয়ে মোহম্মদ ঘুরীর কোন অবদান নাই। তথাপি ইহা অনস্বীকার্য যে, ভারতবর্ষে মুসলমান শাসনের ইতিহাসে মোহম্মদ ঘুরীর দান সুলতান মামুদের দান অপেক্ষা বহুগুণে বেশি। মামুদের অভিযান মাত্রেরই উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু দেব-দেবীর মন্দির লুণ্ঠন, পৌত্তলিক হিন্দুদের হত্যা; কিন্তু ধর্মপ্রচারের প্রয়াস মোহম্মদ ঘুরীর আক্রমণের পশ্চাতে কতক পরিমাণে পরিলক্ষিত হইলেও ভারতবর্ষে স্থায়ী মুসলমান সাম্রাজ্য স্থাপনই ছিল তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। বার বার পাঞ্জাবের মধ্য দিয়া সসৈন্যে যাওয়া-আসার

মামুদের প্রসিদ্ধি মোহম্মদ ঘুরীর অপেক্ষা বহুগুণে বেশি

মামুদ অপরাজেয়, ঘুরীর দুইবার শোচনীয় পরাজয়

মামুদের শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতির পৃষ্ঠপোষকতা কিন্তু ঘুরীর অনুরূপ গুণের অভাব

ফলে পাঞ্জাব স্বভাবতই সুলতান মামুদের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল, কিন্তু মোহম্মদ ঘুরীর অভিযানের ফলে উত্তর-ভারতের এক বিস্তীর্ণ অংশে মুসলমান প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল। সুলতান মামুদ ও মোহম্মদ ঘুরী—এই দুই সামরিক নেতার অধীনে ভারত আক্রমণের যে দুই তরঙ্গ আসিয়াছিল তাহার মধ্যে সুলতান মামুদের আক্রমণ-তরঙ্গের বিশেষ কোন স্থায়ী চিহ্ন ছিল না, কিন্তু মোহম্মদ ঘুরীর আক্রমণ-তরঙ্গ উত্তর-ভারতের হিন্দুরাজগণকে পরাভূত করিয়া ভারত-ইতিহাসে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আনিয়াছিল। ভারতে মুসলমান রাজত্বের স্থাপয়িতা হিসাবে ঘুরীর নাম সর্বপ্রথমেই উল্লেখযোগ্য।

মামুদের অভিযানের মুখ্য উদ্দেশ্য লুণ্ঠন ও ঘুরীর মুখ্য উদ্দেশ্য ভারত বিজয়

ঘুরী ভারতে মুসলমান রাজত্বের স্থাপয়িতা

সুলতান মামুদ ও মোহম্মদ ঘুরীর ভারত-অভিযানের পার্থক্য (Difference between the invasions of Sultan Mahmud and those of Ghuri) ঃ

সুলতান মামুদ ও মোহম্মদ ঘুরী উভয়েই গজনী রাজ্য হইতে ভারত অভিযানে অগ্রসর হইয়াছিলেন—সুলতান মামুদ ছিলেন গজনীর সুলতান, আর ঘুরী ছিলেন নিজ ভ্রাতার অধীনে গজনীর শাসনকর্তা। পদমর্যাদার এই পার্থক্য এই দুইয়ের সামরিক সুযোগ-সুবিধার কতক পরিমাণে পার্থক্যের সৃষ্টি করিয়াছিল সন্দেহ নাই। সুযোগ-সুবিধার পার্থক্য ভিন্ন এই দুইজন আক্রমণকারীর অভিযানের প্রকৃতি ও আদর্শের মধ্যেও কতকগুলি মৌলিক পার্থক্য ছিল।

সুযোগ-সুবিধার পার্থক্য

প্রথমতঃ, সুলতান মামুদের অভিযান মাত্রই ধর্মান্ধ নীতির দ্বারা প্রভাবিত ছিল। পৌত্তলিক হিন্দুদিগকে হত্যা, হিন্দুমন্দির অপবিত্রীকরণ প্রভৃতি তাঁহার এই ধর্মান্ধ নীতি-প্রসূত ছিল। অপর পক্ষে, মোহম্মদ ঘুরীর অভিযানগুলি ধর্মদ্বারা প্রভাবিত হইলেও তাঁহার ধর্মান্ধতা তাঁহার রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে নাই। একমাত্র আজমীর ভিন্ন অন্য কোথাও মোহম্মদ ঘুরীর হিন্দুমন্দির ধ্বংস করার কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। মুলতানের ইসমাইলিয়া মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধেও ঘুরী সামরিক অভিযানে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

মামুদের ধর্মান্ধতা ; মোহম্মদ ঘুরীর নীতি ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হইলেও রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি আচ্ছন্ন নহে

দ্বিতীয়তঃ, স্থলতান মামুদের ভারত-অভিযানের মূল প্রেরণা ছিল ধনরত্ন লুণ্ঠন, মুসলমান আধিপত্য স্থাপন তাঁহার অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু মোহম্মদ ঘুরীর অভিযানে ভারত-জয়ের আকাঙ্ক্ষা পরিলক্ষিত হয়। হিন্দু-রাজগণের সহিত তাঁহার পরপর যুদ্ধের প্রকৃতি লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায় যে, ভারতবর্ষে রাজ্য বিস্তার করাই ছিল তাঁহার অভিযানের মুখ্য উদ্দেশ্য। ১১৭৫-৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মুলতান ও পর বৎসর উচ্ অধিকার করেন। ১১৭৮ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাট আক্রমণ করিয়া তিনি অকৃতকার্য হইয়াছিলেন। কিন্তু পরাজয়ে দমিবার পাত্র তিনি ছিলেন না। পর বৎসরই (১১৭৯) তিনি পেশওয়ার দখল করিয়া শিয়ালকোটে একটি দুর্গ স্থাপন করেন। এই দুর্গ স্থাপন হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, বিজিত রাজ্য রক্ষা করা-ই ছিল ইহার উদ্দেশ্য।

ধনরত্ন লুণ্ঠন মামুদের অভিযানের মুখ্য উদ্দেশ্য, কিন্তু ঘুরীর উদ্দেশ্য রাজ্যবিস্তার

তৃতীয়তঃ, বার বার পাঞ্জাবের মধ্য দিয়া সসৈন্যে যাতায়াতের ফলে পাঞ্জাবের অধিকাংশ স্থলতান মামুদের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। নিজ অধিকার স্থাপনের কোন পূর্ব-পরিকল্পনা অনুসারে ইহা ঘটে নাই। কিন্তু গজনীর শাসনভার গ্রহণ করিয়াই মোহম্মদ ঘুরী ভারত আক্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন অভিযানের দ্বারা সেই পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে মনোযোগী হন। এই কারণে তরাইনের প্রথম যুদ্ধে পরাজিত হইয়াও তিনি নিশ্চেষ্ট হয় নাই। দ্বিতীয়বার তিনি ভারতীয় হিন্দুরাজগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই যুদ্ধেই ভাগ্যদেবী তাঁহার উপর প্রসন্না হন এবং তরাইনের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া তিনি উত্তর-ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করিতে সমর্থ হন। স্থলতান মামুদের অভিযানগুলির ফলে উত্তর-ভারতের রাজ্যগুলির সামরিক ও অর্থনৈতিক দুর্বলতার সৃষ্টি হইয়াছিল, মোহম্মদ ঘুরী সেই দুর্বলতার স্থযোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন। মোহম্মদ ঘুরীর ভারত অভিযানের পর হইতেই ধারাবাহিকভাবে ভারতে মুসলমান বিজয় ও রাজত্বকালের সূচনা হয়।

মামুদের পাঞ্জাব অধিকার পূর্ব-পরিকল্পনা-প্রসূত নহে—ঘুরীর রাজ্যবিস্তার পূর্ব-পরিকল্পনা-প্রসূত

দ্বিতীয় অধ্যায়

দাসবংশ*

(The Slave Dynasty)

কুতব-উদ্দিন আইবক্, ১২০৬-১০ (Qutb-ud-din Aibak):

মোহম্মদ ঘুরী ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবার সময় তাঁহার এক বিশ্বস্ত অনুচর কুতব-উদ্দিনের উপর বিজিত রাজ্যের শাসনভার অর্পণ করিয়া গেলেন। মোহম্মদ ঘুরীর ভারত-অভিযানে কুতব-উদ্দিন গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধি, বিদ্যা ও সমর কুশলতার দিক দিয়া তিনিই ছিলেন মোহম্মদ ঘুরীর সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য অনুচর।

মোহম্মদ ঘুরী কর্তৃক বিজিত রাজ্যের শাসনকর্তা নিযুক্ত

কুতব-উদ্দিন প্রথম জীবনে সামান্য ক্রীতদাস ছিলেন। তুর্কীস্তান হইতে ক্রীতদাস ব্যবসায়ীদের সহিত তিনি পারস্যের নিশাপুর নামক স্থানে আসেন।

---

* দাসবংশ—কুতব-উদ্দিন হইতে আরম্ভ করিয়া কাইকোবাদ-এর শাসনকাল পর্যন্ত (১২০৬-১২৯০) সুলতানগণ সাধারণতঃ দাসবংশ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। বস্তুত, এই নামকরণের কোন যৌক্তিকতা নাই। কারণ, যে সকল ক্রীতদাস দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন তাঁহারা সিংহাসন লাভের পূর্বে প্রত্যেকেই উচ্চ রাজকর্মচারী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এমন কি তাঁহারা পূর্ববর্তী সুলতানের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে সম্পর্কিত ছিলেন। সুতরাং তাঁহারা ক্রীতদাস হিসাবে সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই। প্রথম জীবনে ক্রীতদাস থাকিলেও তাঁহাদিগকে উচ্চ রাজ-কর্মচারীর মর্যাদা দান করিয়া তাঁহাদের দাসত্বের অবসান ঘটান হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন জন্মের দিক দিয়া বিচার করিলেও তাঁহারা প্রায় সকলেই মূলতঃ অভিজাত পরিবার-সম্ভূত ছিলেন। ভাগ্যচক্রেই তাঁহারা স্বাধীনতা হারাইয়া ক্রীতদাসে পরিণত হইয়াছিলেন। ইলতুৎমিস্ নিজ ভ্রাতা কর্তৃক ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রীত হইয়াছিলেন। বলবন মোগলগণ কর্তৃক ধৃত হইয়া ক্রীতদাসরূপে বিক্রীত হইয়াছিলেন। সুতরাং 'দাসবংশ' নামকরণ ইতিহাসে পরিচিতি লাভ করিলেও ইহা যুক্তিসিদ্ধ নহে।

নিশাপুরের কাজী অর্থাৎ বিচারক কুতব-উদ্দিনকে ক্রয় করেন এবং তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে সাহিত্য, ধনুর্বিদ্যা ও সামরিক কৌশল শিক্ষা দেন। কাজীর মৃত্যুর পর নানা ভাগ্য বিপর্যয়ের মধ্য দিয়া কুতব-উদ্দিন মোহম্মদ ঘুরীর নিকট বিক্রীত হন। মোহম্মদ ঘুরীর অধীনে তিনি স্বীয় দক্ষতা প্রমাণ করিবার অপূর্ব সুযোগ লাভ করিলেন এবং অল্পকালের মধ্যেই তিনি মোহম্মদ ঘুরীর সর্বাধিক বিশ্বস্ত কর্মচারীর মর্যাদা প্রাপ্ত হইলেন।

নিশাপুরের কাজীর অধীনে শিক্ষালাভ

মোহম্মদ ঘুরী নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর কুতব-উদ্দিন 'সুলতান' উপাধি ধারণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে স্বাধীনভাবে নিজেকে অধিষ্ঠিত করিলেন (১২০৬)। ঐ সময় হইতেই দিল্লী সুলতানির ইতিহাস শুরু হইল। মোহম্মর ঘুরীর প্রধান ক্রীতদাসের মধ্যে অপর দুইজন ছিলেন কির্‌মান প্রদেশের শাসনকর্তা তাজ-উদ্দিন ইল্‌দিজ্ এবং মুলতান ও উচ্-এর শাসনকর্তা নাসির-উদ্দিন কুবাচা। মোহম্মদ ঘুরীর মৃত্যুর পর তাজ-উদ্দিন ইল্‌দিজ্ গজনী রাজ্যটিও নিজ অধিকারভুক্ত করেন। কুতব-উদ্দিনের ভাগ্যোন্নতিতে ঈর্ষান্বিত হইয়া তাজ-উদ্দিন পাঞ্জাব প্রদেশ অধিকার করিবার উদ্দেশ্যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন।

মোহম্মদ ঘুরীর মৃত্যুর পর কুতব-উদ্দিনের দিল্লীর সুলতান-পদ লাভ

কিন্তু কুতব-উদ্দিন তাঁহাকে পরাজিত করিয়া সাময়িক-ভাবে গজনী পর্যন্ত নিজ দখলে আনিতে সমর্থ হন। কিন্তু কুতব-উদ্দিনের গজনী অধিকার স্থায়ী হইল না। তাঁহার সৈনিকদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া গজনীবাসীরা গোপনে তাজ-উদ্দিনকে গজনী আক্রমণ করিবার জন্য আমন্ত্রণ করিল। অতর্কিতে আক্রান্ত হইয়া কুতব-উদ্দিন গজনী ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। আফগানি-স্তান ও ভারতবর্ষের মুসলমান রাজ্যের রাজনৈতিক ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সুযোগ এইভাবে বিনষ্ট হইল। কুতব-উদ্দিন সম্পূর্ণ ভারতীয় সুলতানে পরিণত হইলেন। অল্পকালের মধ্যেই (১২১০) কুতব-উদ্দিনের মৃত্যু হইল।

তাজ-উদ্দিনের সহিত সংঘর্ষ—সাময়িকভাবে গজনী দখল

তাঁহার মৃত্যু (১২১০)

স্বাধীন সুলতান হিসাবে চারি বৎসর রাজত্বকালে কুতব-উদ্দিন কোন নূতন স্থান জয় করিতে পারেন নাই, কোন সুদক্ষ শাসনব্যবস্থাও স্থাপন করিয়া যাইতে সমর্থ হন নাই। তথাপি সদাশয় ও স্বাধীনচেতা শাসক হিসাবে

তিনি সমসাময়িকদের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন। মিন্‌হাজ্‌-উস্‌-সিরাজের বর্ণনা হইতে তাঁহার সদাশয়তার কথা জানিতে পারা যায়। কুতব-উদ্দিন যে একজন অতিশয় ন্যায়পরায়ণ শাসক ও সুবিচারক ছিলেন তাহা ঐতিহাসিক হাসান-নিজামীর রচনায় উল্লিখিত আছে।* দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে এবং জনসাধারণের সমৃদ্ধি সাধনে তিনি সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। ভারতবর্ষে ইস্‌লাম ধর্ম প্রবর্তনের ব্যবস্থাও তিনি করিয়াছিলেন। তিনি দিল্লী ও আজমীরে দুইটি মস্‌জিদ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তিনি মুক্তহস্তে দান করিতেন এইজন্য তাঁহাকে 'লাখ্‌-বক্স'—অর্থাৎ 'যিনি লক্ষ লক্ষ মুদ্রা দান করিয়াছেন'—নামে অভিহিত করা হইত।

তাঁহার চরিত্র ও কৃতিত্ব

শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন, মসজিদ নির্মাণ

কুতব-উদ্দিনের মৃত্যুর পর আরাম শাহ্‌ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি কুতব-উদ্দিনের পোষ্যপুত্র ছিলেন বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। শাসক হিসাবে আরাম শাহ্‌ ছিলেন একেবারে অকর্মণ্য। লাহোরে আকস্মিকভাবে কুতব-উদ্দিনের মৃত্যু হইলে সিংহাসন লইয়া কোনপ্রকার গোলযোগ যাহাতে না হইতে পারে সেজন্য লাহোরের 'আমীর' ও 'মালিকগণ' আরাম শাহ্‌কে সুলতান পদে অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অকর্মণ্যতার সম্পূর্ণ পরিচয় পাইয়া দিল্লীর আমীরগণ কুতব-উদ্দিনের জামাতা ইল্‌তুৎমিস্‌কে দিল্লীর সিংহাসন গ্রহণ করিতে আহ্বান জানাইলেন। ইল্‌তুৎমিস্‌ ঐ সময়ে বদাউন প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি দিল্লীর আমীর-ওমরাহগণের আমন্ত্রণ পাওয়ামাত্র সসৈন্যে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। দিল্লীর উপকণ্ঠে আরাম শাহ্‌কে যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করিয়া ইল্‌তুৎমিস্‌ সুলতান পদ লাভ করিলেন (১২১১)।

আরাম শাহ্‌ (১২১০—১২১১)

ইল্‌তুৎমিস্‌, ১২১১-৩৬ (Iltutmish): শাম্‌সুদ্দিন ইল্‌তুৎমিস্‌ ইল্‌বেরী তুর্কী জাতির লোক ছিলেন। তিনি তুর্কী অভিজাত পরিবারে

---

* "He dispensed even-handed justice to the people and exerted himself to promote the peace and prosperity of the realm." *Taj-un-Ma'sair*, Hasan-un-Nizami. Vide, *An Advanced History of India*. p. 281.

জন্মগ্রহণ করিলেও তাঁহার ভ্রাতা তাঁহাকে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রয় করিয়া দেওয়ার ফলে তিনি ক্রীতদাস হিসাবেই তাঁহার জীবন শুরু করেন। ইল্‌তুৎমিসের বুদ্ধি ও দেহের গঠন ও সৌন্দর্য দেখিয়া কুতব-উদ্দিন তাঁহাকে ক্রীতদাস ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে অতি উচ্চ মূল্যে ক্রয় করেন। ইল্‌তুৎমিস্ নিজ প্রতিভাবলে শীঘ্রই কুতব-উদ্দিনের বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠেন। কুতব-উদ্দিন তাঁহাকে জামাতারূপে বরণ করেন এবং বদাউনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। কুতব্-উদ্দিন যখন গজনী আক্রমণ করেন তখন ইল্‌তুৎমিস্ যে সমরকুশলতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহার ফলে দিল্লীর আমীর-ওমরাহ্-দিগের অধিকাংশের মনেই তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধার সৃষ্টি হইয়াছিল। এইজন্যই তাঁহাকে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিবার জন্য আমীর-ওমরাহ্‌গণ আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন।

ইলতুৎমিসের প্রথম জীবন

তাঁহার সিংহাসন লাভ

সিংহাসন লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই ইল্‌তুৎমিস্‌কে এক অতি জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইল। মুলতানের শাসনকর্তা নাসির-উদ্দিন কুবাচা নিজেকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং পাঞ্জাব দখল করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অপর দিকে তাজ-উদ্দিন মোহম্মদ ঘুরী কর্তৃক বিজিত ভারতীয় সাম্রাজ্য অধিকার করিবার ইচ্ছা পোষণ করিতেছিলেন। ইখ্‌তিয়ার-উদ্দিনের মৃত্যুর পর (১২০৬) আলী মর্দান নামে জনৈক খল্‌জী অভিজাত ব্যক্তিকে কুতব-উদ্দিন বাংলাদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আলী মর্দান কুতব-উদ্দিনের মৃত্যুর পর 'সুলতান আলা-উদ্দিন' উপাধি ধারণ করিয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। আরাম শাহের দুর্বলতার সুযোগে গোয়ালিওর ও রণথম্ভোর স্বাধীন হইয়া গিয়াছিল। দিল্লীর আমীর-ওমরাহ্‌দের একটি দলও ইল্‌তুৎমিসের বিপক্ষে ছিলেন। এইরূপ নানাবিধ সমস্যা-জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হইলেও ইল্‌তুৎমিস্ দমিলেন না। তিনি প্রথমেই তাঁহার বিরুদ্ধাচারী আমীর-ওমরাহ্‌দের দমন করিয়া তাঁহার সিংহাসন নিরঙ্কুশ করিলেন। তারপর তিনি তাজ-উদ্দিনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ইতিমধ্যে তাজ-উদ্দিন ইল্‌দিজ্ খারজমের শাহ্ কর্তৃক গজনী হইতে বিতাড়িত হইয়া ভারতবর্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং পাঞ্জাব হইতে

তাঁহার সমস্যা

দিল্লীর আমীর-ওমরাহ্ দমন, তাজ-উদ্দিনের পরাজয়

থানেশ্বর পর্যন্ত সকল স্থান দখল করিয়া লইলেন। ১২১৬ খ্রীষ্টাব্দে ইল্‌তুৎমিস্ ইল্‌দিজ্‌কে পরাজিত ও বন্দী করেন। এদিকে নাসির-উদ্দিন কুবাচা লাহোর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন।* ইল্‌তুৎমিস তাঁহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলে তিনি সিন্ধুদেশের চক্কর নামক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

ইতিমধ্যে ১২২১ খ্রীষ্টাব্দে মোঙ্গল নেতা চিঙ্গিজ খাঁ † (Chingiz Khan) তাঁহার বিশাল মোঙ্গলবাহিনী লইয়া ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ সিন্ধুনদের উপত্যকায় উপস্থিত হন। চিঙ্গিজ খাঁ ঐ সময়ে মধ্য ও

---

* Vide *An Advanced History of India*, p. 283; Suvastara: *The Sultanate of Delhi*, p. 101.

†**চিঙ্গিজ খাঁ (Chingiz Khan)**ঃ মোঙ্গলনেতা চিঙ্গিজ খাঁ ১১৫৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার আদি নাম ছিল তেমুচিন (Temuchin)। তের বৎসর বয়সে পিতার মৃত্যু হইলে চিঙ্গিজ নানা দুঃখ-দুর্দশার মধ্য দিয়া কিছুকাল অতিবাহিত করেন। কিন্তু কৈশোরে কঠোর জীবন যাপন করিবার ফলে তিনি স্বভাবতই নির্ভীক, ধৈর্যশালী ও আত্মনির্ভরশীল হইয়া উঠিলেন। ঐ সময়ে মোঙ্গল জাতি কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত ছিল। 'মোঙ্গল' কথাটি 'মোঙ্' অর্থাৎ 'নির্ভীক' শব্দ হইতে আসিয়াছে। বস্তুত, মোঙ্গলগণ যেমন ছিল দুর্ধর্ষ তেমনি ছিল নির্ভীক। মানুষের জীবনের প্রতি তাহাদের বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না। নির্দোষ নর-নারীকে হত্যা করিতে মোঙ্গলদের বাধিত না। এই দুর্ধর্ষ মোঙ্গল জাতির বিভিন্ন দলকে চিঙ্গিজ খাঁ ঐক্যবদ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন। ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এই ঐক্যবদ্ধ মোঙ্গল জাতির 'খাঁ', অর্থাৎ নেতা উপাধি গ্রহণ করিলেন। এক দুর্দমনীয় শক্তি লইয়া চিঙ্গিজের নেতৃত্বে মোঙ্গল জাতি চীন, মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার সকল দেশ বিধ্বস্ত করিল। বখ্, বোখারা, সমরকন্দ এবং আরও বহু সুন্দর সুন্দর নগর চিঙ্গিজের আক্রমণে ধূলিসাৎ হইয়াছিল। খারিজম ও খারিজমের শাহ্-এর রাজ্য আক্রমণের সূত্রে-ই চিঙ্গিজ খাঁ ভারতবর্ষের সিন্ধুদেশে সদলবলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। খারিজমের শাহ্ জালাল-উদ্দিন চিঙ্গিজ খাঁর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্ত নিজ রাজ্য হইতে পলাইয়া আসিয়া সিন্ধুদেশে উপস্থিত হইলে চিঙ্গিজ খাঁ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া সিন্ধু-উপত্যকায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। জালাল-উদ্দিন ভারতবর্ষ ত্যাগ করিলে এবং ভারতবর্ষের গ্রীষ্মের উত্তাপ অসহ্য বলিয়া চিঙ্গিজ খাঁ ভারতবর্ষ আক্রমণ না করিয়া-ই চলিয়া গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পরবর্তী কালের মোঙ্গল আক্রমণের সূত্রপাত তিনিই করিয়া গিয়াছিলেন।

পশ্চিম-এশিয়াস্থ দেশগুলি জয় করিয়া খারজম বা খিবা আক্রমণ করিলে সেখানকার শাহ্ জালাল-উদ্দিন পলাইয়া আসিয়া পাঞ্জাবে উপস্থিত হন। চিঙ্গিজ খাঁ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া সিন্ধু উপত্যকায় আসিয়া উপস্থিত হন। জালাল-উদ্দিন ইল্‌তুৎমিসের নিকট সাময়িকভাবে দিল্লীতে অবস্থানের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া দূত প্রেরণ করিলেন। ইল্‌তুৎমিস্ জালাল-উদ্দিনের উপস্থিতি তাঁহার রাজ্যে বিশৃঙ্খলার কারণ হইয়া দাঁড়াইতে পারে মনে করিয়া জালাল-উদ্দিনের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিলেন এবং জালাল-উদ্দিনের দূতকে গোপনে হত্যা করাইলেন। জালাল-উদ্দিন এইরূপ অসহায় অবস্থার মধ্যেও চিঙ্গিজ খাঁর সৈন্যের সহিত যুঝিয়া চলিলেন। কিছুকাল পর দুর্ধর্ষ মোঙ্গলদের আক্রমণ প্রতিহত করিতে না পারিয়া জালাল-উদ্দিন সিন্ধুপ্রদেশে লুঠতরাজ শুরু করিলেন। নাসির-উদ্দিন কুবাচা বাধ্য হইয়া মুলতানের দুর্গে আশ্রয় লইলেন। সিন্ধুপ্রদেশের বহুস্থান বিধ্বস্ত করিয়া জালাল-উদ্দিন ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া পারস্য দেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। মোঙ্গলগণ পাঞ্জাব ও সিন্ধু অঞ্চলের গ্রীষ্মের উত্তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। এইভাবে বিনা যুদ্ধেই ইল্‌তুৎমিস্ সর্বপ্রথম মোঙ্গল আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইলেন।

চিঙ্গিজ খাঁর সিন্ধুদেশে আগমন : সর্বপ্রথম মোঙ্গল আক্রমণ

খারজমের শাহ্ জালাল-উদ্দিনের ভারত ত্যাগ

অল্পকালের মধ্যেই ইল্‌তুৎমিস্ নাসির-উদ্দিন কুবাচাকে পরাজিত করেন। নাসির-উদ্দিন পরাজিত হইয়া পলায়নকালে সিন্ধুনদ অতিক্রম করিতে গিয়া জলে ডুবিয়া প্রাণ হারাইলেন। ফলে সিন্ধুদেশ দিল্লীর অধিকারভুক্ত হইল।

নাসির-উদ্দিন কুবাচার মৃত্যু : সিন্ধুদেশ দিল্লীর অধিকারভুক্ত

১২২৬ খ্রীষ্টাব্দে ইল্‌তুৎমিস্ রণথম্ভোর পুনরধিকার করেন। ১২২৯ খ্রীষ্টাব্দে ইল্‌তুৎমিস্ বাগ্‌দাদের খলিফার নিকট হইতে 'সুলতান-ই-আজম' (**Great Sultan**) উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। পর বৎসর যোধপুরের উত্তরে মন্দোর নামক স্থানটি তিনি জয় করিলেন।

কুতবউদ্দিনের মৃত্যুর পর বাংলাদেশের খল্‌জী মালিকগণ দিল্লী সুলতানের আনুগত্য অস্বীকার করেন। তাঁহাদের মধ্যে ঘিয়াসউদ্দিন খল্‌জী অত্যন্ত পরাক্রমশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি স্বাধীনভাবে জাজনগর, কামরূপ, তিরহুত ও গৌড় রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। ইল্‌তুৎমিস তাঁহার

ইলতুৎমিসের সাম্রাজ্য
০ ২০০ ৪০০
মাইল
কাশ্মীর
গজনী
পেশোয়ার
লাহোর
মুলতান
দিল্লী
মথুরা
কনৌজ
আজমীর
রণথম্ভোর
গোয়ালিয়র
কাশী
প্রয়াগ
উজ্জয়িনী
গুজরাট
যাদব
দেবগিরি
গোদাবরী নদী
বরঙ্গল
কাকতীয়
উড়িষ্যা
মহানদী
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
পাণ্ড্য
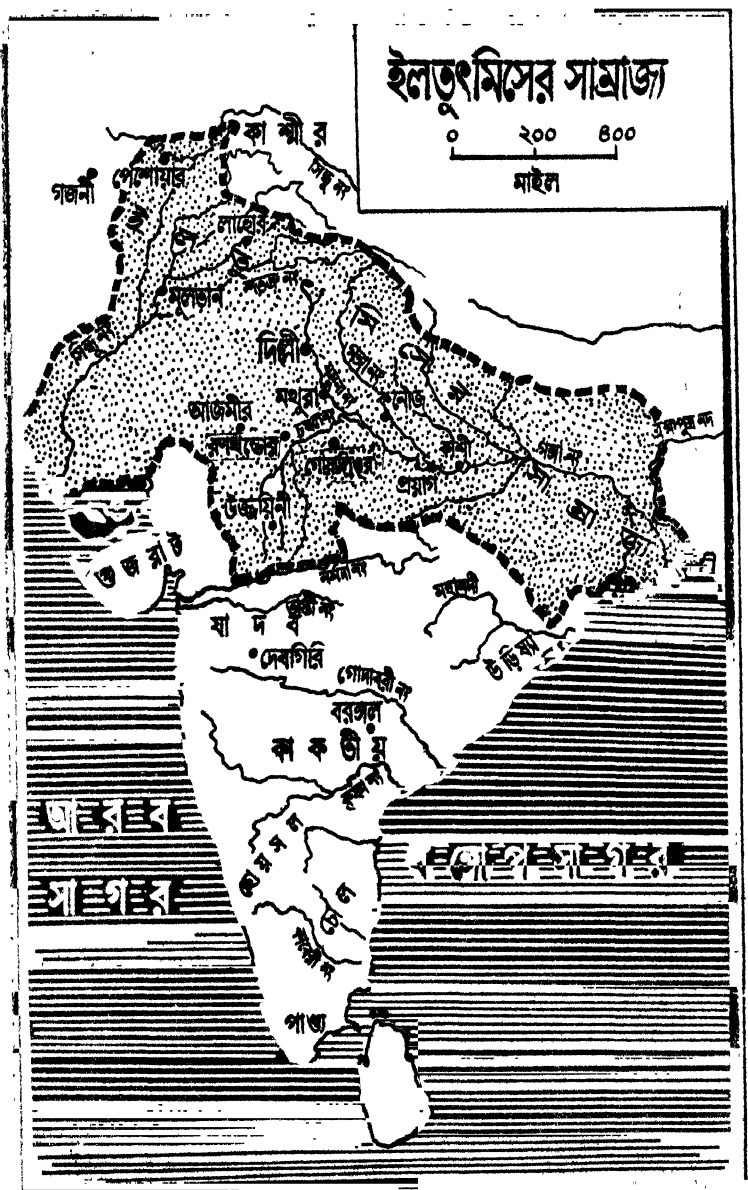
বিরুদ্ধে এক সামরিক অভিযান প্রেরণ করিলে ঘিয়াসউদ্দিন ইল্‌তুৎমিসের বশ্যতা স্বীকার করিয়া চুক্তিবদ্ধ হইলেন। কিন্তু ইল্‌তুৎমিসের সেনাবাহিনী বাংলাদেশ ত্যাগ করিবামাত্র ঘিয়াসউদ্দিন পুনরায় স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন এবং বিহার অধিকার করিয়া লইলেন। সেই সময়ে অযোধ্যার শাসনকর্তা নাসিরউদ্দিন গিয়াসউদ্দিনের বিরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। ঘিয়াসউদ্দিন পরাজিত ও নিহত হইলেন এবং বাংলার খল্‌জী মালিকগণ কারারুদ্ধ হইলেন। কিন্তু কিছুকালের মধ্যে নাসিরউদ্দিন মামুদ শাহ্-এর মৃত্যু হইলে লক্ষণাবতীর খল্‌জী মালিকগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠেন। ইল্‌তুৎমিস্ বাংলাদেশের খল্‌জী মালিকদের দমন করিবার উদ্দেশ্যে এক সামরিক অভিযান প্রেরণ করেন।* খল্‌জী মালিকগণ সহজেই পরাজিত ও ক্ষমতাচ্যুত হইলেন। ইল্‌তুৎমিস্ আলা-উদ্দিন জানিকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। ১২৩২ খ্রীষ্টাব্দে ইল্‌তুৎমিস্ গোয়ালিওর পুনরায় দখল করিলেন। দুই বৎসর পর তিনি মালব আক্রমণ করিয়া ভিল্‌সা দুর্গটি অধিকার করিলেন। উজ্জয়িনী নগরটি আক্রমণ করিয়া তিনি ধূলিসাৎ করিলেন এবং তথাকার মহাকালের মন্দিরটিও ধ্বংস করা হইল। উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্যের মূর্তিটি তিনি দিল্লীতে লইয়া আসিলেন। ইহার অল্পকাল পরেই ১২৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ইল্‌তুৎমিসের মৃত্যু হইল।

রণথম্ভোর, বাংলা, গোয়ালিওর, পুনরধিকার— ভিল্‌সা জয়

ইল্‌তুৎমিসের মৃত্যু (১২৩৬)

ইল্‌তুৎমিসের কৃতিত্ব বিচার (Estimate of Iltutmish): ইল্‌তুৎমিস্ দিল্লীর সুলতানির প্রথম পর্যায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন সন্দেহ নাই। তিনি ছিলেন দিল্লীর দাসবংশের প্রকৃত স্থাপয়িতা। মোহম্মদ ঘুরী ও কুতব-উদ্দিনের বিজিত সাম্রাজ্যের সংহতি ও দৃঢ়তা আনিয়াছিলেন ইল্‌তুৎমিস্। কুতব-উদ্দিনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে এবং আরাম শাহের অকর্মণ্যতার সুযোগে সিন্ধুদেশ, বাংলা, রণথম্ভোর, গোয়ালিওর প্রভৃতি যখন স্বাধীন হইয়াছিল, দিল্লীর আমীর-ওম্‌রাহগণের মধ্যে যখন স্বার্থ-দ্বন্দ্ব দেখা দিয়াছিল, সেই সঙ্কটকালে ইল্‌তুৎমিস্ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু এইরূপ জটিল অবস্থার সম্মুখীন হইয়াও ইল্‌তুৎমিস্ আত্ম-

তাঁহার সমস্যা

*Vide *Ishwari Prasad* : *History of Medieval India*, pp. 161-62, 164.

প্রত্যয় হারান নাই। তাঁহার সমস্যা তাজ-উদ্দিন ইল্‌দিজের ভারত অধিকারের আকাঙ্ক্ষা ও মোঙ্গল আক্রমণে অধিকতর জটিল হইয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু ইল্‌তুৎমিস্ একে একে সকল সমস্যার-ই সমাধান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

আরাম শাহ্ ও দিল্লীর বিরুদ্ধপক্ষীয় আমীর-ওম্‌রাহ্‌দের পরাজিত করিয়া তিনি নিজ সিংহাসন কণ্টকমুক্ত করিয়াছিলেন। তারপর একে একে বিদ্রোহী রাজ্যাংশগুলিকে পুনরধিকার করিয়া তিনি দিল্লী রাজ্য পুনর্গঠন করিয়াছিলেন। রণথম্ভোর, গোয়ালিওর, বাংলাদেশ, সিন্ধুদেশ প্রভৃতি তিনি পুনরায় দিল্লীর অধিকারভুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সাময়িকভাবে তিনি গজনীরাজ্যও দখল করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন ভিল্‌সা দুর্গ, মন্দোর প্রভৃতি দখল করিয়া তিনি দিল্লীর অধিকার বিস্তৃত করিয়াছিলেন। খারজমের শাহ্‌কে আশ্রয় দিতে অস্বীকার করিয়া তিনি দূরদর্শিতার পরিচয় দান করিয়াছিলেন। কারণ, জালাল-উদ্দিনকে দিল্লীতে সাময়িকভাবে অবস্থানের সুযোগ দিলে তুর্কী আমীর-ওমরাহ্‌দের মধ্যে তাঁহার প্রভাব বিস্তৃত হইত, ফলে, ইল্‌তুৎমিসের প্রতি তাঁহাদের আনুগত্য হ্রাস পাইত সন্দেহ নাই। ইহা ভিন্ন চিঙ্গিজ খাঁর শত্রুতাও তাঁহাকে অর্জন করিতে হইত। সুতরাং জালাল-উদ্দিনকে আশ্রয় না দিয়া ইল্‌তুৎমিস্ দিল্লী সুলতানির নিরাপত্তাবিধান-করিয়াছিলেন।

তাঁহার সাফল্য

ইল্‌তুৎমিস্ দিল্লীর তুর্কীশাসনের ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়া ভারতে মুসলমান শাসনের স্থায়িত্ব দান করিয়াছিলেন। ১২৯০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁহার স্থাপিত তুর্কী শাসন টিকিয়াছিল। তিনি ভারতবর্ষের এক বিশাল অংশ জুড়িয়া এক সুদৃঢ় ও সুসংহত শাসন স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন।

তুর্কীশাসনের স্থায়িত্ব দান

ইল্‌তুৎমিস্ একজন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার সামরিক প্রতিভা, দূরদর্শিতা, শাসনদক্ষতা তাঁহাকে ভারতের মুসলমান আমলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতানের মর্যাদা দান করিয়াছে। নব-প্রতিষ্ঠিত মুসলমান শাসনের এক সঙ্কট মুহূর্তে তিনি সিংহাসন লাভ করিয়া নিজ প্রতিভাবলে এক সুসংবদ্ধ রাজ্য ও এক সুদৃঢ় শাসনব্যবস্থা স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন।

অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতান

প্রতিভাবান সামরিক নেতা ও সুদক্ষ শাসক হিসাবেই ইল্‌তুৎমিস্ নিজ

পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন, এমন নহে। তিনি সাহিত্য এবং শিল্পেরও উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহারই পৃষ্ঠপোষকতায় দিল্লীর বিখ্যাত কুতব-মিনার নির্মিত হইয়াছিল। বাগদাদের নিকটবর্তী উন্ নামক স্থানে খাজা কুতব-উদ্দিন নামে একজন ধর্মজ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ইল্‌তুৎমিসের শাসনকালে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। ইল্‌তুৎমিস্ ও অপরাপর গণ্যমান্য ব্যক্তি মাত্রেই খাজা কুতব-উদ্দিনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন। তাঁহারই স্মৃতিরক্ষার্থে কুতব-মিনার নির্মিত হইয়াছিল। কুতব-মিনার সুলতান ইল্‌তুৎমিসের শিল্পানুরাগের নিদর্শনস্বরূপ আজও বিদ্যমান। ইল্‌তুৎমিস্ ধর্মভীরু ছিলেন। নিয়মিত প্রার্থনা, ধর্মজ্ঞানীদের প্রতি শ্রদ্ধা, দয়া-দাক্ষিণ্য প্রভৃতি তাঁহার সদ্‌গুণের উল্লেখ ঐতিহাসিক মিন্‌হাজ্-উস্-সিরাজের রচনায় পাওয়া যায়।

সাহিত্য ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা

তাঁহার সদ্‌গুণাবলী

সুলতানা রাজিয়া, ১২৩৬-৪০ (Sultana Raziyya) : ইল্‌তুৎমিসের জীবদ্দশায়ই তাঁহার প্রথম পুত্র নাসির-উদ্দিনের মৃত্যু হইয়াছিল। অপরাপর পুত্রদের অকর্মণ্যতার পরিচয় পাইয়া ইল্‌তুৎমিস্ মৃত্যুর পূর্বেই নিজ কন্যা রাজিয়াকে সিংহাসনের উত্তরাধিকার দান করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু দিল্লীর অভিজাত শ্রেণী স্ত্রীলোকের সিংহাসনারোহণের পক্ষপাতী ছিলেন না। সেইজন্য ইল্‌তুৎমিসের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা ইলতুৎমিসের পুত্র রুক্‌ন্-উদ্দিন ফিরুজকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। রুক্‌ন্-উদ্দিন যেমন ছিলেন অকর্মণ্য তেমন ছিলেন ব্যভিচারী। তাঁহার আমলে স্বভাবতই শাসনের নামে অত্যাচার-অবিচার ও অমিতব্যয়িতা চরমে পৌঁছিল। এই সুযোগে তাঁহার মাতা শাহ্‌তুর্কান শাসনক্ষমতা হস্তগত করিলেন। শাহ্‌তুর্কান ছিলেন নিম্নবংশসম্ভূতা। শাসনক্ষমতা লাভ করিয়া তিনি ইলতুৎমিসের উচ্চবংশীয়া বেগমদের উপর অকথ্য অত্যাচার শুরু করিলেন। মাতা ও পুত্রের স্বার্থপরতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার ফলে রাজ্যের সর্বত্রই বিদ্রোহ দেখা দিল, ফলে, বদাউন, হান্‌সি, লাহোর, অযোধ্যা ও বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় শাসনাধিকার অমান্য করিয়া চলিল। এমতাবস্থায় দিল্লীর অভিজাতগণ রুক্‌ন্-উদ্দিন ও তাঁহার মাতা শাহ্‌তুর্কানকে

রুক্‌ন্-উদ্দিন ফিরুজ

শাহ্‌তুর্কান

রাজিয়ার সিংহাসন লাভ

কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া ইল্‌তুৎমিসের কন্যা রাজিয়াকে দিল্লীর সিংহাসনে স্থাপন করিলেন।

রাজিয়ার সমস্যাগুলিও কোন অংশে কম জটিল ছিল না। ওয়াজির (*wazir*) বা প্রধান মন্ত্রী মোহম্মদ জুনিয়াদী ও অভিজাত সম্প্রদায়ের একদল সুলতানা রাজিয়ার শাসন সরল মনে গ্রহণ করিলেন না। লাহোর, বদাউন, হান্‌সি, বাংলাদেশ, মুলতান প্রভৃতি স্থান বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল। কিন্তু সুলতানা রাজিয়া অসাধারণ সাহসিকতা ও কূটকৌশলে বিরুদ্ধবাদী অভিজাতগণকে দমন করিলেন। অযোধ্যার সামন্তরাজ নুসরৎ-উদ্দিন রুকন্‌-উদ্দিনের আমলে কেন্দ্রীয় শাসনক্ষমতা অবমাননা করিয়া চলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু রাজিয়াকে তিনি যথাসাধ্য সাহায্য দানে অগ্রসর হইলেন। মোহম্মদ জুনিয়াদীও শেষ পর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করিয়া সিরমুর পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং সেখানেই তাঁহার মৃত্যু হইল। এইভাবে রাজিয়া রাজ্যের সর্বত্র বিদ্রোহীদিগকে পুনরায় দিল্লীর পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করিতে বাধ্য করিলেন। লক্ষ্মণাবতী অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ হইতে দেবল পর্যন্ত যাবতীয় স্থানের আমীর ও মালিকগণ রাজিয়ার আনুগত্য স্বীকার করিলেন।

রাজিয়ার সমস্যা

ওয়াজির মোহম্মদ জুনিয়াদীর দমন

রাজিয়ার শাসনকালের প্রথমভাগে নূর-উদ্দিন নামে জনৈক তুর্কী মুসলমানের নেতৃত্বে কিরামিতাহ্‌ ও মুলাহিদ্‌ নামে দুইটি বিধর্মী মুসলমান সম্প্রদায় বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে রাজিয়া তাহাদিগকে কঠোর হস্তে দমন করেন। কিন্তু তাহাতেই তাঁহার বিপদ কাটিল না। জালাল-উদ্দিন ইয়াকুৎ (Jalal-ud-did Yaqut) নামে জনৈক আবিসিনীয় বা হাব্‌সী অনুচরের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শনের ফলে তুর্কী অভিজাতগণ রাজিয়ার বিরুদ্ধে ইখ্‌তিয়ার-উদ্দিন আল্‌তুনিয়ার নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। আল্‌তুনিয়া ছিলেন সরহিন্দের শাসনকর্তা। রাজিয়া সসৈন্যে আল্‌তুনিয়ার বিদ্রোহ দমনে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত ও ধৃত হইলেন। জালাল-উদ্দিন ইয়াকুৎও এই যুদ্ধে নিহত হইলেন। ইল্‌তুৎমিসের অপর এক পুত্র মুইজ্‌-উদ্দিন বাহ্‌রামকে সুলতান বলিয়া ঘোষণা করা হইল। রাজিয়া আল্‌তুনিয়ার

আল্‌তুনিয়ার বিদ্রোহ

হস্তে বন্দিনী অবস্থা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য আলতুনিয়াকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইলেন। তারপর আলতুনিয়া ও তিনি দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু মুইজ্-উদ্দিন বাহ্রামের সেনাবাহিনীর হস্তে উভয়েই পরাজিত হইলেন। এই দুঃসময়ে তাঁহাদের নিজ সৈন্যগণও তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিল। এমতাবস্থায় কাইথল নামক স্থানে কতিপয় দস্যুর হস্তে তাঁহারা নিহত হইলেন (১২৪০)। এইভাবে রাজিয়ার শাসনের অবসান ঘটিল।

আলতুনিয়া ও রাজিয়া নিহত

মুসলমান শাসনকালের ইতিহাসে রাজিয়া-ই ছিলেন একমাত্র স্ত্রীলোক যিনি দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। রাজিয়া দীর্ঘকাল রাজত্ব করিতে পারে নাই বটে, কিন্তু শাসনকার্যে তাঁহার যে দক্ষতা না ছিল এমন নহে। পিতা ইল্তুৎমিসকে তিনি শাসনকার্যে সাহায্য করিতেন। ঐতিহাসিক মিন্হাজ্-উস্-সিরাজের রচনা হইতে জানা যায় যে, রাজিয়া ন্যায়, সততা, সুবিচার ও সুদক্ষ শাসনের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। শাসকসুলভ ক্ষমতা তাঁহার যথেষ্ট ছিল। যুদ্ধবিদ্যায় তিনি যেমন পারদর্শিনী ছিলেন তেমনি দয়া-দাক্ষিণ্যে, সাহিত্যিক ও বিদ্বানদের পৃষ্ঠপোষকতায় নিজ মানসিক উৎকর্ষের পরিচয় দান করিয়াছিলেন। ফেরিস্তার বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, রাজিয়া বিশুদ্ধ উচ্চারণ করিয়া কোরাণ পাঠ করিতে পারিতেন। তিনি পুরুষের পোশাক পরিধান করিয়া রাজদরবারের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিতেন। স্ত্রীলোকের শাসনের প্রতি ঐ সময়ে যে বিরুদ্ধ মনোভাব বিদ্যমান ছিল তাহার ফলেই শেষ পর্যন্ত রাজিয়ার ন্যায় বিদুষী সুলতানারও পরাভব ঘটিয়াছিল।

রাজিয়ার কৃতিত্ব

মুইজ্-উদ্দিন বাহ্রাম, ১২৪০—৪২ (Muiz-ud-din Bahram) : রাজিয়ার পরাজয় ও মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা মুইজ্-উদ্দিন বাহ্রাম দুই বৎসর রাজত্ব করেন। ইল্তুৎমিসের আমলে চল্লিশ জন তুর্কী আমীর ও মালিক দলবদ্ধ হইয়া শাসনব্যবস্থায় যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ পদ দখল করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইঁহারা 'বন্দেগান-ই-চহেলগান' নামে পরিচিত ছিলেন। ইল্তুৎমিসের ন্যায় ক্ষমতাবান সুলতানের প্রতি তাঁহাদের আনুগত্যের অভাব ছিল না, কিন্তু তাঁহার পরবর্তী কালে সুলতানগণের দুর্বলতার সুযোগে এই সকল আমীর ও মালিকের শক্তি

'চল্লিশ আমীর-এর দল'

অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বাহ্‌রাম ছিলেন সাহসী, সরলপ্রাণ, আড়ম্বরহীন সুলতান। তাঁহার রাজত্বকালে আমীর ও মালিকগণ নানাপ্রকার স্বার্থ-দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। মালিক বদর-উদ্দিন সুংকর ছিলেন বাহ্‌রামের গৃহাধ্যক্ষ বা কঞ্চুকি (Lord Chamberlain) এবং নিজাম্‌-উল্‌-মুল্‌ক ছিলেন তাঁহার ওয়াজির বা মন্ত্রী। বদর-উদ্দিনের প্রতি বাহ্‌রাম ও নিজাম্‌-উল্‌-মুল্‌ক উভয়েই অসন্তুষ্ট ছিলেন। এই কারণে বদর-উদ্দিন বাহ্‌রামকে সিংহাসন-চ্যুত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নিজাম্‌-উল্‌-মুল্‌কের মুখে বদর-উদ্দিনের ষড়যন্ত্রের কথা জানিতে পারিয়া বাহ্‌রাম তাঁহাকে বদাউনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু বদর-উদ্দিন সুলতানের বিনা অনুমতিতেই কয়েকমাস পরেই দিল্লীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই অপরাধের জন্য তাঁহাকে বন্দী ও হত্যা করা হইল। বদর-উদ্দিন ছিলেন সম্ভ্রান্ত ও শক্তিশালী চল্লিশ জন আমীরের অন্যতম। তাঁহাকে হত্যা করায় অপরাপর আমীরগণ স্বভাবতই অত্যন্ত ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। সুলতান কখন কাহাকে হত্যা করিবেন এই সন্দেহে তাঁহারা তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করিলেন।

বদর-উদ্দিনের হত্যা

আমীরগণের ষড়যন্ত্র

এইভাবে অভিজাত সম্প্রদায় যখন বাহ্‌রামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করিলেন ঠিক সেই সময়ে মোঙ্গল নেতা হুলাগু'র অনুচর বাহাদুর তৈর-এর নেতৃত্বে এক মোঙ্গলবাহিনী পাঞ্জাবে প্রবেশ করিয়া লাহোর শহরটি দখল করিল (১২৪১)। বাহ্‌রাম লাহোরের শাসনকর্তার সাহায্যার্থে একদল সৈন্য দিল্লী হইতে লাহোরে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু নিজাম্‌-উল্‌-মুল্‌কের ষড়যন্ত্রে এই সেনাবাহিনী অর্ধপথ হইতে ফিরিয়া আসিয়া দিল্লী আক্রমণ করিল। বাহ্‌রাম 'সাদা কেল্লা' (White Fort) হইতে বিদ্রোহী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে কিছুকাল যুঝিয়া শেষ পর্যন্ত পরাজিত হইলেন। তাঁহাকে বন্দী করিয়া কয়েক দিন পর-ই হত্যা করা হইল।

মোঙ্গল আক্রমণ (১২৪১)

আলা-উদ্দিন মাসুদ-শাহ্, ১২৪২—৪৬ (Ala-ud-din Masud Shah): বাহ্‌রাম শাহের হত্যার পর আমীরগণ আলা-উদ্দিন মাসুদ শাহ্‌কে সুলতান বলিয়া ঘোষণা করিলেন। আলা-উদ্দিন ছিলেন ইল্‌তুৎমিসের

পৌত্র, রুকন্-উদ্দিন ফিরুজ শাহের পুত্র। নিজাম্-উল্-মুল্কের ষড়যন্ত্র ও ঔদ্ধত্যে বিরক্ত হইয়া অপরাপর আমীরগণ তাঁহাকে হত্যা করাইলেন। নিজাম্-উদ্দিন আবু বকরকে ওয়াজির পদে নিযুক্ত করিলেন এবং উলুঘ খাঁ রাজগৃহাধ্যক্ষ বা আমীর-ই-হাজিব নিযুক্ত হইলেন। আলা-উদ্দিন মাসুদ শাহের আমলে বাংলার শাসনকর্তা তুঘান তুঘ্রিল্ খাঁ একপ্রকার স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করিতে লাগিলেন, এমন কি, তিনি অযোধ্যাপ্রদেশ পর্যন্ত আক্রমণ করিলেন। ঐতিহাসিক মিন্হাজ্-উস্-সিরাজের অনুরোধে তুঘান তুঘ্রিল্ খাঁ আর অগ্রসর না হইয়া নিজ কর্মস্থলে ফিরিয়া গেলেন। ইহার অল্পকাল পরেই (১২৪৫) মোঙ্গলগণ পুনরায় ভারতবর্ষ আক্রমণ করিল, কিন্তু এইবার তাহারা সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইয়া ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। আলা-উদ্দিন মাসুদ শাহ্ ক্রমেই ব্যভিচারী ও আরামপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। শাসনকার্যে তাঁহার অকর্মণ্যতা যতই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল তাঁহার অত্যাচারও তেমনি বাড়িয়া চলিল। অবশেষে আমীর ও মালিকগণ আলা-উদ্দিন মাসুদকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া ইল্তুৎমিসের কনিষ্ঠ পুত্র নাসির-উদ্দিন মামুদকে দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিলেন (১২৪৬)।

নিজাম্-উল্-মুল্কের ষড়যন্ত্র—তাঁহার প্রাণনাশ

মোঙ্গল আক্রমণ (১২৪৫)

নাসির-উদ্দিন মামুদ, ১২৪৬—৬৫ (Nasir-ud-din Mahmud): নাসির-উদ্দিন মামুদ ধর্মভীরু, অমায়িক ও ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিলেন। কিন্তু তাঁহার স্বাভাবিক নম্রতা ও অমায়িকতার সুযোগে অভিজাত সম্প্রদায়-ই প্রকৃত শাসনকার্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। নাসির-উদ্দিন নামে মাত্রই সুলতান ছিলেন। তাঁহার দয়া-দাক্ষিণ্য ও ঘনিষ্ঠতা সম্পর্কে সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের রচনায় যথেষ্ট অতিশয়োক্তি রহিয়াছে। যাহা হউক, ব্যক্তিগত উদারতা, ন্যায়-পরায়ণতা ও ধর্মভীরুতা তাঁহার যথেষ্ট পরিমাণে থাকিলেও শাসনকার্যে তিনি ছিলেন অক্ষম। তিনি সুলতান হইয়াও দরবেশের ন্যায় জীবন যাপন করিতেন এবং অবসর সময়ে কোরাণ নকল করিয়া কালাতিপাত করিতেন। ঐতিহাসিক মিন্হাজ্-উস্-সিরাজ নাসির-উদ্দিনের অধীনে এক উচ্চ রাজকর্মচারী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি তাঁহার তবকৎ-ই-নাসিরী

নাসির-উদ্দিনের চরিত্র

নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থাদি সুলতান নাসির-উদ্দিনের নামেই উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

নিজের শাসনক্ষমতার অভাবহেতু স্বভাবতই তাঁহার মন্ত্রী উলুঘ খাঁ প্রকৃতপক্ষে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। উলুঘ খাঁ গিয়াস-উদ্দিন বলবন নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। বলবন অবশ্য শাসনকার্যের দায়িত্ব পালনে চরম দক্ষতা প্রদর্শন করিলেন। তিনি আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষা, বৈদেশিক আক্রমণ হইতে দেশের নিরাপত্তা বিধান প্রভৃতি যাবতীয় শাসন-সংক্রান্ত কার্য দক্ষতার সহিত পরিচালনা করিতে লাগিলেন। প্রথমেই তিনি সাম্রাজ্যের সর্বত্র কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য বলবৎ করিতে সচেষ্ট হইলেন। তিনি দোয়াব অঞ্চলের বিদ্রোহী রাজা ও জমিদারদের বিরুদ্ধে পর পর কয়েকটি অভিযান প্রেরণ করিয়া তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণভাবে দমন করিলেন। ১২৪৯ খ্রীষ্টাব্দে সৈফ্-উদ্দিন হাসান মুলতান দখল করিলে বলবন মুলতান পুনরুদ্ধার করেন। ইহার কয়েক বৎসরের মধ্যেই মুলতান ও উচ্-এর শাসনকর্তা কিস্‌লু খাঁ (Kishlu Khan) দিল্লীর আনুগত্য অস্বীকার করিয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। তিনি একদিকে যেমন দিল্লীর আনুগত্য অস্বীকার করিতেন তেমনই অপর দিকে আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে ইরাণের মোঙ্গল-নেতা হুলাগু'র আনুগত্য স্বীকার করিয়া তাঁহার তাঁবেদার সুলতানে পরিণত হইলেন। এমন কি ১২৫৭ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যার শাসনকর্তা কুৎলুঘ্ খাঁ-এর সাহায্য লইয়া তিনি দিল্লী দখল করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁহার এই চেষ্টা বিফলতায় পর্যবসিত হইল।* প্রায় ঐ সময়ে মোঙ্গলগণ কর্তৃক দিল্লীর সাম্রাজ্য আক্রান্ত হইলে বলবন সেই আক্রমণ প্রতিহত করেন। মোঙ্গলদের সহিত সংঘর্ষের পর মোঙ্গল-নেতা হুলাগু দিল্লীতে দূত প্রেরণ করিয়া দিল্লী সাম্রাজ্যের রাজ্য-সীমা লঙ্ঘন করিবেন না এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিলেন। তথাপি পাঞ্জাব অঞ্চল হইতে মোঙ্গলপ্রভাব ও প্রাধান্য সম্পূর্ণভাবে দূর করা সম্ভব হইল না।

গিয়াস-উদ্দিন বলবনের মন্ত্রিত্ব

আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ

মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত

* Vide *Camb. History of India, vol. III.* p. 70-71.

বাংলা ও বিহারের শাসনকর্তা জালাল-উদ্দিন মাসুদ জানি 'শাহ্' উপাধি গ্রহণ করিয়া একপ্রকার স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করিতে লাগিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর মুঘিস্-উদ্দিন উজ্‌বক্ (Mughis-ud-din Yuzbak) বাংলাদেশের শাসনকর্তার পদকে সম্পূর্ণ স্বাধীন করিয়া লইলেন।* এমন কি তিনি অযোধ্যা জয় করিয়া নিজ রাজ্যভুক্ত করিলেন। কামরূপ আক্রমণ করিতে গিয়া তাঁহার মৃত্যু হইলে বাংলাদেশের উপর পুনরায় দিল্লীর আধিপত্য স্থাপন করা সম্ভব হইল। কারা-এর শাসনকর্তাও স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিলেন এবং কিছুকাল নিজ স্বাধীনতা বজায় রাখিতে সমর্থ হইলেন।

বাংলা ও বিহারের উপর প্রাধান্য পুনঃ-স্থাপন

বলবন কালিঞ্জরের হিন্দু সামন্তরাজ, গোয়ালিওরের রাজা, মেওয়াট অঞ্চলের উপজাতীয় দলগুলিকে দমন করিয়া ঐ সকল অঞ্চলে মুসলমান প্রাধান্য পুনঃস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এইভাবে বলবনের চেষ্টায় দিল্লীর সুলতানের প্রাধান্য প্রায় সর্বত্র স্বীকৃত হইল। ১২৩৬ খ্রীষ্টাব্দে নাসির-উদ্দিনের মৃত্যু হইলে ইল্‌তুৎমিসের বংশ বিলুপ্ত হইল। সুলতান নাসির-উদ্দিন বলবনের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুর পূর্বে তিনি নাকি বলবনকে নিজ উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া গিয়াছিলেন। যাহা হউক, গিয়াস-উদ্দিন বলবন সুলতানের দায়িত্ব পালনের সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিলেন সন্দেহ নাই।

হিন্দুরাজগণের উপর প্রাধান্য পুনঃস্থাপন

গিয়াস-উদ্দিন বলবনের সিংহাসন লাভ

গিয়াস-উদ্দিন বলবন, ১২৬৬-৮৭ (Ghiyas-ud-din Balban) : গিয়াস-উদ্দিন বলবন তুর্কীস্তানের ইল্‌বেরি জাতিসম্ভূত ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি মোঙ্গলদের হস্তে বন্দী হইয়া বাগদাদের খাজা জামাল-উদ্দিনের নিকট ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রীত হন। জামাল-উদ্দিন তাঁহাকে দিল্লীতে লইয়া আসেন এবং সেখানে সুলতান ইল্‌তুৎমিস্ তাঁহাকে ক্রয় করেন। বলবন ইল্‌তুৎমিসের "চল্লিশ জন ক্রীতদাস" (Bandegan chahelgan or 'The Forty')-এর অন্যতম ছিলেন। নিজ প্রতিভাবলে তিনি ক্রমে

* Vide *History of Bengal* (D. U.) Vol. II. p. 51.

সুলতান নাসির-উদ্দিনের দক্ষিণহস্তস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিলেন। নাসির-উদ্দিনের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দেওয়ার ফলে নাসির-উদ্দিনের উপর বলবনের প্রভাব বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল বলা বাহুল্য। নাসির-উদ্দিনের মন্ত্রী হিসাবে তিনি শাসনকার্যের যাবতীয় ক্ষমতা হস্তগত করিয়াছিলেন। প্রধান মন্ত্রী হিসাবে দীর্ঘকাল শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া তিনি যেমন নিজ শাসনক্ষমতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তেমনি তিনি সুশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থার জন্য সর্বপ্রথমেই তুর্কী অভিজাতদিগকে দমন করিবার প্রয়োজন সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন মোঙ্গল আক্রমণের বিরুদ্ধে সীমান্ত রক্ষা করাও তাঁহার অন্যতম প্রধান গুরুদায়িত্ব ছিল।

বলবনের প্রথম জীবন

বরণীর রচনায় উল্লেখ আছে যে, ভয়ের কারণ থাকিলে প্রজাবর্গ শাসন মানিয়া চলে, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণভাবে লোপ পাইয়াছে উপলব্ধি করিয়া গিয়াস-উদ্দিন বলবন পুনরায় রাষ্ট্রশক্তি সম্পর্কে জনসাধারণ বিশেষতঃ অভিজাত সম্প্রদায়ের মনে ভীতির সৃষ্টি করিতে কৃত-সংকল্প হইলেন।

তাঁহার প্রধান সমস্যা

বলবন প্রথমেই এক বিশাল সামরিক বাহিনী গঠনে প্রবৃত্ত হইলেন। পুরাতন সামরিক বাহিনীর পুনর্গঠন করিয়া তিনি অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যের সমর-কুশলতা বহু গুণে বৃদ্ধি করিলেন। অভিজ্ঞ, সুদক্ষ এবং অনুগত মালিক ও আমীরদের অধীনে তিনি তাঁহার সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন অংশকে স্থাপন করিলেন। এই সেনাবাহিনীর সাহায্যে বলবন দিল্লীর নিকটবর্তী অঞ্চল ও দোয়াব অঞ্চলে শান্তি ও শৃঙ্খলা আনয়ন করিলেন। মেওয়াটী দস্যুদের আক্রমণে দিল্লীর উপকণ্ঠে পর্যন্ত ধন-প্রাণের নিরাপত্তা ছিল না। বলবন এই সকল দস্যুকে কঠোর হস্তে দমন করিলেন। দিল্লীর নিরাপত্তার জন্য তিনি চতুর্দিকে সুরক্ষিত সামরিক পাহারার ব্যবস্থা করিলেন। কাম্পিল, পাতিয়ালী, ভোজপুর প্রভৃতি স্থানে মেওয়াটী দস্যুদের প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল; বলবন স্বয়ং এই সকল স্থানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে অগ্রসর হইলেন। এইভাবে ক্রমাগত চেষ্টা দ্বারা মেওয়াটী দস্যুদের দমন করিয়া রাস্তাঘাটে চলাচলের নিরাপত্তা বিধান করিতে তিনি সমর্থ হইয়াছিলেন।

সামরিক সংগঠন

মেওয়াটী দস্যু দমন

মেওয়াটী দস্যুদের দমনের ফলে শুধু ধন-প্রাণই রক্ষা পাইল এমন নহে, ব্যবসায়-

বাণিজ্যও পুনরায় সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। ভবিষ্যতে মেওয়াটী দস্যুগণ যাহাতে কোন উপদ্রব করিতে না পারে সেজন্য বলবন গোপালগীর নামক স্থানে একটি দুর্গ নির্মাণ এবং জালালী নামক দুর্গ টির সংস্কারসাধন করিয়াছিলেন। বলবন কর্তৃক এই দস্যু দমনের সুফল পরবর্তী কালেও পরিলক্ষিত হয়। যাট বৎসর পরেও ঐতিহাসিক বরণী উল্লেখ করিয়াছেন যে, দেশের কোথাও দস্যুদের উপদ্রব ছিল না।

জমিদারী প্রথা পরিবর্তনের সংকল্প ত্যাগ

অভিজাত সম্প্রদায়ের ক্ষমতা খর্ব করিবার উদ্দেশ্যে বলবন তাহাদের জমি ভোগ-দখলের শর্তাদি সম্পূর্ণ পরিবর্তন করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারই এক বিশ্বস্ত কর্মচারীর পরামর্শে তিনি এই সংকল্প ত্যাগ করেন। তথাপি তিনি 'বন্দেগান-ই-চহেলগান' বা 'চল্লিশ জন ক্রীতদাস'-এর ক্ষমতা খর্ব করিয়া শাসন-ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

শের খাঁ

বলবন জাদ (Jud) অঞ্চলের উপজাতিদের দমন করিবার জন্য এক সামরিক অভিযানে স্বয়ং অগ্রসর হইয়াছিলেন। ইহার পর তিনি মোঙ্গল আক্রমণের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনে প্রবৃত্ত হন। বলবনের কার্যাদির মধ্যে মোঙ্গল আক্রমণ হইতে দেশের নিরাপত্তা বিধানই ছিল সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। বলবনের নিকট-আত্মীয় শের খাঁ ছিলেন সুনাম, লাহোর ও দীপালপুর অঞ্চলের একজন শক্তিশালী জায়গীরদার। মোঙ্গল আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশরক্ষার ব্যাপারে শের খাঁ গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন দুর্ধর্ষ জাঠ, খোকর, ভট্টি প্রভৃতি উপজাতিকে তিনি নিজ প্রাধান্যাধীনে আনিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রাধান্য ও সাফল্যে অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত ও সন্দিগ্ধ হইয়া বিষপ্রয়োগে তাঁহাকে হত্যা করাইয়া বলবন অদূরদর্শিতার কাজ করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। যাহা হউক তিনি কালক্ষেপ না করিয়া তাঁহার প্রথম পুত্র মোহম্মদকে মুলতানে এবং দ্বিতীয় পুত্র বুগ্‌রা খাঁকে সামান ও সুনাম নামক স্থানে সসৈন্যে মোতায়েন করিলেন। মোঙ্গল আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার এই ব্যবস্থার সাফল্য ১২৭৯ খ্রীষ্টাব্দে পরিলক্ষিত হইল। ঐ বৎসর মোঙ্গলগণ ভারত আক্রমণ করিলে মুলতানের দুই

মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করিবার ব্যবস্থা

মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত (১২৭৯)

পুত্র অতিশয় তৎপরতার সহিত তাহাদিগকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করিয়া ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতে বাধ্য করেন।

মোঙ্গল আক্রমণের সুযোগ লইয়া বাংলাদেশের শাসনকর্তা তুঘান তুঘ্‌রিল্‌ খাঁ নিজেকে স্বাধীন সুলতান বলিয়া ঘোষণা করিলেন। বলবন আমীর খাঁ ও মালিক তাম্বঘি-র নেতৃত্বে তুঘান তুঘ্‌রিল্‌ খাঁর বিরুদ্ধে পর পর দুইটি অভিযান প্রেরণ করিলেন, কিন্তু উভয় অভিযানই ব্যর্থ হইল। অতঃপর বলবন স্বয়ং তৃতীয় অভিযানের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। তুঘান তুঘ্‌রিল্‌ খাঁ ভয়ে নিজ রাজধানী ত্যাগ করিয়া জাজনগরের অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই ধৃত ও নিহত হইলেন। বলবন তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র বুগ্‌রা খাঁকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন।

বাংলার শাসনকর্তা তুঘান্‌ তুঘ্‌রিল্‌ খাঁর স্বাধীনতা ঘোষণা—পরাজয় ও মৃত্যু

বাংলার বিদ্রোহ দমন শেষ হইতে না হইতেই মোঙ্গলগণ পুনরায় পাঞ্জাব আক্রমণ করিলে বলবনের প্রথম পুত্র মোহম্মদ তাহাদিগকে বাধা দিতে গিয়া প্রাণ হারাইলেন। প্রিয়পুত্রের মৃত্যু-শোক সহ্য করিতে না পারিয়া অল্পকালের মধ্যেই বলবন প্রাণত্যাগ করিলেন (১২৮৭)।

মোঙ্গল আক্রমণ (১২৮৭)

গিয়াস-উদ্দিন বলবন দূরদর্শী শাসক ছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, হিন্দুস্থানের ন্যায় বিশাল দেশকে শাসনাধীনে রাখিতে হইলে কেবলমাত্র সামরিক বলপ্রয়োগ করিলে চলিবে না। শাসনের দক্ষতা-ই হওয়া চাই উহার মূল ভিত্তি। এইজন্য শাসনকার্য যাহাতে সুষ্ঠু ও সুদক্ষ হইতে পারে সেই চেষ্টাও তিনি করিয়াছিলেন। তাঁহার শাসনব্যবস্থার মূল প্রকৃতি ছিল সামরিক শক্তির সহিত সুশাসনের সামঞ্জস্য। শাসনব্যবস্থার সর্বোচ্চে ছিলেন সুলতান স্বয়ং। তাঁহার অনুমতি ও অনুমোদন ভিন্ন শাসন-সংক্রান্ত কোন কাজ যাহাতে না করা হয় সেই ব্যবস্থা তিনি করিয়াছিলেন। এমন কি, তাঁহার পুত্রগণও শাসনব্যাপারে কোন স্বাধীনতা ভোগ করিতেন না।

বলবনের শাসনব্যবস্থা

বিচার বিষয়ে যাহাতে কোনপ্রকার পক্ষপাতিত্ব না ঘটিতে পারে বলবন সেই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট-আত্মীয়গণও ন্যায্য বিচার এড়াইতে পারিতেন না। বলবনের সুবিচার ও নিরপেক্ষতা

বিচার-ব্যবস্থা

সম্পর্কে :অভিজাত সম্প্রদায়ের সকলেই অবহিত ছিলেন। সুলতানের নিকট হইতে কোন অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভব হইবে না বুঝিতে পারিয়া অভিজাতগণ তাহাদের দাস-দাসী, ক্রীতদাস প্রভৃতির প্রতিও অন্যায় আচরণ করিতে সাহস পাইতেন না। জনৈক মালিক অর্থাৎ অভিজাত ব্যক্তি তাঁহার এক দাসকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করাইয়াছিলেন। বলবন মৃত ব্যক্তির বিধবা স্ত্রীর নিকট হইতে এই অভিযোগ জানিতে পারিয়া স্বয়ং মালিককেই প্রকাশ্যভাবে বেত্রাঘাত করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। বলবনের এক প্রিয়পাত্র হইবৎ খাঁ (Haibat Khan) এক ব্যক্তির প্রাণনাশ করিয়াছিলেন, এজন্য মৃত ব্যক্তির বিধবা পত্নীকে কুড়ি হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দান করিয়া তাঁহাকে নিজ প্রাণ রক্ষা করিতে হইয়াছিল।

রাজ্যের কোথায় কি ঘটিয়াছে তাহা সর্বদা যাহাতে সুলতানের কর্ণগোচর হইতে পারে সেইজন্য বহু গুপ্তচর নিযুক্ত ছিল। রাজ্যে অবিচার, অরাজকতা বা অন্যায় আচরণ সম্পর্কে গুপ্তচরগণকে সর্বদা সংবাদ সংগ্রহ করিতে হইত। সুলতানের পুত্র বুগ্‌রা খাঁর কার্যকলাপ সম্পর্কেও গুপ্তচরগণকে খোঁজখবর রাখিতে হইত।

গুপ্তচর

বলবনের কৃতিত্ব (Achievements of Balban) : উলুঘ্ খাঁ গিয়াস-উদ্দিন বলবন নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। প্রথম জীবনে তিনি সামান্য ক্রীতদাস হিসাবে জীবন শুরু করিয়াছিলেন। ইল্‌তুৎমিসের বিশ্বস্ত 'চল্লিশ জন' ক্রীতদাসের তিনি ছিলেন অন্যতম। ইল্‌তুৎমিসের মৃত্যুর পর দিল্লীর শাসন-ব্যবস্থায় যে দুর্বলতা দেখা দিয়াছিল তাহা ক্রমেই দিল্লী সুলতানির ভিত্তি দুর্বলতর করিয়া ফেলিতেছিল। সুযোগ বুঝিয়া অভিজাত সম্প্রদায়—আমীর ও মালিকগণ স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই সময়ে নাসির-উদ্দিন সুলতানপদে অধিষ্ঠিত হন এবং বলবন নাসির-উদ্দিনের শাসনকার্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। সুলতান নাসির-উদ্দিনের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিয়া বলবন নিজ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বহুগুণে বৃদ্ধি করেন এবং সুলতানের যাবতীয় কার্য নিজেই সম্পাদন করিতে থাকেন। শাসনকার্যে অপটু নাসির-উদ্দিন নামে মাত্রই সুলতান ছিলেন, প্রকৃত সুলতান ছিলেন বলবন।

প্রথম জীবন

নাসির-উদ্দিনের মন্ত্রী হিসাবে বলবন দেশের অরাজকতা দূর করিয়া শাসন-ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা আনয়নের জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। দোয়াব অঞ্চলের বিদ্রোহী জমিদারগণকে তিনি পুনরায় আনুগত্যাধীনে আনিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। উদ্ধত আমীর ও মালিকগণ যাহাতে শাসনকার্যে কোনপ্রকার বাধা সৃষ্টি করিতে না পারে সেই ব্যবস্থাও তিনি করিয়াছিলেন। গোয়ালিওর-এর রাজা, কালিঞ্জরের হিন্দুসামন্তরাজ প্রভৃতিকে তিনি পুনরায় দিল্লীর আধিপত্য স্বীকার করিতে বাধ্য করিলেন। বাংলাদেশের শাসনকর্তা মুঘিস্-উদ্দিনকে তিনি দমন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ঐ সময়ে তিনি সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই। মুঘিস্-উদ্দিনের মৃত্যুর পর বাংলাদেশে দিল্লীর প্রভুত্ব স্বীকৃত হইয়াছিল। এইভাবে সুলতানপদ গ্রহণের পূর্বেই বলবন নিজ শাসনদক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

নাসির-উদ্দিনের মন্ত্রী হিসাবে শাসনকার্য পরিচালনা

নাসির-উদ্দিনের মৃত্যুর পর বলবন সুলতানপদ গ্রহণ করিয়া দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন ও বহিরাগত শত্রু মোঙ্গলদের আক্রমণ প্রতিহত করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। মোঙ্গল আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষার জন্য তিনি নিজের দুই পুত্রকে মুলতান, সামান ও সুনাম-এ সৈন্যসহ মোতায়েন রাখিয়াছিলেন।

আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা ও বহিরাগত শত্রু হইতে দেশ রক্ষা

আমীর ও মালিকদের ঔদ্ধত্য দমন করিয়া তিনি দেশের সর্বত্র কেন্দ্রীয় শাসন বলবৎ করিলেন। সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করিয়া তিনি স্বীয় শক্তি বৃদ্ধি করিলেন এবং দেশের সর্বত্র ন্যায় বিচার স্থাপন করিলেন। গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়া দেশের সকল অংশ হইতে যাবতীয় অত্যাচার, অবিচার, ষড়যন্ত্র প্রভৃতির সংবাদ সংগ্রহের ব্যবস্থাও তিনি করিয়াছিলেন।

আমীর ও মালিকদের দমন : গুপ্তচর নিয়োগ

দোয়াব অঞ্চলের দস্যুদিগকে দমন করিয়া তিনি দীর্ঘ ষাট বৎসরের মধ্যে সর্বপ্রথম রাস্তাঘাটে চলাচলের নিরাপত্তা বিধান করিলেন। রাজধানীর নিরাপত্তার জন্য দিল্লীর চতুর্দিকে কতকগুলি সামরিক চৌকিও (outpost) নির্মিত হইল। মেওয়াটী দস্যুগণ যাহাতে

মেওয়াটী দস্যু দমন

ভবিষ্যতে পুনরায় শক্তিসঞ্চয় করিতে না পারে সেজন্য তিনি গোপালগীর নামক স্থানে একটি দুর্গ স্থাপন করিয়া দস্যুদের কর্মকেন্দ্রগুলি বিধ্বস্ত করিলেন।

দিল্লী সুলতানির মর্যাদা বৃদ্ধি

এইভাবে অক্লান্ত চেষ্টা দ্বারা গিয়াস-উদ্দিন বলবন দিল্লী সুলতানির মর্যাদা ও শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ইল্‌তুৎমিসের পরবর্তী কালে দিল্লী সুলতানির এক সঙ্কট মুহূর্তে শাসনভার গ্রহণ করিয়া বলবন পুনরায় মুসলমান শাসন দৃঢ়ভিত্তিতে স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

ব্যক্তিগত চরিত্র: মর্যাদাপূর্ণ ও নিষ্কলুষ

সুলতান হিসাবে বলবন যেমন ছিলেন অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্রও ছিল তেমনি নিষ্কলুষ। তিনি পারস্যদেশের রাজসভার অনুকরণে নিজ রাজসভা গঠন করিয়াছিলেন। পারসিক আদব-কায়দা, অনুষ্ঠানপ্রিয়তা প্রভৃতি ছিল তাঁহার রাজসভার বৈশিষ্ট্য। মোঙ্গল আক্রমণে স্বদেশ হইতে বিতাড়িত মধ্য-এশিয়ার পনর জন রাজাকে তিনি নিজ রাজসভায় আশ্রয় দান করিয়াছিলেন। বিখ্যাত কবি আমীর খুস্‌রভ্ বলবনের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন। আমীর খুস্‌রভ্ বা খুস্‌রু ছিলেন ঐ সময়কার শ্রেষ্ঠ কবি, তিনি 'ভারতের তোতাপাখী' (*Parrot of India*) নামে পরিচিতি লাভ করিয়াছিলেন।

তাঁহার দান—মুসলমান শাসনের ভিত্তি সুদৃঢ়করণ

রাজকীয় মর্যাদা ও ভগবান-প্রদত্ত রাজক্ষমতায় বলবন বিশ্বাসী ছিলেন। বিচারক হিসাবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ, মুসলমান হিসাবে তিনি ছিলেন অত্যধিক ধর্মভীরু এবং সুলতান হিসাবে তিনি ছিলেন আত্মমর্যাদাপূর্ণ। ভারতে মুসলমান শাসনের ভিত্তি সুদৃঢ়ভাবে স্থাপনে বলবনের দান ছিল অপরিসীম।

বলবনের পরবর্তী কালে শাসনকার্যে দুর্বলতা

কাইকোবাদ, ১২৮৭—৯০ (Kaiqubad): সুলতান গিয়াস-উদ্দিন বলবন কোন উপযুক্ত উত্তরাধিকারী রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। দীর্ঘ কুড়ি বৎসর বলবন যে রাজক্ষমতা দক্ষতার সহিত পরিচালনা করিয়া গিয়াছিলেন উহা পরবর্তী দুর্বল শাসকদের আমলে বিনষ্ট হইল।

বলবনের মৃত্যুর পর তাঁহার এক পৌত্র কাইকোবাদকে আমীর ও মালিকগণ সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। কাইকোবাদের পিতা বুগ্‌রা খাঁ ছিলেন

তখন বাংলাদেশের শাসনকর্তা! তিনি নিজপুত্রের সুলতানপদ প্রাপ্তির বিরোধিতা করিলেন না। কিন্তু অষ্টাদশ বর্ষীয় যুবক কাইকোবাদ যেমন ছিলেন শাসনকার্যে অনভিজ্ঞ তেমনি ছিলেন ইন্দ্রিয়পরায়ণ। স্বভাবতই শাসন-ব্যবস্থা তাঁহার আমলে ক্রমেই শিথিল হইয়া পড়িল। কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে অভিজাত শ্রেণী স্বার্থদ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইলেন। নিজাম-উদ্দিন নামে জনৈক আমীর কৌশলে শাসনক্ষমতা হস্তগত করিলেন, আর কাইকোবাদ নিজাম-উদ্দিনের হস্তে ক্রীড়নকস্বরূপ হইয়া রহিলেন।

কাইকোবাদের সিংহাসন লাভ—নিজাম-উদ্দিনের প্রাধান্য

এমন সময়ে মোঙ্গলগণ পাঞ্জাব আক্রমণ করিয়া সামান পর্যন্ত অগ্রসর হইলে মালিক মোহম্মদ বক্‌বক্ (Malik Muhammad Baqbaq) মোঙ্গলগণকে লাহোরের নিকট যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। তিনি এক হাজার মোঙ্গলকে বন্দী করিয়া দিল্লীতে লইয়া আসিলে তাহাদিগকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়।

মোঙ্গল আক্রমণ

এদিকে নিজাম-উদ্দিন নিজ ক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিরুদ্ধপক্ষের মালিক ও আমীরদের ক্ষমতাচ্যুত এবং মর্যাদা ও প্রতিপত্তিহীন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি কাই-খসরুকে হত্যা করিলেন এবং সুলতানের ওয়াজির (*Wajir*) খাজা খাতিরকে প্রকাশ্যে অপমান করিলেন। নিজাম-উদ্দিন সুলতানপদ অধিকার করিবার উদ্দেশ্যেই এইভাবে অত্যাচার বাড়াইয়া চলিয়াছিলেন। ফলে, আভ্যন্তরীণ শাসনে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল এবং শান্তিপ্রিয় নাগরিকমাত্রেই ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশ হইয়া পড়িতেছিল।

নিজাম-উদ্দিনের ঔদ্ধত্য

এমতাবস্থায় কাইকোবাদের পিতা বুগ্‌রা খাঁ পুত্রের অকর্মণ্যতায় অতিষ্ঠ হইয়া সসৈন্যে দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কাইকোবাদ ও বুগ্‌রা খাঁর মধ্যে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিল। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে পিতা ও পুত্রের মধ্যে যুদ্ধের পরিবর্তে মিলন ঘটিল। কাইকোবাদ বাংলাদেশের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইলেন এবং বুগ্‌রা খাঁ তাঁহাকে শাসনসম্পর্কে নানাবিধ উপদেশ দান করিয়া নিজ কর্মকেন্দ্রে ফিরিয়া আসিলেন।

বুগ্‌রা খাঁর অভিযান

নিজাম-উদ্দিনের ঔদ্ধত্য ক্রমেই বৃদ্ধি পাওয়ায় কাইকোবাদের পক্ষেও তাহা আর সহ্য করা সম্ভব হইল না। তিনি নিজ ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করিতে মনস্থ করিলেন। নিজাম-উদ্দিনকে বিষ-প্রয়োগে হত্যা করা হইল। কাইকোবাদ খল্‌জী মালিক জালাল-উদ্দিন ফিরুজকে সেনাধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করিয়া বরণ (Baran) প্রদেশের সামন্ত হিসাবে নিযুক্ত করিলেন। খল্‌জী মালিক ও তুর্কী অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে দারুণ বিরোধ ছিল। ফলে, অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে এক অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হইল। এই সময়ে কাইকোবাদ বাতরোগে পঙ্গু হইলে তাঁহারই এক শিশুপুত্রকে তুর্কী অভিজাতগণ দিল্লীর সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। এই শিশু সুলতানের নামকরণ হইল শামস্‌-উদ্দিন কয়ুমর। তুর্কী অভিজাতদের ষড়যন্ত্রে দিল্লীর রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এইরূপ জটিলতার সৃষ্টি হইলে জালাল-উদ্দিন ফিরুজ খল্‌জী বরণ হইতে সসৈন্যে দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া বলপূর্বক দিল্লী নগরী দখল করিলেন। তারপর তিনি কাইকোবাদকে গোপনে হত্যা করাইয়া নিজেকে সুলতান বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং অল্পকাল শামস্‌-উদ্দিন কয়ুমর-এর প্রতিনিধি হিসাবে শাসনকার্য চালাইবার পর ১২৯০ খ্রীষ্টাব্দে স্বয়ং সুলতানপদ গ্রহণ করিলেন। জালালউদ্দিনের সিংহাসন আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীর দাসবংশের বিলোপ ঘটিল।

নিজাম-উদ্দিনের হত্যা

জালাল-উদ্দিনের সৈন্যাধ্যক্ষপদে নিয়োগ

তুর্কী অভিজাতগণের ষড়যন্ত্র

জালাল-উদ্দিনের সিংহাসন অধিকার

হিন্দুস্থানে মুসলমানদের সাফল্যের কারণ (Causes of the Muslim success in Hindusthan): ভারত বিজয়ে মুসলমানদের সাফল্য এবং হিন্দু রাজগণের দেশরক্ষার অক্ষমতার পশ্চাতে বহুবিধ কারণ ছিল।

প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সম্রাট হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পরবর্তী দীর্ঘ পাঁচ শতাব্দী ধরিয়া ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে এক ব্যাপক বিশৃঙ্খলতা ও বিচ্ছিন্নতা দেখা দেয়। কোন একজন সুদক্ষ শক্তিশালী সম্রাটের পক্ষে হয়ত ঐ অব্যবস্থা ও বিচ্ছিন্নতা দূর করিয়া পুনরায় ভারতবর্ষে রাজনৈতিক ঐক্য আনয়ন করা সম্ভব হইত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ সময়ে ভারতবর্ষে কোন

সুযোগ্য সম্রাট জন্মগ্রহণ করেন নাই। কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতার সুযোগে যেমন ব্যাপক রাজনৈতিক অব্যবস্থা ও অনৈক্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, তেমনি ব্যাপক অব্যবস্থা ও অনৈক্যের ফলে কেন্দ্রীয় শাসন বলিয়া কিছু আর ছিল না। ভারতের সর্বত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্তরাজগণ কেন্দ্রীয় আধিপত্যের দুর্বলতার সুযোগে সম্পূর্ণ স্বাধীন হইয়া গেলেন। ঐক্য বা সংগঠন বলিতে কিছুই এই সকল রাজার মধ্যে ছিল না। পরস্পর হিংসা, দ্বেষ ও স্বার্থের দ্বন্দ্বের ফলে হিন্দুদের রাজনৈতিক ঐক্য সমূলে বিনাশপ্রাপ্ত হইল। এই রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার স্বাভাবিক ফল হিসাবেই বহিরাগত আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার শক্তি কোন ভারতীয় হিন্দু রাজারই আর ছিল না। পরস্পর বিবদমান স্বাধীন রাজগণের মধ্যে স্বার্থপরতা ও সঙ্কীর্ণতার চরম প্রকাশ পরিলক্ষিত হইল। এইরূপ রাজনৈতিক অবস্থা মুসলমান আক্রমণকারীদের সহায়ক হইয়াছিল বলা বাহুল্য।

সম্রাট হর্ষবর্ধনের পরবর্তী কয়েক শতাব্দীর অব্যবস্থা ও অনৈক্য : অসংখ্য ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যের উৎপত্তি

দ্বিতীয়তঃ, মুসলমান আক্রমণ প্রতিহত করিবার মত শক্তি একমাত্র রাজপুতদেরই ছিল। সৈনিক হিসাবে রাজপুতজাতি সমসাময়িক কালের যে কোন জাতির শ্রেষ্ঠ সৈনিকদের সহিত তুলনীয় হইলেও এবং যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণদানের সাহস ও বীরত্ব তাহাদের থাকিলেও, তাহারা একই সংগঠনে সঙ্ঘবদ্ধ হয় নাই। তাহাদের পরস্পর হিংসা-দ্বেষ, তাহাদের স্ব স্ব প্রাধান্য এবং স্বাতন্ত্র্যের মনোবৃত্তি সৈনিক হিসাবে তাহাদের শ্রেষ্ঠত্বকে বিনাশ করিয়াছিল। বহিরাগত শত্রুর বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধভাবে না দাঁড়াইবার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবেই তাহারা মুসলমানদের আক্রমণে হতবল হইয়া পড়িয়াছিল। ঐক্যবদ্ধভাবে দেশরক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিলেও তাহারা একতাবদ্ধ হইতে পারে নাই।

রাজপুতজাতির পরস্পর বিদ্বেষ

তৃতীয়তঃ, মধ্য-এশিয়ার পর্বতসঙ্কুল শীতপ্রধান দেশ হইতে আগত দুর্ধর্ষ শক্তিশালী মুসলমান আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে গ্রীষ্মপ্রধান ভারতীয়দের দুর্বলতা সহজেই অনুমেয়। ইহা ভিন্ন মুসলমান আক্রমণকারীদের মধ্যে শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা এবং সংগঠন ক্ষমতা ছিল অত্যধিক। বিচ্ছিন্ন, পরস্পর

পর্বতসঙ্কুল শীতপ্রধান দেশ হইতে আগত মুসলমান আক্রমণকারিগণের শৃঙ্খলা ও সংহতি

বিবদমান হিন্দু রাজগণের বিরুদ্ধে সুসংহত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ মুসলমান আক্রমণকারীদের শক্তি অপ্রতিহত হইয়া উঠিয়াছিল।

একক অধিনায়কত্বের অধীনে মুসলমান সৈনিকগণ—হিন্দুদের মধ্যে উহার অভাব

চতুর্থতঃ, মুসলমান আক্রমণকারিগণ একই নেতার অধীনে যুদ্ধ করিত, অপর পক্ষে হিন্দুরাজগণ যেখানে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন সেখানেও সেনাবাহিনী বিভিন্ন রাজার নেতৃত্বাধীনে যুদ্ধ করিত। সর্বময় একক অধিনায়কত্ব হিন্দু সেনাবাহিনীর মধ্যে ছিল না।

পঞ্চমতঃ, হিন্দুদের জাতিভেদ প্রথা তাহাদের ঐক্যের পথে বাধার সৃষ্টি করিয়াছিল। জাতির ভিত্তিতে পরস্পর বিদ্বেষী শ্রেণীতে বিভক্ত হিন্দু সমাজ তথা হিন্দু সৈন্য ঐক্যের আদর্শে উদ্বুদ্ধ ছিল না। জাতিভেদ-প্রসূত বিদ্বেষ অনেক

হিন্দুদের সঙ্কীর্ণ জাতিভেদ প্রথা

ক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থ ও দেশাত্মবোধকে ছাড়াইয়া গিয়াছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদের মধ্যেও জাতিভেদ মানিয়া চলা হইত। স্বভাবতই যুদ্ধক্ষেত্রে অতি প্রয়োজনীয় সঙ্ঘবদ্ধতা ও সংহতি তাহাদের মধ্যে জাগিতে পারে নাই। পক্ষান্তরে মুসলমান আক্রমণকারিগণের মধ্যে জাতিভেদ বলিয়া কিছু না থাকায় তাহাদের পক্ষে ঐক্যবদ্ধভাবে যুদ্ধ করা সম্ভব হইয়াছিল। তদুপরি মুসলমানদের মধ্যে ধর্মের ঐক্য ধর্মোন্মত্ততায় পরিণত হওয়ায় তাহারা হিন্দু সৈন্যকে সহজেই পরাজিত করিতে সক্ষম হইয়াছিল।*

হিন্দু রাজগণের মধ্যে জাতীয় ঐক্যের অভাব

ষষ্ঠতঃ, হিন্দু রাজগণের নিজ নিজ স্থানীয় স্বার্থ এবং দলগত মনোবৃত্তি তাঁহাদের জাতীয় ঐক্য নাশ করিয়াছিল, কিন্তু আক্রমণকারী মুসলমান সৈন্যের মধ্যে ইস্‌লাম ধর্মের ঐক্য বিদ্যমান ছিল। হিন্দু রাজগণের মধ্যে না ছিল জাতীয় ঐক্য, না ছিল ধর্মের উন্মত্ততা। ফলে মুসলমান আক্রমণকারিগণ যেখানে ছিল সঙ্ঘবদ্ধ সেখানে হিন্দু জাতি ছিল বিচ্ছিন্ন।†

* "The Indian caste-system is unfavourable to military efficiency as against foreign foes." Lane-Poole, p. 63.

† "Solidarity and zeal, added to their greater energy and versatility gave the Muslims superiority over the nation." Lane-Poole, p. 63 ; Ishwari Prasad, pp. 204ff.

সপ্তমতঃ, ইস্‌লাম ধর্মের প্রাধান্য স্থাপনের ইচ্ছা, পৌত্তলিক হিন্দুগণকে হত্যা করিয়া 'গাজী' হইবার আকাঙ্ক্ষা এবং হিন্দুমন্দিরাদি লুণ্ঠন করিয়া ধনরত্ন আত্মসাৎ করিবার আগ্রহ মুসলমান আক্রমণকারীদের দুর্ধর্ষ বাহিনীতে পরিণত করিয়াছিল। হিন্দু রাজগণের মধ্যে এইরূপ কোন আকাঙ্ক্ষা বা আগ্রহ ছিল না।

পৌত্তলিকদের হত্যার জন্য মুসলমানদের আগ্রহ

অষ্টমতঃ, হিন্দুরাজগণ চিরাচরিত হস্তীবাহিনী, অশ্ববাহিনী, পদাতিক ও রথ—এই চারি প্রকার বাহিনী লইয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইতেন। তাঁহাদের যুদ্ধ-পদ্ধতি ছিল যেমন প্রাচীন তেমনই অকার্যকরী। হস্তীবাহিনীর উপর অত্যধিক গুরুত্ব তাঁহারা আরোপ করিতেন বটে, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে হস্তীবাহিনীর দ্বারা হিন্দু-পক্ষের উপকার অপেক্ষা অপকারই অধিক সাধিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। ডক্টর স্মিথ্ বলেন যে, কোন হিন্দু সেনানায়ক শত্রুর যুদ্ধকৌশল শিক্ষা করিয়া সামরিক দক্ষতা বৃদ্ধির চেষ্টা কোনকালেই করেন নাই। আলেকজাণ্ডারের যুদ্ধকৌশল প্রাচীন হিন্দুদের যুদ্ধকৌশলের অপকর্ষতা প্রমাণ করিয়াছিল, কিন্তু আলেকজাণ্ডারের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া মুসলমান আক্রমণ কাল পর্যন্ত হিন্দুরাজগণ সামরিক পদ্ধতির কোন উন্নতিমূলক পরিবর্তন সাধন করিতে সচেষ্ট হন নাই। ফলে আলেক-জাণ্ডার যেমন 'আকস্মিক আক্রমণ কৌশল' (shock tactics) দ্বারা হিন্দুদের পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াই মোহম্মদ ঘুরী, বাবর, আহ্‌মদ শাহ্ দুর্‌রাণী প্রভৃতি হিন্দুরাজগণের বিরুদ্ধে জয়ী হইয়া-ছিলেন। আলেকজাণ্ডারের আক্রমণ হইতে দীর্ঘ দেড় হাজার বৎসর পরও হিন্দু-রাজগণ ঐ প্রাচীন যুদ্ধ কৌশলই অনুসরণ করিতেছিলেন। ফলে যুদ্ধে প্রাণদানে কুণ্ঠিত না হইলেও বা বীরত্ব প্রদর্শনে হিন্দু সৈনিক মুসলমানদের অপেক্ষা কোন অংশে কম না হইলেও মুসলমান আক্রমণ প্রতিহত করিতে সমর্থ হয় নাই।

হিন্দুদের সামরিক পদ্ধতির অপকর্ষতা

নবমতঃ, হিন্দু আমলে সামরিক দায়িত্ব এক বিশেষ শ্রেণীর লোকের উপর ন্যস্ত থাকায় অপরাপর শ্রেণী সামরিক দায়িত্ব সম্পর্কে উদাসীন ছিল। দেশ ও জাতি যখন জীবন-মরণ সমস্যায় জড়িত, জাতির স্বাধীনতা যখন বিপন্ন তখনও দেশরক্ষার দায়িত্ব একমাত্র সামরিক শ্রেণীর উপরই ন্যস্ত ছিল। সামরিক বাহিনীর পশ্চাতে সমগ্র জাতির সহায়তা বা সমগ্র জাতির

স্বাধীনতা রক্ষার আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় না। পৌত্তলিকদের হত্যা ও হিন্দুদের মন্দির ও বিগ্রহাদি লুণ্ঠনকার্যে পার্বত্য অঞ্চলের মুসলমানদের সৈনিকরূপে নিযুক্ত করা অত্যন্ত সহজ ছিল, কিন্তু এইরূপ সহজে দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনী গঠন করা হিন্দুরাজগণের পক্ষে সম্ভব ছিল না। হিন্দু ও মুসলমান আক্রমণকারীদের যুদ্ধ দুইটি ভিন্ন-পন্থী সমাজ-ব্যবস্থার সংঘর্ষ বলিয়া বর্ণনা করা অনুচিত হইবে না। হিন্দুসমাজ ছিল অতি প্রাচীন, অপর পক্ষে মুসলমান সমাজ ছিল নূতন ও সজীবতাপূর্ণ। প্রাচীন ও নূতনের সংঘর্ষে নূতনই জয়ী হইল।

সামরিক শ্রেণীর পশ্চাতে সমগ্র জাতির সহায়তার অভাব

দশমতঃ, যুদ্ধক্ষেত্রে হিন্দু পক্ষের ভুল-ভ্রান্তি, হিন্দুদের অদূরদর্শিতা প্রভৃতিও তাহাদের পরাজয়ের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। পরাজিত শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাকে নির্মূল করিবার প্রয়োজনবোধ বা চেষ্টা হিন্দু রাজগণ করেন নাই। তরাইনের প্রথম যুদ্ধে জয় লাভ করিয়াও (১১৯১) হিন্দু-রাজগণ মোহম্মদ ঘুরীর শক্তি সম্পূর্ণভাবে বিনাশ করিতে অগ্রসর হন নাই। ফলে পরবৎসরই ঘুরী ঐ একই প্রান্তরে হিন্দুবাহিনীকে পরাজিত করিয়া ভারতে মুসলমান শাসনের গোড়াপত্তন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

হিন্দুদের সামরিক ভুল-ভ্রান্তি, পরাজিত শত্রুকে বিনাশের প্রয়োজনীয়তা অনুপলব্ধ

একাদশতঃ, ক্রীতদাস প্রথা মুসলমান আক্রমণকারীদের শক্তি বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছিল। মুসলমান ক্রীতদাসদের মধ্য হইতে বহু সুদক্ষ, শক্তিশালী, কর্মক্ষম ও বিচক্ষণ ব্যক্তির উদ্ভব হইয়াছিল। কুতব-উদ্দিন, ইল্‌তুৎমিস্‌, বলবন প্রভৃতির নাম এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। নব প্রতিষ্ঠিত মুসলমান সাম্রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ়ীকরণে ইঁহাদের দান অপরিমেয়।

মুসলমান ক্রীতদাসগণের দান

সর্বশেষে এ কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, আক্রমণকারীদের কতক-গুলি স্বাভাবিক সুবিধা থাকে। আকস্মিক আক্রমণ দ্বারা কোন দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারিলে সেখানে যে অব্যবস্থা, ভীতি ও মানসিক দুর্বলতার সৃষ্টি হয় তাহা আক্রমণকারী শত্রুর কাজ কতকটা সহজ করিয়া দেয়। মুসলমান আক্রমণকারীদের ধর্মোন্মত্ততা * ও লুণ্ঠন-লিপ্সা মুসলমান

আক্রমণকারী শত্রুর স্বাভাবিক সুযোগ-সুবিধা

* Their very bigotry was an instrument of self-preservation. Lane-Poole, p. 63. Ishwari Prasad, p. 204.

আক্রমণকারীদের মধ্যে এক অদম্য শক্তির সঞ্চার করিয়াছিল। অপর দিকে, হিন্দুগণ আত্মরক্ষায় অগ্রসর হইলেও তাহাদের মধ্যে মুসলমান আক্রমণকারীদের বীভৎসতার ভীতি-প্রসূত দুর্বলতারও অবধি ছিল না। এই সকল কারণে মুসলমান আক্রমণকারিগণ হিন্দুদের পর্যুদস্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিল ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই।

তৃতীয় অধ্যায়

খল্‌জী বংশ

(The Khaljis)

খল্‌জী বংশের আদি পরিচয় (The Origin of the Khaljis) : খল্‌জী বংশের আদি পরিচয় সম্পর্কে মুসলমান ঐতিহাসিক নিজাম-উদ্দিন, ফেরিস্তা ও জিয়া-উদ্দিন বরণীর মধ্যে মতানৈক্য রহিয়াছে। নিজাম-উদ্দিন ও ফেরিস্তার মতে খল্‌জী বংশ তুর্কী জাতিসম্ভূত*। জিয়া-উদ্দিন বরণীর মতে তাঁহারা ছিলেন তুর্কীদের হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতির লোক। আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যেও এবিষয়ে মতানৈক্য রহিয়াছে। কোন কোন আধুনিক ঐতিহাসিক মনে করেন যে, খল্‌জী বংশ মূলতঃ তুর্কী জাতিসম্ভূতই বটে, কিন্তু দীর্ঘকাল আফগানিস্তানে বসবাসের ফলে তাঁহারা আফগান জাতির সর্বপ্রকার বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। তুর্কী ও আফগানদের মধ্যে সর্বদাই বিরোধ লাগিয়া থাকিত। তুর্কীদের সহিত আফগান প্রভাবে প্রভাবিত খল্‌জী বংশেরও বিবাদের অন্ত ছিল না।

আদি পরিচয় সম্পর্কে মতানৈক্য

যাহা হউক, পঙ্গু সুলতান কাইকোবাদের হত্যা ও তুর্কী মালিক ও আমীরদের দুর্বলতার সুযোগে দিল্লীর সিংহাসন খল্‌জী বংশের অধিকারে আসিল। বৃদ্ধ মালিক

জালাল-উদ্দিন খল্‌জীর সিংহাসন প্রাপ্তি (১৩ জুন, ১২৯০)

*Vide Iswari Prasad, *History of Medieval India*, p. 208fn.

জালাল-উদ্দিন ফিরুজ খল্‌জী দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন (১৩ই জুন, ১২৯০)।

জালাল-উদ্দিন ফিরুজ খল্‌জী, ১২৯০-৯৬ (Jalal-ud-din Firuz Khalji) : জালাল-উদ্দিন কাইকোবাদ ও তাঁহার শিশুপুত্র শামস্-উদ্দিন কয়ূমর এবং তুর্কী অভিজাতগণের নেতৃস্থানীয় কয়েকজনের প্রাণনাশ করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি জনসাধারণের সমর্থন লাভ করিতে পারিলেন না। সুতরাং দিল্লীর নিকটবর্তী কাইকোবাদ কর্তৃক আরব্ধ কিলোখ্‌রী (Kilokhri) নামক প্রাসাদে তিনি তাঁহার অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া নিজেকে দিল্লীর সুলতান বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কিন্তু দিল্লী নগরীতে প্রবেশ করিবার সুযোগ তিনি পাইলেন না। এজন্য কিছুকাল ধরিয়া কিলোখ্‌রী প্রাসাদের নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ করিয়া তিনি সেখানেই রাজধানী স্থাপন করিলেন।

হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে সিংহাসন প্রাপ্তি

কিন্তু তাঁহার চরিত্রের গুণাবলী অল্প-কালের মধ্যেই তাঁহাকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিল। বরণীর বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, তিনি যেমন ছিলেন ধর্মপ্রবণ ও দয়ালু তেমনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ ও উদারচিত্ত। অভিজাত সম্প্রদায়কে তিনি ভূসম্পত্তি দানের প্রতিশ্রুতি দিয়া স্ববশে আনিলেন। ইহার পর তাঁহার দিল্লীতে প্রবেশ করিবার বাধা দূর হইল এবং তাঁহার শাসনের প্রতি বিদ্বেষ ও বিরোধিতাও বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইল।

তাঁহার চরিত্রের গুণাবলী

সিংহাসনে আরোহণের সময় জালাল-উদ্দিনের বয়স ছিল সত্তর বৎসর। স্বভাবতঃই তিনি পরকালের চিন্তায় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কোনপ্রকার অন্যায় অত্যাচার বা রক্তপাত না করিয়া শাসনকার্য পরিচালনা করাই হইল তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য। তিনি তুর্কী অভিজাতদের অনেককে উচ্চ রাজকর্মচারিপদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের বিরোধিতা দূর করিলেন। বলবনের ভ্রাতুষ্পুত্র মালিক চজ্জু (Chajju)-কে তিনি সেনাধ্যক্ষ পদে পুনর্নিয়োগ করিলেন। জালাল-উদ্দিন নিজ আত্মীয়-স্বজনদেরও নানা উপাধিতে সম্মানিত করিলেন এবং রাজকর্মচারিপদে নিযুক্ত করিলেন।

তাঁহার উদারতা

সাময়িককালের জন্য জালাল-উদ্দিন দেশে শান্তি স্থাপনে সক্ষম হইলেও

তাঁহার শাসন মূলতঃ দুর্বল ছিল বলিয়া অল্প কালের মধ্যেই দেশে অরাজকতা দেখা দিল। বলবনের ভ্রাতুষ্পুত্র মালিক চজ্জু বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। এই বিদ্রোহে অপরাপর মালিকগণও যোগদান করিলে মালিক চজ্জুর শক্তি বৃদ্ধি পাইল। তিনি নিজেকে কারা প্রদেশের স্বাধীন সুলতান বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কিন্তু জালাল-উদ্দিনের পুত্র আরকলি খাঁ (Arkali Khan) এই বিদ্রোহ দৃঢ়হস্তে দমন করিলেন। কিন্তু ইহাতেও ধর্মভীরু বৃদ্ধ জালাল-উদ্দিনের শাসন-নীতির দুর্বলতা দূর করিবার কোন চেষ্টা দেখা গেল না। উপরন্তু জালাল-উদ্দিন বিদ্রোহীদিগকে সম্পূর্ণভাবে ক্ষমা করিয়া তাহাদের স্পর্ধা-বৃদ্ধির সাহায্য করিলেন। তাঁহার এই দয়া-প্রবণতাকে দুর্বলতা মনে করিয়া অভিজাত সম্প্রদায় পুনরায় ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। প্রকাশ্যে সুলতানের বিরুদ্ধে অপমানসূচক মন্তব্য করিতেও তাঁহারা ভীত হইলেন না। এইভাবে দিল্লীর সুলতানির মর্যাদা ধূলিসাৎ হইল। খল্‌জী অভিজাতগণও জালাল-উদ্দিনের দুর্বলতায় বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। জালাল-উদ্দিনের দুর্বলতা দিন দিন সকলের নিকটই প্রকট হইয়া উঠিলে অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত আহম্মদ চাপ নামে জনৈক রাজকর্মচারী ও মালিক তাজ-উদ্দিন কুচি, এই দুইজনের মধ্যে একজনকে দিল্লীর সিংহাসনে স্থাপনের জন্য খল্‌জী মালিকদের মধ্যে ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল। এই ষড়যন্ত্রের সংবাদ পাইয়াও সুলতান জালাল-উদ্দিন অভিজাত সম্প্রদায়কে সাবধান করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন। কিন্তু আহম্মদ বেগ ছিলেন অতিশয় বিশ্বস্ত ও অনুগত ব্যক্তি। তিনি সুলতানের দুর্বলতায় বিরক্ত হইয়া অনেক সময় স্পষ্ট ভাষায় সুলতানকে সতর্ক করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু তিনি জালালউদ্দিনের চিরবিশ্বস্ত অনুচর ছিলেন। এজন্য সিংহাসন অধিকারের পর আলাউদ্দিন খল্‌জী তাঁহার চক্ষু দুইটি উৎপাটন করাইয়া তাঁহাকে শাস্তি দিয়াছিলেন।

মালিক চজ্জুর বিদ্রোহ

জালাল-উদ্দিনের দুর্বলতা

প্রয়োজনবোধে কঠোরতা অবলম্বন করিতেও সুলতান জালাল-উদ্দিন যে পারিতেন তাহার প্রমাণ সিদি মৌলার নৃশংস হত্যায় পাওয়া যায়। সিদি মৌলার শিষ্যগণ তাঁহাকে খলিফা (Caliph) পদে স্থাপন করিতে ইচ্ছুক এই সংবাদ পাইয়া ইস্‌লাম ধর্মের পৃষ্ঠপোষক জালাল-উদ্দিন ইস্‌লাম ধর্মগুরু খলিফার অবমাননা হইতেছে এই কারণে

সিদি মৌলার হত্যা

হাতীর পায়ের নীচে সিদি মৌলাকে পিষ্ট করাইয়াছিলেন বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন কিন্তু বস্তুতঃ সিদি মৌলা সুলতানকে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন বলিয়াই তাঁহাকে এরূপ নৃশংসভাবে হত্যা করা হইয়াছিল। যাহা হউক, এই নৃশংসতা জালাল-উদ্দিনের প্রতি জনসাধারণের একাংশকে বীতশ্রদ্ধ করিয়া তুলিল।

আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যাপারেই জালাল-উদ্দিন যে তাঁহার দুর্বলতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন এমন নহে। পররাষ্ট্র-ক্ষেত্রেও তাঁহার দুর্বলতা প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি ১২৯০ খ্রীষ্টাব্দে রণথম্ভোর দুর্গ আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইবার পথে ঝাইন্ (Jhain) দুর্গটি দখল করেন এবং ঐ দুর্গে অবস্থিত দেবমন্দির ও বিগ্রহাদি ধ্বংস করেন। কিন্তু রণথম্ভোর দুর্গ জয় করিতে অকৃতকার্য হইয়া তিনি দিল্লী ফিরিয়া আসেন। এই অপমানজনক প্রত্যাবর্তনে আমীর-ওমরাহ্‌গণ বিরক্তি প্রকাশ করিলে জালাল-উদ্দিন বলিয়াছিলেন যে, তিনি একজন মুসলমানেরও প্রাণ বিপন্ন করিয়া রণথম্ভোর দুর্গ জয় করিতে ইচ্ছুক নহেন।

রণথম্ভোর জয়ে বিফলতা

মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধ ব্যাপারে জালান-উদ্দিন অবশ্য তাঁহার ক্ষমতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। ১২৯২ খ্রীষ্টাব্দে মোঙ্গল-নেতা হুলাগু বা হলাকুর পৌত্র আবদুল্লা দেড় লক্ষ মোঙ্গল সৈন্যসহ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। জালাল-উদ্দিন দিল্লী হইতে সেনাবাহিনী প্রেরণ করিয়া মোঙ্গলদের সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিলেন। অতঃপর দুই পক্ষের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইল। চিঙ্গিজ খাঁর পৌত্র উল্‌ঘু তাঁহার কতিপয় অনুচরসহ ভারতবর্ষে স্থায়িভাবে বসবাস করিতে চাহিলেন। জালাল-উদ্দিন উল্‌ঘুর সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিয়া উল্‌ঘু ও তাঁহার অনুচরবৃন্দকে ইস্‌লাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করিলেন। অল্পকাল পরেই উল্‌ঘু ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার অনুচরদের কেহ কেহ দিল্লীর উপকণ্ঠে স্থায়িভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে রহিয়া গেল। ইহারা ইস্‌লাম ধর্ম এবং মুসলমানদের আচার-আচরণ গ্রহণ করিয়া 'নব মুসলমান' নামে পরিচিতি লাভ করিল।

মোগল আক্রমণ প্রতিরোধ (১২৯২)

মন্দোর ও ঝইন্ অঞ্চলে অভিযান

মন্দোর ও ঝইন্ অঞ্চলে সামরিক অভিযান সম্পন্ন করিয়া জালাল-উদ্দিন যুদ্ধসজ্জা ত্যাগ করিলেন। কিন্তু ধর্মভীরু, শান্তিপ্রিয় সুলতান জালাল-উদ্দিন শান্তিতে মরিতে পারিলেন না। নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা আলা-উদ্দিন খল্জীর হস্তে তাঁহার অপমৃত্যু ঘটিল।

জালাল-উদ্দিনের অপমৃত্যু

আলা-উদ্দিন-খল্জী, ১২৯৬—১৩১৬ (Ala-ud-din Khalji):

আলা-উদ্দিন ছিলেন জালাল-উদ্দিন ফিরুজের ভ্রাতুষ্পুত্র। জালাল-উদ্দিনের অভিভাবকত্বাধীনেই তিনি মানুষ হইয়াছিলেন। জালাল-উদ্দিন-সস্নেহে ভ্রাতুষ্পুত্রকে মানুষ করিয়া তাঁহার সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিয়া তাঁহাকে কারা প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। কারা প্রদেশের শাসনকর্তাপদে নিযুক্ত থাকাকালেই আলা-উদ্দিন তথাকার বিদ্রোহী আমীর ও মালিকদের প্ররোচনায় দিল্লীর সিংহাসন লাভের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতে লাগিলেন।* নিজ পত্নী এবং শ্বশ্রূমাতাও (mother-in-law) আলা-উদ্দিনের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁহাদের ব্যবহারেও আলা-উদ্দিন দিল্লী হইতে দূরে থাকিতে চাহিলেন এবং সুযোগ পাইলে দিল্লীর প্রাধান্য হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কারা প্রদেশের শাসন-কর্তাপদে নিয়োগ

১২৯২ খ্রীষ্টাব্দে জালাল-উদ্দিনের অনুমতিক্রমে তিনি মালব দেশ আক্রমণ করিলেন এবং এই সূত্রে ভিল্সা দুর্গটি লুণ্ঠন করিয়া প্রভূত পরিমাণ ধনরত্ন লইয়া আসিলেন। লুণ্ঠিত ধনরত্ন লইয়া তিনি দিল্লীতে উপস্থিত হইলে সুলতান জালাল-উদ্দিন খুব প্রীত হইলেন এবং আলা-উদ্দিনকে অযোধ্যারও শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন।

মালব আক্রমণ ও ভিলসা দুর্গ লুণ্ঠন (১২৯২)

আলা-উদ্দিনের আকাঙ্ক্ষা ছিল অপরিসীম। ভিল্সা দুর্গ লুণ্ঠনের পর হইতেই তাঁহার আকাঙ্ক্ষা আরও বৃদ্ধি পাইল। ঐ দুর্গটি আক্রমণ করিতে গিয়া-ই আলা-উদ্দিন দেবগিরি বা দৌল-তাবাদের ঐশ্বর্যের সংবাদ পাইয়াছিলেন। ঐ সময়ে দেবগিরিতে যাদব বংশীয়

দেবগিরি আক্রমণ

***"The crafty suggestions of the Kara rebels made a lodgement in his brain, and, from the very first year of his occupation of that territory, he began to follow up his design of proceeding to some distant quarter and amassing money."—*Barani*, vide, *An Advanced History of India*, p. 297.**

রাজা রামচন্দ্র রাজত্ব করিতেন। আলা-উদ্দিন এইবার জালাল-উদ্দিনের বিনা-অনুমতিতেই দেবগিরি আক্রমণ করিলেন। অতর্কিতে আক্রান্ত হইয়া রামচন্দ্র আত্মরক্ষা করিতে পারিলেন না। ঐ সময়ে তাঁহার পুত্র শঙ্করদেব অধিকাংশ সেনাবাহিনী সহ রাজধানী হইতে অনুপস্থিত থাকায় রামচন্দ্র সহজেই পরাজিত হইলেন। তিনি দেবগিরির সুরক্ষিত দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং সেখান হইতে পুনরায় যুদ্ধ করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। এমন সময় আলা-উদ্দিন গুজব রটাইয়া দিলেন যে, দিল্লীর সুলতান শীঘ্রই বিশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যসহ দাক্ষিণাত্য বিজয়ের জন্য আসিতেছেন। এই মিথ্যা রটনায় আলা-উদ্দিনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। রামচন্দ্র আর যুদ্ধ না করিয়া আপোষ-মীমাংসা-ই সমীচীন হইবে মনে করিলেন। চুক্তির শর্তানুসারে আলা-উদ্দিনকে পঞ্চাশ মণ সোনা, সাত মণ মণিমুক্তা, চল্লিশটি হাতী ও কয়েক হাজার ঘোড়া দেওয়া স্থির হইল। ইহা ভিন্ন দেবগিরি নগরটি লুণ্ঠন করিয়া আলা-উদ্দিন যে-পরিমাণ ধনরত্ন সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহাও তিনি লইয়া যাইতে পারিবেন স্থির হইল। এমন সময় রামচন্দ্রের পুত্র শঙ্করদেব রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি এই অপমানজনক চুক্তির শর্তাদি অগ্রাহ্য করিয়া আলা-উদ্দিনকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরাজিত হইয়া তিনি পিতৃ-প্রতিশ্রুত শর্তাদি মানিতে এবং তদুপরি ইলিচপুর নামক স্থান ও প্রচুর পরিমাণ ধনরত্ন ক্ষতিপূরণ হিসাবে দিতে স্বীকৃত হইলেন। ইলিচপুর অবশ্য রামচন্দ্রের অধীনেই রহিল, কিন্তু এজন্য তাঁহাকে আলা-উদ্দিনের নিকট বাৎসরিক করদানের প্রতিশ্রুতি দিতে হইল।

দেবগিরির যাদব-বংশীয় রাজা রামচন্দ্রের পরাজয়

আলা-উদ্দিনের দেবগিরি-অভিযানের ঐতিহাসিক গুরুত্ব কোন অংশেই কম ছিল না। বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণে ইহাই ছিল সর্বপ্রথম মুসলমান অভিযান। ভবিষ্যতে দাক্ষিণাত্যে মুসলমান আধিপত্য বিস্তারের সূত্রপাত এই সময় হইতেই হইয়াছিল। দাক্ষিণাত্যের রাজগণের সামরিক দুর্বলতাও মুসলমান সুলতান-দের নিকট এই সময় হইতেই প্রকট হইয়া পড়িয়াছিল।

দেবগিরি বিজয়ের গুরুত্ব

দেবগিরি হইতে বিজয়গৌরবে আলা-উদ্দিন কারায় ফিরিয়া আসিলেন। লুণ্ঠিত ধনরত্নাদি তিনি দিল্লীর রাজভাণ্ডারে প্রেরণ না করিয়া নিজেই তাহা

আলা-উদ্দিন কর্তৃক জালাল-উদ্দিনের প্রাণনাশ

আত্মসাৎ করিলেন। কিন্তু আলা-উদ্দিনের এইরূপ স্বাধীন কার্যকলাপে বাধা দেওয়ার প্রয়োজন জালাল-উদ্দিন উপলব্ধি করিলেন না। স্নেহান্ধতার বশবর্তী হইয়া তিনি তাঁহার সভাসদ্‌গণের পরামর্শ উপেক্ষা করিয়া আলা-উদ্দিনকে দেবগিরি অভিযানের জন্য স্বাগত জানাইবার উদ্দেশ্যে স্বয়ং কারায় উপস্থিত হইলেন। সেখানে জালাল-উদ্দিন ভ্রাতুষ্পুত্র আলা-উদ্দিনকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করিলে, পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী তাঁহাকে আক্রমণ করা হইল। তিনি পলায়নের চেষ্টা করিলে তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া উহা আলাউদ্দিনের নিকট উপস্থিত করা হইল।* এইভাবে পিতৃকল্প স্নেহান্ধ পিতৃব্যকে বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণার সাহায্যে হত্যা করিয়া আলা-উদ্দিন স্বয়ং দিল্লীর সুলতান পদ অধিকার করিলেন।

১২৯৬ খ্রীষ্টাব্দে জালাল-উদ্দিনকে হত্যা করিয়া আলা-উদ্দিন দিল্লীর সিংহাসন লাভ করিলেন, কিন্তু সিংহাসনে বসিয়াই তাঁহাকে নানাপ্রকার জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইল। জালাল-উদ্দিনের অনুগত অভিজাতগণ আলা-উদ্দিনের উপর জালাল-উদ্দিনের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে সচেষ্ট ছিলেন। জালাল-উদ্দিনের পত্নী মালিকা জাহান নিজ পুত্র কাদ্‌র খাঁ (Qadr Khan)-কে রুকন-উদ্দিন ইব্রাহিম উপাধিতে ভূষিত করিয়া সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু অভিজাত শ্রেণীর কোন প্রকার সমর্থন না পাওয়ায় তাঁহার পক্ষে সিংহাসন-লাভ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছিল।

তাঁহার সমস্যা

আলা-উদ্দিন অভিজাত সম্প্রদায়কে প্রচুর পরিমাণ উৎকোচদানে সন্তুষ্ট করিলেন। জনসাধারণের মধ্যেও প্রচুর পরিমাণ অর্থ বিতরণ করা হইল। এইভাবে তিনি অভিজাত শ্রেণী ও জনসাধারণকে নিজ পিতৃব্যের হত্যার কথা ভুলাইতে চেষ্টা করিলেন।

অভিজাত সম্প্রদায় ও জনসাধারণের মধ্যে প্রচুর অর্থ বিতরণ

তারপর আলা-উদ্দিন মুলতানে আর্‌কলি খাঁ, কাদর্‌ প্রভৃতি সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের বন্দী করিলেন এবং তাঁহাদের চক্ষু উৎপাটন করিয়া

---

* Vide Cam. History of India. vol, III, p. 98

হান্‌সি দুর্গে নিক্ষেপ করিলেন। মালিকা জাহান এবং চক্ষু-উৎপাটিত করাইয়া আহ্‌মদ চাপকেও দিল্লীর কারাগারে কঠোর প্রহরাধীনে রাখা হইল। নিজ সিংহাসন এইরূপে নিরঙ্কুশ করিয়া আলা-উদ্দিন যে অভিজাতগণ পূর্বে জালাল-উদ্দিনের অনুগত ছিলেন, কিন্তু পরে অর্থের লোভে আলা-উদ্দিনের পক্ষে আসিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে কঠোর শাস্তি দানে ত্রুটি করিলেন না। কারণ, যাহারা অর্থের লোভে যে-কোন পক্ষ সমর্থনে রাজী হয় তাহারা যে বিশ্বাসভাজন নহে, একথা তাঁহার অজানা ছিল না।

সিংহাসনাধিকার নিষ্কণ্টক করণ

সিংহাসনাধিকার নিরঙ্কুশ হইলেও আলা-উদ্দিনের সমস্যার জটিলতার অবসান ঘটিল না। আভ্যন্তরীণ গোলযোগ, মোঙ্গল আক্রমণ, রাজপুতানা, মালব, গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চলের বিদ্রোহ, তুর্কী অভিজাতবর্গের বিরোধিতা প্রভৃতি নানাবিধ সমস্যার আশু সমাধান প্রয়োজন ছিল।

অপরাপর সমস্যা

মোঙ্গল আক্রমণ ও আলা-উদ্দিন (Mongol raids and Ala-ud-din) : মোঙ্গল আক্রমণই বহুদিন ধরিয়াই দিল্লীর সুলতানের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ছিল। আলা-উদ্দিনের রাজত্বকালে মোঙ্গলগণ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে আসিয়া বারবার পরাজিত মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করিবার ব্যাপারে আলা-উদ্দিনের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। আলা-উদ্দিনের সিংহাসনারোহণের কয়েক মাসের মধ্যেই মোঙ্গলগণ ভারতবর্ষ আক্রমণ করে, কিন্তু উত্তর-পশ্চিম ভারতের শাসনকর্তা জাফর খাঁ জলন্ধরের নিকট মোঙ্গলদিগকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন।

মোঙ্গল আক্রমণ

প্রথম আক্রমণ (১২৯৬)

আলা-উদ্দিনের রাজত্বের দ্বিতীয় বৎসরে (১২৯৭) মোঙ্গলগণ তাহাদের নেতা সল্‌দি (Saldi)-র অধীনে অগ্রসর হইয়া দিল্লীর অনতিদূরে সিরি দুর্গটি অধিকার করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু এবারও তাহারা জাফর খাঁর হস্তে পরাজিত হয়। ১২৯৯ খ্রীষ্টাব্দে মোঙ্গল নেতা কুৎলুঘ্‌ খাজা দুই লক্ষ মোঙ্গল অনুচর লইয়া দিল্লীর উপকণ্ঠে যমুনা নদীর তীর পর্যন্ত অগ্রসর হইতে সমর্থ হন।

দ্বিতীয় আক্রমণ (১২৯৭)

তৃতীয় আক্রমণ (১২৯৯)

এবারও জাফর খাঁ মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু যুদ্ধে তাঁহার মৃত্যু ঘটিল। কিন্তু তাঁহার সামরিক দক্ষতার ফলে মোঙ্গলবাহিনীর মনে যে ভীতির সৃষ্টি হইয়াছিল সম্ভবতঃ সেই কারণেই মোঙ্গলগণ ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। জাফর খাঁর মৃত্যুতে মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করিবার অসুবিধা বৃদ্ধি পাইলেও আলা-উদ্দিন তাহাতে খুশীই হইলেন, কারণ তিনি জাফর খাঁর ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। জাফর খাঁর মৃত্যুতে আলা-উদ্দিন যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

জাফর খাঁর মৃত্যু

১৩০৪ খ্রীষ্টাব্দে মোঙ্গলগণ পুনরায় ভারতবর্ষ আক্রমণ করিল। এইবার তাহারা লাহোর-এর উত্তরে আম্‌রোহা (Amroha) পর্যন্ত অগ্রসর হইলে সুলতানি সৈন্যের হস্তে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইয়া ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। কিন্তু দুর্ধর্ষ মোঙ্গলগণ দমিবার পাত্র ছিল না। তাহারা ১৩০৭-৮ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় ইক্‌বাল্ মন্দ্-এর নেতৃত্বে সিন্ধু নদী অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। আলা-উদ্দিন তাহাদের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী সেনাবাহিনী প্রেরণ করিলেন। সুলতানি সৈন্যের নিকট মোঙ্গল-বাহিনী পরাজিত হইল। ইক্‌বাল্ মন্দ্ যুদ্ধে নিহত হইলেন এবং বহু সংখ্যক মোঙ্গল বন্দী হইল। এইভাবে পুনঃপুনঃ প্রতিহত হইয়া মোঙ্গলগণ হিন্দুস্তান আক্রমণের নেশা ত্যাগ করিল। আলা-উদ্দিনের সেনাবাহিনীর সমরদক্ষতা ও পরাজিত মোঙ্গলবাহিনীর উপর নৃশংসতা মোঙ্গল নেতাদের মনে হিন্দুস্তান সম্পর্কে এক দারুণ ভীতির সৃষ্টি করিল।

চতুর্থ আক্রমণ (১৩০৪)

পঞ্চম ও সর্বশেষ (১৩০৭-৮)

মোঙ্গল আক্রমণ সম্পূর্ণভাবে প্রতিহত করিয়া আলা-উদ্দিন রাজ্য জয়ে মনোনিবেশ করিবার সুযোগ পাইলেন। কিন্তু মোঙ্গল জাতি ভবিষ্যতেও যাহাতে হিন্দুস্তান আক্রমণের সুযোগ না পায় সেজন্য তিনি প্রথমেই উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের সংরক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিলেন এবং সামান ও দীপালপুর নামক স্থানে দুইটি সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করিলেন। এই দুই স্থানে একমাত্র মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি

আলা-উদ্দিনের মোঙ্গল নীতি

সামান ও দীপালপুরে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন

সেনাবাহিনী সর্বদা রাখিলেন। পাঞ্জাবের শাসনকর্তা গাজী মালিককে তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করিলেন। ইহা ভিন্ন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দেশে তিনি একসারি দুর্গ নির্মাণ করাইলেন এবং পুরাতন দুর্গগুলির সংস্কার সাধন করিলেন। এইভাবে মোঙ্গলদের আক্রমণ প্রতিহত করিবার ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দেশের জনসাধারণ যেমন শান্তিতে বসবাস করিবার সুযোগ পাইল তেমনি আলা-উদ্দিনও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দেশে দুর্গ নির্মাণ

দিল্লীর উপকণ্ঠে ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া যে সকল 'নব-মুসলমান' বসবাস করিতেছিল তাহারা প্রথমে ভাবিয়াছিল যে, ইস্‌লাম ধর্মে দীক্ষিত হইলেই উচ্চ রাজকর্মচারিপদে তাহাদিগকে নিযুক্ত করা হইবে। কিন্তু সাধারণ সৈনিকের কাজ ভিন্ন অপর কোন বৃত্তি গ্রহণের সুযোগ না পাওয়ায় তাহাদের অসন্তোষ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। গুজরাট হইতে ফিরিবার পথে আলা-উদ্দিনের সেনাবাহিনীর মধ্যে যে সকল 'নব-মুসলমান' সৈনিক ছিল তাহারা একপ্রকার বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে আলা-উদ্দিন তাহাদিগকে সেনাবাহিনী হইতে বহিষ্কৃত করেন। এই ঘটনার ফলে মোঙ্গলদের অসন্তোষ আরও বৃদ্ধি পায়। তাহারা আলা-উদ্দিনকে হত্যা করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল, কিন্তু এই ষড়যন্ত্র প্রকাশ হইয়া পড়িলে আলা-উদ্দিনের আদেশে এক দিনে ত্রিশ হাজার 'নব-মুসলমান'কে হত্যা করিয়া তাহাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করা হইল। উপরোক্তভাবে আলা-উদ্দিন খল্‌জী আভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত মোঙ্গল সমস্যার সমাধান করিলেন।

নব মুসলমানদের বিদ্রোহ

ত্রিশ হাজার 'নব মুসলমান' হত্যা

আলা-উদ্দিনের দিগ্বিজয় (Conquests of Ala-ud-din) : প্রথম জীবনে মালব ও দেবগিরির বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে সাফল্য লাভ করিয়া আলা-উদ্দিনের রাজ্যজয় লিপ্সা অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। তিনি গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডারের ন্যায় পৃথিবী-বিজেতা হইবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতে থাকেন। ধর্মের দিক দিয়া তিনি নিজেকে ইস্‌লাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মোহম্মদের সহিত তুলনা করিতেন এবং দিগ্বিজয় ও এক নূতন ধর্ম প্রবর্তন এই

আলা-উদ্দিনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা : দিগ্বিজয় ও ধর্মপ্রবর্তন

উভয় প্রকার বিজয়ের আশা পোষণ করিতেন।* ঐতিহাসিক জিয়া-উদ্দিন বরণীর রচনা হইতে জানা যায় যে, দিগ্বিজয়ী ও ধর্মপ্রবর্তকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবার পূর্বে আলা-উদ্দিন তাঁহার কটোয়াল নিজাম্-উল্-মুল্‌ক-এর মতামত জানিতে চাহিলে স্পষ্টবক্তা নিজাম্-উল্-মুল্‌ক আলা-উদ্দিনকে ধর্ম-প্রবর্তকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ায় দুরাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। উপরন্তু তিনি আলা-উদ্দিনকে পৃথিবী-বিজয়ের পূর্বে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন ভারতের ঐক্য, মোঙ্গল আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা, সুদক্ষ রাজকর্মচারীর প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতির কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন।† কটোয়াল আলা-উল্-মুল্‌ক-এর এই সকল উপদেশ আলা-উদ্দিন অবনত মস্তকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। পৃথিবী-বিজয়ের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিলেও আলা-উদ্দিন নিজেকে আলেকজাণ্ডারের দ্বিতীয় সংস্করণ বলিয়া মনে করিতেন এবং নিজ মুদ্রায় 'দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার' উপাধি মুদ্রিত করিয়া তিনি উচ্চাভিলাষের পরিচয় দিয়াছিলেন।

কটোয়াল নিজাম্-উল্-মুল্‌কের উপদেশ

দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার উপাধি ধারণ

১২৯৭ খ্রীষ্টাব্দে আলা-উদ্দিন উলুঘ্ খাঁ ও নুসরৎ খাঁকে গুজরাট জয়ে প্রেরণ করেন। ঐ সময়ে গুজরাটের রাজা ছিলেন কর্ণদেব। উলুঘ্ খাঁ ও নুসরৎ খাঁ গুজরাটের রাজধানী অন্‌হিল্‌বার আক্রমণ করিলে কর্ণদেব কাপুরুষের ন্যায় রাজধানী হইতে পলাইয়া গেলেন। তাঁহার রাণী কমলা দেবী সুলতানি সৈন্যের হস্তে ধরা পড়িলেন। সুলতানের সেনাপতিদ্বয়ের হস্তে গুজরাটের রাজধানী অন্‌হিল্‌বার বিধ্বস্ত হইল। গুজরাট জয়ের সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া নুসরৎ খাঁ ক্যাম্বে (Cambay)-এর দিকে অগ্রসর হইলেন। সেখানে তিনি বণিকদের নিকট হইতে প্রভূত পরিমাণ ধনরত্ন আদায় করিয়া লইয়া আসিলেন। ঐ স্থান হইতে কাফুর নামে এক অতি

গুজরাট জয় (১২৯৭)

ক্যাম্বে আক্রমণ

*"Ala-ud-din......dreamed of spiritul as well as material conquests. In the latter he sought to surpass Alexander of Macedon and in the former Muhammad." *The Cambridge History of India, Vol. III*, p. 104.

† Vide *Cambridge History of India. Vol, III*, pp. 101-2; *An Advanced History of India*, p. 301; *History of Mediaeval India*, Ishwari Prasad, pp. 226-7.

সুদর্শন খোজা (eunuch)-কেও লইয়া আসা হইল। ইনিই আলা-উদ্দিনের বিখ্যাত সেনাপতি মালিক কাফুর নামে ইতিহাসে পরিচিত।

১২৯৯ খ্রীষ্টাব্দে আলা-উদ্দিন রণথম্ভোর বিজয়ে উলুঘ্ খাঁ ও নুসরৎ খাঁকে প্রেরণ করিলেন। কুতব-উদ্দিন সর্বপ্রথম রণথম্ভোর জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে রণথম্ভোর স্বাধীন হইয়া গেলে ইল্‌তুৎমিস পুনরায় উহা জয় করেন। কিন্তু ইহার পরও রাজপুতগণ রণথম্ভোর পুনরধিকার করিতে সমর্থ হয়। আলা-উদ্দিনের রাজত্বকালে হামীর দেব ছিলেন রণথম্ভোরের রাণা। তিনি কয়েকজন বিদ্রোহী নব-মুসলমানকে তাঁহার রাজ্যে আশ্রয় দিয়াছিলেন। এইজন্য আলা-উদ্দিন তাঁহার রাজ্য আক্রমণের জন্য সামরিক অভিযান প্রেরণ করেন। হামীর দেবের বিরুদ্ধে উলুঘ খাঁ ও নুসরৎ খাঁর অভিযান বিফল হইলে আলা-উদ্দিন স্বয়ং সসৈন্যে রণথম্ভোর আক্রমণকালে পথিমধ্যে তিলপৎ নামক স্থানে আলা-উদ্দিনের ভ্রাতুষ্পুত্র আকৎ খাঁ তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টা করেন। আলা-উদ্দিন আকৎ খাঁ কর্তৃক আহত হইলেও তাঁহার প্রাণ রক্ষা পায়। আকৎ খাঁ ধৃত এবং প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন।

রণথম্ভোর জয় (১২৯৯)

রণথম্ভোর জয় করিতে সমর্থ হইয়া আলা-উদ্দিন রাজপুতানার শ্রেষ্ঠ রাজ্য মেবার আক্রমণে সাহসী হইলেন। মেবার রাজ্য ছিল পাহাড় ও ঘন জঙ্গল প্রভৃতি প্রাকৃতিক সীমারেখা দ্বারা পরিবেষ্টিত। মেবারের রাজধানী চিতোর ছিল পাহাড়ের উপর অবস্থিত। স্বভাবতই মেবার তথা চিতোর জয় করা সহজসাধ্য ছিল না। কিন্তু আলা-উদ্দিন ইহাতে দমিবার পাত্র ছিলেন না। ১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চিতোর আক্রমণ করিলেন। চিতোর আক্রমণের প্রত্যক্ষ কারণ ও প্রধান উদ্দেশ্য ছিল গুহিলা রাজপুত রাণা রতনসিংহের অনন্যাসুন্দরী রাণী পদ্মিনীকে লাভ করা।* পদ্মিনী-সংক্রান্ত কাহিনীর সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে

চিতোর জয় (১৩০৩)

---

*"The immediate cause of the invasion was his (Ala-ud-din's) passionate desire to obtain possession of Padmini, the peerless queen of Rana Ratan Singh, renowned for her beauty all over Hindustan." *History of Mediaeval India*, Ishwari Prasad, p. 230, for Feristah's account also see footnote, pp. 230-31.

বলিয়া ডক্টর কে. এস. লাল, জি. এইচ্. ওঝা প্রভৃতি আধুনিক ইতিহাসবিদ্‌গণ মনে করিয়া থাকেন। রতনসিংহ বীরদর্পে আলা-উদ্দিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া শেষ পর্যন্ত পরাজিত ও ধৃত হইলেন। কিন্তু রাজপুতগণ এক অভিনব কৌশলে তাঁহাকে বন্দী দশা হইতে মুক্ত করিল। ফলে পুনরায় যুদ্ধ শুরু হইল। রাজপুত বীর গোরা ও বাদল অসাধারণ বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করিলেন। কিন্তু বিশাল সুলতানি বাহিনীকে পরাজিত করা অসম্ভব দেখিয়া রাজপুত রমণীগণ 'জোহর' অর্থাৎ জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ বিসর্জন দিলেন। এইভাবে প্রাণ বিসর্জন দিয়া তাঁহারা সুলতানি সৈন্যের হস্তে বন্দী হওয়ার অপমান হইতে পরিত্রাণ পাইলেন।* আলা-উদ্দিন নিজ পুত্র খিজির খাঁকে চিতোরের শাসনকর্তা হিসাবে রাখিয়া আসিলেন। ১৩১১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত খিজির খাঁ চিতোরে রহিলেন। কিন্তু ঐবৎসর রাজপুতদের আক্রমণ প্রতিহত করিতে না পারিয়া তিনি চিতোর ত্যাগ করিয়া দিল্লী

*"The funeral pyre was lighted within the great subterranean retreat in chambers impervious to the light of the day and the defenders of Chitor beheld in procession the queens, their own wives and daughters, to the number of several thousands. The fair Padmini closed the throng......They were conveyed to the cavern, and the opening closed upon them, leaving them to find security from dishonour in the devouring element." Vide, *An Advanced History of India.* pp. 232-3.

Also vide A. L, Srivastava : *The sultanate of Delhi*, p. 167 ;

"The episode of Padmini has received or great deal of prominence in connection with Alauddin's conquest of Chitor. The bardic chronicles of Rajputana represent the invasion of Chitor as solely due to the Sultan's desire to get possession of Padmini, the beautiful queen of Rana Ratan Singha of Chitor and they have woven round it a long tale of romance, heroism and treachery, too well-known to need any repetitions. Later writers like Abu-'l-Fazl, Hazi-ud-Dabir, Firishta, and Neusi have accepted the story, but many modern writers are inclined, to reject it altogether" *The Delhi Sultanate*—Bharatiya Vidyabhan publication, vol VI, pp, 26-27

চলিয়া আসিলেন। অতঃপর জালোর-এর মালদেবকে আলা-উদ্দিন চিতোরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। ইনি কয়েক বৎসর পর রাণা হামীর দেবের নিকট চিতোর ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ১৩১৮ খ্রীষ্টাব্দে চিতোর পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করে।

চিতোর জয় করিয়া আলা-উদ্দিন মালবদেশের বিরুদ্ধে এক সামরিক অভিযান প্রেরণ করেন। মালবরাজ রায় মাহ্‌লক দেব (Rai Mahlak Deva) আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও নিজদেশ রক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হইলে আলা-উদ্দিন তাঁহার একান্ত সচিব (Confidential Chamberlain) আইন্‌-উল্‌-মুল্‌ককে মালবের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন।

মালব জয়

মালব জয়ের পর আলা-উদ্দিন উজ্জয়িনী, ধার, চান্দেরী ও মাণ্ডু জয় করিয়া সমগ্র উত্তর-ভারত নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করিলেন। উত্তর-ভারত জয় শেষ করিয়া আলা-উদ্দিন দক্ষিণ-ভারত জয়ে মনোযোগী হইলেন। ইতিমধ্যে দেবগিরির রাজা রামচন্দ্র ইলিচপুরের জন্য প্রতিশ্রুত বাৎসরিক কর দান বন্ধ করিলে আলা-উদ্দিন মালিক কাফুরকে দেবগিরির বিরুদ্ধে অভিযানে প্রেরণ করিলেন। কাফুরের হস্তে পরাজিত হইয়া রামচন্দ্র আলা-উদ্দিনের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন।

উজ্জয়িনী, ধার, চান্দেরী ও মাণ্ডু জয়

দেবগিরির বিরুদ্ধে অভিযান

ঐ সময়ে কাকতীয় বংশের রাজা প্রতাপরুদ্রদেব ছিলেন বরঙ্গলের রাজা। দেবগিরির পতনের সংবাদ পাইয়া প্রতাপরুদ্রদেব মালিক কাফুরের সম্ভাব্য আক্রমণ হইতে নিজরাজ্য রক্ষার বন্দোবস্ত করিতে সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু মালিক কাফুরের সমরকুশলতার সহিত যুঝিতে না পারিয়া শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে দিল্লীর সুলতানের বশ্যতা স্বীকার করিতে হইল। ইহা ভিন্ন বাৎসরিক করদানে স্বীকৃতি এবং প্রভূত পরিমাণ ধনরত্ন, বহুসংখ্যক হাতী ও ঘোড়া ক্ষতিপূরণস্বরূপ দিতেও তিনি বাধ্য হইলেন।

বরঙ্গল রাজ্যের বশ্যতা

বরঙ্গল রাজ্য জয় করিয়া মালিক কাফুর হোয়সলরাজ বীরবল্লালের

হোয়সল রাজ্যের বশ্যতা

রাজধানী দ্বারসমুদ্র আক্রমণ করিলেন। তিনিও দেশ রক্ষার্থ যুঝিয়া শেষ পর্যন্ত পরাজিত হইলেন এবং যাবতীয় সঞ্চিত ধনরত্ন ক্ষতিপূরণ হিসাবে দান করিতে এবং দিল্লী সুলতানের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন।

পাণ্ড্যরাজ্যের রাজধানী মাদুরা অধিকার

পাণ্ড্যরাজ্যে ঐ সময়ে রাজপরিবারের মধ্যে এক ভ্রাতৃ-বিরোধ চলিতেছিল। এই সুযোগে অতি সহজেই মালিক কাফুর পাণ্ড্যরাজ্যের রাজধানী মাদুরা অধিকার করিলেন।

সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্যন্ত অগ্রগতি : দেবগিরির বিরুদ্ধে অভিযান

পাণ্ড্যরাজ্য জয়ের পর মালিক কাফুর সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন। ইতিমধ্যে (১৩২২) দেবগিরির রাজা রামচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র শঙ্করদেব রাজা হইলেন। তিনি পিতৃ-প্রতিশ্রুত করদান বন্ধ করিলে মালিক কাফুর তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে দিল্লীর বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য করেন। এইভাবে সমগ্র দাক্ষিণাত্যও আলা-উদ্দিনের সাম্রাজ্যভুক্ত হইল। আলা-উদ্দিন এক বিশাল সাম্রাজ্যের সুলতানের মর্যাদা লাভ করিলেন।

আলা-উদ্দিনের শাসন (Administration of Ala-ud-din) : আলা-উদ্দিনের শাসন-নীতি পূর্ববর্তী মুসলমান সুলতানদের শাসন-নীতি অপেক্ষা সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। গতানুগতিকতা ত্যাগ করিয়া আলা-উদ্দিন এক নূতন শাসনপদ্ধতির উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। নিজে একজন অতি গোঁড়া মুসলমান হইলেও তিনি ধর্মের দ্বারা নিজ রাজনৈতিক দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন হইতে দিতেন না। স্বীয় রাজনৈতিক বিচার-বিবেচনা দ্বারা তিনি শাসনকার্য

তাঁহার শাসন-নীতি

পরিচালনা করিতেন, শাসনকার্যে কাজী বা উলেমাদের মতামত বা নির্দেশের তিনি ধার ধারিতেন না। তাঁহার শাসনপদ্ধতির মূলকথা ছিল সুলতানের প্রাধান্য সর্বময় করিয়া তোলা। শাসনকার্যে সুলতানের আদেশ-ই আইনের ন্যায় বলবৎ হইবে, ধর্মের আইন শাসনকার্যে সম্পূর্ণ অচল বলিয়া তিনি মনে করিতেন। স্থায়ী ও সুদৃঢ় শাসনব্যবস্থা চালু রাখা-ই ছিল তাঁহার শাসনের মূল নীতি। উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের বিদ্রোহ, সুলতানের আদেশ অমান্য এবং কর্তব্য কার্যে অবহেলা প্রভৃতির দৃষ্টান্ত আলা-উদ্দিনের শাসনব্যবস্থাকে স্বৈরাচারী করিয়া

তুলিয়াছিল। সুদৃঢ় শাসন বজায় রাখিবার প্রয়োজনীয় পন্থা অবলম্বনে তিনি ন্যায়-অন্যায় বা ধর্মাধর্মের ধার ধারিতেন না।*

আলা-উদ্দিন কেবলমাত্র দিগ্বিজয়ী সামরিক প্রতিভার-ই পরিচয় দিয়াছিলেন, এমন নহে। শাসনকার্যের প্রয়োজনীয় যাবতীয় ব্যবস্থা তিনি অবলম্বন করিবার মতো রাজনৈতিক দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন, ইহা অনস্বীকার্য।

সুষ্ঠু শাসন প্রবর্তনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন

আকৎ খাঁর বিশ্বাসঘাতকতা ও হাজী মৌলার বিদ্রোহ এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের স্বেচ্ছাচার ও বিদ্রোহী মনোভাবের পশ্চাতে আলা-উদ্দিন চারিটি বিশেষ কারণ নিহিত আছে উপলব্ধি করিলেন। এইগুলি হইল অভিজাত সম্প্রদায়ের অর্থবল, শাসনকার্য সম্পাদনে অবহেলা, অত্যধিক মদ্যপান এবং পরস্পর মেলা-মেশার অবাধ সুযোগ। এই সকল কারণ দূর করিবার উদ্দেশ্যে আলা-উদ্দিন কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন।

প্রথমতঃ, আলা-উদ্দিন বহুসংখ্যক গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়া রাজ্যের কোথায় কি ঘটিতেছে তাহার যাবতীয় সংবাদ সংগ্রহের ব্যবস্থা করিলেন। অভিজাত

গুপ্তচর নিয়োগ

সম্প্রদায় বা রাজকর্মচারিগণ কোনপ্রকার সন্দেহাত্মক কার্য-কলাপে লিপ্ত হইলে সেই সংবাদ গোপনে সুলতানের কর্ণগোচর করা ছিল গুপ্তচরদের কর্তব্য। গুপ্তচরগণের নিকট হইতে কাহারো সম্পর্কে কোনপ্রকার সন্দেহজনক কার্যকলাপের সংবাদ পাইলে সুলতান তাহার বিরুদ্ধে সমুচিত শাস্তিবিধান করিতেন।

দ্বিতীয়তঃ, রাজকর্মচারিগণকে জায়গীর দানের প্রথা তিনি উঠাইয়া

জায়গীর প্রথা, ভাতা, সরকারী সাহায্য প্রভৃতির বিলোপ সাধন

দিলেন। সরকারী ভাতা বা অপর কোন সাহায্য দান তিনি বন্ধ করিলেন। যে-কোন অজুহাতে প্রজাবর্গের নিকট হইতে অর্থ আদায়ের ব্যবস্থা করা হইল। অর্থের প্রাচুর্য থাকিলেই বিদ্রোহের মনোবৃত্তি ও সামর্থ্য জন্মিয়া

* "Men are heedless, disrespectful, and disobey my commands; I am then compelled to be severe to bring them to obedience. I do not know whether this is lawful or unlawful; whatever I think to be for the good of the state, or suitable for the emergency, that I decree, and as for what may happen to me on the approaching day of judgement that I know not." *Alauddin to Quazi Mughis-ud-din*, vide, *History of Mediaeval India*. Ishwari Prasad. p. 243.

আলাউদ্দিনের সাম্রাজ্য
০ ২০০ ৪০০
মাইল
কাবুল
গজনী
লাহোর
শতদ্রু নং
মুলতান
দিল্লী
গঙ্গা নং
আজমীর
রণথম্ভোর
চিতোর
গোয়ালিওর
কাশী
গঙ্গা নং
উজ্জয়িনী
কালিঞ্জর
প্রয়াগ
গৌড়
অনহিলবার
জুনাগড়
নর্মদা নং
তাপ্তী নং
উড়িষ্যা
দেবগিরি
মহানদী
বরঙ্গল
গোদাবরী
কৃষ্ণা নং
ব ঙ্গো প সা গ র
আরব সাগর
কাঞ্চী
তাঞ্জোর
মাদুরা
সিংহল

থাকে, এই ছিল আলা-উদ্দিনের ধারণা। এজন্য তিনি ধনবান হিন্দুমাত্রকেই নানাভাবে শোষণ করিয়া তাহাদের অর্থবল নাশ করিলেন।* মোরল্যাণ্ড (Moreland)-এর মতে 'হিন্দু' কথাটি বিত্তশালী ব্যক্তিমাত্রকেই বুঝাইত। কিন্তু তাঁহার এই ব্যাখ্যা আধুনিক ঐতিহাসিকগণ সুযৌক্তিক মনে করেন না।† দোয়াব অঞ্চলের হিন্দু কৃষকদের নিকট হইতে উৎপন্ন ফসলের অর্ধাংশ রাজস্ব হিসাবে গৃহীত হইতে লাগিল। আমীর, মালিক, মহাজন প্রভৃতি কাহারও হাতে যাহাতে অধিক অর্থ সঞ্চিত হইতে না পারে তিনি সেই ব্যবস্থা করিলেন।

রাজকর্মচারী তথা অভিজাতবর্গের অবাধ মেলামেশা নিষিদ্ধ

তৃতীয়তঃ, তিনি মদ্যপান বা অপর কোন মাদক দ্রব্যের ব্যবহার নিষিদ্ধ করিয়া দিলেন। সুলতান নিজেও মদ্যপান ত্যাগ করিলেন। অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহাদি বা অন্য কোনপ্রকার সামাজিক অনুষ্ঠান সুলতানের অনুমতি ভিন্ন সম্পন্ন করা নিষিদ্ধ হইল। এইভাবে অভিজাত শ্রেণী তথা রাজ-কর্মচারিবৃন্দের অবাধ মেলামেশার যাবতীয় সুযোগ বন্ধ করা হইল। ফলে, ষড়যন্ত্রের সুযোগও আর রহিল না।

সেনাবাহিনীর সংগঠন

চতুর্থতঃ, আলা-উদ্দিন আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার এবং রাজ্য বিস্তারের জন্য শক্তিশালী সেনাবাহিনীর প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া সেনাবাহিনীর প্রসার সাধন করিলেন। সেনাবাহিনীকে নূতন পদ্ধতিতে সংগঠিত ও সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তিনি খল্‌জী সামরিক পদ্ধতির (Khalji militarism) গোড়াপত্তন করিলেন। বিশাল সেনাবাহিনীর ব্যয়-সংকুলান করা কঠিন হইবে বিবেচনা করিয়া তিনি সৈনিকদের অতি সামান্য বেতনেই নিযুক্ত করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্য হইতে আনীত ধনরত্নের প্রাচুর্যের ফলে মুদ্রার মূল্য হ্রাস পাওয়ায়

*"No Hindu could hold up his head, and in his house no sign of gold or silver or any superfluity was to be seen." Vide, *The Oxford History of India*, Smith, p. 234.

† Vide Moreland : *Agrarian System of Moslem India*, p. 32 fn. "Moreland adds that the Hindu refers to the upper classes and not the peasants, but this interpretation is at least doubtful." Vide, *The Delhi Sultanate*, Bharatiya Vidyabhaban, p. 24.

জিনিসপত্রের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কিন্তু সৈনিকগণ অল্প বেতনেই যাহাতে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতে পারে সেজন্য তিনি দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, যথা, চাউল, আটা, চিনি, তেল, কাপড় প্রভৃতির দাম বাঁধিয়া দিলেন। ইহাতে সৈনিক ও অপরাপর বেতনভোগী ব্যক্তি মাত্রেরই সুবিধা হইল বটে, কিন্তু কৃষকদের দুর্গতির সীমা রহিল না। নিয়ন্ত্রিত মূল্যের* অধিক কেহ লইতে সাহস পাইত না। সুলতানের ভয়ে রাজকর্মচারিগণও সততা রক্ষা করিয়া চলিতেন। ফলে, মূল্য নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা কার্যকরী হইয়াছিল।

জিনিসপত্রের মূল্য নিয়ন্ত্রণ

পঞ্চমতঃ, রাজস্ব উৎপন্ন ফসলের দ্বারা গ্রহণ করা হইত। রাজস্ব হিসাবে গৃহীত এই ফসল কোন আকস্মিক প্রয়োজনে ব্যয় করিবার উদ্দেশ্যে সরকারী গুদামে মজুত রাখা হইত। সরকার ভিন্ন অপর কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির পক্ষে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ফসল মজুত রাখা নিষিদ্ধ ছিল।

উৎপন্ন ফসলে রাজস্ব দান: সরকারী গুদামে ফসল মজুত রাখিবার ব্যবস্থা

ষষ্ঠতঃ, ওজনে কম দিয়া ব্যবসায়িগণ যাহাতে কাহাকেও ঠকাইতে না পারে সেজন্য নিয়ম করা হইয়াছিল যে, বিক্রেতা ওজনে যে পরিমাণ জিনিস কম দিবে ঠিক সেই পরিমাণ মাংস তাহার শরীর হইতে কাটিয়া লওয়া হইবে, ফলে কেহই ওজনে কম দিতে সাহস পাইত না।

ব্যবসায়ীদের উপর কড়া নজর

---

* Wheat	7½	Jital	per	maund
Barley	4	,,	,,	,,
Paddy	5	,,	,,	,,
Pulse	5	,,	,,	,,
Sugar	1⅓	,,	,,	seer
Gur	1⅓	,,	,,	3 seers
Butter	1	,,	,,	3 seers
Salt	5	,,	,,	2½ maunds
Oil sesamum	1	,,	,,	2⅓ seers
Mash	5	,,	,,	maund
Moth	3	,,	,,	,,

1 Jital = $\frac{1}{64}$th of a silver rupee, *i.e.*, 1⅓ farthing more or less. Vide. *History of Mediaeval India*, Ishwari Prasad p. 248.

সামগ্রী মজুত রাখা নিষিদ্ধ

সপ্তমতঃ, ব্যবসায়ী মাত্রকেই সরকারের নিকট নাম রেজেস্ট্রী করিতে হইত। ভবিষ্যতে বেশী মুনাফার লোভে কাহারো কোন জিনিস মজুত রাখা নিষিদ্ধ ছিল।

সমালোচনা (Criticism) : আলা-উদ্দিনের শাসন-সংস্কার, তাঁহার সামরিক সংগঠন প্রভৃতির ফলে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হইল।

আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা—বহিরাগত শত্রু হইতে দেশ রক্ষা

বহিরাগত মোঙ্গল শত্রুর আক্রমণও প্রতিহত হইল এবং সর্বোপরি বিদ্রোহী রাজগণ ও অভিজাত শ্রেণী সুলতানের আধিপত্য সম্পূর্ণভাবে মানিয়া চলিতে লাগিলেন। জনসাধারণের জীবনযাত্রা সহজ হইল, কারণ একমাত্র কৃষক শ্রেণী ভিন্ন অপরাপর সকলের পক্ষে মূল্য নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা অত্যন্ত সুবিধাজনক হইয়াছিল। ধান, গম প্রভৃতি খাদ্যশস্যের মূল্য অতি অল্প ছিল বলিয়া কৃষকদের দুর্দশার অন্ত ছিল না।

আলা-উদ্দিন আমলা শ্রেণীর মধ্যে যে ভীতির সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহার ফলে শাসনকার্যে অবহেলা করিতে কেহ সাহসী হইত না। সুলতানের আদেশ অমান্য করার শাস্তি যেমন ছিল কঠোর তেমনি ছিল নির্মম। বলপূর্বক শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার পক্ষে উপরোক্ত ব্যবস্থা কার্যকরী হইলেও প্রজা ও রাজকর্মচারিবর্গের স্বাভাবিক আনুগত্যের উপর সুলতানের শক্তি নির্ভর করিত না বলিয়াই আলা-উদ্দিনের রাজত্বের শেষভাগে তাঁহার শাসনব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়িতে থাকে। মালিক কাফুর সেই সুযোগে শাসনক্ষমতা হস্তগত করিয়া আলা-উদ্দিনকে হাতের পুতুলে পরিণত করিতে সমর্থ হন।

স্বৈরাচারী একক অধিনায়কত্ব : রাজকর্মচারী বা প্রজার স্বাভাবিক আনুগত্যের অভাব

হিন্দুরাজগণের প্রতি আলা-উদ্দিনের স্বৈরাচারী ব্যবহার, তাঁহাদের সর্বপ্রকার স্বাধীনতা হরণ স্বভাবতই সুলতানের প্রতি তাঁহাদের স্বাভাবিক আনুগত্যের পথ বন্ধ করিয়াছিল। অনুগত রাজগণের প্রতি সম্রাটসুলভ উদারতা আলা-উদ্দিন প্রদর্শন করেন নাই, ফলে হিন্দুরাজগণ দিল্লীর অধীনতাপাশ ছিন্ন করিবার সুযোগের অপেক্ষায় থাকিতেন। হিন্দু জনসাধারণের উপর অসহনীয় করভার স্থাপন করিয়া এবং তাহাদিগকে দরিদ্র করিয়া আলা-উদ্দিন নিজ সাম্রাজ্যের

হিন্দুরাজগণ ও হিন্দু প্রজাবর্গের বিদ্বেষ

দুর্বলতা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। লাঞ্ছিত হিন্দুগণ প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করিবার সুযোগ না পাইয়া অন্তরে অন্তরে সুলতানের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষভাব পোষণ করিত। প্রজার স্বাভাবিক আনুগত্য এইভাবে বিনষ্ট হওয়ায় আলা-উদ্দিনের শাসনের মূলভিত্তি যে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল বলা বাহুল্য। তাঁহার রাজত্বকালের শেষদিকে গুজরাট, চিতোর, দেবগিরি প্রভৃতি দিল্লীর অধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়া স্বাধীন হইয়া গিয়াছিল।

নব-মুসলমানদের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার, আমীর ও মালিক তথা পদস্থ রাজকর্মচারিবৃন্দের প্রতি সন্দিগ্ধ মনোভাব এবং তাঁহাদের অবাধ জীবনযাত্রার অধিকারনাশ আলা-উদ্দিনের বিরুদ্ধে এক গভীর বিদ্বেষের সৃষ্টি করিয়াছিল। রাজকর্মচারিগণ যাহাতে সম্পূর্ণভাবে কর্তৃত্বাধীনে থাকেন সেই কারণে আলা-উদ্দিন মুসলমান সমাজের নিম্ন পর্যায় হইতে বহু ব্যক্তিকে উচ্চ রাজকর্মচারিপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতে তিনি অখণ্ড আনুগত্য লাভ করিলেও তাঁহার অবর্তমানে শাসন পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিবার মতো ব্যক্তিত্ব সৃষ্টির পথ বন্ধ হইয়াছিল। আপাতদৃষ্টিতে আলা-উদ্দিনের শাসন সাফল্যলাভ করিলেও এই সাফল্যের পশ্চাতে কতকগুলি দুর্বলতা লুক্কায়িত ছিল এবং তাঁহার শেষ জীবনে এগুলি প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সংস্কারের কোন চিহ্নই আর ছিল না।

নব-মুসলমান ও রাজকর্মচারীদের প্রতি কঠোরতা

আলা-উদ্দিনের সাহিত্য, শিল্প ও স্থাপত্যানুরাগ (Ala-ud-din's patronage of literature, art and architecture) : আলা-উদ্দিন স্বয়ং নিরক্ষর ছিলেন বটে, কিন্তু বিদ্যা ও বিদ্বানের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহার আমলে আমীর খসরু ও হাসানের ন্যায় কবি ও বিদ্বান ব্যক্তির উদ্ভব হইয়াছিল। খসরু ও হাসান আলা-উদ্দিনের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন। সুলতান পদলাভের পর আলা-উদ্দিন ফার্সী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন।

বিদ্যা ও বিদ্বানের পৃষ্ঠপোষকতা

আলা-উদ্দিন শিল্পকলা এবং স্থাপত্যেরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার আদেশে বহুসংখ্যক দুর্গ নির্মিত হইয়াছিল। এগুলির মধ্যে আলাই দুর্গটি নির্মাণ কৌশলের দিক দিয়া উল্লেখযোগ্য। তাঁহার আদেশে কুতব মসজিদটি

শিল্পকলা ও স্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষকতা

আরও বড় করিয়া নির্মাণ শুরু হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার রাজত্বকালে উহা সম্পূর্ণ হয় নাই। তিনি একটি নূতন মিনার নির্মাণ শুরু করাইয়াছিলেন। এই মিনারটির নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হইলে ইহা কুতব মিনারের প্রায় দ্বিগুণ হইত বলিয়া অনুমান করা হয়। কিন্তু এই মিনারটিও অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে।

আলা-উদ্দিনের শেষ জীবন (Last days of Ala-ud-din Khalji) : ভাগ্যদেবী চঞ্চলা। আলা-উদ্দিনের ভাগ্যও চিরদিন সমান রহিল না। শেষ বয়সে তাঁহার স্বাস্থ্য ও মন ভাঙিয়া পড়িল। তাঁহার বিচারবুদ্ধি ও রাজনৈতিক জ্ঞান লোপ পাইল। সুযোগ বুঝিয়া মালিক কাফুর আলা-উদ্দিনের মন তাঁহার পত্নী ও পুত্রদের বিরুদ্ধে বিষাইয়া তুলিলেন। এইভাবে কাফুর শাসনকার্যের সম্পূর্ণ ক্ষমতা নিজ হস্তগত করিলেন। বৃদ্ধ সুলতান আলা-উদ্দিন খল্‌জী মালিক কাফুরের হাতে ক্রীড়নকস্বরূপ হইলেন। পিতৃব্য জালাল-উদ্দিনের নৃশংস হত্যার শাস্তিস্বরূপই যেন আলা-উদ্দিন বৃদ্ধ বয়সে দৈহিক এবং মানসিক যাতনায় ভুগিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন (১৩১৬)।

দৈহিক ও মানসিক যাতনা : মালিক কাফুরের প্রাধান্য

মৃত্যু (১৩১৬)

আলা-উদ্দিনের কৃতিত্ব বিচার (Estimate of Ala-ud-din) : আলা-উদ্দিনের কৃতিত্ব বিচারে মধ্যযুগের মুসলমান ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। আফ্রিকা হইতে আগত পর্যটক ইব্‌ন্ বতুতা আলা-উদ্দিনকে দিল্লীর শ্রেষ্ঠ সুলতানগণের অন্যতম বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ডক্টর স্মিথ্ ইব্‌ন্ বতুতার এই উক্তি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এবং প্রকৃত ইতিহাস দ্বারা সমর্থিত নহে বলিয়া মনে করেন। আলা-উদ্দিনের সুলতানপদ লাভের ইতিহাস বা তাঁহার রাজত্বকালের কার্যকলাপ দ্বারা ইব্‌ন্ বতুতার এই 'অদ্ভুত এবং আশ্চর্যজনক' উক্তি সমর্থিত হয় না।* ডক্টর স্মিথ্ বলেন যে,

ইব্‌ন্ বতুতার

ডক্টর স্মিথের মন্তব্য

***"The African traveller Ibn Batuta in the fourteenth century expressed the opinion that Ala-ud-din deserved to be considered *one of the best Sultans.* That somewhat surprising verdict is not justified either by the manner in which Ala-ud-din attained power or by history of his acts as Sultan." *The Oxford History of India*, Smith, pp. 231-32.**

জিয়া-উদ্দিন বরণী আলা-উদ্দিনের রাজত্বকাল সম্পর্কে একটি ধারাবাহিক বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন। সেই বর্ণনায় বরণী আলা-উদ্দিনকে নিষ্ঠুর, চক্রান্তকারী ও পাপাচারী সুলতান বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বরণীর মতে আলা-উদ্দিন মিশরের ফ্যারাওগণের অপেক্ষাও অধিকতর নিষ্ঠুর এবং নির্দোষ ব্যক্তির রক্তপাতে অধিকতর সিদ্ধহস্ত ছিলেন।*

জিয়া-উদ্দিন বরণীর বর্ণনা

ইব্‌ন্ বতুতা ও জিয়া-উদ্দিন বরণীর মত পরস্পর-বিরোধী বটে, কিন্তু নিরপেক্ষ বিচারে উভয়ের মত-ই আংশিকভাবে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়।

উভয় মতের আংশিক সত্যতা

আলা-উদ্দিন ছিলেন একজন স্বৈরাচারী শাসক, তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছিল সীমাহীন। নিজ উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিতে তিনি ন্যায়-অন্যায়ের ধার ধারিতেন না। নিজ পিতৃব্য জালাল-উদ্দিনকে নৃশংসভাবে হত্যা করিয়া সিংহাসন দখল করিতে তিনি কোন দ্বিধা-বোধ করেন নাই। বহুসংখ্যক নর-নারী, শিশু-বৃদ্ধকে হত্যা করিয়া নিজ সিংহাসনাধিকার নিরঙ্কুশ করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। নিষ্ঠুরতা, অকৃতজ্ঞতা, সন্দিগ্ধ মনোভাব, পরের গুণ গ্রহণ না করা প্রভৃতি ছিল তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। তিনি ছিলেন যেমন ক্ষণক্রোধী ও উদ্ধত তেমনি ছিলেন অত্যাচারী ও রক্তপিপাসু। তাঁহারই আদেশে একদিনে ত্রিশ হাজার নব-মুসলমানের প্রাণনাশ করা হইয়াছিল।

আলা-উদ্দিনের নিষ্ঠুরতা

অভিজাত শ্রেণীর অনেকেরই সাহায্য-সহায়তায় আলা-উদ্দিন সিংহাসন লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সিংহাসন আরোহণের পর তিনি সেই সকল ব্যক্তির ধনসম্পত্তি অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। কৃতজ্ঞতার লেশও তাঁহার অন্তরে ছিল না। জাফর খাঁ মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করিয়া আলা-উদ্দিনের

তাঁহার অকৃতজ্ঞতা

*** "Zia-ud-din Barani, the excellent historian who gives the fullest account of his reign, justly dwells on his *crafty cruelty* and his addiction to disgusting vice. *He shed*, we are told, *more innocent blood than ever Pharaoh was guilty of*, and he *did* not *escape the retribution for the blood of his patron*." Ibid, p. 232.**

সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা বিধান করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই জাফর খাঁ মোঙ্গলদের সহিত যুদ্ধে যখন প্রাণ হারাইলেন তখন আলা-উদ্দিন দুঃখিত না হইয়া বরং আনন্দিতই হইয়াছিলেন। প্রতিভাবান ব্যক্তিদের তিনি সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন। জাফর খাঁর দক্ষতায় তিনি স্বভাবতই ভীত হইয়া উঠিয়াছিলেন। বরণী আলা-উদ্দিনকে নিরক্ষর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু ফেরিস্তার বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, সুলতান হওয়ার পর আলাউদ্দিন ফার্সী গ্রন্থাদি পাঠ করিতে শিখিয়াছিলেন।

অত্যাচারী শাসক

বিত্তশালী হিন্দু ও মুসলমান অভিজাত সম্প্রদায়ের হাতে যাহাতে কোন প্রকার ধন-দৌলত সঞ্চিত না হইতে পারে তিনি সেই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। দোয়াব অঞ্চলের হিন্দু কৃষকদের উৎপন্ন ফসলের অর্ধাংশ রাজস্ব হিসাবে আদায় করিয়া তিনি তাহাদের অবস্থা শোচনীয় করিয়া তুলিয়াছিলেন। বিশাল সামরিক বাহিনীর ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য তিনি সকল জিনিসপত্রের মূল্য এমনভাবে বাঁধিয়া দিয়াছিলেন যে, কৃষক ও অপরাপর উৎপাদনকারীদের দুর্দশার সীমা ছিল না।

জিয়া-উদ্দিন বরণীর মন্তব্যের সত্যতা

উপরোক্ত যুক্তির উপর ভিত্তি করিয়া জিয়া-উদ্দিন বরণী আলা-উদ্দিনকে নিষ্ঠুর, পাপাচারী, অকৃতজ্ঞ এবং অত্যাচারী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। জিয়া-উদ্দিন বরণীর মন্তব্য যে সম্পূর্ণ মিথ্যা নহে, বলা বাহুল্য।

চরিত্র ও শাসনের বৈশিষ্ট্য

তথাপি আলা-উদ্দিনের চরিত্র ও শাসনের অপর একটি দিকও ছিল। তিনি একজন অসীম সাহসী বীর যোদ্ধা ছিলেন, ইহা অনস্বীকার্য। তাঁহার প্রতিটি সামরিক অভিযানই সফল হইয়াছিল। উত্তর-ভারতে গুজরাট, মালব, চিতোর, রণথম্ভোর, উজ্জয়িনী, মাণ্ডু, ধার, চান্দেরী প্রভৃতি রাজ্য তিনি জয় করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যে দেবগিরি, বরঙ্গল, দ্বারসমুদ্র, মাদুরা প্রভৃতি রাজ্য তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিল। গিয়াস-উদ্দিন বলবন যে মুসলমান সামরিক পদ্ধতির

সুলতানির রাজত্বের নিরাপত্তা বিধান

গোড়াপত্তন করিয়া গিয়াছিলেন আলা-উদ্দিন উহার চরম উন্নতি সাধন করিয়া ভারতবর্ষে মুসলমান শাসনের নিরাপত্তা বিধান করিয়াছিলেন। ধর্ম ও রাজনীতির পার্থক্য মুসলমান সুলতানদের মধ্যে সর্বপ্রথমে আলা-উদ্দিনই উপলব্ধি করিতে সক্ষম

হইয়াছিলেন। শাসন ব্যাপারে তিনি কাজী, উলেমা প্রভৃতির নির্দেশ মানিতেন না। নিজে গোঁড়া মুসলমান হইলেও তিনি তাঁহার রাজনৈতিক দৃষ্টি ধর্মের দ্বারা আচ্ছন্ন হইতে দেন নাই। তাঁহার শাসনব্যবস্থার মূল নীতি ছিল সুদৃঢ় ও সুদক্ষ শাসন স্থাপন করা। আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন এবং মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করিয়া তিনি সুলতানি শাসনের নিরাপত্তা বিধান করিয়াছিলেন। অভিজাত সম্প্রদায় যাহাতে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইতে না পারে সেইজন্য তিনি তাহাদের ধন-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়াছিলেন এবং মদ্যপান, অবাধ মেলামেশা, বিনা অনুমতিতে বিবাহ প্রভৃতি নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। গুপ্তচর নিয়োগ করিয়া তিনি দেশের বিভিন্ন অংশের যাবতীয় সংবাদ সংগ্রহের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং প্রয়োজনবোধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেন।

ধর্ম-নিরপেক্ষ শাসন

শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনের ব্যবস্থা

আলা-উদ্দিনের রাজত্বকালে আমীর খসরু, হাসান প্রভৃতির ন্যায় কবি ও সাহিত্যিকের উদ্ভব হইয়াছিল। আলা-উদ্দিন স্বয়ং সাহিত্য ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। তিনি কুতব মসজিদটিকে আরও বড় করিবার এবং কুতব-মিনারের দ্বিগুণ আকারের আর একটি মিনার নির্মাণের কাজ শুরু করাইয়াছিলেন।

সাহিত্য ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা

আলা-উদ্দিনের চরিত্রের এই দিকটা দেখিলে এবং তাঁহার সাফল্যের নিরপেক্ষ বিচার করিলে তাঁহাকে দিল্লীর শ্রেষ্ঠ সুলতানদের অন্যতম বলিয়া অভিহিত করা অনুচিত হইবে না। মানুষ হিসাবে আলা-উদ্দিন সংকীর্ণতা ও নীচতার পরিচয় দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বিজেতা ও শাসক হিসাবে তাঁহার স্থান যে উচ্চে ছিল এবিষয়ে সন্দেহ নাই। সমরকুশল নৃপতি, সামরিক সংগঠক, দিগ্বিজয়ী বীর ও সুদক্ষ শাসক হিসাবে আলা-উদ্দিন নিজ পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। সুতরাং নিরপেক্ষ বিচারে একথা স্বীকার্য যে, জিয়া-উদ্দিন বরণী ও ইবন্ বতুতার পরস্পর-বিরোধী মন্তব্য একটি অপরটির পরিপূরক মাত্র। উভয় মন্তব্য আলা-উদ্দিনের উপর সমভাবে প্রযোজ্য।

মানুষ হিসাবে হীন হইলেও শাসক, সামরিক সংগঠক ও বিজেতা হিসাবে দক্ষতা

বরণী ও বতুতার মন্তব্য পরস্পর পরিপূরক

আলা-উদ্দিনের পরবর্তী খল্‌জী শাসন (Khalji rule after Ala-ud-din) ঃ আলা-উদ্দিনের বৃদ্ধ বয়সের সুযোগ লইয়া মালিক কাফুর শাসন-ক্ষমতা হস্তগত করিয়াছিলেন। এমন কি, তিনি খিজির খাঁর বিরুদ্ধে আলা-উদ্দিনের মন বিষাইয়া দিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শিহাব-উদ্দিন উমরকে উত্তরাধিকার দিয়া যাইতে প্ররোচিত করিয়াছিলেন। আলা-উদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁহার নাবালক পুত্র শিহাব-উদ্দিনকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া মালিক কাফুর যাবতীয় শাসনক্ষমতা হস্তগত করিলেন। খিজির খাঁ ও সাদি খাঁ—অর্থাৎ আলা-উদ্দিনের প্রথম দুই পুত্রের চক্ষু উৎপাটন করিয়া তাঁহাদিগকে বন্দী করিয়া রাখা হইল এবং আলা-উদ্দিনের প্রথমা পত্নীকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হইল। আলা-উদ্দিনের তৃতীয় পুত্র মুবারক খাঁকেও বন্দী করা হইল। তাঁহারও চক্ষু উৎপাটন করিবার ইচ্ছা কাফুরের ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে কাফুরের ঔদ্ধত্য এতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, খল্‌জী সুলতানদের অনুরক্ত অভিজাত ও দাসগণ তাঁহাকে হত্যা করিয়া আলা-উদ্দিনের তৃতীয় পুত্র মুবারককে সিংহাসনে স্থাপন করিল।

কাফুরের অত্যাচারী শাসন

মুবারক প্রথমে কনিষ্ঠ ভ্রাতা শিহাব-উদ্দিন উমর-এর প্রতিনিধিরূপে শাসন শুরু করিয়া সামান্য কয়েক দিন পরেই তাঁহার চক্ষু দুইটি উৎপাটন করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন এবং স্বয়ং কুতব-উদ্দিন মুবারক শাহ্‌ উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসন অধিকার করিলেন।

মুবারক শাহ্‌-এর সিংহাসন লাভ

কুতব-উদ্দিন মুবারক শাহ্‌, ১৩১৬-১৩২০ (Qutb-ud-din Mubarak Shah) ঃ সুলতান পদ গ্রহণ করিয়া কুতব-উদ্দিন মুবারক প্রথমে শাসন ক্ষমতার পরিচয় দিলেন বটে, এবং আলা-উদ্দিনের রাজত্বকালে যে সকল কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল তাহা নাকচ করিয়া দিয়া তিনি সাধারণ্যে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধার উদ্রেক করিলেন। তিনি রাজনৈতিক কারণে বন্দী মাত্রকেই মুক্তি দিলেন, আমীর ও অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে যাহাদের ভূসম্পত্তি আলা-উদ্দিন বাজেয়াপ্ত করিয়াছিলেন তাহাও ফিরাইয়া দিলেন। কিন্তু ইহাতে কৃতজ্ঞতার স্থলে অকৃতজ্ঞতা ও অশ্রদ্ধার সৃষ্টি হইল। সুলতানের উদারতাকে দুর্বলতা মনে করিয়া সর্বত্র সুলতানের আদেশ-অমান্য শুরু হইল।

সাধারণ্যে শ্রদ্ধার সৃষ্টি

মুবারক শাহের অকর্মণ্যতা

সুলতান মুবারক শাহ্‌ও ছিলেন অলস ও অকর্মণ্য। তিনি আমোদ-প্রমোদ ও মদ্যপানে রত হইলেন। তিনি খুস্‌রভ খাঁ নামে এক নীচ বংশসম্ভূত ব্যক্তির অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহাকে প্রধান উজির পদে নিযুক্ত করিলেন।

মুবারক শাহ্‌-এর আমলে গুজরাট ও দেবগিরিতে বিদ্রোহ দেখা দিলে, আইন-উল-মুল্‌ক গুজরাটের বিদ্রোহ এবং সুলতান স্বয়ং দেবগিরির বিদ্রোহ দমন করিলেন। সৌভাগ্যবশত মুবারক শাহের আমলে কোন মোঙ্গল আক্রমণ ঘটে নাই, নতুবা ভারতবাসীর দুর্দশার অন্ত থাকিত না। যাহা হউক, দেবগিরি অভিযানের সাফল্যে মুবারকের ঔদ্ধত্য আরও বৃদ্ধি পাইল। তিনি ইসলাম জগতের প্রধান নেতা খলিফার আনুগত্য স্বীকার করা দূরের কথা, স্বয়ং খলিফার 'অল ওয়াসিক্‌ বিল্লাহ্‌' উপাধি ধারণ করিলেন। কিন্তু অধিক কাল রাজত্ব করা তাঁহার ভাগ্যে ছিল না। ১৩২০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে খুস্‌রভ্‌-এর প্ররোচনায় মুবারক শাহ্‌কে হত্যা করা হইল। এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে খল্‌জী বংশের রাজত্বের অবসান ঘটিল।

গুজরাট ও দেবগিরির বিদ্রোহ দমন

খুস্‌রভ্‌ (Khusrav): মুবারক শাহের হত্যার পর খুস্‌রভ্‌ নাসির-উদ্দিন খুস্‌রভ্‌ শাহ্‌ উপাধি ধারণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার অত্যাচারী শাসন দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। পাঞ্জাবের দীপালপুরের শাসনকর্তা গাজী মালিক অপরাপর অভিজাতবর্গের সহায়তা লাভ করিয়া খুস্‌রভ্‌ শাহ্‌কে দিল্লীর উপকণ্ঠে এক যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করিলেন। আলা-উদ্দিনের কোন বংশধর না থাকায় অভিজাতগণের অনুরোধে গাজী মালিক গিয়াস-উদ্দিন তুঘ্‌লক উপাধি ধারণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন (১৩২০)।

চতুর্থ অধ্যায়

তুঘ্‌লক বংশ

(The Tughluqs)

গিয়াস-উদ্দিন তুঘ্‌লক, ১৩২০-২৫ (Ghiyas-ud-din-Tughluq) ঃ দাস বংশের অবসানের পর জালাল-উদ্দিন যেমন দিল্লীর সুলতানি শাসন রক্ষাকল্পে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন সেইরূপ খল্‌জী বংশের অবসানে সুলতানি শাসনের এক সঙ্কট মুহূর্তে গিয়াস-উদ্দিন তুঘ্‌লক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। জালাল-উদ্দিনের ন্যায় তিনিও বৃদ্ধ বয়সে সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু গিয়াস-উদ্দিন বৃদ্ধ হইলেও তাঁহার সাহস ও মানসিক বলের অভাব ছিল না। অল্প কয়েক বৎসর রাজত্ব করিয়া তিনি আলা-উদ্দিন খল্‌জীর আইন-কানুনের মধ্যে যেগুলি দেশের প্রকৃত মঙ্গলজনক ছিল সেগুলি পুনরায় কার্যকরী করিয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন জাতিতে তুর্কী। স্বভাবতই অসংখ্য তুর্কী মালিক, আমীর-ওমরাহ্‌-গণের আনুগত্য লাভ করিতে তাঁহার বেগ পাইতে হইল না। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সাম্রাজ্যের সর্বত্র তাঁহার আধিপত্য স্বীকৃত হইল।

বৃদ্ধবয়সে গিয়াস-উদ্দিনের সিংহাসন লাভ

খল্‌জী বংশের প্রতি আনুগত্যপূর্ণভাবে যে সকল কর্মচারী কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছিলেন গিয়াস-উদ্দিন তাঁহাদিগকে উচ্চ রাজকর্মচারিপদে নিযুক্ত করিলেন এবং তাঁহাদিগকে জায়গীর হিসাবে জমি দান করিলেন। আত্মীয়স্বজনদের প্রতিও তিনি উদার ব্যবহার করিতে ত্রুটি করিলেন না। নিজ পুত্র ফকর্-উদ্দিন মোহম্মদ জুনা খাঁকে তিনি 'উলুঘ খাঁ' উপাধিতে ভূষিত করিলেন। কাহারও ন্যায্য দাবি তিনি অস্বীকার করিলেন না। খুস্রু শাহ্‌-এর রাজত্বকালে অথবা আলা-উদ্দিনের কঠোর আইনের প্রয়োগের ফলে যে-সকল ব্যক্তি সম্পত্তি হারাইয়াছিল গিয়াস-উদ্দিন তাহাদিগের নিজস্ব সম্পত্তি ফিরাইয়া দিলেন।

তাঁহার উদারতা

কৃষির উন্নতিকল্পে তিনি সেচের ব্যবস্থা করিলেন। রাজ্যের স্থানে স্থানে দুর্গ নির্মাণ করাইয়া প্রয়োজনবোধে কৃষকগণ যাহাতে দস্যুদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে সেই ব্যবস্থা করিলেন; রাস্তা-ঘাট দস্যু-তস্করের উপদ্রব হইতে নিরাপদ করিলেন। বড় বড় উদ্যান তিনি তৈয়ার করাইলেন। উৎপন্ন ফসলের দশমাংশ রাজস্ব হিসাবে গ্রহণ করা হইত। কৃষকদের অবস্থার উন্নতি-ই হইল রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধির একমাত্র উপায়। বলপূর্বক অধিক রাজস্ব আদায় করিতে পারিলেও তাহাতে সরকারের শক্তি বৃদ্ধি না পাইয়া বরঞ্চ হ্রাস প্রাপ্ত হয়, এই কথা প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও রাজকর্মচারিগণকে তিনি স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন। হিন্দুদের হাতে যাহাতে অধিক অর্থ সঞ্চিত হইতে না পারে সেই ব্যবস্থা তিনি করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তিনি আলা-উদ্দিনের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছিলেন, বলা বাহুল্য।

কৃষি, রাস্তাঘাট প্রভৃতির উন্নতি বিধান; দস্যু-তস্করের উপদ্রব নিবারণ

সরকারী ডাক চলাচলের অতি উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা তিনি করিয়াছিলেন। ঘোড়ার পিঠে করিয়া এবং লোক মারফৎ ডাক একস্থান হইতে অপর স্থানে প্রেরণের ব্যবস্থা ছিল।

ডাক চলাচলের ব্যবস্থা

গিয়াস-উদ্দিন ধর্মভীরু নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন। ধর্মের অনুশাসন তিনি বর্ণে বর্ণে পালন করিয়া চলিতেন। তিনি নিজে মদ্য স্পর্শ করিতেন না এবং তাঁহার সাম্রাজ্যে মুসলমানদের মদ্যপান ও মদ প্রস্তুত করাও নিষিদ্ধ ছিল। গিয়াস-উদ্দিন ছিলেন আড়ম্বরহীন, সদাশয় ও সরলপ্রাণ ব্যক্তি, সুলতান পদের মর্যাদার অহঙ্কার তাঁহার ছিল না।

তাঁহার চরিত্র

সিংহাসন আরোহণের অল্পকালের মধ্যেই গিয়াস-উদ্দিন কাকতীয় বংশের রাজা দ্বিতীয় প্রতাপরুদ্র দেবের বিরুদ্ধে পুত্র জুনা খাঁকে এক সামরিক অভিযানে প্রেরণ করিয়াছিলেন। মুবারক শাহ্-এর রাজত্বের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া প্রতাপরুদ্র দেব বরঙ্গলের স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। প্রথম অভিযান সফল না হইলেও দ্বিতীয় অভিযানে জুনা খাঁ প্রতাপরুদ্র দেবকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ফলে, বরঙ্গল দিল্লীর সুলতানের আনুগত্যাধীন হইয়াছিল। এই সময় হইতেই কাকতীয় বংশের প্রতিপত্তি ও মর্যাদা চিরতরে লোপ পায়।

বরঙ্গল পুনরধিকার

জুনা খাঁ যখন দক্ষিণাত্যে কাকতীয়রাজ প্রতাপরুদ্র দেবকে দমন করিতে ব্যস্ত তখন মোঙ্গলগণ ভারতবর্ষ আক্রমণ করে। মোঙ্গলবাহিনী অবশ্য অতি শোচনীয়ভাবে পরাজিত ও বিতাড়িত হয়। প্রায় এই সময়েই বাংলাদেশের সিংহাসন লইয়া এক আত্মকলহের সৃষ্টি হইয়াছিল। শামস্‌-উদ্দিন ফিরুজের পুত্র শিহাব-উদ্দিন, নাসির-উদ্দিন ও বাহাদুর-এর মধ্যে কলহ দেখা দিলে শিহাব-উদ্দিন ও নাসির-উদ্দিন গিয়াস-উদ্দিন তুঘ্‌লকের সাহায্য প্রার্থনা করেন। বাংলাদেশ দিল্লীর সুলতানের আধিপত্য নামেমাত্রই স্বীকার করিত, প্রকৃতক্ষেত্রে বাংলার শাসনকর্তারা স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করিতেন। গিয়াস-উদ্দিন তুঘলক সুযোগ বুঝিয়া বাংলাদেশে দিল্লীর প্রাধান্য পুনঃস্থাপনের উদ্দেশ্যে পুত্র জুনা খাঁকে দিল্লীতে প্রতিনিধি হিসাবে রাখিয়া সসৈন্যে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। বাহাদুর শাহ্‌ পরাজিত হইলেন, নাসির-উদ্দিনকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হইল। ফলে, বাংলাদেশ দিল্লীর আধিপত্যাধীনে আসিল।

বাংলায় সুলতানি আধিপত্য পুনঃস্থাপন

বাংলাদেশ হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে গিয়াস-উদ্দিন তিরহুতের রাজা হরিসিংদেবকে পরাজিত করিয়া সেই রাজ্য দিল্লীর সুলতানের প্রাধান্যাধীনে আনিলেন।

তিরহুত জয়

গিয়াস-উদ্দিন রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলে দিল্লীর ছয় মাইল দূরে আফগানপুর নামক স্থানে পুত্র জুনা খাঁ পিতার সম্বর্ধনার জন্য একটি তোরণ নির্মাণ করান। গিয়াস-উদ্দিন ঐ তোরণের নিকটবর্তী হইলে উহা ধ্বসিয়া পড়িয়া তাঁহার মৃত্যু ঘটে। ইব্‌ন্‌ বতুতা, আবুল-ফজ্‌ল, নিজাম-উদ্দিন আহ্‌ম্মদ, বদাউনী প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ এই তোরণ ধ্বসিয়া পড়িবার পশ্চাতে জুনা খাঁর ষড়যন্ত্র ছিল বলিয়া মনে করেন। গিয়াস-উদ্দিনের এইভাবে মৃত্যু ঘটিলে (১৩২৫) জুনা খাঁ 'মোহম্মদ-বিন্‌-তুঘ্‌লক' উপাধি গ্রহণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন।

গিয়াস-উদ্দিনের মৃত্যু (১৩২৫)

মোহম্মদ-বিন্‌-তুঘ্‌লক, ১৩২৫—৬১ (Muhammad-bin-Tughluq): আদর্শবাদী মোহম্মদ-বিন্‌-তুঘ্‌লক ভারতের মধ্যযুগীয় ইতিহাসের

অন্যতম উল্লেখযোগ্য সুলতান ছিলেন, ইহা অনস্বীকার্য। তাঁহার চরিত্র সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে যত মতানৈক্য রহিয়াছে, অপর কোন সুলতানের চরিত্র সম্পর্কে এতটা অনৈক্য আছে কিনা সন্দেহ। স্টেন্‌লি লেনপুল (Stanley Lane-Poole) তাঁহাকে মধ্যযুগীয় ভারত-ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সুলতানদের অন্যতম বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ঈশ্বরী প্রসাদ (Ishwari Prasad)-এর মতে তিনি ছিলেন মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ সুলতান।* জিয়া-উদ্দিন বরণী তাঁহাকে প্রকৃতির এক অতি বিস্ময়কর সৃষ্টি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আফ্রিকা হইতে আগত পর্যটক ইব্‌ন্ বতুতা মোহম্মদ তুঘলকের রাজত্বকালে কয়েক বৎসর ভারতবর্ষে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত পরিচয় হইতে মোহম্মদ তুঘ্‌লকের চরিত্রের বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, তিনি একাধারে দয়ার সাগর ও রক্তপিপাসু ছিলেন।† বস্তুত, মোহম্মদ তুঘ্‌লকের চরিত্রে কতকগুলি পরস্পর-বিরোধী বৈশিষ্ট্যের এক অতি অদ্ভুত সংমিশ্রণ দেখা যায়।

তাঁহার চরিত্র

দয়ার সাগর ও রক্ত-পিপাসু

মোহম্মদ তুঘ্‌লক-এর চরিত্রে কতকগুলি অনন্যসাধারণ গুণ পরিলক্ষিত হয়। বিদ্যা, মানসিক উৎকর্ষ, আদর্শ ও প্রতিভার দিক দিয়া বিচার করিলে মধ্যযুগে ভারতীয় নৃপতিদের মধ্যে তাঁহাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে তিনি আলা-উদ্দিন অপেক্ষাও দুঃসাহসী ছিলেন, আদর্শবাদের দিক দিয়া তিনি অস্ট্রিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় যোসেফ্‌কেও হার মানাইয়াছিলেন। তাঁহার বহুমুখী প্রতিভা সমসাময়িকদের বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছিল।

বিদ্যা, মানসিক উৎকর্ষ, আদর্শ ও প্রতিভার বিস্ময়কর সংমিশ্রণ

---

* "Muhammad Tughluq was unquestionably the ablest man among the crowned heads of the Middle Ages." *History of Mediaeval India*, Ishwari Prasad, p. 269.

† "This king is of all men the one who most loves to dispense gifts and to shed blood. His gateway is never free from a beggar whom he has relieved and a corpse which he has slain —*Ibn Batuta*, vide, Lane-Poole, p, 127.

মোহম্মদ তুঘ্‌লক একাধারে দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, কবি ও গণিতশাস্ত্রবিদ্‌ ছিলেন। গ্রীক দর্শন, ধর্মশাস্ত্র, ভেষজ-বিজ্ঞান, তর্কশাস্ত্র, ভাষাতত্ত্ব, আরবী ও ফার্সী ভাষায় তিনি পারদর্শিতা অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার হস্তাক্ষর ছিল অতি চমৎকার। বিভিন্ন রোগের লক্ষণ সম্পর্কে জ্ঞান-লাভের জন্য তিনি রোগীর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত থাকিতেন। দান-দক্ষিণায় তিনি ছিলেন মুক্তহস্ত। বহু লোক তাঁহার দয়া-দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভরশীল ছিল। তিনি মৌলিক প্রতিভা ও কৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার স্মৃতিশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর এবং তাঁহার সংকল্প ছিল অচল ও অটল। তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন ছিল পবিত্র ও নিষ্কলুষ। ব্যক্তি হিসাবে তিনি ছিলেন যেমন উদার তেমনি অনাড়ম্বর। সত্য ও ন্যায়ের প্রতি তাঁহার নিষ্ঠা ছিল অপরিসীম। তিনি ছিলেন অতি নিষ্ঠাবান মুসলমান।

একাধারে দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, ভাষাতাত্ত্বিক, চিকিৎসা-শাস্ত্রবিদ্‌

ব্যক্তিগত জীবন পবিত্র ও নিষ্কলুষ

এইরূপ বহুবিধ গুণের আধার হইয়াও মোহম্মদ তুঘ্‌লক ইংলণ্ডের রাজা এথেলরেড্‌-দি-আনরেডি (Ethelred the Unready or Redeless)-এর ন্যায় অপরের সৎপরামর্শ গ্রহণেও প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভা ও মানসিক উৎকর্ষ সব কিছুই তাঁহার বিচক্ষণতার অভাবে নিষ্ফল হইয়া গিয়াছিল।* নিজ খেয়ালের বশবর্তী হইয়া তিনি চলিয়াছিলেন, ফলে তাঁহার পরিকল্পনা মাত্রেই বিফলতায় পর্যবসিত হইয়াছিল এবং দেশের সর্বত্র অব্যবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল। ঐতিহাসিক এল্‌ফিন্‌স্টোনের মতে মোহম্মদ-বিন্‌-তুঘ্‌লকের অবিমৃষ্যকারিতা তাঁহার প্রতিভাকে সম্পূর্ণভাবে বিনাশ করিয়াছিল। স্বৈরাচারী শক্তির সহিত খেয়ালী মনোবৃত্তির সংমিশ্রণে মোহম্মদ তুঘ্‌লকের কার্যাদি অব্যবস্থিতচিত্তের পরিচায়ক হইয়াছিল। দিল্লী হইতে রাজধানী দৌলতাবাদে স্থানান্তরিত করা,

বিচক্ষণতার অভাব

অব্যবস্থিতচিত্ততার পরিচয়

* "Yet the whole of these splendid talents and accomplishments were given to him in vain; they were accompanied by a perversion of judgement which after every allowance for the intoxication of absolute power, leaves us in doubt whether he was not affected by some degree of insanity." *Elphinstone*, Vide, *Oxford History of India* p. 238.

খোরাসান ও কারাজল (ফেরিস্তার মতে চীন) বিজয়ের পরিকল্পনা, তামার নোটের প্রচলন, দোয়াব অঞ্চলের কৃষকদের উপর করভার স্থাপন প্রভৃতি তাঁহার বিকৃতমস্তিষ্কের পরিচায়ক বলিয়া অনেকে মনে করেন। ইতিহাসে তিনি ডন্ কুইকজোট-এর (Don Quixote) ন্যায় খামখেয়ালী রাজা বলিয়াই পরিচিত। তাঁহার চরিত্রে স্বভাবতই কতকগুলি পরস্পর-বিরোধী গুণের এক অদ্ভুত এবং অভূতপূর্ব সংমিশ্রণ পরিলক্ষিত হয় (*He was a mixture of opposites*)।

কিন্তু ঐতিহাসিক ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন যে, আপাতদৃষ্টিতে মোহম্মদ তুঘ্‌লককে পরস্পর-বিরোধী বৈশিষ্ট্যের প্রতীক বলিয়া মনে হইলেও বস্তুত তিনি সেরূপ ছিলেন না। মোহম্মদ তুঘ্‌লক স্বভাবতই অব্যবস্থিতচিত্ত বা রক্ত-পিপাসু ছিলেন এমন নহে। মধ্যযুগীয় স্বৈরাচারী একক অধিনায়কদের মতো কোন কোন পরিস্থিতিতে ক্রোধের বশবর্তী হইয়া তিনি বর্বরোচিত শাস্তি হয়ত দিয়া থাকিবেন, কিন্তু ইহা তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হিসাবে বর্ণনা করা অনুচিত হইবে বলিয়া ঈশ্বরী প্রসাদ মনে করেন। নর-হত্যায় তাঁহার আনন্দ ছিল, এই কথা সমসাময়িক ইতিহাস আলোচনা করিলে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয় না। তাঁহার কার্যাদির মধ্যে যেটুকু অব্যবস্থিতচিত্ততা লক্ষ্য করা যায় তাহা তাঁহার মস্তিষ্কের অসুস্থতাজনিত মনে করা ভুল হইবে। তাঁহার মূল ত্রুটি ছিল এই যে, তিনি বাস্তব জগতের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া তাঁহার সংস্কার-কার্যাদি সম্পন্ন করেন নাই। বস্তুতপক্ষে, তাঁহার কার্যকলাপের পশ্চাতে সুচিন্তিত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতির পরিচয় পাওয়া যায়।

ঈশ্বরী প্রসাদের মতবাদ

বিফলতাকে সহজ মনে গ্রহণ করিবার মতো মানসিক বল তাঁহার ছিল না, সংস্কারকার্যে প্রয়োজনীয় ধৈর্যও তিনি প্রদর্শন করেন নাই। এই সকল কারণে তাঁহার কার্যাদি বিফলতায় পর্যবসিত হইয়াছিল। "মোহম্মদ-বিন্ তুঘলক সম্পর্কে মূল কথা হইল এই যে, তিনি সহজেই ধৈর্যের সীমা লঙ্ঘন করিতেন। তাঁহার আদর্শবাদী সংস্কার যখন জনসাধারণ আশানুরূপ আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করিল না, তখন ক্রোধের বশবর্তী হইয়া তিনি বহু অযৌক্তিক কার্যাদি করিয়াছেন।" কিন্তু তদানীন্তন দিল্লী সুলতানী সাম্রাজ্যের ন্যায় বিশাল সাম্রাজ্যের সুলতানের

তাঁহার অসাফল্যের কারণ

মহম্মদ বিন্ তুঘলকের
২০০ ৪০০
মাইল
ঘোর
কাবুল
গজনী
পেশোয়ার
কাশ্মীর
লাহোর
নগরকোট
মুলতান
থানেশ্বর
দিল্লী
অযোধ্যা
আগ্রা
আজমীর
কনৌজ
কাশী
গঙ্গা
রণথম্ভোর
গোয়ালিওর
প্রয়াগ
বিহার
কামরূপ
অনহিলবারা
মালব
উজ্জয়িনী
নর্মদা নদ
গিরনার
তাপ্তী নদ
দেবগিরি
মহানদী
উড়িষ্যা
কল্যাণ
বরঙ্গল
গুলবর্গা
তেলিঙ্গনা
আরব
সাগর
গোয়া
দ্বার সমুদ্র
দ্বারসমুদ্র
ম্যাঙ্গালোর
কানানোর
কালিকট
মাদুরা
কুইলন
সিংহল
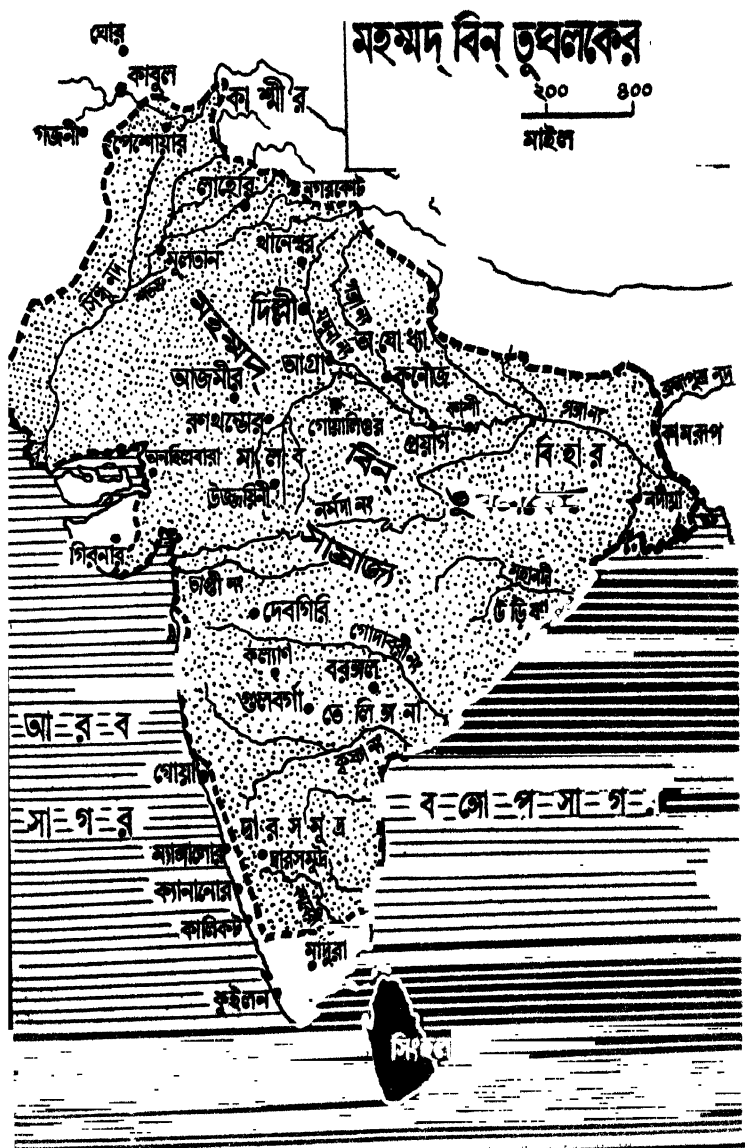
পক্ষে বাস্তব জগতের সহিত সামঞ্জস্য না রাখিয়া চলা বা সংস্কার-কার্যে প্রয়োজনীয় ধৈর্য অবলম্বন না করা বা ক্রোধের বশবর্তী হইয়া নৃশংসতার আশ্রয় গ্রহণ করা কোনভাবেই সমর্থনযোগ্য নহে একথা স্বীকার করিতেই হইবে।*

তাঁহার কার্যাদি (His works) : সিংহাসন আরোহণের পর সর্বপ্রথমেই মোহম্মদ তুঘ্‌লক দোয়াব অঞ্চলের কৃষকদের করভার বাড়াইয়া দিলেন। ফলে, দোয়াব অঞ্চলের কৃষকদের দুর্দশার অন্ত রহিল না। দোয়াব অঞ্চলের সর্বত্র দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। কৃষকগণ কর দিতে না পারায় তাহাদের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইল। বদাউনীর মতে এই করভার বৃদ্ধির মূল কারণ ছিল দোয়াব অঞ্চলের বিত্তশালী কৃষকদের বিদ্রোহী মনোভাব দমন করা এবং আনুষঙ্গিকভাবে রাজকোষ অর্থদ্বারা পূর্ণ করিয়া তোলা।† গার্ডনার ব্রাউনের মতে জিয়া-উদ্দিন বরণীর বর্ণনায় দোয়াব অঞ্চলের কৃষকদের উপর অত্যাচারের যে বীভৎস রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা কতকটা অতিরঞ্জনের ফল। বস্তুত, সেই সময়ে অনাবৃষ্টির ফলে যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল তাহাই ছিল কৃষকদের দুর্দশার অন্যতম প্রধান কারণ। যাহা হউক, সুলতান যখন প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিলেন তখন মুক্ত হস্তে অর্থ সাহায্য করিয়া সেখানকার প্রজাবর্গকে রক্ষার চেষ্টা করিলেন। রাজকোষের অর্থাভাব, দোয়াব অঞ্চলের প্রজাবর্গের বিদ্রোহাত্মক মনোভাব ও তাহাদের অর্থবল সুলতানের করবৃদ্ধির পশ্চাতে মূল যুক্তি ছিল। এই করবৃদ্ধির ফলে প্রকাশ্য বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল এবং উহা দমন করিতে গিয়া অকথ্য অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, একথা অনস্বীকার্য।††

দোয়াব অঞ্চলে করবৃদ্ধি : কৃষকদের দুর্দশা

১৩২৬-২৭ খ্রীষ্টাব্দে মোহম্মদ তুঘ্‌লক দিল্লী হইতে রাজধানী দেবগিরিতে স্থানান্তরিত করিবার আদেশ দিলেন। দেবগিরির নূতন নামকরণ হইল

* Vide *The Delhi Sultanate*, Bharatiya Vidyabhavan Publication, p. 85.

† Badauni's view has been accepted by Wolseley Haig. Vide, *The Delhi Sultanate*, Bharatiya Vidyabhavan, p. 64.

†† *Ibid.* pp. 64—65.

দৌলতাবাদ। সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির দিক হইতে বিচার করিলে দেবগিরি সর্বাধিক কেন্দ্রীয় স্থান (central position) ছিল সেবিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহা ভিন্ন মোঙ্গল আক্রমণ হইতে নিরাপত্তার দিক দিয়া বিচার করিলেও দিল্লী অপেক্ষা দেবগিরি রাজধানীর পক্ষে অধিকতর উপযোগী ছিল সন্দেহ নাই, কারণ মোঙ্গলগণ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দেশ হইতে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াই অনায়াসে দিল্লীর নিকটবর্তী হইতে পারিত। কিন্তু দূরবর্তী দেবগিরি ছিল এবিষয়ে অধিকতর নিরাপদ। ডক্টর হুসেন-এর মতে মহম্মদ বিন্-তুঘ্লক দেবগিরিকে ইস্‌লামীয় কৃষ্টির কেন্দ্র হিসাবে গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন।* কিন্তু কেবল মাত্র সরকারী দপ্তর স্থানান্তরিত করিলেই যে রাজধানী আপনা-আপনিই স্থানান্তরিত হইত মোহম্মদ তুঘ্লক তাহা বুঝিতে পারেন নাই। তিনি দিল্লীর যাবতীয় লোককে দৌলতাবাদে যাইতে আদেশ দিয়া দিল্লীবাসীদের যেমন অশেষ দুর্দশাগ্রস্ত করিয়াছিলেন তেমনই রাজধানী স্থানান্তরিত করিবার পরিকল্পনার ব্যর্থতাও ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। রাজধানী স্থানান্তরিত করিতে গিয়া দিল্লীবাসীদের কিরূপ দুর্দশাগ্রস্ত করা হইয়াছিল তাহা বরণী, ইবন্ বতুতা ও ইসামীর রচনায় পাওয়া যায়। কিছুকাল পরই তিনি সকলকে দিল্লী প্রত্যাবর্তনের আদেশ দিয়া তাহাদের সম্পূর্ণ সর্বনাশ সাধন করিয়াছিলেন।

দৌলতাবাদের রাজধানী স্থানান্তর

১৩২৭-২৮ খ্রীষ্টাব্দে তর্মাশিরীন্ খাঁর নেতৃত্বে মোঙ্গলগণ ভারত আক্রমণ করে এবং সমগ্র পাঞ্জাব বিধ্বস্ত করিয়া দিল্লীর উপকণ্ঠে উপস্থিত হয়। মোহম্মদ-বিন্-তুঘ্লকের আমলে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সংরক্ষণের দুর্বলতার সুযোগেই এইরূপ ঘটিয়াছিল সন্দেহ নাই। ফেরিস্তার বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, সুলতান প্রভূত পরিমাণ ধনরত্ন উৎকোচ দান করিয়া তর্মাশিরীন্ খাঁকে নিরস্ত করিয়াছিলেন। বদাউনী, এহিয়া-বিন্-আহম্মদ প্রভৃতি ঐতিহাসিকের মতে মোহম্মদ-বিন্-তুঘ্লক তর্মাশিরীন্ খাঁকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। যাহা হউক, মোহম্মদের সীমান্ত-নীতির দুর্বলতার পরিচয় ইহা হইতেই পাওয়া যায়।

মোঙ্গল আক্রমণ

---

* *Ibid* p. 68.

অক্ষুনদী-অঞ্চল, খোরাসান ও ইরাক জয়ের আশায় মোহম্মদ তুঘ্‌লক তিন লক্ষ সত্তর হাজার সৈন্যের এক বাহিনী এক বৎসর পোষণ করিয়া অবশেষে সেই পরিকল্পনা ত্যাগ করেন। ইহা অনেকে মোহম্মদ তুঘ্‌লকের অব্যবস্থিতচিত্ততার পরিচায়ক বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। বস্তুতপক্ষে, ঐ সময়ে পারস্য দেশের আভ্যন্তরীণ অব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভব ছিল এবং উপযুক্ত সামরিক শক্তির সাহায্যে পারস্য দেশ জয় করা কঠিন ছিল না। মিশরের রাজা এবিষয়ে মোহম্মদ তুঘ্‌লককে সাহায্য দানে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করায় মোহম্মদ তুঘ্‌লককে পারস্য জয়ের পরিকল্পনা বাধ্য হইয়াই ত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

পারস্য বিজয়ের পরিকল্পনা

হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে কারাজল বা কুর্মাচল প্রদেশ জয় করিবার জন্য মোহম্মদ তুঘ্‌লক এক অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহার পশ্চাতেও দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই অঞ্চলের পার্বত্য জাতি প্রায়ই সুলতানি সাম্রাজ্য আক্রমণ ও সীমান্তবর্তী অঞ্চলে নানা প্রকার অত্যাচার করিত। সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার দিক দিয়া এই স্থানের পার্বত্য জাতিকে দমন করার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আকস্মিক বারিপাতের ফলে সুলতান প্রেরিত অভিযান বিফলতায় পর্যবসিত হইয়াছিল। তথাপি কুর্মাচল আক্রমণের সুফল পরবর্তী বহুকাল পর্যন্ত পার্বত্য জাতির শান্তিপূর্ণভাবে বসবাসের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়।

কারাজল বা কুর্মাচল অভিযান

বিশাল সেনাবাহিনীর ব্যয় সঙ্কুলান, মুক্ত হস্তে দান ও শাসনকার্যে ব্যয়-বাহুল্যের ফলে রাজকোষ অর্থশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। এই আর্থিক অনটন দূর করিবার উদ্দেশ্যে মোহম্মদ তুঘ্‌লক চীনদেশের অনুকরণে তামার নোটের প্রবর্তন করেন। নিছক নূতনত্বের আনন্দেই সুলতান এইরূপ করিয়াছিলেন, ইহা সত্য নহে। কিন্তু অল্প মূল্যের ধাতুর মুদ্রাকে অধিক মূল্যের মুদ্রার প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করিতে হইলে যে সকল সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন ছিল তিনি তাহা করেন নাই। ফলে, দেশের অভ্যন্তরে তামার নোট ব্যাপকভাবে জাল করা শুরু হইল। বিদেশী বণিকগণ তামার মুদ্রা স্বভাবতই গ্রহণ করিল না। অবশেষে বাধ্য হইয়া

তামার নোটের প্রচলন

মোহম্মদ তুঘ্‌লক স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে যাবতীয় তামার নোট উঠাইয়া লইলেন। চতুর্দশ শতাব্দীতে নোট চালু করা বা অল্প মূল্যের ধাতুতে সরকারী ছাপ দিয়া অধিক মূল্যের প্রতীক (token) হিসাবে চালু করিবার সমস্যা সহজেই অনুমেয়। সুলতানের চেষ্টা স্বভাবতই বিফলতায় পর্যবসিত হইল।

মোহম্মদ-বিন্-তুঘলকের শাসন ছিল যেমন উদার তেমনি ধর্মনিরপেক্ষ। তিনি হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি যে উদারতা প্রদর্শন করিতেন পূর্ববর্তী সুলতানের কেহ সেইরূপ করেন নাই। রতন নামে জনৈক হিন্দু কর্মচারী সুলতানের রাজস্ব বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন, একথা ইব্‌ন্ বতুতার বর্ণনায় উল্লেখ আছে। তিনি ধর্মপরায়ণ মুসলমান ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ধর্মপরায়ণতা ধর্মান্ধতায় পর্যবসিত হয় নাই। তাঁহার শিক্ষা ও সংস্কৃতিই তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গির উদারতা সৃষ্টি করিয়াছিল। তিনি সতীদাহ প্রথা নিবারণের জন্য সর্বপ্রথম চেষ্টা করিয়াছিলেন। চিতোর ও রণথম্ভোর-এর রাজপুতগণকে পদানত রাখা সহজসাধ্য হইবে না বুঝিতে পারিয়া তিনি তাহাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন নাই।

ধর্মনিরপেক্ষ উদার শাসন

বিচার বিষয়ে মোহম্মদ তুঘ্‌লক অত্যন্ত সজাগ দৃষ্টি রাখিতেন। ন্যায় ও সততার ভিত্তিতে বিচারকার্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে তিনি বিচার বিষয়ে কাজী, উলেমা প্রভৃতির একচেটিয়া অধিকার নাকচ করেন। তিনি স্বয়ং ছিলেন বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ কর্তা। কাজী, মুফ্‌তি প্রভৃতি তথাকথিত আইনজ্ঞদের মতামত ন্যায্য বিচারের পরিপন্থী বলিয়া মনে করিলে তিনি তাঁহাদের মতামত অগ্রাহ্য করিয়া নিজ মতের প্রাধান্য দিতেন। মুসলমান ধর্মজ্ঞানীদেরও প্রয়োজনবোধে শাস্তি দিতে তিনি দ্বিধাবোধ করিতেন না।

বিচার বিষয়ে সততা ও ন্যায়পরায়ণতা

কৃষির উন্নতিসাধন এবং দুর্ভিক্ষের সময় ঋণদান প্রভৃতি কাজের জন্য মোহম্মদ তুঘ্‌লক 'আমীরকোহী' নামে এক কর্মচারি-পদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

কৃষির উন্নতিসাধন

মোহম্মদ-বিন্‌-তুঘ্‌লকের বিফলতার কারণ ও ফলাফল (The Causes and Effects of Muhammad-bin-Tughluq's failure) :

তাঁহার বিফলতার কারণ :

সুলতান মোহম্মদ-বিন্‌-তুঘ্‌লক অস্ট্রিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় যোসেফ্‌-এর ন্যায়ই বহুমুখী প্রতিভা এবং দূরদর্শী পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষমতা সত্ত্বেও প্রত্যেক কাজেই বিফল হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ, পরিকল্পনার অযৌক্তিকতার জন্য তাঁহার বিফলতা ঘটিয়াছিল এমন নহে, উহার প্রধান কারণ ছিল পরিকল্পনাগুলি কার্যকরী করিবার জন্য অবলম্বিত পদ্ধতির ত্রুটি। দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তরিত করিতে হইলে কেবলমাত্র সরকারী দপ্তর স্থানান্তরিত করিলেই চলিত তাহা তিনি উপলব্ধি করেন নাই। পারস্য জয় বা কুর্মাচল জয়ের ক্ষেত্রেও তাঁহার পরিকল্পনা যুক্তিযুক্ত ছিল সন্দেহ নাই।

(১) কার্য পদ্ধতির ত্রুটি

দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার পরিকল্পনাগুলি ছিল সমসাময়িক কালের ধারণা ও বিশ্বাস হইতে বহুল পরিমাণে অগ্রবর্তী। স্বভাবতই জনসাধারণের সহানুভূতি সেগুলির পশ্চাতে ছিল না। তাঁহার তামার নোট প্রচলনের ক্ষেত্রে ইহা বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যায়।

(২) জনসাধারণের ধারণা ও বিশ্বাস হইতে অগ্রবর্তী আদর্শ

তৃতীয়তঃ, প্রতিভাবান, আদর্শবাদী সুলতান হইলেও মোহম্মদ তুঘ্‌লক অপরের সৎ পরামর্শেরও ধার ধারিতেন না। সংস্কার কার্যে অস্থিরতা এবং অপরের পরামর্শ গ্রহণে অনিচ্ছা তাঁহার বিফলতার অন্যতম প্রধান কারণ বলিয়া বিবেচ্য।

(৩) অপরের সৎ পরামর্শ গ্রহণে অনিচ্ছা

চতুর্থতঃ, সংস্কার কার্যের জন্য যে পরিমাণ ধৈর্যের প্রয়োজন, মোহম্মদ তুঘ্‌লকের তাহা ছিল না। ফলে, কোন একটি সংস্কার বিফলতায় পর্যবসিত হওয়ায় তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া উঠিতেন, ফলে অপর কাজেও বিফলতা তিনি ডাকিয়া আনিতেন।

(৪) ধৈর্যের অভাব

সর্বশেষে, রাজকর্মচারিবৃন্দের নিকট হইতেও তিনি প্রয়োজনীয় সহায়তালাভে সমর্থ হন নাই। দোয়াব অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তিনি কৃষকদের সাহায্য করিবার জন্য যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা প্রধানত রাজকর্মচারীদের উপযুক্ত সহযোগিতার অভাবেই কার্যকরী হয় নাই।

(৫) রাজকর্মচারীদের সহায়তার অভাব

সুলতান মোহম্মদ তুঘ্‌লকের বিফলতার ফলে দিল্লী সুলতানির মর্যাদা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থাভাবহেতু শাসনকার্যের দক্ষতা বিনষ্ট হইয়াছিল। ফলে, সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে অরাজকতা ও বিদ্রোহ সৃষ্টির সুযোগ ঘটিয়াছিল, বলা বাহুল্য। মোহম্মদ তুঘ্‌লকের রাজত্বের শেষদিকে কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া দাক্ষিণাত্যের কাকতীয় রাজা কৃষ্ণনায়ক ও হোয়সলরাজ বীরবল্লাল এক সামরিক সংঘ স্থাপন করিয়া দিল্লী সাম্রাজ্য হইতে দ্বার-সমুদ্র ও করমণ্ডল উপকূল বিচ্ছিন্ন করিয়া লইযাছিলেন।

ফলাফল : দাক্ষিণাত্য, দেবগিরি, বাংলা, সিন্ধু প্রভৃতি স্থানে বিদ্রোহ

দেবগিরিতে আমীরগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং আলা-উদ্দিন বহ্‌মন শাহের নেতৃত্বে এক স্বাধীন রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন। বাংলা ও গুজরাটে ঐ সময়ে বিদ্রোহ দেখা দিলে মোহম্মদ-বিন-তুঘ্‌লক গুজরাটের বিদ্রোহ দমন করিতে অগ্রসর হন। বিদ্রোহী নেতা তাঘী গুজরাটের শাসনকর্তাকে হত্যা করিয়া অতিশয় পরাক্রমশালী হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সুলতান তাহাকে তকালপুর নামক স্থানে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন। ইহার পর কিছুকাল গুজরাটে অবস্থান করিয়া এবং গুজরাটের বিদ্রোহ সম্পূর্ণভাবে দমন করিয়া তিনি সিন্ধু আক্রমণ করিতে অগ্রসর হন। কিন্তু পথিমধ্যে অসুস্থ হইয়া পড়ায় তাঁহার এই অভিযান ব্যর্থ হয় এবং তট্টা নামক স্থানে মৃত্যুমুখে পতিত হন (১৩৫১)।* এইভাবে তাঁহার মৃত্যুকালে সুলতানি সাম্রাজ্যের পতনোন্মুখতা পরিস্ফুট হইয়া উঠে। মোহম্মদ তুঘ্‌লকের রাজত্বকালে যে অব্যবস্থা দেখা দিয়াছিল তাহা দূর করিয়া সুলতানি শাসনকে দৃঢ় করা আর সম্ভব হয় নাই। ফলে, এই অরাজকতা ও অব্যবস্থা দিল্লী সুলতানির পতনের অন্যতম প্রধান কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।† মোহম্মদ তুঘ্‌লকের সংগঠনী শক্তির অভাব, তাঁহার অধৈর্য এবং

দিল্লী সুলতানির পতনের অন্যতম কারণ

* Vide, *The Delhi Sultanate*, Bharatiya Vidyabhaban, p. 80.

† "Endowed with extra-ordinary intellect and industry, he lacked the essential qualities of a constructive statesman and his ill-advised measures and stern policy enforced in disregard of popular will, sealed the doom of his empire." *An Advanced History of India*, p. 326. "He had brought exceptional abilities

সর্বোপরি জনসাধারণের মতামতের অপেক্ষা না রাখিয়া তাঁহার পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার পদ্ধতি সুলতানি শাসনের সর্বনাশ সাধন করিয়াছিল।

মোহম্মদ-বিন্-তুঘ্লকের কৃতিত্ব বিচার (Estimate of Muhammad-bin-Tughluq) : মোহম্মদ তুঘ্লকের চরিত্র ও কৃতিত্ব সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ একমত নহেন। এল্ফিন্স্টোন, হ্যাভেল, টমাস, স্মিথ্ লেনপুল প্রভৃতি ঐতিহাসিক মোহম্মদ তুঘ্লকের কার্যকলাপে তাঁহার বিকৃত-মস্তিষ্কের পরিচয় পাইয়া থাকেন। পক্ষান্তরে গার্ডনার ব্রাউন (Mr. Gardner Brown), ঈশ্বরী প্রসাদ প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ মোহম্মদের বিরুদ্ধে রক্তলোলুপতা ও বিকৃতমস্তিষ্কের অভিযোগ সম্পূর্ণ অযৌক্তিক বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। তাঁহারা মোহম্মদ-বিন্-তুঘ্লককে মধ্য-যুগের শ্রেষ্ঠ সুলতান বলিয়া বিবেচনা করেন। ইবন্ বতুতার বর্ণনায় অথবা জিয়া-উদ্দিনের রচনায় মোহম্মদ তুঘ্লককে বিকৃতমস্তিষ্ক বলিয়া কোথাও উল্লেখ করা হয় নাই। জিয়া-উদ্দিন বরণী সুলতানের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করিতেন। সুলতান যদি প্রকৃতই বিকৃতমস্তিষ্ক হইতেন তাহা হইলে জিয়া-উদ্দিন বরণী উহার বর্ণনা করিতেন সেবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। অবশ্য তাঁহার বর্ণনায় মোহম্মদ-বিন্-তুঘ্লকের সামঞ্জস্যহীন কার্যকলাপ ও রক্তলোলুপতার কথা আছে। ইবন্ বতুতাও বলিয়াছেন যে, সুলতান মোহম্মদ তুঘ্লক যেমন ছিলেন দয়ার সাগর তেমনি ছিলেন রক্তপাতে সিদ্ধহস্ত। উপরোক্ত পরস্পর-বিরোধী মন্তব্যের নিরপেক্ষ বিচারে ইহা স্পষ্ট হইবে যে, এল্ফিন্স্টোন, স্মিথ্, হ্যাভেল প্রভৃতির রচনায় সুলতানের ত্রুটিগুলি সম্পর্কে যেমন সামান্য অতিশয়োক্তি আছে, তেমনি গার্ডনার ব্রাউন ও ঈশ্বরী প্রসাদের রচনায় সুলতানের দোষ স্খালনের আগ্রহাতিশয্য রহিয়াছে।

মোহম্মদ তুঘ্লকের চরিত্র সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতানৈক্য

মোহম্মদ-বিন্-তুঘ্লক শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি

and highly cultivated mind to the task of governing the greatest Indian Empire that had so far been known, and he had failed stupendously. It was a tragedy of high intentions self-defeated." Lane-Poole, p. 138.

ছিলেন, ইহা অনস্বীকার্য। দর্শন, বিজ্ঞান, ভেষজ-বিজ্ঞান, গ্রীকদর্শন, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করিয়া মোহম্মদ তুঘ্‌লক সমসাময়িক রাজগণের নিকট এক বিস্ময়ের পাত্র হইয়াছিলেন। একাধারে এইরূপ বহুবিধ গুণের সংমিশ্রণ অন্ততঃ রাজগণের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু এই সকল সদ্‌গুণের সহিত বাস্তব জগৎ সম্পর্কে অনভিজ্ঞতা ও অবাস্তব আদর্শবাদিতা মোহম্মদ তুঘ্‌লকের বিফলতার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কেবলমাত্র আদর্শবাদ ও পরিকল্পনার দুঃসাহসিকতা ও উহার মৌলিক যৌক্তিকতা যদি কাহারো কৃতিত্ব নিরূপণের মাপকাঠি হয় তাহা হইলে মোহম্মদ তুঘ্‌লকের স্থান পৃথিবীর বহু রাজারই ঊর্ধ্বে, বলা বাহুল্য। কিন্তু প্রজাবর্গের প্রকৃত হিতসাধন এবং দেশের সুষ্ঠু, সুশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থা পরিচালনা এবং পরিকল্পনার কার্যকারিতাই যদি রাজকর্তব্যের সাফল্যের মাপকাঠি হয় তাহা হইলে মোহম্মদ তুঘ্‌লকের কার্যকলাপ কেবল বিফলতায় পর্যবসিত হইয়াছিল এমন নহে, তাঁহার বাস্তব জ্ঞানহীনতা ও রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার পরিচয়ও দিয়াছিল।

তাঁহার বহুমুখী প্রতিভা

তাঁহার [illegible]ত্রের ত্রুটি

দোয়াব অঞ্চলে করভার বৃদ্ধির পশ্চাতে বিদ্রোহাত্মক ও বিত্তশালী প্রজাবর্গকে শাস্তিদানের মনোবৃত্তি পরিলক্ষিত হয়। দোয়াব অঞ্চলের প্রজাবর্গের দুর্দশামোচনে সুলতানই স্বয়ং ঋণদানের আদেশ দিয়াছিলেন। শাসনকার্যে অকর্মণ্যতার ফলেই সুলতানের কার্যে এইরূপ অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। রাজধানী দৌলতাবাদে স্থানান্তরের পরিকল্পনার পশ্চাতে যুক্তি ছিল বটে, কিন্তু স্থানান্তর করিবার উপায় সম্পর্কে তাঁহার কোন বাস্তব জ্ঞান ছিল না। কেবলমাত্র সরকারী দপ্তর স্থানান্তরিত করিয়াই যে রাজধানী স্থানান্তর করা সম্ভব ছিল তিনি তাহা বুঝিতে পারেন নাই। দিগ্বিজয় সম্পর্কেও তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছিল বাস্তবতাবর্জিত। পারস্য দেশের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার সুযোগে উহা জয় করিবার ইচ্ছা অযৌক্তিক এই কথা বলা যায় না, কিন্তু মিশরের রাজার সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া পারস্য জয় করা সম্ভব হইলেও তাহা হইতে যে জটিলতার সৃষ্টি হইত সেবিষয়ে সন্দেহ নাই।

দোয়াব অঞ্চলে করভার বৃদ্ধি

দৌলতাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত করণ

পারস্যজয়ের যৌক্তিকতা

এই পরিকল্পনা অবশ্য মিশরের রাজার সাহায্যের অভাবে কার্যকরী হয় নাই। এক্ষেত্রেও স্থলতান অভিজ্ঞ রাজনীতিকস্থলভ জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা বলা চলে না। কুর্মাচলের অভিযান অবশ্য আংশিকভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। অনেকে এই অভিযানকে চীন-দেশের বিরুদ্ধে অভিযান বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু বরণীর রচনায় স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, স্থলতান চীন ও ভারতবর্ষের মধ্যবর্তী কারাজল বা কুর্মাচল জয় করিবার উদ্দেশ্যে অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই অঞ্চলের পার্বত্য জাতি ভারতের সীমান্ত দেশে আক্রমণ ও লুণ্ঠনকার্যে লিপ্ত থাকিত। স্থলতানের সামরিক অভিযান আকস্মিক বারিপাতে বিফল হইলেও ইহার পর তাহাদের আক্রমণ ও লুণ্ঠন বন্ধ হইয়াছিল। অবশ্য এই অভিযানের সেনাবাহিনীর মধ্যে মাত্র দশজন অশ্বারোহী জীবিত অবস্থায় ফিরিয়া আসিলে স্থলতান অভিযানের বিফলতার সংবাদ পাইয়া এই দশজনকেও হত্যার আদেশ দিয়াছিলেন। তামার নোটের প্রচলন করিতে গিয়াও উহা জাল করার বিরুদ্ধে কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা তিনি অবলম্বন করেন নাই। ফলে, প্রতি ঘরে ঘরে তামার নোট জাল হওয়ায় এই ব্যবস্থা বিফল হইয়াছিল এবং তামার নোটের পরিবর্তে স্বর্ণমুদ্রা দিয়া মোহম্মদ তুঘ্‌লক যাবতীয় তামার নোট উঠাইয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ফলে, রাজকোষ অর্থশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল।

কুর্মাচল অভিযানের আংশিক সাফল্য

তামার নোটের প্রচলন

মোঙ্গল নেতা তর্‌মাশিরীন্ খাঁকে উৎকোচ প্রদান করিয়া নিরস্ত করার পশ্চাতে স্থলতানের দুর্বলতার পরিচয় পাওয়া যায়। ফেরিস্তার এই উক্তি আমরা যদি গ্রহণ না করি এবং বদাউনী ও এহিয়া-বিন্-আহম্মদের বর্ণনায় মোহম্মদ তুঘ্‌লক কর্তৃক মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করিবার কথা যদি সত্যও হয় তথাপি, মোহম্মদ তুঘ্‌লকের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সংরক্ষণের নীতির দুর্বলতার দরুণই যে মোঙ্গলগণ দিল্লীর উপকণ্ঠে উপস্থিত হইতে পারিয়াছিল তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

মোঙ্গল নীতি

বিচার-ব্যবস্থাকে ন্যায় ও সততার ভিত্তিতে স্থাপন করা, ধর্মনিরপেক্ষ-ভাবে শাসন পরিচালনা, হিন্দুদের প্রতি উদারতা, কৃষির উন্নতি সাধন প্রভৃতি মোহম্মদ তুঘ্‌লকের শাসনের আংশিক সাফল্যের পরিচায়ক সন্দেহ নাই। আর্থিক দুর্বলতা-

বিচার, ধর্মনিরপেক্ষ শাসন, কৃষি

হেতু শাসনকার্যে অব্যবস্থা দেখা দিলে সুলতান তাহা দূর করিতে সমর্থ হন নাই। ফলে, দাক্ষিণাত্য, বাংলা ও সিন্ধুদেশ দিল্লীর আনুগত্য অস্বীকার করিল এবং বিশাল সুলতানি সাম্রাজ্য দ্রুত ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। সুলতান মোহম্মদ-বিন্-তুঘ্‌লক শিক্ষা, সংস্কৃতি, উচ্চ আদর্শ ও বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন হইয়াও সুলতানি সাম্রাজ্যের ধ্বংসের কারণস্বরূপ হইয়াছিলেন। তাঁহার বাস্তবতা-বর্জিত কার্যকলাপ, যুগধর্মের অগ্রবর্তী ধ্যান-ধারণা, অনভিজ্ঞতা, ধৈর্য ও স্থৈর্যহীনতা সুলতানি শাসনের সর্বনাশ ডাকিয়া আনিয়াছিল।

তাঁহার বিফলতা

ফিরুজ তুঘ্‌লক ১৩৫১-১৩৮৮ (Firuz Tughluq): সিন্ধুর বিদ্রোহ দমন করিতে গিয়া সুলতান মোহম্মদ-বিন্-তুঘ্‌লকের আকস্মিক মৃত্যু ঘটিলে নেতৃবিহীন সেনাবাহিনীর মধ্যে এক দারুণ বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। সুলতানের সেনাবাহিনীতে ভাড়াটিয়া মোঙ্গল সৈনিকগণ সিন্ধুর বিদ্রোহী নেতাদের সৈন্যবাহিনীর সহিত যোগদান করিয়া সুলতানি সৈন্যের শিবির লুণ্ঠন শুরু করিলে উপস্থিত অভিজাতবর্গের অনুরোধে ফিরুজ শাহ্‌ সুলতান-পদ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। প্রথমে সুলতান-পদ গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেও পরিস্থিতি বিবেচনায় শেষ পর্যন্ত অভিজাতবর্গের অনুরোধ তিনি এড়াইতে পারিলেন না। ফিরুজ শাহের বয়স তখন ৪৬ বৎসর। সুলতান-পদ গ্রহণ করিয়া (মার্চ, ১৩৫১) ফিরুজ শাহ্‌ প্রথমেই সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিলেন এবং সৈন্যবাহিনীসহ দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সুলতান-পদ গ্রহণ (মার্চ, ১৩৫১)

এদিকে খাজা-ই-জাহান নামে মোহম্মদ তুঘ্‌লকের জনৈক অনুচর এক শিশুকে মোহম্মদ তুঘ্‌লকের পুত্র বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং নিজ অভিভাবকত্বাধীনে তাঁহাকে দিল্লীর সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। মোহম্মদ তুঘ্‌লকের কোন পুত্র সন্তান ছিল বলিয়া অভিজাতবর্গের কাহারও জানা ছিল না, তদুপরি সুলতানির ঐ সঙ্কটকালে কোন নাবালককে সিংহাসনে স্থাপন করাও সমীচীন নহে বিবেচনা করিয়া অভিজাতগণের প্রায় সকলেই ফিরুজ তুঘ্‌লকের পক্ষ গ্রহণ করিলেন। মহম্মদ-বিন-তুঘ্‌লকের ভগিনী খোদাবন্দ্‌ জাদা নিজ পুত্রের স্বার্থে ফিরুজ তুঘ্‌লকের নির্বাচনের বিরোধিতা করিয়াছিলেন।

খাজা-ই-জাহান কর্তৃক এক শিশুকে দিল্লীর সিংহাসনে স্থাপন

ফিরুজ তুঘ্‌লক সসৈন্যে দিল্লীতে উপস্থিত হইলে খাজা-ই-জাহান আত্মসমর্পণ করিলেন। ফিরুজ খাজা-ই-জাহানকে মার্জনা করিলেন এবং সামান নামক স্থানে জীবনের অবশিষ্ট সময় শান্তিতে কাটাইবার অনুমতি দিলেন। কিন্তু পথিমধ্যেই সামান ও সুনাম অঞ্চলের সেনাধ্যক্ষ শের খাঁর জনৈক অনুচর কর্তৃক খাজা-ই-জাহান নিহত হইলেন।

খাজা-ই-জাহানের আত্মসমর্পণ

ফিরুজ তুঘ্‌লকের দিল্লীর সিংহাসন লাভ কতদূর আইনসঙ্গত হইয়াছিল সে বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতানৈক্য রহিয়াছে। ফিরুজ ছিলেন গিয়াস-উদ্দিনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রজবের পুত্র। তাঁহার মাতা ছিলেন জনৈকা রাজপুত রমণী। জিয়া-উদ্দিন বরণীর মতে মোহম্মদ তুঘ্‌লক মৃত্যু-কালে ফিরুজ তুঘ্‌লককে সিংহাসনের উত্তরাধিকার দিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু এ বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। 'খুলাসাও-উৎ-তারিখ' প্রণেতা সুজনরায় ভাণ্ডারি এবং ফিরুজ তুঘ্‌লকের সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণের মতে মোহম্মদ বিন তুঘ্‌লকের কোন পুত্র সন্তান ছিল না। খোদাবন্দ-জাদা কর্তৃক নিজ পুত্রের জন্য সিংহাসন দাবি এই তথ্যকে সমর্থন করে। যাহা হউক ফিরুজ তুঘ্‌লকের সিংহাসন অধিকারের মূল এবং প্রধান যুক্তি ছিল তৎকালীন সঙ্কটজনক পরিস্থিতি।

ফিরুজের সিংহাসন-দাবির যৌক্তিকতা

ফিরুজ তুঘ্‌লক সিংহাসন আরোহণের পূর্বেই শাসনকার্যের অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন। মোহম্মদ তুঘ্‌লকের আমলে তিনি উচ্চ রাজকর্মচারি-পদে নিযুক্ত ছিলেন। রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা বা শাসন-কার্যে পারদর্শিতা অর্জন করিলেও মূলতঃ ফিরুজ শাহ্‌ তুঘ্‌লক ছিলেন রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষাহীন ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি। যুদ্ধ-বিগ্রহাদি অপেক্ষা ধর্মকর্মেই তিনি অধিক আনন্দ লাভ করিতেন। সমসাময়িক মুসলমান ঐতিহাসিক জিয়া-উদ্দিন বরণী ও শামস্‌-ই-সিরাজ আফিফ্‌ ফিরুজ শাহকে শ্রেষ্ঠ 'মুসলমান শাসক' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বরণী ও আফিফ্‌-এর মতে ফিরুজ শাহ্‌ যেমন ছিলেন ন্যায়পরায়ণ, দয়াবান ও সত্যনিষ্ঠ তেমনি ছিলেন সদাচারী ও ধর্মভীরু। তাঁহার ধর্মপ্রবণতা, দয়া-দাক্ষিণ্য, সততা ও মানবতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ সম্পর্কে সমসাময়িক ঐতিহাসিক, বিশেষভাবে জিয়া-উদ্দিন

তাঁহার চরিত্র

বরণীর অভিমত ঐতিহাসিক ডক্টর স্মিথ্‌ গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করেন না। ফিরুজ শাহ্‌ রাজকর্মচারীদের দুর্নীতি দমনের কোন চেষ্টাই করেন নাই, বরঞ্চ অপাত্রে দয়া প্রদর্শনের ফলে দুর্নীতি বৃদ্ধি পাইয়াছিল মাত্র।*

যাহা হউক, ফিরুজ নিজস্ব ধারণা অনুযায়ী দয়াপ্রবণতা, প্রজাহিতৈষণা, ন্যায়পরায়ণতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু সামরিক নেতা হিসাবে তিনি ছিলেন অকর্মণ্য এবং দয়া প্রদর্শনে কোন বুদ্ধি-বিবেচনার ধার তিনি ধারিতেন না। তাঁহার পরধর্ম অসহিষ্ণুতা ও ধর্মান্ধতা তাঁহার রাজনৈতিক জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। তিনি পুরীর জগন্নাথ মন্দিরটি ভাঙ্গিয়া দিয়া উহার অভ্যন্তরস্থ দেব-দেবী মূর্তি অপবিত্র করিয়াছিলেন। সীরাৎ-ই-ফিরুজশাহী নামক সমসাময়িক ঐতিহাসিক রচনায় এই বিবরণ পাওয়া যায়। আইন-উল্‌-মুল্‌ক এর রচনায় ইহার সমর্থন রহিয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি উদারতা প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করেন নাই। তাঁহার ধর্মান্ধতা সমসাময়িক উলেমাদের প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল। তারিখ-ই-ফিরুজশাহী ও তারিখ-ই-মোবারকশাহী গ্রন্থে তাঁহার গুণাবলীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হইয়াছে। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে, জনসাধারণের উপকার সাধন তাঁহার শাসনের মূলসূত্র ছিল। স্থাপত্য শিল্পে তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল।

* সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণ ফিরুজ শাহের দয়াপ্রবণতা সম্পর্কে প্রশংসা করিতে গিয়া যে সকল উদাহরণ দিয়াছেন সেগুলি নিরপেক্ষ বিচারে সুলতানের অকর্মণ্যতার পরিচায়ক বলিয়া বিবেচিত হইবে। তাঁহার আমলে রাজকর্মচারিগণ উৎকোচ গ্রহণ না করিয়া কোন কর্তব্যই সম্পাদন করিত না। একদা জনৈক সৈনিককে ক্রন্দনরত দেখিয়া সুলতান উহার কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে জানিতে পারিলেন যে, শীঘ্রই সৈনিকটির ঘোড়া উচ্চ কর্মচারী কর্তৃক পরিদর্শনের জন্য হাজির করিতে হইবে, অথচ এক মোহর উৎকোচ না দিতে পারিলে ঐরূপ দুর্বল ঘোড়া পরিদর্শনে অবশ্যই বাতিল হইয়া যাইবে। সুলতান সৈনিকটিকে এক মোহর দান করিয়া তাহার ঘোড়া যাহাতে পরিদর্শনে টিকিতে পারে সেই উৎকোচ দানের ব্যবস্থা তিনি করিয়া দিয়াছিলেন।

ফিরুজ তুঘ্‌লকের উদ্দেশ্য ছিল ইস্‌লাম ধর্মের তথা কোরাণের নীতির ভিত্তিতে শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করা। দিল্লীর সুলতানিকে তিনি একধর্মাশ্রয়ী শাসনে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন। এইরূপ শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে প্রজাবর্গের উন্নতি সাধন করা তাঁহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, বলা বাহুল্য। শাসনকার্যে উদারতা অবলম্বনের চেষ্টাও তিনি করিয়াছিলেন।

তাঁহার উদ্দেশ্য

সুলতান-পদ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই ফিরুজ শাহ্‌কে নানাবিধ জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইল। মোহম্মদ তুঘ্‌লকের শাসনের দুর্বলতার সুযোগে বাংলাদেশের শাসনকর্তা শামস্‌-উদ্দিন ইলিয়াস্‌ শাহ্‌ স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না। তিনি স্বাধীন সুলতান হিসাবে নিজ রাজ্য বিস্তারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি লক্ষণাবতী (Lakhanauti) ও পূর্ববঙ্গ জয় করিয়া তিরহুত আক্রমণ করিয়াছিলেন। বাংলাদেশে দিল্লীর প্রভুত্ব পুনঃস্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে ফিরুজ শাহ্‌ ইলিয়াস্‌ শাহের বিরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। ইলিয়াস্‌ শাহ্‌ সুলতানের অভিযানের সংবাদ পাইয়াই তাঁহার সুরক্ষিত একডালা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। একডালা দুর্গটি ছিল দিনাজপুরে অবস্থিত। ফিরুজ শাহ্‌ একডালা দুর্গ জয় করিতে না পারিয়া দিল্লী প্রত্যাবর্তন করিলেন। ঐতিহাসিক শামস্‌-ই সিরাজের মতে সুলতান ফিরুজ একডালা দুর্গস্থ নরনারী ও শিশুর কাতর আর্তনাদে অভিভূত হইয়া দুর্গটি জয় না করিয়াই চলিয়া গিয়াছিলেন। অপরাপর ঐতিহাসিকদের মতে আকস্মিকভাবে বর্ষা নামিলে ফিরুজ তুঘ্‌লক একডালা দুর্গের অবরোধ উঠাইয়া লইয়া দিল্লী ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যাহা হউক, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে তাঁহার সামরিক নৈপুণ্যহীনতা প্রমাণিত হইয়াছিল এবিষয়ে সন্দেহ নাই।

বাংলার বিরুদ্ধে প্রথম অভিযানের বিফলতা

ইলিয়াস্‌ শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সিকন্দর শাহ্‌ বাংলার সুলতান হইলে ফিরুজ তুঘ্‌লক পুনরায় বাংলা জয় করিবার জন্য সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। সিকন্দর শাহ্‌ পিতার পন্থা অনুসরণ করিয়া একডালা দুর্গে আশ্রয় লইলেন। সুরক্ষিত একডালা দুর্গ টি জয় করা ফিরুজের পক্ষে সহজ হইল না। দীর্ঘকাল অবরুদ্ধ

বাংলার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযানের বিফলতা

অবস্থায়ও সিকন্দর একডালা দুর্গটি রক্ষা করিয়া চলিতে সমর্থ হইলেন। অবশেষে বর্ষা শুরু হইলে ফিরুজ শাহ্‌ সিকন্দরের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইলেন (১৩৫৪)। ইহার পর প্রায় দীর্ঘ দুই শতাব্দী ধরিয়া বাংলার সুলতানগণ নিরুপদ্রবে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই দুই শতাব্দীর মধ্যে দিল্লীর সুলতানগণ আর বাংলাদেশ আক্রমণ করেন নাই।

উড়িষ্যা জয়

বাংলাদেশ হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে ফিরুজ শাহ্‌ জাজনগর (বর্তমান উড়িষ্যা) আক্রমণ করেন। উড়িষ্যার হিন্দুরাজা নিজরাজ্য ত্যাগ করিয়া তেলিঙ্গানায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ফিরুজ শাহ্‌ পুরী প্রবেশ করিয়া পুরীর বিখ্যাত জগন্নাথ মন্দির অপবিত্র করিলেন এবং মন্দির হইতে জগন্নাথদেবের মূর্তিটি মুসলমানগণ কর্তৃক রাজপথে পদদলিত করাইবার উদ্দেশ্যে দিল্লী লইয়া গেলেন।* পলাতক উড়িষ্যা-রাজ ফিরুজ তুঘ্‌লকের সহিত সন্ধির প্রস্তাবসহ দূত প্রেরণ করিলেন। কুড়িটি হাতী উপঢৌকন দিয়া এবং প্রতি বৎসর কুড়িটি হাতী কর হিসাবে দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া তিনি ফিরুজের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইলেন।

মোহম্মদ-বিন্‌-তুঘ্‌লকের রাজত্বের শেষদিকে সুলতানি সাম্রাজ্যের সর্বত্র অব্যবস্থা দেখা দিয়াছিল। সেই সুযোগে নগরকোট দুর্গটি স্বাধীন হইয়া গিয়াছিল। ফিরুজ তুঘ্‌লক নগরকোট দুর্গটি পুনরধিকার করেন। নগরকোট

নগরকোট জয়

দুর্গস্থ জ্বালামুখীর মন্দিরে প্রাপ্ত তিনশত সংস্কৃত গ্রন্থ ফিরুজ শাহের আদেশে তাঁহার সভাকবি আজ-উদ্দিন-খালিদ-খানী কর্তৃক ফার্সী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। এই অনুবাদ গ্রন্থ 'দালাল-ই-ফিরুজশাহী' নামে পরিচিত।

১৩৬১-৬২ খ্রীষ্টাব্দে ফিরুজ শাহ্‌ সিন্ধু প্রদেশ জয় করিবার উদ্দেশ্যে ৯০ হাজার পদাতিক ও ৪৮০টি হস্তীসহ যাত্রা করিলেন। শামস্‌-ই-সিরাজের মতে সিন্ধুর স্থানীয় নেতৃবর্গের বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপ দমন করিয়া সেখানে দিল্লী সুলতানের নিরঙ্কুশ আধিপত্য পুনঃস্থাপন ছিল ফিরুজশাহের সিন্ধু

* "Firuz reached Puri, occupied the Raja's palace, and took the great idol, which he sent to Delhi to be trodden under foot by the faithful." *Cambridge History of India, Vol. III.* p. 178.

অভিযানের মূল উদ্দেশ্য।* সিন্ধু নদের তীরে পৌঁছিয়া তিনি বহু সংখ্যক নৌকা সংগ্রহ করিলেন। তারপর সিন্ধুর 'জাম'-(শাসক)-এর রাজধানী তট্টা অবরোধ করিলেন। কিন্তু 'জাম' বন্‌হ্‌বিনা (Banhbina) বীরত্ব সহকারে এই অবরোধ প্রতিহত করিয়া চলিলেন। সেই সময়ে সুলতানের সেনাবাহিনীর অধিকাংশ সৈনিক খাদ্যাভাব ও মহামারীতে মৃত্যুমুখে পতিত হইল।† সুলতানের নৌবাহিনীও শত্রু কর্তৃক অধিকৃত হইল। সৈন্যসংখ্যা পূরণের উদ্দেশ্যে সুলতান গুজরাটে কিছুকাল অবস্থান করিতে বাধ্য হইলেন।

সিন্ধুদেশ জয়

গুজরাটের পথে এক বিশ্বাসঘাতকের চক্রান্তে পড়িয়া ফিরুজ শাহ্‌কে সসৈন্যে কচ্ছ প্রদেশের জলাভূমিতে দীর্ঘ ছয়মাস পথভ্রান্ত অবস্থায় কাটাইতে হইয়াছিল। ইতিমধ্যে দিল্লী হইতে সামরিক সাহায্য আসিয়া পৌঁছিলে তিনি সিন্ধুর দিকে অগ্রসর হইলেন। সিন্ধুদেশ মোহম্মদ তুঘ্‌লকের মৃত্যুর পূর্ব হইতেই স্বাধীনতা ভোগ করিতেছিল। প্রায় একাদশ বৎসর স্বাধীনতা ভোগ করিয়া সিন্ধুদেশ পুনরায় ফিরুজ শাহের চেষ্টায় দিল্লীর অধিকারভুক্ত হইল।

ফিরুজ শাহের শাসনব্যবস্থা ইস্‌লাম ধর্মনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

শাসনব্যবস্থা

শাসনকার্যে উদারতার পরিচয় তিনি দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ধর্মান্ধতা সেই উদারতার সুফল বিনাশ করিয়াছিল। অ-মুসলমান প্রজাবর্গকে তিনি ইস্‌লাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। অ-মুসলমান প্রজাবর্গের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবার প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করেন নাই।

খারাজ, জাকৎ, জিজিয়া, খামস্, শারব প্রভৃতি কর স্থাপন

কোরাণে উল্লিখিত চারি প্রকার কর তিনি স্থাপন করিয়াছিলেন যথা: (১) 'খারাজ' বা ভূমি-রাজস্ব (জমির ফসলের দশমাংশ), (২) 'জাকৎ' বা সরকারকে দান (benevolence), (৩) 'জিজিয়া' বা অ-মুসলমানদের উপর ধার্য মাথাপিছু

---

* According to Shams-i-Siraj Afif—"the turbulent activities of those chiefs (of Sind) for years, engendered by a hostile and rebellious spirit furnished a clear excuse for the Sind campaign." "...We need hardly wonder that Firuz should have undertaken afresh one (campaign) to indicate the imperial prestige." *The Delhi Sultanate* p. 95.

† *Ibid* p. 95.

কর, ও (৪) 'খাম্‌স্‌' বা খনিজ দ্রব্যাদির পঞ্চমাংশ কর। এই চারিপ্রকার কর ভিন্ন 'শাহ্‌ব বা সেচকর', লুণ্ঠিত দ্রব্যাদির একাংশ প্রভৃতিও গ্রহণ করা হইত। পূর্বে নানাপ্রকার অবৈধ কর আদায় করা হইত। কিন্তু ফিরুজ শাহ্‌ এই সকল অবৈধ কর উঠাইয়া দিয়াছিলেন।

ফিরুজ শাহ্‌ আভ্যন্তরীণ ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নতি সাধনের জন্য আন্তঃপ্রাদেশিক শুল্ক উঠাইয়া দিয়াছিলেন। পূর্বে এক প্রদেশ হইতে অপর প্রদেশে কোন সামগ্রী চালান দিতে হইলে আন্তঃপ্রাদেশিক শুল্ক দিতে হইত। এই শুল্ক-প্রথা রহিত করিবার ফলে সুলতানি সাম্রাজ্যের সর্বত্র অবাধ বাণিজ্য পরিচালনার সুবিধা হইল। শিল্প ও বাণিজ্যের অভূতপূর্ব প্রসারে ফিরুজের শুল্কনীতির সুফল পরিলক্ষিত হইল। জনসাধারণের অবস্থার উন্নতির অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে সরকারী রাজস্বের পরিমাণও বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল। ফিরুজ শাহের আমলে একমাত্র দোয়াব অঞ্চল হইতেই ছয় কোটি পঁচাশী লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হইত। তাঁহার আমলে নিত্য-ব্যবহার্য জিনিসপত্রের মূল্য হ্রাস পাওয়ার ফলে জনসাধারণের সুখ-সুবিধা বৃদ্ধি পাইয়াছিল, বলা বাহুল্য। ইহা ভিন্ন, ফিরুজ শাহ্‌ বিস্তীর্ণ পতিত জমি আবাদের ব্যবস্থা করাইয়াছিলেন এবং উহা হইতে যে আয় হইত তাহা ধর্ম ও শিক্ষার প্রসারকল্পে ব্যয় করিবার আদেশ দিয়াছিলেন।*

শুল্কনীতির পরিবর্তন : ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নতিবিধান

ফিরুজ তুঘ্‌লক বহুসংখ্যক সেচ-খাল খনন করাইয়া কৃষির উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। এই সেচ-খালগুলির একটি শতদ্রু নদী হইতে ঘাগর পর্যন্ত এবং অপর একটি যমুনা নদী হইতে ফিরুজাবাদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অপর আরও দুইটি খালের মধ্যে একটি মাণ্ডবী ও সিরমুর পাহাড় হইতে হান্‌সী ও হিসার পর্যন্ত এবং অপরটি ঘাগর নদী হইতে হিরনীখেরা গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

সেচ-খাল খনন : কৃষির উন্নতি সাধন

নির্মাতা হিসাবেও ফিরুজ তুঘ্‌লকের উল্লেখযোগ্য অবদান রহিয়াছে। তিনি বহুসংখ্যক শহর ও উদ্যান নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ফতেবাদ,

---

* Vide *An Advanced History of India*, (2nd Edn. 1960-reprint) p. 332.

জৌনপুর, হিসার, ফিরুজপুর ও ফিরুজাবাদ নামে শহরগুলি তিনিই স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন বহুসংখ্যক হাসপাতাল, মসজিদ, সরাইখানা, স্মৃতিসৌধ প্রভৃতি নির্মাণ করাইয়া তিনি তাঁহার স্থাপত্য শিল্পানুরাগের পরিচয় দিয়াছিলেন। আলা-উদ্দিন নির্মিত ত্রিশটি উদ্যানের তিনি সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন এবং নিজে মোট বারোশত নূতন উদ্যান রচনা করিয়াছিলেন। মৌর্য সম্রাট অশোক নির্মিত দুইটি স্তম্ভ তিনি দিল্লীতে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। এই দুইটি অশোকস্তম্ভের একটি মীরাট হইতে এবং অপরটি খিজিরাবাদ হইতে তিনি আনাইয়াছিলেন।*

শহর স্থাপন, উদ্যান রচনা; অশোক নির্মিত স্তম্ভ দিল্লীতে স্থানান্তরিত

ফিরুজ শাহ্ বিচার-ব্যবস্থারও সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। তিনি হস্তপদছেদন প্রভৃতি নিষ্ঠুর শাস্তি-প্রথা উঠাইয়া দিয়া বিচার-ব্যবস্থাকে বহুল পরিমাণে উদার ও মানবোচিত করিয়াছিলেন। বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য তিনি একটি 'কর্মসংস্থান' সংস্থা, (Employment bureau) স্থাপন করিয়াছিলেন। দরিদ্রের চিকিৎসার জন্য দাতব্য-চিকিৎসালয় (Dar-ul-Shafa) এবং তাহাদিগকে অর্থ সাহায্য দানের জন্য সরকারী সাহায্য ভাণ্ডার (Diwan-i-khairat) স্থাপন করিয়াছিলেন। মুদ্রা-নীতির পরিবর্তন সাধন করিয়া তিনি উহা অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত করিয়া তুলিয়াছিলেন। 'আধা' ও 'বিখ্' নামে দুই প্রকার মিশ্রিত ধাতুর মুদ্রার সর্বপ্রথম প্রচলন তিনিই করিয়াছিলেন।

বিচার-ব্যবস্থার সংস্কার: কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা: দাতব্য চিকিৎসালয়: সরকারী সাহায্য ভাণ্ডার: মুদ্রানীতির সংস্কার

সামন্ত-প্রথার ভিত্তিতে ফিরুজ তুঘ্লক সামরিক সংগঠন করিয়াছিলেন। সৈনিকদিগকে তিনি জায়গীর ভোগ-দখলের অধিকার দিয়াছিলেন। সাময়িকভাবে নিযুক্ত সৈনিকদিগকে অবশ্য নগদ বেতন দিবার ব্যবস্থা ছিল। কোন কোন সামরিক কর্মচারী কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানের রাজস্ব ভোগ করিবার অধিকার পাইতেন।

সামন্ত-প্রথার ভিত্তিতে সামরিক সংগঠন

* অশোকস্তম্ভ দুইটি কিভাবে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল তাহার এক অতি সুন্দর বর্ণনা সমসাময়িক ঐতিহাসিক সামস্-ই-সিরাজ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। Vide Elliot's *History of India. Vol. III p. 350.*

ফিরুজ শাহের রাজত্বকালে দিল্লীতে ক্রীতদাসের সংখ্যা খুব বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ঐতিহাসিক শামস্‌-ই-সিরাজের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, ঐ সময়ে দেশে মোট এক লক্ষ আশী হাজার ক্রীতদাস ছিল। প্রতিশ্রুত রাজস্বের পরিমাণ হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে অথবা অপর কোনরূপ স্বার্থসিদ্ধির জন্য আমীরগণ ফিরুজ শাহকে প্রায়-ই উপঢৌকনস্বরূপ ক্রীতদাস প্রেরণ করিত। সুলতান তাঁহাদের আনুগত্যের পুরস্কারস্বরূপ তাঁহাদের দেয় রাজস্বের পরিমাণ হ্রাস করিয়া দিতেন। ফলে একদিকে যেমন সরকারী রাজস্বের পরিমাণ হ্রাস পাইত অপর দিকে তেমনি অধিকতর সংখ্যক ক্রীতদাসের ভরণপোষণের ভার সুলতানকে বহন করিতে হইত।

ক্রীতদাসের সংখ্যা বৃদ্ধি : রাজস্বের ক্ষতি

ফিরুজ শাহ্‌ ইস্‌লামী শিক্ষা বিস্তারের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় বহু সংখ্যক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বহু মুসলমান ধর্মজ্ঞানী ও পণ্ডিত ফিরুজ শাহের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন। মুসলমান ধর্মজ্ঞানীদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জালাল-উদ্দিন রুমী ফিরুজ শাহের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিতেন। তাঁহার আমলেই বরণী, আফিফ্‌, আইন-উল্‌-মুল্‌ক প্রভৃতি তাঁহাদের ইতিহাস গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছিলেন। ফিরুজ শাহের আদেশে আজ-উদ্দিন-খালিদ-খানী তিনশত সংস্কৃত গ্রন্থ ফারসী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন।

ফিরুজের জাঁকজমকপূর্ণ রাজসভা

ফিরুজ শাহ্‌ জাঁকজমকপূর্ণ রাজসভার পক্ষপাতী ছিলেন। অনুষ্ঠানাদির সময় তিনি তাঁহার রাজসভা অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত করাইতেন।

বৃদ্ধবয়সে জ্যেষ্ঠ পুত্র ফতা খাঁর মৃত্যুতে ফিরুজ তুঘ্‌লকের দেহ ও মন উভয়ই ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং তাঁহার শাসনক্ষমতা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। ক্রমে তাঁহার বিচার ও বিবেচনা-বুদ্ধি বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে। অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র জাফর খাঁরও মৃত্যু হয়। ফলে কেন্দ্রীয় শাসনে চরম দুর্বলতা দেখা দেয়। এই দুর্বলতার সুযোগ লইয়া সুলতানেরই তৃতীয় পুত্র মোহম্মদ খাঁ শাসনক্ষমতা হস্তগত করেন। কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতার কুফল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে ব্যাপক অন্তর্দ্বন্দ্বে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। ফিরুজ শাহের মৃত্যুর পূর্বেই রাজ্যের সর্বত্র অরাজকতা দেখা দেয়। অন্তর্দ্বন্দ্বে আত্মরক্ষা করা

পুত্র ফতা খাঁর মৃত্যু : ফিরুজ তুঘ্‌লকের দুর্বলতা

তাঁহার মৃত্যু (১৩৮৮)

কঠিন বিবেচনা করিয়া মোহম্মদ খাঁ দিল্লী হইতে পলায়ন করেন। ফিরুজ তুঘ্লক নিজ পৌত্র তুঘ্লক খাঁকে শাসনভার দান করিয়া ১৩৮৮ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ফিরুজ শাহের কৃতিত্ব বিচার (Critical Estimate of Firuz Tughluq): মোহম্মদ তুঘ্লকের আকস্মিক মৃত্যুতে সুলতানি সেনা-বাহিনীতে যখন চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল সেই সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে অভিজাতবর্গের সনির্বন্ধ অনুরোধে নিজ অনিচ্ছাসত্ত্বেও ফিরুজ্ শাহ্ সুলতানপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেনাবাহিনীর মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিয়া উহাকে নিরাপদে দিল্লী লইয়া যাইতে তিনি সমর্থ হইয়াছিলেন বটে কিন্তু সমরকুশলতা বা সামরিক সংগঠক হিসাবে তিনি কোন প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেন নাই। সম্মুখীন সমস্যার আশু সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন বা কোন দৃঢ় সংকল্প লইয়া কার্যে অবতীর্ণ হওয়া ফিরুজ তুঘ্লকের পক্ষে সম্ভব হইত না। সামরিক অভিযান মাত্রেই তিনি অব্যবস্থিতচিত্ততা ও দুর্বলতার পরিচয় দিয়াছিলেন। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে তাঁহার দুইটি অভিযান-ই তাঁহার সামরিক অক্ষমতার পরিচায়ক। সিন্ধুদেশে তিনি দিল্লীর অধিকার পুনঃস্থাপন করিয়াছিলেন বটে

সামরিক নেতা হিসাবে ফিরুজ তুঘ্লক

কিন্তু তাঁহার সেই অভিযানেও সামরিক দুর্বলতা ও সেনাপতিসুলভ দূরদর্শিতার অভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার বিচক্ষণতার অভাবেই কচ্ছ প্রদেশের জলাভূমিতে তাঁহাকে দীর্ঘকাল সসৈন্যে কাটাইতে হইয়াছিল। দিল্লী হইতে সময়মত সামরিক সাহায্য উপস্থিত না হইলে তাঁহার সিন্ধু জয়ের পরিকল্পনাও বিফল হইত, বলা বাহুল্য। একমাত্র জাজনগর (বর্তমান উড়িষ্যা) বিজয়ে তিনি সম্পূর্ণভাবে সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন। ইহাও উড়িষ্যার হিন্দু রাজার রাজধানী ত্যাগ করিয়া পলায়নের ফলেই সম্ভব হইয়াছিল মনে করিলে ভুল হইবে না। দাক্ষিণাত্যের যে-সকল অংশ সুলতানি সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল সেগুলি জয় করিবার কোন চেষ্টাই তিনি করেন নাই। সামরিক নেতৃত্বের ক্ষমতা ফিরুজ শাহ্ তুঘ্লকের মোটেই ছিল না, এবিষয়ে সন্দেহ নাই। জায়গীর প্রথার উপর তাঁহার সামরিক সংগঠন নির্ভরশীল ছিল। ইহার ফলে সৈনিকগণের তথা সামরিক কর্মচারি-

বর্গের কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস পাইয়াছিল। কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণের সুবিধা এই জায়গীর প্রথার ফলে বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

ফিরুজ শাহ্‌ অত্যধিক ধর্মভীরু গোঁড়া মুসলমান ছিলেন। তিনি কোরাণের নির্দেশানুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁহার গোঁড়ামি ধর্মান্ধতায় পর্যবসিত হইয়াছিল। পুরীর মন্দিরের বিগ্রহ দিল্লীতে মুসলমানদের দ্বারা পদদলিত করাইবার উদ্দেশ্যে তিনি লইয়া গিয়াছিলেন। পৌত্তলিকতার বিনাশসাধন পরম ধর্ম বলিযা তিনি মনে করিতেন, কিন্তু হিন্দুস্থানের সুলতানের পক্ষে হিন্দু ধর্মের প্রতি এইরূপ অশ্রদ্ধা প্রদর্শন রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই। তাঁহার ধর্মাচরণের পশ্চাতে হিন্দু নির্যাতনের কোন উদ্দেশ্য না থাকিলেও নিজধর্ম পালনে অত্যধিক গোঁড়ামি প্রদর্শন করিতে গিয়া তিনি হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর স্থাপন করিয়াছিলেন। কোরাণের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মানিতে গিয়া তিনি কোন কোন ক্ষেত্রে অ-মুসলমান প্রজাবর্গের উপর অনিচ্ছাকৃত অত্যাচার ও পরধর্ম অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।* হিন্দু নির্যাতনের কোন উদ্দেশ্য তাঁহার যে ছিল না তাহা ফিরুজ শাহের প্রজাহিতৈষী সংস্কার হইতে বুঝিতে পারা যায়। বিচার-ব্যবস্থার কঠোরতা দূর করিয়া, সেচকার্যের জন্য খাল খনন করিয়া এবং আন্তঃপ্রাদেশিক শুল্ক উঠাইয়া দিয়া জনসাধারণের প্রভূত উন্নতি তিনি সাধন করিয়াছিলেন এবং এই জনসাধারণের অধিকাংশ-ই ছিল হিন্দু। দরিদ্র ও পীড়িত প্রজাবর্গের সুবিধার জন্য দাতব্য চিকিৎসালয়, সরকারী সাহায্য ভাণ্ডার, বেকার সমস্যা দূরীকরণের জন্য 'কর্মসংস্থান সংস্থা' স্থাপন করিয়া ফিরুজ তুঘ্‌লক তাঁহার মানসিক উৎকর্ষ ও প্রজাহিতৈষণার পরিচয় দিয়াছিলেন।

শাসক হিসাবে ফিরুজ শাহ্‌

এই সকল কার্যকলাপের ফলে প্রজাবর্গের মঙ্গল সাধিত হইয়াছিল বলা বাহুল্য। সমসাময়িক ঐতিহাসিক মাত্রেই ফিরুজ শাহের শাসনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। এই সকল ঐতিহাসিকের রচনায় ফিরুজ শাহের চরিত্রের গুণাবলী

সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের প্রশংসা

* "Kindly to the Hindus, he yet sternly forbade public worship of idols and painting of portraits and taxed the Brahmanas who had hitherto been exempt." Lane-Poole, p.149.

ও তাঁহার শাসনপদ্ধতি সম্পর্কে অতিশয়োক্তি রহিয়াছে সন্দেহ নাই। ও আফিফ্ কর্তৃক সুলতানকে ন্যায়পরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ, দয়াবান প্রভৃতি গুণের আধার বলিয়া বর্ণনা ডক্টর স্মিথ্ গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করেন নাই। কিন্তু অতিশয়োক্তি বাদ দিলেও ফিরুজ শাহ্ যে প্রজাহিতৈষী, ধর্মভীরু, দয়াপ্রবণ সুলতান ছিলেন তাহা নিরপেক্ষ বিচারে সমর্থিত হইবে। আধুনিক ঐতিহাসিক মাত্রেই ফিরুজ শাহ্ সম্পর্কে এইরূপ অভিমত পোষণ করিয়া থাকেন।

আধুনিক ঐতিহাসিকদের অভিমত

তথাপি রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাবহেতু ফিরুজ তুঘ্লক অপাত্রে দয়া প্রদর্শন এবং জায়গীর প্রথার পুনঃপ্রবর্তন করিয়া শাসনব্যবস্থায় দুর্বলতার সৃষ্টি করিয়াছিলেন।* মোহম্মদ তুঘ্লকের আমলে দিল্লী সুলতানির যে পতনের সূচনা হইয়াছিল ফিরুজ তুঘ্লক তাহা রোধ করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পূর্বেই সাম্রাজ্যের নানাস্থানে অব্যবস্থা দেখা দিয়াছিল। নির্মাতা হিসাবে ফিরুজ তুঘ্লকের উল্লেখযোগ্য দান রহিয়াছে। তিনি অসংখ্য উদ্যান, মস্‌জিদ, সরাইখানা প্রভৃতি স্থাপন করিয়া এবং হিসার, ফিরোজপুর ফিরুজাবাদ, জৌনপুর প্রভৃতি শহরের গোড়াপত্তন করিয়া তাঁহার নির্মাণ-শিল্পানুরাগের পরিচয় দিয়াছিলেন। বহু মুসলমান ধর্মজ্ঞানী, যথা রুমী, ঐতিহাসিক বরণী, আফিফ কবি আজ-উদ্দিন খালিদ-খানী প্রভৃতি তাঁহার পৃষ্ঠ-পোষকতা লাভ করিয়াছিলেন।

রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাব

নির্মাতা হিসাবে ফিরুজ শাহ্

ধর্মপ্রাণ ও বিদ্বান ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতা

মানবতার দিক দিয়া বিচার করিলেও ফিরুজ তুঘ্লক প্রশংসার পাত্র ছিলেন সন্দেহ নাই। তিনি যেমন ছিলেন দয়াবান তেমনি ছিলেন স্নেহশীল। ধর্মবিষয়ে সংকীর্ণতার পরিচয় দান করিলেও তিনি স্বভাবতঃই উদারচিত্ত ও জনকল্যাণকামী সুলতান ছিলেন এবং তাঁহার আমলে শাসক ও শাসিতের মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু নানাবিধ গুণের অধিকারী

মানবতার বিচারে ফিরুজ শাহ

* "Firoz was loved, perhaps respected, but certainly not feared." Lane-Poole, p.152.

হইয়াও ফিরুজ তুঘ্‌লক দিল্লী সুলতানির পতনোন্মুখতা রোধ করিতে সক্ষম হন নাই।

তুঘ্‌লক বংশের অবসান (End of the Tughluq dynasty) : ফিরুজ শাহের মৃত্যুর পর তুঘ্‌লক বংশের দুর্বলতর সুলতানদের হস্তে দিল্লী সুলতানি পতনের দিকে দ্রুত ধাবিত হইল। ফিরুজ শাহের মৃত্যুর পর গিয়াস-উদ্দিন তুঘ্‌লক শাহ্‌ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন (১৩৮৮)। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই তাঁহারই সম্পর্কিত ভ্রাতা—ফিরুজ তুঘ্‌লকের দ্বিতীয় পুত্র* জাফর খাঁর পুত্র আবুবক্‌র গোপনে তাঁহাকে হত্যা করাইয়া নিজে সিংহাসন দখল করিলেন। আবুবক্‌র-এর ভাগ্যেও বেশিদিন সুলতান-পদ ভোগ সম্ভব হয় নাই। নাসির-উদ্দিন মোহম্মদ শাহ্‌ কর্তৃক তিনি সিংহাসনচ্যুত ও কারারুদ্ধ হইলেন এবং কারাগারেই কিছুকাল পরে তাঁহার মৃত্যু ঘটিল। নাসির-উদ্দিনও সিংহাসন লাভ করিয়া বেশিদিন রাজত্ব করিবার অবকাশ পাইলেন না। তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুর পর (১৩৯৪) তাঁহার পুত্র আলা-উদ্দিন সিকন্দর শাহ্‌ সিংহাসন আরোহণের প্রায় দুই মাসের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

গিয়াস-উদ্দিন তুঘ্‌লক শাহ্‌, আবুবক্‌র, নাসির-উদ্দিন মোহম্মদ শাহ্‌, আলা-উদ্দিন সিকন্দর শাহ্‌

তাঁহার পর নাসির-উদ্দিন মাহ্‌মুদ শাহ্‌ (২য়) সিংহাসন আরোহণ করিলেন। তিনিই ছিলেন তুঘ্‌লক বংশের শেষ সুলতান। তাঁহার রাজত্বকালে গুজরাটের শাসনকর্তা জাফর খাঁ এবং জৌনপুরের মালিক সারওয়ার নামে জনৈক খোজা স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। দিল্লীর অভিজাতগণের কয়েকজন নুসরৎ শাহ্‌ নামে ফিরুজ তুঘ্‌লকের অপর এক পৌত্রকে সুলতান বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এইভাবে সুলতান-পদ লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং রাজ্যের বিভিন্ন অংশের স্বাধীনতা ঘোষণা প্রভৃতির ফলে যখন দিল্লী

নাসির-উদ্দিন মাহ্‌মুদ শাহ্‌ (২য়)—তুঘ্‌লক বংশের শেষ সুলতান

* Zafar Khan was the second son of Firuz Tughlaq and not the third son as mentioned in *The Delhi Sultanate.* Bharatiya Vidyabhavan Publication, p. 110. Vide *Tarikh-i-Mubarakshahi*, English Translation by Prof. K. K. Basu, p. 149ff., *An Advanced History of India*, p. 604.

সুলতানির পতন আসন্নপ্রায় ঠিক সেই সময়ে তৈমুরলঙ্গের ভারত আক্রমণ উহার উপর চরম আঘাত হানিল।

তৈমুর লঙ্গ (Timur the Lame) : মধ্য-এশিয়ার সমরকন্দে ১৩৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তৈমুরের জন্ম হয়। তিনি ছিলেন 'লঙ্গ' অর্থাৎ খোঁড়া (Lame), এই কারণে তিনি তৈমুর লঙ্গ নামে পরিচিত। খোঁড়া হইলেও তৈমুরের ন্যায় দুর্ধর্ষ সামরিক নেতা ইতিহাসে বিরল। ১৩৬৯ খ্রীষ্টাব্দে সমরকন্দের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তৈমুর 'আমীর' উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি মোঙ্গলবীর চিঙ্গিজ খাঁর সাম্রাজ্য পুনর্গঠনের উদ্দেশ্য লইয়া দিগ্বিজয়ে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি চাঘতাই তুর্কীজাতির নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া একে একে পারস্য, আফগানিস্তান, মেসোপটামিয়া প্রভৃতি জয় করেন। তারপর তিনি হিন্দুস্থানের দিকে অগ্রসর হইলেন। কোন দেশ আক্রমণ ব্যাপারে তৈমুরের কোন অজুহাতের প্রয়োজন ছিল না, তাঁহার দুর্ধর্ষ সামরিক শক্তিই ছিল যুদ্ধ-সৃষ্টির একমাত্র যুক্তি। ন্যায়, অন্যায় বা উপযুক্ত কারণের ধার তিনি ধারিতেন না।

জন্ম ও প্রথম জীবন

ভারতবর্ষ আক্রমণের ক্ষেত্রে অবশ্য তৈমুর লঙ্গের অজুহাতের অভাব হইল না। দিল্লীর সুলতানগণ পৌত্তলিকতার উচ্ছেদসাধন না করিয়া পৌত্তলিক হিন্দুদের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করিতেছেন ইহা তৈমুরের সহ্য হইল না। কিন্তু পৌত্তলিকতার বিনাশসাধনের ইচ্ছা ভিন্ন রাজনৈতিকক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন ভারতবর্ষ হইতে ধনরত্ন লুণ্ঠনের সুযোগও তিনি গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার ভারত অভিযানের প্রকৃতি লক্ষ্য করিলে ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, লুণ্ঠনই ছিল তাঁহার মূল উদ্দেশ্য। পৌত্তলিকতার অবসান ঘটাইয়া হিন্দু-অধ্যুষিত ভারতবর্ষে ইস্‌লামের প্রাধান্য স্থাপনের ইচ্ছা ছিল তাঁহার নিকট অজুহাত মাত্র।

ভারতবর্ষ আক্রমণের অজুহাত

১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তৈমুরের পৌত্র পীর মোহম্মদ একদল সৈন্যসহ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিলেন এবং সহজেই মুলতান দখল করিতে সমর্থ হইলেন। ঐ বৎসর তৈমুরও ভারতবর্ষে পৌঁছিলেন। তিনি তাঁহার বিশাল সেনাবাহিনী-সহ একে একে সিন্ধু, ঝিলাম ও রাভী নদী অতিক্রম করিয়া মুলতানের

নিকটবর্তী তলম্ব (Talamba) নামক শহরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

ভারতবর্ষ আক্রমণ (১৩৯৮): পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠন

তলম্ব শহর আক্রমণ করিয়া তৈমুর সেখানকার অধিবাসিগণকে ক্রীতদাসে পরিণত করিলেন এবং তাহাদের নিকট হইতে প্রভূত পরিমাণ অর্থ আদায় করিলেন। তলম্ব হইতে দিল্লী অভিমুখে যাত্রাপথে দীপালপুর, ভাতনেইর প্রভৃতি স্থান লুণ্ঠন করিয়া এবং অসংখ্য নর-নারীর প্রাণনাশ করিয়া তিনি দিল্লীর উপকণ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দিল্লীর উপকণ্ঠে তিনি প্রায় একলক্ষ হিন্দু বন্দীকে হত্যা করিয়া এক নারকীয় কাণ্ড অনুষ্ঠিত করিলেন। এই পৈশাচিক কাণ্ডের একমাত্র যুক্তি ছিল এই যে, দিল্লী আক্রমণকালে হিন্দু বন্দিগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিতে পারে।

সুলতান নাসির-উদ্দিন মোহম্মদ ও তাঁহার মন্ত্রী মল্লু ইক্‌বাল (Mallu-Iqbal) তৈমুরকে বাধাদানে অগ্রসর হইলেন। মোহম্মদ ও মল্লুকে পরাজিত করিয়া তৈমুর সহজেই দিল্লী অধিকার করিলেন। পরাজিত হইয়া মোহম্মদ গুজরাটে এবং মল্লু বরণ প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। দিল্লীর ইস্‌লাম ধর্ম-জ্ঞানীদের সনির্বন্ধ অনুরোধে তৈমুর নাগরিকদের প্রাণনাশ করিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন বটে, কিন্তু তৈমুরের সেনাবাহিনীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া হিন্দুনাগরিকগণ আত্মরক্ষার চেষ্টা করিলে এক ব্যাপক হত্যাকাণ্ড শুরু হইল।

তৈমুরের দিল্লী প্রবেশ: হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠন

তৈমুরের দুর্ধর্ষ বাহিনী অগণিত হিন্দু নর-নারীর রক্তে দিল্লীর রাজপথ রঞ্জিত করিল।* দিল্লী হইতে বহুসংখ্যক স্থপতিকে সমরকন্দের জুম্মা মস্‌জিদ (Friday Mosque) নির্মাণের জন্য ধরিয়া লইয়া যাওয়া হইল। দিল্লী নগরীতে কয়েকদিন ধরিয়া পৈশাচিক হত্যালীলা ও লুণ্ঠনের পর তৈমুর সিরি, জাঁহাপনা ও পুরাতন দিল্লী প্রভৃতি আরও তিনটি শহরে প্রবেশ করিয়া অনুরূপ লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড চালাইলেন।

ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য বিস্তার তৈমুরের উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি পনর দিন

---

* "So complete was the desolation that the city (Delhi) was utterly ruined, and those of the inhabitants who were left died, while for two whole months not a bird moved wings in Delhi." Vide, *Cambridge History of India, Vol. III.* p. 201.

দিল্লীতে অবস্থানের পর ফিরুজাবাদ ও মীরাট হইয়া স্বদেশের দিকে অগ্রসর হইলেন। হরিদ্বারের নিকটে তিনি এক হিন্দু বাহিনীকে পরাজিত করিলেন। ইহা ভিন্ন তিনি কাংড়া ও জম্মুও দখল করিলেন। তিনি খিজির খাঁ সৈয়দকে মুলতান, লাহোর ও দীপালপুরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া ১৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিলেন।

মীরাট, কাংড়া, জম্মু প্রভৃতি জয়

তৈমুরের আক্রমণ ভগবানের অভিসম্পাত-স্বরূপ

ভারতবাসীর দিক হইতে বিচার করিলে তৈমুর লঙ্গের আক্রমণ ছিল ভগবানের অভিসম্পাতস্বরূপ।* অপর কোন আক্রমণকারী ভারতবাসীর উপর এইরূপ ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ও অত্যাচার অনুষ্ঠিত করেন নাই।

তাঁহার মৃত্যু (১৪০৫)

দিল্লী হইতে ফিরিয়া কয়েক বৎসরের মধ্যেই তৈমুর লঙ্গের মৃত্যু ঘটে। তাঁহার মৃত্যুকালে তাঁহার বিজিত সাম্রাজ্যের অতিক্ষুদ্র একাংশমাত্র তাঁহার অধীনে ছিল। ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা রক্তপিপাসু, নিষ্ঠুর অত্যাচারী হিসাবে নিজ পরিচয় রাখিয়া তৈমুর ১৪০৫ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

তৈমুরের আক্রমণ পতনোন্মুখ দিল্লীর সুলতানির উপর চরম আঘাত হানিয়াছিল। তৈমুরের অবাধ হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠন দিল্লী সুলতানির পতনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উভয় প্রকার কারণ হিসাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে। এই আঘাতের পর দিল্লী সুলতানির অবসান ঘটিয়াছিল। দিল্লী সুলতানদের একদা বিশাল সাম্রাজ্যের স্পর্ধিত রাজধানী দিল্লী ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছিল। তৈমুরের আক্রমণের পর যে ব্যাপক অব্যবস্থা দেখা দিয়াছিল তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিল। ভারতের সমাজ-ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক কাঠামো সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিগণ নিজ নিজ প্রাধান্য বিস্তারে মনোযোগী হইয়াছিল। আর ভারতবাসীর দুর্দশার সীমা ছিল না।

তৈমুরের আক্রমণের ফলাফল

---

* He left India "after inflicting on India more misery than had ever before been inflicted by any conqueror in a single invasion." *Ibid*, p. 200.

তৈমুর ভারতবর্ষ ত্যাগ করিলে দিল্লীর রাজনৈতিক অব্যবস্থার সুযোগ লইয়া অভিজাত শ্রেণী স্বার্থসিদ্ধিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। তাহারা ফিরুজ শাহের অপর এক পৌত্র নুসরৎ শাহ্‌কে দিল্লীর সিংহাসন দখল করিতে প্ররোচিত করিল। এই সময়ে নুসরৎ শাহ্‌ দোয়াব অঞ্চলে অবস্থান করিতেছিলেন। অভিজাতবর্গের প্ররোচনায় তিনি দিল্লী দখল করিলেন বটে (১৩৯৯), কিন্তু শীঘ্রই মল্লু-ইক্‌বালের হস্তে পরাজিত হইয়া দিল্লী ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। মল্লু-ইক্‌বাল পলাতক সুলতান নাসির-উদ্দিন মোহম্মদকে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তনের জন্য অনুরোধ জানাইলে তিনি রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। ইতিমধ্যে দিল্লীর সুলতানি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের শাসকগণ স্বাধীন হইয়াছিলেন। নাসির-উদ্দিন মোহম্মদের প্রাধান্য দিল্লী, রোটক, দোয়াব ও সম্বল অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। নাসির-উদ্দিন দিল্লীর সুলতান-পদে কেবল নামে মাত্রই অধিষ্ঠিত ছিলেন, প্রকৃত শাসনভার ছিল মল্লু-ইক্‌বালের হস্তে। স্বভাবতঃ দুর্বল সুলতান নাসির-উদ্দিন ১৪১৩ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে গিয়াস-উদ্দিন স্থাপিত তুঘ্‌লক বংশের অবসান ঘটিল।

তৈমুরের আক্রমণের পরবর্তী কালের রাজনৈতিক অবস্থা

তুঘ্‌লক বংশের অবসান (১৪১৩)

সুলতান নাসির-উদ্দিন মোহম্মদের মৃত্যুতে দুই শতাধিক বৎসরের তুর্কী-শাসনের অবসান ঘটিল (১৪১৩)। আমীর ও মালিকগণ দৌলত খাঁকে তাঁহাদের নেতৃপদে বরণ করিলেন। দৌলত খাঁ কোন রাজকীয় উপাধি ধারণ না করিয়াই কেবলমাত্র অভিজাত-বর্গের নেতা হিসাবে দিল্লীর শাসনভার গ্রহণ করিলেন। তিনি কাটিহারের হিন্দু সামন্ত-রাজগণকে দিল্লীর প্রভুত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য করিলেন। কিন্তু পর বৎসরই তৈমুর লঙ্গের ভারতীয় সাম্রাজ্যের শাসনকর্তা খিজির খাঁ দিল্লী আক্রমণ করিয়া দৌলত খাঁকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করিলেন। খিজির খাঁ দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়া (১৪১৪) এক নূতন সুলতান বংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

দৌলত খাঁর নেতৃপদ লাভ

খিজির খাঁ কর্তৃক দিল্লীর সিংহাসন অধিকৃত

সৈয়দ বংশ, ১৪১৪—৫০ (The Sayyid Dynasty):

খিজির খাঁ, ১৪১৪—২১ (Khijir Khan): খিজির খাঁ নিজেকে সৈয়দ

বংশ অর্থাৎ ইস্‌লাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মোহম্মদের বংশসম্ভূত বলিয়া পরিচয় দিতেন। এবিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে বলিয়া আধুনিক ঐতিহাসিকগণ মনে করেন। যাহা হউক, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বংশ 'সৈয়দ বংশ' নামেই ইতিহাসে পরিচয় লাভ করিয়াছে। খিজির খাঁ তৈমুর লঙ্গের ভারতীয় সাম্রাজ্যের শাসনকর্তা ছিলেন, সুতরাং দিল্লীর সিংহাসন লাভ করিয়াও তিনি কোন রাজকীয় উপাধি গ্রহণ করেন নাই। তিনি অন্ততঃ মৌখিকভাবে হইলেও নিজেকে তৈমুরের অধীন শাসনকর্তা বলিয়া পরিচয় দিতেন। তিনি তৈমুরের চতুর্থ পুত্র শাহ্‌ রুখ্‌ (Shah Rukh)-এর নিকট উপঢৌকন প্রেরণ করিয়া নিজ আনুগত্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে।

খিজির খাঁর সৈয়দ বংশসম্ভূত বলিয়া দাবি

তৈমুরের বংশের প্রতি আনুগত্য

ফেরিস্তার বর্ণনায় খিজির খাঁ উদার মনোবৃত্তিসম্পন্ন, দয়াশীল ও ন্যায়-পরায়ণ শাসক ছিলেন বলিয়া উল্লিখিত আছে। কিন্তু খিজির খাঁ মোট সাত বৎসর রাজত্ব করিয়াও দিল্লী সুলতানির কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম হন নাই। তাঁহার আমলে সুলতানি সাম্রাজ্য দিল্লীর পার্শ্ববর্তী কয়েকটি জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই ক্ষুদ্র-পরিসর রাজ্যেও কোনপ্রকার শৃঙ্খলা ছিল না। কনৌজ, পাতিয়ালী, এটোয়া প্রভৃতি অঞ্চলের হিন্দু জমিদারগণ দিল্লীর প্রভুত্ব অমান্য করিয়া চলিবার চেষ্টা করিতেন। যাহা হউক, এইরূপ বিদ্রোহাত্মক অবস্থার সহিত যুঝিয়া খিজির খাঁ ১৪২১ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁহার পুত্র মোবারক শাহ্‌কে উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া গিয়াছিলেন।

খিজির খাঁর মৃত্যু

মোবারক শাহ্‌, ১৪২১-৩৪ (Mubarak Shah) : মোবারক শাহ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া আভ্যন্তরীণ অব্যবস্থা ও অরাজকতা দূর করিবার চেষ্টা করেন। তাঁহার রাজত্বকালে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই। তাঁহার আমলেই এহিয়া-বিন্‌-আহ্‌মদ 'তারিখ-ই-মোবারক শাহী' নামে একখানা ইতিহাস-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে মোবারক শাহের রাজত্বকালের অতি নির্ভরযোগ্য তথ্যাদি পাওয়া যায়।

এহিয়া-বিন্‌-আহম্মদ রচিত 'তারিখ-ই-মোবারক শাহী'

মোবারক শাহ্ ভাতিন্দা ও দোয়াব অঞ্চলের বিদ্রোহ দমন করিয়া অনাদায়ী কর আদায় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু খোকর জাতিকে দমন করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। সুলতানির দুর্বলতার সুযোগ লইয়া খোকর জাতি দিল্লী অধিকার করিবার আশা পোষণ করিত। কিন্তু ইতিমধ্যে দিল্লীর হিন্দু ও মুসলমান অভিজাতবর্গের ষড়যন্ত্রে মোবারক শাহ্ প্রাণ হারাইলেন। ষড়যন্ত্রকারী অভিজাতবর্গ খিজির খাঁর পৌত্র মোহম্মদ শাহ্‌কে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন।

ভাতিন্দা ও দোয়াব অঞ্চলে মোবারক শাহের সাফল্য

মোহম্মদ শাহ্, ১৩৩৪-৪৫ (Muhammad Shah): মোহম্মদ শাহের রাজত্বের প্রথমদিকে অভিজাতবর্গের নেতা ওয়াজির বা মন্ত্রী সারওয়ার-উল্-মুল্ক শাসন-ক্ষমতা হস্তগত করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু সারওয়ার-এর মৃত্যুর পর মোহম্মদ শাহ্ যখন প্রকৃত শাসন-ক্ষমতা পাইলেন তখনও তিনি রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা না করিয়া নিজ ক্ষমতার অপব্যবহার শুরু করিলেন। ক্রমে অভিজাতবর্গ ও প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ মোহম্মদ শাহের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িলেন। মালবের শাসনকর্তা মামুদ শাহ্ খল্‌জী দিল্লী অধিকার করিবার উদ্দেশ্যে সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। শিরহিন্দ ও লাহোরের শাসনকর্তা বহ্‌লুল খাঁ লোদী (Bahlul Khan Lodi) মালবের শাসনকর্তার বিরুদ্ধে সুলতানকে সাহায্য দানে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু সুলতানের দুর্বলতার পরিচয় পাইয়া বহ্‌লুল খাঁ লোদী নিজেই দিল্লী অধিকার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ১৪৪৫ খ্রীষ্টাব্দে মোহম্মদ শাহের মৃত্যুতে তাঁহার এক পুত্রকে অভিজাতবর্গ সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। ইনি 'আলা-উদ্দিন আলম্ শাহ্' উপাধি ধারণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। দিল্লী সুলতানের ক্ষমতা তখন দিল্লী ও উহার পার্শ্ববর্তী কয়েকটি গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

ওয়াজির সারওয়ার-উল্-মুল্কের শাসন-ক্ষমতা

মোহম্মদ শাহের অকর্মণ্যতা

আলা-উদ্দিন আলম্ শাহ্, ১৪৪৫-৫১ (Ala-ud-din Alam Shah): আলা-উদ্দিন সুলতান-পদের অযোগ্য ছিলেন। দিল্লী ও উহার

তাঁহার অকর্মণ্যতা : বহ্‌লুল খাঁ লোদীর নিকট সিংহাসন ত্যাগ

পার্শ্ববর্তী কয়েকখানি গ্রামের উপর কর্তৃত্ব করিবার ক্ষমতাও তাঁহার ছিল না। তিনি বহ্‌লুল খাঁ লোদীর অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া বদাউনে চলিয়া গেলেন। এইভাবে সৈয়দ বংশের অবসান ঘটিল।

লোদী বংশ (The Lodi Dynasty) :

বহ্‌লুল খাঁ লোদী, ১৪৫১-৮৯ (Bahlul Khan Lodi) : বহ্‌লুল লোদী ছিলেন আফগান জাতির 'লোদী' উপদলসম্ভূত। তিনি যখন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন তখন দিল্লীর সুলতানি সাম্রাজ্য এক অতি ক্ষুদ্র রাজ্যে পর্যবসিত হইয়াছে। এই স্বল্পায়তন রাজ্যের মধ্যেও অরাজকতা ও অব্যবস্থার শেষ ছিল না। বহ্‌লুল লোদী কিন্তু কেবলমাত্র সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি সুলতানি শাসনকে পুনঃ সঞ্জীবিত করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। আফগানসুলভ সামরিক দক্ষতা তাঁহার ছিল। তিনি প্রথমেই নিজেকে মন্ত্রী হামিদ খাঁর প্রভাব-মুক্ত করিলেন। বৃদ্ধ মন্ত্রী হামিদ খাঁর সহায়তায় তিনি সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু হামিদ খাঁর প্রভাব হইতে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করিতে না পারিলে শাসন-ব্যাপারে তাঁহার কোন স্বাধীনতা থাকিবে না বিবেচনা করিয়াই বহ্‌লুল লোদী হামিদ খাঁকে কারারুদ্ধ করিলেন। জৌনপুরের মোহম্মদ শাহ্‌ দিল্লীর সিংহাসন অধিকারের চেষ্টা করিতেছিলেন, বহ্‌লুল লোদী তাঁহার সেই চেষ্টা ব্যর্থ করেন। প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও সামন্তগণের মধ্যে যাঁহারা স্বাধীন হইয়া গিয়াছিলেন তাঁহাদের অনেককেই বহ্‌লুল পুনরায় দিল্লীর সুলতানের আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য করিয়াছিলেন।

বহ্‌লুল লোদীর কার্যাদি

শাসক হিসাবে বহ্‌লুল লোদী ফিরুজ শাহ তুঘ্‌লকের পরবর্তী দিল্লী সুলতানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু বিধ্বস্ত সুলতানি সাম্রাজ্যের মর্যাদা বা শক্তি পুনরায় ফিরাইয়া আনা তখন কাহারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। উদ্ধত আফগান অভিজাতবর্গের ক্ষমতা-লিপ্সা বহ্‌লুল লোদী কর্তৃক দিল্লী সুলতানির পুনরুজ্জীবনের চেষ্টায় ব্যাঘাত ঘটাইয়াছিল। আফগান অভিজাতবর্গ বহ্‌লুল

আফগান অভিজাত-বর্গের ঔদ্ধত্য

লোদীকে সুলতানের সম্মান দিতেন না। বাধ্য হইয়াই আফগান অভিজাত-বর্গের প্রধান হিসাবে যতটুকু সম্মান পাওয়া সম্ভব ছিল তাহাতেই বহ্‌লুল লোদীকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইয়াছিল। তথাপি ইহা অনস্বীকার্য যে, বহ্‌লুল লোদীর চেষ্টায় দিল্লী সুলতানির হৃত ক্ষমতা ও মর্যাদা কতক পরিমাণে ফিরিয়া আসিয়াছিল।

বহ্‌লুল লোদীর আংশিক সাফল্য

ব্যক্তি হিসাবেও বহ্‌লুল লোদী অনাড়ম্বর, দয়াবান ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। দরিদ্রের প্রতি দয়া, বিদ্যা ও বিদ্বানের পৃষ্ঠপোষকতা, শাসন-ব্যাপারে দক্ষতা বহ্‌লুল লোদীর চরিত্রের অপরাপর বৈশিষ্ট্য ছিল। ১৪৮৯ খ্রীষ্টাব্দে গোয়ালিওর জয় করিয়া ফিরিবার পথে বহ্‌লুল লোদী অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং জলালী নামক শহরের নিকট মৃত্যুমুখে পতিত হন।

তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য

সিকন্দর লোদী, ১৪৮৯-১৫১৭ (Sikandar Lodi): বহ্‌লুল লোদীর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রদের মধ্যে সিংহাসন লইয়া এক অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। বহ্‌লুল লোদীর দ্বিতীয় পুত্র নিজাম খাঁকে অভিজাতবর্গের একদল সুলতান বলিয়া ঘোষণা করিলে প্রথম পুত্র বারবক শাহ্‌ কনিষ্ঠ ভ্রাতার আনুগত্য স্বীকার করিতে অস্বীকার করিলেন। বহ্‌লুল লোদী কর্তৃক বারবক শাহ্‌ জৌন-পুরের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সেখানে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন।

উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব

নিজাম খাঁ 'সিকন্দর শাহ্‌ লোদী' নাম ধারণ করিয়া দিল্লীর সুলতান পদ গ্রহণ করিলেন। প্রথমেই সিকন্দর শাহ্‌ বারবক শাহের বিরুদ্ধে সসৈন্যে যাত্রা করিলেন। ফলে, বারবক শাহ্‌ সিকন্দরের আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য হইলেন। কিছুকাল তাঁহাকে জৌনপুরের শাসনকর্তা হিসাবেই রাখা হইল বটে, কিন্তু তাঁহার অকর্মণ্যতার পরিচয় পাইয়া সিকন্দর শাহ্‌ তাঁহাকে পদচ্যুত করিলেন এবং তিনি যাহাতে কোনপ্রকার গোলযোগ সৃষ্টি করিতে না পারেন সেজন্য তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিলেন।

নিজাম খাঁর 'সিকন্দর শাহ্‌' নাম ধারণ : তাঁহার সাফল্য

সিকন্দর শাহ্ ক্ষমতাশালী শাসক ছিলেন। রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসনের বিশৃঙ্খলা দূর করিয়া তিনি সুলতানি শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধিতে মনোযোগী হইলেন। তিনি তিরহুত, বিহার প্রভৃতি অঞ্চল জয় করিয়া সুলতানি রাজ্যের সীমা বৃদ্ধি করিলেন এবং বাংলাদেশের সুলতান হুসেন শাহের সহিত তিনি মিত্রতামূলক চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া একে অপরের রাজ্য আক্রমণ করিবেন না, এই শর্তবদ্ধ হইলেন।

তিরহুত, বিহার জয়, বাংলাদেশের সহিত সন্ধি

আফগান অভিজাতবর্গের ঔদ্ধত্য দমন করিবার উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহাদের জায়গীরের হিসাব পরীক্ষা প্রভৃতি নূতন নূতন ব্যবস্থার প্রচলন করিলেন। ন্যায্য প্রাপ্য অপেক্ষা অধিক অর্থ বা সুযোগ-সুবিধা হইতে আফগান অভিজাত-বর্গকে তিনি বঞ্চিত করিলেন। সরকারী আয়-ব্যয়ের যথাযথ হিসাব রক্ষা ও হিসাব পরীক্ষার ব্যবস্থাও তিনি করিলেন। বহু সংখ্যক গুপ্তচর নিয়োগ করিয়া তিনি প্রজাবর্গের মতামত সম্পর্কে গোপনে সংবাদ সংগ্রহের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রজাবর্গের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য তিনি শস্যকর এবং আন্তঃ-প্রাদেশিক শুল্ক উঠাইয়া দিয়াছিলেন।

সিকন্দর শাহের শাসনব্যবস্থা

সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণ সিকন্দর লোদীর প্রভূত প্রশংসা করিয়াছেন। দৃঢ়চেতা ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসাবে তিনি সমসাময়িক ব্যক্তি মাত্রেরই শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন। দরিদ্র প্রজাবর্গের প্রতি সহানুভূতি, বিদ্বান ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা, বিচার ব্যাপারে সততা তাঁহার চরিত্রের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি নিজেও ফার্সী ভাষায় কবিতা রচনা করিতেন। তাঁহার সুশাসনের ফলস্বরূপ রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা যেমন ফিরিয়া আসিয়াছিল, প্রজাবর্গের জীবনযাত্রাও তেমনি স্বচ্ছন্দতর হইয়া উঠিয়াছিল। আগ্রা শহরটি তাঁহার আমলেই স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু ধর্ম ব্যাপারে সিকন্দর শাহ্ লোদী অসহিষ্ণু, সংকীর্ণ নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। ধর্মান্ধতার বশবর্তী হইয়া তিনি হিন্দুদের নির্যাতন করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। মথুরার হিন্দু মন্দির তাঁহারই আদেশে ধূলিসাৎ করা হইয়াছিল। হিন্দুদিগকে যমুনা নদীতে স্নান করিতে দেওয়া হইত না। জনৈক ব্রাহ্মণ হিন্দুধর্ম ইস্‌লাম ধর্ম অপেক্ষা কোন

তাঁহার চরিত্র

তাঁহার ধর্মান্ধতা

অংশে হীন নহে এই কথা বলিবার অপরাধে সুলতানের আদেশে প্রাণ হারাইয়াছিলেন।

ইব্রাহিম লোদী, ১৫১৭-২৬ (Ibrahim Lodi) : ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে সিকন্দর শাহ্ লোদীর মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র ইব্রাহিম লোদী সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। কিন্তু অভিজাতবর্গের একদল ইব্রাহিম লোদীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা জালাল খাঁ লোদীকে জৌনপুরের স্বাধীন সুলতান বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ইব্রাহিম লোদী জালাল খাঁকে পরাজিত ও নিহত করিয়া সুলতানি রাজ্যের ব্যবচ্ছেদ রোধ করিলেন।

সিংহাসন লাভ

ইব্রাহিম লোদীর সামরিক দক্ষতার অভাব ছিল না বটে, কিন্তু তাঁহার বিচার-বিবেচনা বা দূরদর্শিতা বলিয়া কিছু ছিল না। তিনি আফগান এবং অপরাপর অভিজাতদের সম্পূর্ণভাবে ক্ষমতাহীন করিবার চেষ্টা শুরু করিলে স্বভাবতঃই অভিজাত শ্রেণী তাঁহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। দরিয়া খাঁ লোহানীর অধীনে বিহার স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। লাহোরের শাসনকর্তা দৌলত খাঁ লোদীর পুত্র দিলওয়ার খাঁর প্রতি সুলতান ইব্রাহিম লোদীর দুর্ব্যবহার অগ্নিতে ঘৃতাহুতির কাজ করিল। দৌলত খাঁ লোদী ও আলম খাঁ (ইব্রাহিম লোদীর খুল্লতাত) ইব্রাহিম লোদীকে সিংহাসন হইতে বিতাড়িত করিবার উদ্দেশ্যে কাবুলের আমীর বাবর (Babar)-এর সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। বাবর ছিলেন তৈমুরের বংশধর। তাঁহার যুদ্ধ-ক্ষমতা যেমন ছিল অনন্যসাধারণ, তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষাও ছিল তেমনি অপরিসীম। বাবর এই আমন্ত্রণ সাগ্রহে গ্রহণ করিলেন এবং ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া পানিপথের প্রথম যুদ্ধে (১৫২৬) ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত ও নিহত করিয়া ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করিলেন। এইভাবে দিল্লী সুলতানির অবসান ঘটিল।

তাঁহার কার্যকলাপ : অভিজাত শ্রেণীর বিরোধিতা

দিল্লী সুলতানির পতনের কারণ (Causes of the downfall of the Delhi Sultanate) : দিল্লী সুলতানি দুই শতাব্দীর অধিককাল ভারতবর্ষের এক সুবিশাল অংশে প্রভুত্ব করিয়া পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। বস্তুত তুঘ্‌লক বংশের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই তুর্কী শাসন তথা দিল্লী সুলতানির অবসান ঘটিয়াছিল। ইহার পর সৈয়দ ও

পতনের দুই প্রকার কারণ : আভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত

লোদী বংশ কিছুকাল দিল্লী সুলতানি হস্তগত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে লোদী বংশের পতনের সঙ্গে সঙ্গে দিল্লী সুলতানি নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। এই পতনের পশ্চাতে আভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত এই দুই প্রকার কারণই ছিল।

আভ্যন্তরীণ কারণগুলির মধ্যে সর্বপ্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, দিল্লী সুলতানি ছিল সামরিক শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, জনসাধারণের স্বাভাবিক আনুগত্য বা জাতীয়তাবোধের উপর নহে। সুলতানির নিরাপত্তা বা রক্ষার ব্যাপারে জনসাধারণের কোন প্রকার আগ্রহ ছিল না। জনসাধারণের এইরূপ নির্লিপ্ততার ফলে সুলতানি শাসনের ভিত্তি স্বভাবতঃই দুর্বল হইয়া গিয়াছিল। দুর্বল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বিশাল সাম্রাজ্যের বাহ্যিক রূপ যতটা প্রভুত্বব্যঞ্জক ছিল ঠিক সেই তুলনায় উহা ছিল শক্তিহীন, বলা বাহুল্য।

আভ্যন্তরীণ :

(১) সামরিক শক্তির উপর নির্ভরশীল সাম্রাজ্য

দ্বিতীয়তঃ, সুলতানি শাসন সামন্ত-প্রথা অনুসরণ করিয়া চলিত। সামন্ততান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় সহজাত ত্রুটি-ই ছিল এই যে, কেন্দ্রীয় শাসনে সামান্য দুর্বলতা দেখা দিলেই রাজ্যের বিভিন্ন অংশ স্বাধীন হইয়া যাইত। ফলে, একই স্থান পুনঃপুনঃ জয় করিবার অথবা ব্যাপক বিদ্রোহ দমন করিবার প্রয়োজন হইত। রাজকর্মচারিবর্গ, সামরিক নেতৃবর্গ ও প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণের ক্ষমতালিপ্সা ও স্বার্থপরতা এবং কেন্দ্রীয় শাসনের প্রতি অখণ্ড আনুগত্যের অভাব শাসন-ব্যবস্থায় দুর্বলতার সৃষ্টি করিত। স্বার্থান্বেষণে ব্যগ্র রাজকর্মচারিগণের উপর নির্ভরশীল শাসন-ব্যবস্থার সংহতি বিনষ্ট হইবে তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। মোহম্মদ তুঘ্‌লকের রাজত্বের শেষভাগে এইরূপ দুর্বলতার চরম প্রকাশ আমরা লক্ষ্য করি। সিন্ধুদেশ, বাংলা ও দাক্ষিণাত্য ঐ সময়েই স্বাধীন হইয়া গিয়াছিল।

(২) সামন্ত-তান্ত্রিক শাসনের সহজাত দুর্বলতা

তৃতীয়তঃ, সুলতানগণ ও অভিজাত শ্রেণীর নৈতিক অবনতি ও রাজসভার বিলাস-ব্যসন সমগ্র শাসন-ব্যবস্থাকে দুর্নীতিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল। একমাত্র আলা-উদ্দিন খল্‌জীর আমলে অভিজাত সম্প্রদায়ের বিলাস-ব্যসন বন্ধ ছিল,

(৩) সুলতানগণ ও অভিজাত শ্রেণীর নৈতিক অবনতি ও বিলাস-ব্যসন

কিন্তু অপরাপর সুলতানদের আমলে ব্যাপক বিলাসপ্রিয়তা ও দুর্নীতি সুলতানদের দেশশাসনের নৈতিক দাবি বিনষ্ট করিয়াছিল।

(৪) অকর্মণ্য ক্রীতদাসের সংখ্যা বৃদ্ধির কুফল

চতুর্থতঃ, সুলতানি আমলের শেষ দিকে ক্রীতদাসের সংখ্যা এত বেশি বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, তাহাদের ভরণপোষণে রাজকোষের প্রভূত পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হইত। ইহা ভিন্ন সুলতানদিগকে ক্রীতদাস উপঢৌকন দিয়া সামন্ত রাজগণ ও স্থানীয় শাসনকর্তাগণ তাঁহাদের প্রতিশ্রুত বাৎসরিক কর বা রাজস্বের পরিমাণ কমাইয়া লইতেন। ফলে, রাজস্বের পরিমাণ যথেষ্ট হ্রাস পাইয়াছিল। সুলতানি আমলের প্রথম দিকে ক্রীতদাসগণের মধ্য হইতে ইল্‌তুৎমিস্‌, বলবন, কুতব-উদ্দিনের ন্যায় সুদক্ষ শাসকের উদ্ভব হইয়াছিল বটে, কিন্তু পরবর্তী কালে ক্রীতদাসগণের মধ্য হইতে কোন উল্লেখযোগ্য শাসকের উদ্ভব ঘটে নাই।

(৫) পরবর্তী সুলতানগণের দুর্বলতা

পঞ্চমতঃ, সুলতানি আমলের শেষভাগের সুলতানগণের অধিকাংশ-ই যেমন ছিলেন শাসনকার্যে অক্ষম তেমনি ছিলেন নৈতিকতাবর্জিত। ইহার ফল শাসনকার্যের দুর্বলতায় পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল।

(৬) মোহম্মদ তুঘ্‌লকের আমলের অব্যবস্থা

ষষ্ঠতঃ, মোহম্মদ-বিন্‌-তুঘ্‌লকের অবাস্তব আদর্শবাদিতা ও অকার্যকর পরিকল্পনা প্রভৃতির ফলে সুলতানি সাম্রাজ্যের ভিত্তিই দুর্বল হইয়াছিল এমন নহে, সুলতান-পদের মর্যাদাও হ্রাস পাইয়াছিল। দাক্ষিণাত্য, বাংলা ও সিন্ধু কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া স্বাধীন হইয়া গিয়াছিল। এই পতনোন্মুখতা রোধ করিবার অথবা দিল্লী সুলতানিকে পুনঃ-সঞ্জীবিত করিবার ক্ষমতা পরবর্তী কোন সুলতানেরই ছিল না। সামরিকক্ষেত্রে অকর্মণ্য ফিরুজ তুঘ্‌লক বাংলাদেশ পুনরধিকার করিতে সক্ষম হন নাই। দাক্ষিণাত্য পুনরধিকারের চেষ্টাও তিনি করেন নাই। উপরন্তু তিনি জায়গীর প্রথার পুনঃপ্রবর্তন করিয়া ও অপাত্রে দয়া প্রদর্শন করিতে গিয়া সুলতানি শাসনকে অধিকতর দুর্বল করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার অযৌক্তিক উদারতায় অভিজাত শ্রেণী শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন।

সপ্তমতঃ, বিশাল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ হইতে আগত পর্যাপ্ত পরিমাণ

রাজস্ব, সুলতান, রাজকর্মচারিবর্গ ও অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা বৃদ্ধি করিয়াছিল। দেশরক্ষা বা জনকল্যাণের দায়িত্ব স্বভাবতঃই সকলে ভুলিয়া গিয়া দুর্নীতিপূর্ণ আনন্দে নিমজ্জিত রহিল। ফলে, ঐ সময়ে বিদেশী আক্রমণ শুরু হইলে স্বভাবতঃই তাঁহারা দেশরক্ষা করিতে সক্ষম হইলেন না।

(৭) বিদেশী আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার অক্ষমতা

সর্বশেষে, ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সুলতানদের অধিকাংশ-ই তাঁহাদের রাজনৈতিক বিচারবুদ্ধি ধর্মের দ্বারা আচ্ছন্ন হইতে দিয়াছিলেন। হিন্দুস্থানের সুলতানদের পক্ষে ধর্ম-নিরপেক্ষ শাসন পরিচালনার প্রয়োজন উপলব্ধি করিবার মতো রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি তাঁহারা প্রদর্শন করেন নাই। জিজিয়া কর স্থাপন ও প্রকাশ্যে পৌত্তলিক ধর্মপালন নিষেধ করিয়া অ-মুসলমান প্রজাবর্গের আনুগত্য তাঁহারা হারাইয়াছিলেন।

(৮) অ-মুসলমান প্রজাবর্গের প্রতি বিভেদমূলক ব্যবহার

দিল্লী সুলতানির পতনের বহিরাগত কারণ ছিল দুইটি। প্রথমতঃ, দিল্লী সুলতানি যখন পতনের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতেছিল তখন তৈমুর কর্তৃক ভারত আক্রমণ এবং দিল্লীতে লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড সুলতানির উপর যে আঘাত হানিয়াছিল তাহা হইতে রক্ষা পাওয়া সম্ভব ছিল না। তৈমুরের আক্রমণ ভারতের রাজনৈতিক সংহতি বিনাশ করিয়া দিল্লীর সুলতানির পতন ঘটাইয়াছিল।

বহিরাগত কারণ :
(১) তৈমুরের আক্রমণ

দ্বিতীয়তঃ, লোদী বংশের শাসনের দুর্বলতা, ইব্রাহিম লোদীর অত্যাচার ও অকর্মণ্যতা অভিজাত শ্রেণী ও তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে এক দারুণ অসন্তোষের সৃষ্টি করিয়াছিল। ইহার ফলে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খাঁ লোদী কাবুলের রাজা বাবরের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। বাবরের সাহায্যে দিল্লী সুলতানি দখল করা-ই ছিল দৌলত খাঁর উদ্দেশ্য, কিন্তু কার্যতঃ দেখা গেল সাহায্যকারী মিত্র হিসাবে বাবরকে আমন্ত্রণ করিয়া তিনি ভারতবর্ষের এক নূতন প্রভু আনয়ন করিয়াছিলেন। পানিপথের প্রথম যুদ্ধে (১৫২৬) জয়লাভ করিয়া বাবর দিল্লী সুলতানির তথা তুর্কী-আফগান শাসনের অবসান ঘটাইয়া মোঙ্গল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিলেন।

(২) বাবরের আক্রমণ

পঞ্চম অধ্যায়

স্থলতানি সাম্রাজ্য হইতে উদ্ভূত স্বাধীন রাজ্যসমূহ

(Independent Kingdoms out of the ashes of the Sultanate)

(১)

উত্তর-ভারতীয় রাজ্যসমূহ (Kingdoms of Northern India) :

স্থলতানির দুর্বলতার স্থযোগ লইয়া স্থলতানি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন সময়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিল, কিন্তু কিছুকাল স্বাধীনতা ভোগের পরই প্রায় সব কয়টি রাজ্যই মোঙ্গল সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া পড়ে। স্থলতানি সাম্রাজ্য হইতে স্বাধীনতা লাভ ও মোঙ্গল সাম্রাজ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অন্তর্বর্তী কালের ইতিহাস এই সকল রাজ্যের নিজস্ব স্বাধীন ইতিহাস। এই পৃথকভাবে আলোচনা করা সমীচীন।

দিল্লী স্থলতানির দুর্বলতা : স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব

ইতিহাস স্বভা

জৌনপুর (Jaunpur) : ১৩৯৪ খ্রীষ্টাব্দে মোহম্মদ-বিন্-তুঘ্‌লকের আমলে মালিক সারওয়ার নামক জনৈক ক্ষমতাবান খোজা (eunuch) জৌনপুরে এক স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। সারওয়ার তাঁহার রাজ্য পশ্চিমে আলিগড় ও পূর্বে তিরহুত পর্যন্ত বিস্তার করিয়াছিলেন। সারওয়ার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন রাজবংশ শর্‌কী (Sharqi) বংশ নামে পরিচিত। ১৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দে সারওয়ারের মৃত্যু হইলে তাঁহার দত্তক পুত্র মালিক করণফুল 'মোবারক শাহ্ শর্‌কী' নাম ধারণ করিয়া জৌনপুরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। সামান্য তিন বৎসর রাজত্বের পর ১৪০২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইব্রাহিম শাহ্ শর্‌কী সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইব্রাহিম শর্‌কী বংশের শ্রেষ্ঠ শাহ্ ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকাল সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির উন্নয়নের জন্য প্রসিদ্ধি

শর্‌কী বংশের প্রতিষ্ঠা

লাভ করিয়াছিল। তাঁহারই পৃষ্ঠপোষকতায় জৌনপুর মুসলমান শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার আমলে জৌনপুরে যে সকল মসৃজিদ ও হর্ম্যাদি নির্মিত হইয়াছিল সেগুলিতে হিন্দু স্থাপত্য শিল্পের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। অতাল মসৃজিদ (*Atala Masjid*) আজিও হিন্দু স্থাপত্য-প্রভাবিত মুসলমান নির্মাণশিল্পের নিদর্শন হিসাবে বিদ্যমান আছে। ইব্রাহিম বাংলাদেশের রাজা গণেশ-এর বিরুদ্ধে অভিযানে অগ্রসর হইয়া অকৃতকার্য হইয়াছিলেন। ১৪৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ইব্রাহিমের মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র মামুদ শাহ্ মালব ও দিল্লীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি চুণার জেলার অধিকাংশ নিজ রাজ্যভুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু কাল্পী জয় করিতে গিয়া তিনি অকৃতকার্য হন। দিল্লীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে গিয়া তিনি বহ্লুল লোদীর হস্তে পরাজিত হইয়াছিলেন। মামুদ শাহ্-এর মৃত্যুর (১৪৫৭) পর তাঁহার পুত্র মোহম্মদ শাহ্ সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই আততায়ীর হস্তে তিনি প্রাণ হারাইলে হুসেন শাহ্ (১৪৫৮—৭৯) সিংহাসনে আরোহণ করেন। হুসেন শাহ্ বহ্লুল লোদীর সহিত মিত্রতাবদ্ধ হন এবং তিরহুতের স্বাধীন জমিদারগণকে তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিতে বাধ্য করেন। তিনি উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া তথাকার হিন্দু-রাজার নিকট হইতে প্রভূত পরিমাণ ধনরত্ন লইয়া আসিয়াছিলেন। গোয়ালিওর দুর্গ আক্রমণে তিনি সম্পূর্ণভাবে কৃতকার্য হইতে না পারিলেও রাজা মানসিংহের নিকট হইতে প্রচুর পরিমাণ ক্ষতিপূরণ তিনি আদায় করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার পর তিনি বহ্লুল লোদীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহার সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটে এবং জৌনপুর পুনরায় দিল্লীর সুলতানি সাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত হয়।

ইব্রাহিম শর্কী—শর্কী বংশের শ্রেষ্ঠ 'শাহ্'

মামুদ শাহ্ ও মোহম্মদ শাহ্

হুসেন শাহ্

কাশ্মীর (Kashmir): প্রথমে কাশ্মীর দিল্লীর সুলতানি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল না বটে, কিন্তু ১৩১৫ খ্রীষ্টাব্দে শাহ্ মির্জা নামে জনৈক ভাগ্যান্বেষী মুসলমান কাশ্মীরের হিন্দুরাজার অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন এবং হিন্দুরাজার মৃত্যু হইলে বলপূর্বক সিংহাসন অধিকার করেন। শাহ্ মির্জা 'শামস্-উদ্দিন শাহ্' উপাধি ধারণ করিয়া কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ

করেন (১৩৪৬)। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার চারি পুত্র জামসিদ্, আলা-উদ্দিন, শিহাব-উদ্দিন ও কুতব-উদ্দিন পর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন। কুতব-উদ্দিনের মৃত্যুর পর (১৩৯৪) তাঁহার পুত্র সিকন্দর শাহ্ সিংহাসনে আরোহণ করেন।

কাশ্মীরে মুসলমান শাসনের গোড়াপত্তন

সিকন্দর শাহ্ ছিলেন হিন্দুবিদ্বেষী ও ধর্মোন্মত্ত অত্যাচারী শাসক। তাঁহার অত্যাচারে কাশ্মীরের হিন্দুগণ ইস্‌লাম ধর্মগ্রহণে বাধ্য হইয়াছিল। এইভাবে কাশ্মীর রাজ্যে মুসলমানদের যে সংখ্যাধিক্য ঘটে তাহাই কাশ্মীরের বর্তমান জনসংখ্যার মধ্যে মুসলমান সংখ্যাধিক্যের মূল কারণ। তৈমুর যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন তখন সিকন্দর শাহ্ তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। ১৪১৬ খ্রীষ্টাব্দে সিকন্দরের মৃত্যু হইলে তাঁহার প্রথম পুত্র আলি শাহ্ এবং পরে দ্বিতীয় পুত্র শাহী খাঁ সিংহাসনে আরোহণ করেন। শাহী খাঁ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া 'জৈন-উল্-আবিদীন' উপাধি গ্রহণ করেন।

সিকন্দর শাহের পরধর্ম-অসহিষ্ণুতা

কাশ্মীরের মুসলমান রাজগণের মধ্যে জৈন-উল্-আবিদীন ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তিনি ছিলেন প্রজা-হিতৈষী, উদারচেতা ও সুদক্ষ শাসক। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তিনি যে সকল ব্রাহ্মণ তাঁহার পিতার অত্যাচারে দেশত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে দেশে ফিরাইয়া আনেন। শুধু তাহাই নহে তিনি সকল ধর্মের লোককেই ধর্মপালনের চূড়ান্ত স্বাধীনতা দান করেন। তাঁহার প্রজাহিতৈষণা ও পরধর্ম-সহিষ্ণুতা মোগল সম্রাট আকবরের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। প্রজার মঙ্গলের জন্য জৈন-উল্-আবিদীন রাজপথে দস্যু-তস্করের উপদ্রব নিবারণ করেন। গ্রাম্য-শাসনভার তিনি গ্রামের প্রতিনিধিবর্গের উপর ন্যস্ত করেন। ইহা ভিন্ন মুদ্রানীতির উন্নতি সাধন করিয়া দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় সামগ্রীর চূড়ান্ত মূল্য নির্ধারণ করিয়া তিনি প্রজাবর্গের অশেষ উপকার করিয়াছিলেন। হিন্দুদের উপর হইতে জিজিয়া কর উঠাইয়া দিয়া প্রজামাত্রেরই অধিকার যে সমান সেই নীতি তিনি কার্যকরী করিয়াছিলেন।

জৈন-উল্-আবিদীন (১৪২০-৭০)

তাঁহার প্রজাহিতৈষী উদার নীতি

জৈন-উল্-আবিদীন নিজ মাতৃভাষা ভিন্ন হিন্দী, ফারসী ও তিব্বতীয় ভাষায়

যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। সাহিত্য ও সংস্কৃতির তিনি ছিলেন একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় সাহিত্য, শিল্প ও সঙ্গীত বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। তিনি সংস্কৃত মহাভারত ও রাজতরঙ্গিণী নামক কাশ্মীরের ইতিহাস ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করাইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন আরবী ও ফার্সী ভাষায় লিখিত বহু গ্রন্থ তিনি হিন্দী ভাষায় অনুবাদ করাইয়াছিলেন। তাঁহার উদারতা, প্রজাহিতৈষণা পরধর্ম-সহিষ্ণুতার জন্য তাঁহাকে 'কাশ্মীরের আকবর' (*The Akbar of Kashmir*) বলিয়া অভিহিত করা হয়।

সাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা : 'কাশ্মীরের আকবর'

জৈন-উল্-আবিদীন পরবর্তী রাজগণের অকর্মণ্যতা হেতু মির্জা হায়দর নামে মোগল সম্রাট হুমায়ুনের জনৈক আত্মীয় কাশ্মীর জয় করিতে সমর্থ হন (১৫৪০)। কয়েক বৎসর পরে (১৫৫৫) কাশ্মীরের অভিজাতবর্গ মির্জা হায়দরকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া চক্ বংশ (The Chakks) নামে এক নূতন বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দে কাশ্মীর মোঙ্গল সম্রাটের আধিপত্য স্বীকার করে।

মোঙ্গল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্তি

মালব (Malwa) : চতুর্দশ শতকের প্রারম্ভে (১৩০৫) আলা-উদ্দিন খল্জী মালবরাজ্য জয় করিয়াছিলেন। প্রায় এক শতাব্দী ধরিয়া দিল্লীর সুলতানের অধীন থাকিবার পর ১৪০১ খ্রীষ্টাব্দে তথাকার শাসনকর্তা দিলওয়ার খাঁ ঘুরী স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। দিলওয়ার খাঁ জাতিতে ছিলেন আফগান। অল্পকালের মধ্যেই হুসাং শাহ্ (Hushang Shah) কর্তৃক দিলওয়ার খাঁর পুত্র নিহত হন। হুসাং শাহ্ সিংহাসন অধিকার করিয়া রাজ্যবিস্তারে মনোযোগী হন। তিনি অতর্কিতে উড়িষ্যা রাজ্য আক্রমণ করিয়া তথাকার রাজার নিকট হইতে ৭৫টি হাতী আদায় করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন তিনি খের্ল (Kherl) জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দিল্লী, গুজরাট, বহ্মনী রাজ্য, জৌনপুর প্রভৃতি বিভিন্ন শক্তির সহিত তিনি ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রায় সকল যুদ্ধেই তিনি পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

হুসাং শাহের রাজ্যবিস্তার

হুসাং শাহের মৃত্যুর অল্পকাল পরই মামুদ খাঁ খল্জী মালবের সিংহাসন

অধিকার করিয়া লন। মামুদ ছিলেন হুসাং শাহের পুত্র গজনী খাঁর মন্ত্রী।

মালবে খলজী বংশের প্রতিষ্ঠা

মামুদ খাঁ খলজী গুজরাটের আহম্মদ শাহের আক্রমণ প্রতিহত করেন এবং দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিবার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হন। কিন্তু তাঁহার অভিযান বিফলতায় পর্যবসিত হয়। মেবারের রাণা কুম্ভ এবং বহ্‌মনী সুলতানদের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। মামুদ খলজী মালবের মুসলমান রাজবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি ছিলেন, সন্দেহ নাই।

মামুদ খলজী

শাসনকার্যের দক্ষতা, সামরিক প্রতিভা, ব্যবহারিক অমায়িকতা, সততা ও বিদ্যোৎসাহিতা তাঁহাকে সমসাময়িক সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন করিয়া তুলিয়াছিল।

পরবর্তী কালে মালবের মর্যাদা ও প্রতিপত্তি ক্রমেই হ্রাস পাইতে থাকে। মামুদ খলজী (২য়) মেবারের রাণা সংগ্রাম সিংহের হস্তে পরাজিত ও ধৃত হন। তাঁহার-ই রাজত্বকালে গুজরাটের শাসনকর্তা বাহাদুর শাহ্‌ মালব জয় করেন। ১৫৬১ খ্রীষ্টাব্দে আকবর কর্তৃক মালব দেশ বিজিত হওয়ার পূর্বেও সম্রাট হুমায়ুন ও শের শাহ্‌ মালব অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

আকবর কর্তৃক মালব বিজয় (১৫৬১)

গুজরাট (Gujrat): ১২৯৭ খ্রীষ্টাব্দে আলা-উদ্দিন খলজী গুজরাট দিল্লী সুলতানির অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন। প্রায় এক শতাব্দীর পর তথাকার প্রাদেশিক শাসনকর্তা জাফর খাঁ তুঘ্‌লক বংশের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন (১৪০১)। জাফর খাঁ সাময়িক কালের জন্য নিজ পুত্র তাতার খাঁ কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু দিল্লীর বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে তাতার খাঁর মৃত্যু হইলে জাফর খাঁ পুনরায় সিংহাসন লাভ করেন। এইবার তিনি সুলতান মুজফ্‌ফর শাহ্‌ নাম ধারণ করিয়া রাজত্ব করিতে থাকেন। মুজফ্‌ফর শাহ্‌ মালবের সুলতান হুসাং শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং ধার নামক স্থানটি অধিকার করেন। তিনি জৌনপুরের বিরুদ্ধেও সামরিক অভিযানে অগ্রসর হইয়াছিলেন। মুজফ্‌ফর শাহের পৌত্র আহ্‌মদ শাহ্‌ (১৪১১—৪২) অত্যন্ত ক্ষমতাশালী সুলতান ছিলেন। তিনি মালব, খান্দেশ

মুজফ্‌ফর শাহ্‌

আহ্‌মদ শাহ্‌

ও কতিপয় রাজপুত রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যবস্থার উন্নতি এবং বিচার-ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করিয়া দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনিই আহ্‌মদাবাদ শহরটি স্থাপন করিয়াছিলেন।

এই বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন আহ্‌মদ শাহের পৌত্র আবুল ফত খাঁ (**Abul Fath Khan**)। তিনি ইতিহাসে মামুদ বেগরহা (**Mahmud Begarha**) নামে পরিচিত। তিনি মালবদেশের সহিত যুদ্ধ করিয়া গিরনার ও চম্পানীর জয় করেন। তিনি জগৎ (দ্বারকা) নামক স্থানের দস্যুদের সম্পূর্ণভাবে দমন করিয়া ঐ অঞ্চলে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনেন। তাঁহার আমলে গুজরাট রাজ্য সর্বাধিক বিস্তারলাভ করিয়াছিল। কেবল রাজ্য বিস্তার করিয়াই মামুদ বেগরহা ক্ষান্ত ছিলেন না, প্রজার মঙ্গল সাধন, ন্যায্য বিচার এবং ইস্‌লাম ধর্ম প্রবর্তনের জন্যও তিনি অক্লান্ত চেষ্টা করিতেন। তিনি মিশরের সুলতানের সহিত যুগ্মভাবে পোর্তুগীজ জলদস্যুদের দমন করিতে চেষ্টা করেন। ১৫০৮ খ্রীষ্টাব্দে মিশর ও গুজরাটের এক যুগ্ম নৌবাহিনী বোম্বাই-সন্নিকটে এক জলযুদ্ধে পোর্তুগীজদের পরাজিত করিয়াছিল। কিন্তু পর বৎসর (১৫০৯) পোর্তুগীজ নৌবাহিনী এই যুগ্ম বাহিনীকে পরাজিত করে এবং ইহার ফলে পোর্তুগীজগণ মামুদ বেগরহা-এর নিকট হইতে দিউ (Diu) নামক স্থানে কুঠি স্থাপনের অধিকার লাভ করে।

মামুদ বেগরহা

পোর্তুগীজ দমন

পরবর্তী সুলতানগণ—দ্বিতীয় মুজফ্‌ফর শাহ্‌ ও বাহাদুর শাহ্‌ রাজপুতদের সহিত ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া চলিয়াছিলেন। বাহাদুর শাহ্‌ চিতোর বিধ্বস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন (১৫৩৪)। তিনি মালব জয় করিয়া গুজরাট রাজ্যের সীমা আরও বৃদ্ধি করেন। কিন্তু মোগল সম্রাট হুমায়ুনের হস্তে পরাজিত হইয়া তিনি মালব ও নিজ রাজ্যের একাংশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। শের শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধকালীন হুমায়ুন মালব ও গুজরাটের একাংশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে বাহাদুর শাহ্‌ পুনরায় সেই সকল স্থান নিজ অধিকারভুক্ত করেন। বাহাদুর শাহ্‌-ই ছিলেন গুজরাটের শেষ স্বাধীন সুলতান। তিনি পোর্তুগীজদের জলদস্যুতা দমনের উদ্দেশ্যে পোর্তুগীজ গবর্ণর নুনহো দা কুনহা (**Nunho da Cunnha**)-র সহিত সাক্ষাতের জন্য এক পোর্তুগীজ

দ্বিতীয় মুজফ্‌ফর শাহ্‌ ও বাহাদুর শাহ্‌

জাহাজে উঠিলে পোর্তুগীজরা তাঁহাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করে এবং তাঁহার অনুচরদেরও হত্যা করে। বাহাদুর শাহের পরবর্তী সুলতানদের স্বাধীনভাবে শাসন পরিচালনার ক্ষমতা ছিল না। সেই সুযোগে অভিজাতবর্গ শাসনক্ষমতা হস্তগত করিয়াছিল। ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে আকবর গুজরাট মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করেন।

পোর্তুগীজদের।
বিশ্বাসঘাতকতা

(২)

বাংলাদেশের ইতিহাস (History of Bengal): সুলতানি শাসনের চরম প্রতিপত্তিকালেও বাংলাদেশের উপর দিল্লীর সম্পূর্ণ প্রাধান্য স্থাপন সম্ভব হয় নাই। দিল্লী হইতে বাংলাদেশের দূরত্বই ইহার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল সেবিষয়ে সন্দেহ নাই।

ইখ্‌তিয়ার উদ্দিন মহম্মদ-বিন্ বখ্‌তিয়ার খল্‌জী (Ikhtyar Uddin Muhammad-Bin Bakhtyar Khalji): বাংলাদেশে মুসলমান আধিপত্যের পোড়াপত্তন করিয়াছিলেন ইখ্‌তিয়ার উদ্দিন মহম্মদ-বিন্ বখ্‌তিয়ার খল্‌জী। প্রথম জীবনে বখ্‌তিয়ার খল্‌জী ভাগ্যান্বেষী সৈনিকের ন্যায় গজনীতে শিহাবুদ্দিন ঘুরীর সেনাবাহিনীতে চাকরি গ্রহণের চেষ্টা করিয়া বিফলমনোরথ হন। ইহার পর দিল্লীতে মহম্মদ ঘুরীর প্রতিনিধি কুতব-উদ্দিন আইবকের সভায় আসিয়াও তিনি নিরাশ হন। অবশেষে বদাউন প্রদেশের শাসনকর্তার অধীনে কিছুকাল বেতনভোগী সৈনিক হিসাবে কাজ করিয়া তিনি অযোধ্যার শাসনকর্তা মালিক হুসাম-উদ্দিনের অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন (১১৯৭ খ্রীঃ)। হুসাম-উদ্দিন তাঁহাকে বর্তমান মির্জাপুর জেলার একাংশে দুইটি ক্ষুদ্র পরগণার জায়গীর দান করেন। এই অঞ্চলের জায়গীরদার হিসাবে অবস্থান কালেই মহম্মদ বখ্‌তিয়ারের রাজ্যজয়ের আকাঙ্ক্ষা ও সুযোগ বৃদ্ধি পায়। পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের গহড়বার নেতৃবর্গকে পরাজিত করিয়া বখ্‌তিয়ার খল্‌জী প্রথমেই নিজ জায়গীরের সীমা প্রসারিত করেন। তারপর কর্মনাশা নদীর পূর্বতীর ধরিয়া তিনি বর্তমান বিহার অঞ্চলের দিকে অভিযান শুরু করেন। সেই সময় খল্‌জী ও তুর্কী মালিকদের অনেকেই ভারতে ভাগ্যান্বেষণে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন বখ্‌তিয়ার খল্‌জীর ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার অধীনে চাকরি

প্রথম জীবন

ভাগ্যান্বেষী সৈনিক

দক্ষিণ-বিহারে অভিযান

গ্রহণ করিলে তাঁহার শক্তি আরও বৃদ্ধি পাইল। যাহা হউক, বখ্‌তিয়ার খলজী উত্তর বিহারে কর্ণাটক বংশের অধীন শক্তিশালী মিথিলা রাজ্যের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে সাহসী হইলেন না। তিনি দক্ষিণ-বিহারের দিকে অভিযান শুরু করিলেন। কুতব উদ্দিন অইবক্ মহম্মদ বখ্‌তিয়ারের নেতৃত্বে ইস্‌লামের সাফল্যে আনন্দিত হইয়া তাহাকে 'খিলাৎ'* প্রেরণ করিলেন। মহম্মদ বখ্‌তিয়ার কিন্তু ইস্‌লামের প্রসারের উদ্দেশ্যে সামরিক অভিযানে অগ্রসর হন নাই। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল যথাসম্ভব অল্প সময়ে এবং অল্প রক্তপাত করিয়া অধিক পরিমাণ লুণ্ঠিত দ্রব্য আত্মসাৎ করা।† তিনি দক্ষিণ-বিহার অঞ্চলে একটি সুরক্ষিত 'বিহার' (Hisar-i-Bihar) অধিকার করিয়া উহার অভ্যন্তরস্থ যাবতীয় লোককে হত্যা করিলেন (১১৯৯ খ্রীঃ)। এই বিহারটি ছিল 'ওদন্ত-পুর বিহার' নামে পরিচিত। এই 'বিহার' নাম হইতেই মুসলমানগণ বিহার প্রদেশের নামকরণ করিয়াছিল।††

অভিযানের উদ্দেশ্য

দক্ষিণ-বিহারে মুসলমান অধিকার স্থাপন

পরবৎসর (১২০০ খ্রীঃ) মহম্মদ বখ্‌তিয়ার পুনরায় দক্ষিণ-বিহারের দিকে সামরিক অভিযানে অগ্রসর হইয়া সেই অঞ্চলে স্থায়ী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে কয়েকটি সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বেসামরিক শাসনকার্যও শুরু করিলেন। ইহা হইতে একথা স্বভাবতই মনে করা যাইতে পারে যে, ১২০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই মহম্মদ বখ্‌তিয়ার দক্ষিণ-বিহারের কতকাংশে নিজ অধিকার বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।**

---

*"Malik Qutbuddin Aibak is said to have hailed the rising star of Islam (Muhammad Bakhtyar) by sending him a *khilat* with words of praise and encouragement." *History of Bengal* (D.U.) vol II, pp. 2-3.

† Muhammad Bakhtyar was not the knight-errant of Islam to seek out and fight only his most formidable Hindu adversaries of whom there were several in the neighbourhood......His object was to secure a maximum of booty at a minimum of risk and bloodshed." *History of Bengal,* vol II, (D.U), p. 3.

†† "As the Muslims learnt afterwards that is was a *Vihara* or *Madrasa* they gave the whole country the name of Bihar...... The fortified monastery which Bakhtiyar captured probably in 1199 A.D. was known as *Audand Bihar or Odandapura-Vihara."* *History of Bengal* (D.U.) vol II. p. 3.

** *Riyaz-us-Salatin* quoted in *History of Bengal* (D.U.) vol II, p. 3.

পরবৎসর (১২০১ খ্রীঃ) মহম্মদ বখ্‌তিয়ার খল্‌জী লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী নদীয়ার দিকে অগ্রসর হইলেন। একদিন শীতের মধ্যাহ্নে মাত্র ১৮ জন* অশ্বারোহী অনুচরসহ বখ্‌তিয়ার নদীয়ার তোরণদ্বারে উপস্থিত হইলেন। বণিকের ছদ্মবেশে নগরে প্রবেশ করিতে তাহাদের কোন অসুবিধা হইল না।

মহম্মদ বখ্‌তিয়ার খল্‌জীর নদীয়া আক্রমণ

লক্ষ্মণ সেনের প্রাসাদের সম্মুখে আসিয়া তাহারা আকস্মিক-ভাবে তরবারি বাহির করিয়া আক্রমণ শুরু করিলে প্রাসাদের অভ্যন্তরে ও বাহিরে এক দারুণ ভীতি ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইল। লক্ষ্মণ সেন রাজধানী রক্ষা করা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া নৌকাযোগে গোপনপথে পূর্ববঙ্গে পলায়ন করিলেন।

বাংলাদেশে মুসলমান অধিকার স্থাপন

ইতিমধ্যে মহম্মদ বখ্‌তিয়ার খল্‌জীর সেনাবাহিনী আসিয়া উপস্থিত হইলে সমগ্র নদীয়া নগরটি বখ্‌তিয়ারের অধিকারে আসিল। এইভাবে বাংলাদেশে হিন্দু আধিপত্যের অবসান ঘটিয়া মুসলমান আধিপত্য স্থাপিত হইল। পূর্ববঙ্গে অবশ্য লক্ষ্মণ সেন ও তাঁহার বংশধরগণ আরও দীর্ঘকাল ধরিয়া নিজেদের স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া চলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

মহম্মদ বখ্‌তিয়ার কর্তৃক লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী নদীয়া জয় ও পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান অধিকার স্থাপনের বিবরণ সম্পর্কে ইতিহাস রচয়িতাদের মধ্যে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। তবকৎ-ই-নাসিরী, ফতুয়া-উস্‌-সালাতিন, রিয়াজ-উস্‌-সালাতিন প্রভৃতি ইতিহাস গ্রন্থে পরস্পর-বিরোধী বিবরণ রহিয়াছে।

মিন্‌হাজের বিবরণ : মহম্মদ বখ্‌তিয়ারের নদীয়া আক্রমণ

মিন্‌হাজ-উদ্দিন তাঁহার 'তবকৎ-ই-নাসিরী' গ্রন্থে মহম্মদ বখ্‌তিয়ারের নদীয়া জয় সম্পর্কে এক কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই কাহিনীতে উল্লেখ আছে যে, বখ্‌তিয়ার কর্তৃক বিহার জয়ের কথা লক্ষ্মণ সেন ও তাঁহার প্রজাবর্গ জানিবার পর তাঁহার মন্ত্রী, জ্যোতিষী, সকলেই তাঁহাকে নদীয়া ত্যাগ করিয়া যাইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ সেন অবশ্য এই কাপুরুষোচিত উপদেশে কর্ণপাত করেন নাই। তাঁহার মন্ত্রীদের কেহ কেহ, ধনী বণিক সম্প্রদায়, ধর্মভীরু ব্রাহ্মণগণ প্রভৃতি অনেকেই পূর্বাহ্নেই পলাইয়া গিয়া পূর্ববঙ্গ, আসাম

* ১৮ জন অশ্বারোহী অনুচরসহ বখ্‌তিয়ার খল্‌জি, অর্থাৎ মোট ১৯ জন (১৮+১)। Vide *History of Bengal* (D.U) vol. I, p. 243, vol II, p. 4.

প্রভৃতি অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এমতাবস্থায়ও বৃদ্ধ লক্ষ্মণ সেন নিজ রাজধানী ত্যাগ করিয়া যান নাই। এইরূপ পরিস্থিতিতে একদিন দ্বিপ্রহরে রাজা লক্ষ্মণসেন যখন মধ্যাহ্নাহারে বসিয়াছেন সেই সময়ে মহম্মদ বখ্‌তিয়ার ১৮ জন অশ্বারোহী সৈন্য সহ রাজধানীর তোরণদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহম্মদ বখ্‌তিয়ারের বিশাল বাহিনীর অন্য সকলে তখনও পশ্চাতে ছিল, কারণ তাহারা বখ্‌তিয়ার-এর সহিত অশ্বচালনায় পাল্লা দিতে পারে নাই। মাত্র ১৮ জন অশ্বারোহী তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে সক্ষম হইয়াছিল।* রাজধানী রক্ষা করা অসম্ভব দেখিয়া লক্ষ্মণসেন গোপনপথে নগ্নপদে রাজধানী ত্যাগ করিয়া গেলেন।†

লক্ষ্মণ সেনের নদীয়া ত্যাগ

আধুনিক ঐতিহাসিকগণ মিন্‌হাজের এই বিবরণ সম্পূর্ণভাবে ইতিহাস-সম্মত বলিয়া মনে করেন না। মহম্মদ বখ্‌তিয়ার কর্তৃক বিহার অধিকৃত হইবার সংবাদ পাইবার পরও লক্ষ্মণ সেন দেশরক্ষা বিশেষভাবে রাজধানী রক্ষার কোন ব্যবস্থা করেন নাই, একথা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। যাহা হউক, মিন্‌হাজ-উদ্দিন, 'ফতুয়া-উস্‌-সালাতিনে'র রচয়িতা ইসামির রচনায় একথা স্পষ্টভাবেই উল্লিখিত আছে যে, মহম্মদ বখ্‌তিয়ার খল্‌জী ছদ্মবেশে নদীয়া নগরীতে প্রবেশ করিয়া অতর্কিতে আক্রমণ করিয়াছিলেন। ইসামির বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, মহম্মদ বখ্‌তিয়ার বণিকের ছদ্মবেশে রাজা লক্ষ্মণ সেনকে উপঢৌকন দিতে গিয়া নিজের অনুচরবর্গকে হিন্দুদিগের উপর আক্রমণ শুরু করিবার ইঙ্গিত করেন। হিন্দুগণ এইভাবে অতর্কিতে আক্রান্ত হইয়াও রাজা লক্ষ্মণ সেনের চতুর্দিকে দাঁড়াইয়া তাঁহার নিরাপত্তা রক্ষা করিয়া এবং মুসলমান আক্রমণ প্রতিহত করিয়া চলিল। তাহাদের পার-দর্শিতায় মুসলমান সৈনিকদের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হইল। তারপর মহম্মদ খল্‌জীর অনুচরগণ যখন একই সঙ্গে হিন্দু সৈনিকদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল

আধুনিক ঐতিহাসিকদের মত

মিন্‌হাজ ও ইসামির বর্ণনার সামঞ্জস্য

ইসামির বিবরণ

---

* Minhaj, Tabaqat-i-Nasiri, quoted in *History of Bengal* (D.U,) vol. I, p. 243

† Ibid, p. 243.

তখন তাহারা আর আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইল না। রাজা লক্ষ্মণ সেন মহম্মদ বখ্‌তিয়ারের হস্তে বন্দী হইলেন।*

যাহা হউক, মিন্‌হাজ-ই-সিরাজ ও ইসামির বিবরণ হইতে মহম্মদ বখ্‌তিয়ার ছদ্মবেশে নদীয়া নগরীতে প্রবেশ করিয়া অতর্কিতে লক্ষ্মণ সেনের প্রাসাদ আক্রমণ করিয়াছিলেন এই কথা :নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। ইহা ভিন্ন ১৮ জন অনুচর সহ মহম্মদ বখ্‌তিয়ার বাংলাদেশ জয় করিয়াছিলেন একথাও যে সত্য নহে তাহা মিন্‌হাজ-উদ্দিনের বর্ণনা হইতে প্রমাণিত হয়। মধ্যাহ্নকালে স্নানাহারের সময় বাংলাদেশের সর্বত্র (অন্ততঃ সেই যুগে) শিথিলতা দেখা দিত। মহম্মদ বখ্‌তিয়ার এইরূপ সময়ে নদীয়া আক্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার পক্ষে উহা অধিকার করা সহজ হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন তিনি যখন ১৮ জন অশ্বারোহী অনুচর সহ প্রাসাদদ্বারে উপস্থিত হইয়াছিলেন সেই সময়ে তাঁহার অশ্বারোহীদের অপর একদল নগরের মধ্যস্থল এবং তৃতীয় দল তোরণদ্বার পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়া গিয়াছিল। কারণ, মহম্মদ বখ্‌তিয়ার যখন আক্রমণ শুরু করেন তখন একই সঙ্গে রাজপ্রাসাদের সম্মুখ, নগরের মধ্যস্থল এবং তোরণদ্বার—এই তিন অংশ হইতে আক্রমণসূচক ধ্বনি উত্থিত

মিন্‌হাজ ও ইসামির বিবরণের প্রকৃত মূল্য

* ..."Muhammad Baktyar reached Nadia in the disguise of the leader of a merchant caravan from Seistan and induced Rai-Lakhmaniya to come out of the palace to impact the thorough-bred Tartar horses and excellent brocade of China, besides vast stores of the rare products of every clime which he had brought for sale. When the Rai reached the *Karwan* (halting place of the caravans) Muhammad offered him a rich *peshkash* of precious things and at the same time made a signal to a party of his soldiers to fall upon the Hindus. The Turks charged and defeat befell the Hindu soldiers a party of whom, however, stood their ground firmly around the Rai which created alarm among the Turks....At last when the brave warriors of the Khilji breed made a hurricane-like onslaught and killed some Hindu *Sawars*, the Rai fell a prisoner to Bakhtyar".—Isami : *Futuh-us Salatin*. Vide *History of Bengal* (D.U.) vol. II. pp. 4-5.

হইয়াছিল। সুতরাং মাত্র ১৮ জন অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া আসিয়া বখ্‌তিয়ার খল্‌জী বাংলাদেশ জয় করিয়াছিলেন এই কিম্বদন্তী নিছক কিম্বদন্তী ভিন্ন অপর কিছু নহে।*

মিন্‌হাজ-ই-সিরাজ লক্ষ্মণ সেনকে উদারচেতা, দয়াবান ও পরাক্রমশালী 'রায়' অর্থাৎ 'রাজা' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, নবীনচন্দ্র সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতির রচনায় লক্ষ্মণ সেনের প্রকৃত চরিত্র অঙ্কিত হয় নাই। ঐতিহাসিক তথ্যের উপর নির্ভর না করিয়া তাঁহারা লক্ষ্মণ সেনকে দুর্বলচিত্ত, কাপুরুষ হিসাবে বর্ণনা করিয়া বীরের প্রতি অবিচার করিয়াছেন।†

বাংলাদেশে মুসলমান আধিপত্য

ক্রমে পূর্ববঙ্গ ভিন্ন বাংলাদেশের অপরাপর অংশেও মুসলমান অধিকার বিস্তৃত হয়। বাংলার প্রথম মুসলমান শাসনকর্তা ছিলেন ইখ্‌তিয়ার-উদ্দিন। তাঁহার শাসনব্যবস্থা কতকটা দলীয় সামন্ত-প্রথার ন্যায় ছিল। তাঁহার রাজধানী ছিল লক্ষ্মণাবতী।

ইখ্‌তিয়ার-উদ্দিনের মৃত্যুর পর আলি মর্দান বাংলাদেশের শাসন সাময়িক-কালের জন্য হস্তগত করেন। ইহার পর মহম্মদ বখ্‌তিয়ার তিব্বত জয় করিবার জন্য অভিযান প্রেরণ করেন। কিন্তু এই অভিযান সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়। এই অভিযানের ব্যর্থতার ফলে মহম্মদ বখ্‌তিয়ারের শক্তি-সামর্থ্য ও সম্মান ক্ষুণ্ণ হইলে বিহার তাঁহার অধিকারচ্যুত হইয়া পড়ে। এমতাবস্থায় তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িলে আলি মর্দান খল্‌জী তাঁহাকে হত্যা করেন বলিয়া কথিত আছে।†† (১২০৬ খ্রীঃ)। কিন্তু মহম্মদ বখ্‌তিয়ার খল্‌জীর অনুগত খল্‌জী মালিক ইয়াজ-উদ্দিন মহম্মদ শিবান ১২০৭ খ্রীষ্টাব্দে আলি মর্দানকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া খল্‌জী মালিকদের ইচ্ছাক্রমে বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু মহম্মদ ঘুরীর মৃত্যুর পর তাঁহার প্রতিনিধি কুতব-উদ্দিন আইবক্ স্বাধীন সুলতানপদ গ্রহণ করিলে আলি মর্দান বন্দিদশা হইতে পলাইয়া গিয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করেন। আলি মর্দানের অনুরোধে সুলতান কুতব-উদ্দিন

---

* *Vide History of Bengal* (D.U.) vol. II. pp. 6-8,

† Vide *History of Bengal* (D.U.) vol. I, pp. 246-47.

†† Vide *History of Bengal* (D.U.) vol. II pp. 10-11.

অযোধ্যার শাসনকর্তা রুমিকে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অভিযানে প্রেরণ করেন। রুমি ইয়াজ-উদ্দিন মহম্মদ শিবানের স্থলে হুসাম-উদ্দিন ইয়াজকে বাংলাদেশের শাসনকর্তা-পদে স্থাপন করেন (১২০৮)। ইহার অল্পকাল পর আলি মর্দান কুতব-উদ্দিনের পার্শ্বচর হিসাবে গজনীর তাজ-উদ্দিন ইল্‌দিজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া শেষ পর্যন্ত ইল্‌দিজের সেনাবাহিনীর হস্তে বন্দী হন। ১২১০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বন্দিদশা হইতে মুক্ত হইয়া পুনরায় কুতব-উদ্দিনের সহিত মিলিত হন।

কুতব-উদ্দিনের পার্শ্বচর হিসাবে আলি মর্দান

আলি মর্দানের বীরত্বে ও আনুগত্যে প্রীত হইয়া কুতব-উদ্দিন তাঁহাকে লক্ষ্মণাবতীর অর্থাৎ বাংলাদেশের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। হুসাম-উদ্দিন ইয়াজ কুতব-উদ্দিনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আলি মর্দানের লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্তৃপদ গ্রহণে প্রকাশ্য বাধার সৃষ্টি করিলেন না। পরবর্তী দুই বৎসর ১২১০-১২১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আলি মর্দান এক অত্যাচারী শাসন চালাইয়া দেশের অভ্যন্তরে এবং বাহিরে এক দারুণ ভীতির সৃষ্টি করিলেন। ইতিমধ্যে কুতব-উদ্দিনের মৃত্যু হইলে মুলতান ও সিন্ধু-প্রদেশের শাসনকর্তা নাসির-উদ্দিন কুবাচার ন্যায় আলি মর্দানও স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন এবং 'সুলতান' উপাধি ধারণ করিলেন। তাঁহার নূতন নাম হইল 'সুলতান আলা-উদ্দিন'। কিন্তু আলি মর্দানের (সুলতান আলা-উদ্দিন) অত্যাচারী শাসনের ফলে তাঁহার অনুচরদের মধ্যেই প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। এই সুযোগে হুসাম-উদ্দিন ইয়াজ গোপনে ষড়যন্ত্র করিয়া আলি মর্দানকে হত্যা করিলেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে পুনরায় বাংলার শাসনভার গ্রহণ করিলেন (১২১৩ খ্রীঃ)।

আলি মর্দানের স্বাধীনতা ঘোষণা

তাঁহাব মৃত্যু

সুলতান গিয়াস-উদ্দিন ইওয়াজ খলজী, ১২১৩-২৭ (Sultan Ghyasuddin Iwaz khilji 1213-27) : সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই গিয়াস-উদ্দিন শাসনব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করিতে মনোনিবেশ করিলেন। এমন সময়ে উড়িষ্যার গঙ্গবংশীয় সম্রাট তৃতীয় অঙ্গভীমের সেনাপতি ও মন্ত্রী বিষ্ণু রাঢ় আক্রমণ করেন। তিনি বীরভূমের লক্‌নোর নামক স্থানটি অধিকার করিতে সমর্থ হন। বিষ্ণুর হস্তে পরাজিত হইবার পর মুসলমান সৈনিকদের মধ্যে এক হতাশা দেখা দেয়। যাহা হউক, সৈনিকদের মধ্যে জেহাদের জিগীর তুলিয়া এবং সুলতানের তথা ইসলামের মর্যাদা রক্ষায়

তাঁহার সমস্যা

কথা বলিয়া তাহাদের মনে কতকটা উৎসাহের সৃষ্টি করা হইল। আনুমানিক ১২১৪ খ্রীষ্টাব্দে গিয়াস-উদ্দিন লক্‌নোর পুনরুদ্ধার করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। দীর্ঘকাল যুদ্ধের পর লক্‌নোর গিয়াস-উদ্দিন কর্তৃক পুনরধিকৃত হইল। মিন্‌হাজ-উদ্দিনের রচনায় উল্লিখিত আছে যে, গিয়াস-উদ্দিন লক্‌নোর পুনরুদ্ধার করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি অজয় নদীর তীর হইতে শুরু করিয়া দামোদর নদী ও বিষ্ণুপুর পর্যন্ত নিজ রাজ্যসীমা বিস্তার করিলেন। মিন্‌হাজ-উদ্দিনের মতে বঙ্গ (পূর্ববঙ্গ), কামরূপ ও তিরহুত গিয়াস-উদ্দিনকে নিয়মিত কর প্রেরণ করিত। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ এই উক্তি সম্পূর্ণভাবে সত্য বলিয়া মনে করেন না।* যাহা হউক, গিয়াস-উদ্দিন যে সমগ্র বাংলাদেশের উপর আধিপত্য বিস্তারে সচেষ্ট ছিলেন এবং দক্ষিণ-বিহার পুনর্দখল করিয়াছিলেন সেবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। তাঁহার রাজ্য লক্ষ্মণাবতী, পূর্ণিয়া, তাজপুর, পাঞ্জরা, ঘোড়াঘাট, বর্তমান বগুড়া ও রাজসাহীর কতকাংশ, টাণ্ডা, শরিফাবাদ, সুলেমানাবাদ, দক্ষিণ-বিহার প্রভৃতি কতকগুলি সরকারে বিভক্ত ছিল।† তিনি তাঁহার রাজধানী গৌড়ে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। গিয়াস-উদ্দিনের রাজত্বকালে বাংলা ও বিহারের যে সকল অংশ তাঁহার রাজ্যভুক্ত ছিল সেগুলিতে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় ছিল। গিয়াস-উদ্দিন গৌড়কে বাৎসরিক প্লাবন হইতে রক্ষা করিবার জন্য বাঁধ নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন এবং দেবকোট ও লক্‌নোর শহর দুইটিকে গৌড়ের সহিত প্রশস্ত রাস্তা, খেয়া প্রভৃতি দ্বারা সংযুক্ত করিয়াছিলেন। এইভাবে ১২২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত গিয়াস-উদ্দিন দক্ষতার সহিত রাজত্ব করার পর, ঐ বৎসর দিল্লী সুলতান ইল্‌তুৎমিস্ বাংলা ও বিহার জয় করিবার উদ্দেশ্যে সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। গিয়াস-উদ্দিনও ইল্‌তুৎমিস্‌কে বাধাদানের উদ্দেশ্যে পদাতিক ও নৌবাহিনী সহ অগ্রসর হইলেন। মুঙ্গের অথবা শকৃরিগলি ও তেলিয়াগড়ির নিকটে ইল্‌তুৎমিসের অগ্রগতি প্রতিহত হইল। গিয়াস-উদ্দিন ও ইল্‌তুৎমিসের মধ্যে এক চুক্তি

লক্‌নোর পুনরধিকার

তাঁহার রাজ্যসীমা

রাজধানীর নিরাপত্তা বিধান

ইল্‌তুৎমিসের বিহার ও বাংলা আক্রমণ

---

* Vide *History of Bengal* (D. U.) vol. II. pp. 22-23.

† Vide *History of Bengal* (D.U.) vol. II. p. 29.

স্বাক্ষরিত হইল। গিয়াসউদ্দিন ইল্‌তুৎমিসের আনুগত্য স্বীকার করিয়া লইলেন। ইহার পর ইল্‌তুৎমিস আলা-উদ্দিন জানি নামে জনৈক মালিককে বিহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে গিয়াস-উদ্দিন আলা-উদ্দিন জানিকে বিতাড়িত করিয়া বিহার পুনর্দখল করিলেন।

এদিকে অযোধ্যায় পৃথু নামে জনৈক নেতার নেতৃত্বে হিন্দুগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে ইল্‌তুৎমিস্ নিজ পুত্র নাসির-উদ্দিন মামুদকে অযোধ্যার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু তাঁহার মূল উদ্দেশ্য ছিল নাসির-উদ্দিনের অধীনে গিয়াস-উদ্দিনের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করা। নাসির-উদ্দিন অযোধ্যায় আভ্যন্তরীণ গোলযোগ দমনে ব্যস্ত আছেন ভাবিয়া গিয়াস-উদ্দিন পূর্ববঙ্গ জয় করিবার উদ্দেশ্যে অভিযানে অগ্রসর হইলেন। ঠিক সেই সুযোগে নাসির-উদ্দিন বাংলাদেশে সসৈন্যে প্রবেশ করিলেন। গিয়াস-উদ্দিন পূর্ববঙ্গ হইতে সামান্য সংখ্যক সৈন্য সহ দ্রুত ফিরিয়া আসিয়া গৌড়ের অনতিদূরে নাসির-উদ্দিনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইয়া নাসির-উদ্দিনের হস্তে অনুচরগণসহ বন্দী হইলেন। নাসির-উদ্দিনের আদেশে তাঁহার শিরশ্ছেদ করা হইল (১২২৭ খ্রীঃ)।

ইল্‌তুৎমিসের পুত্র নাসির-উদ্দিনের হস্তে গিয়াস-উদ্দিনের পরাজয় ও প্রাণনাশ

বলবন আমিন খাঁকে তুঘ্‌রিল খাঁর বিরুদ্ধে এক বিশাল সেনাবাহিনীসহ প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তুঘ্‌রিল খাঁ আমিন খাঁকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিতে সমর্থ হইলেন। পর বৎসর বলবন তুঘ্‌রিলের বিরুদ্ধে অপর এক সামরিক অভিযান প্রেরণ করিলেন। কিন্তু এই অভিযানও ব্যর্থ হইলে বলবন স্বয়ং সসৈন্যে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। তুঘ্‌রিল খাঁ জাজনগর (বর্তমান উড়িষ্যা)-এর এক অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, কিন্তু সুলতানি সৈন্য কর্তৃক ধৃত ও নিহত হইলেন। বলবন নিজ পুত্র বুগ্‌রা খাঁকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন (১২৮১ খ্রীঃ)।

বলবনের আমলে বাংলাদেশ

বুগ্‌রা খাঁ—সুলতান নাসির-উদ্দিন, ১২৮২-১২৯০ খ্রীঃ (Bughra Khan—Sultan Nasiruddin, 1282-90) : বলবনের পুত্র বুগ্‌রা খাঁ

সামান প্রদেশের (বর্তমান পাতিয়ালা রাজ্য) শাসনকর্তা হিসাবে তাঁহার কর্মজীবন শুরু করেন। বাংলাদেশে তুঘ্‌রিল খাঁ স্বাধীনতা ঘোষণা করিলে ১২৮২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁহার পিতার সঙ্গে অভিযানে আসেন। তুঘ্‌রিল খাঁর পরাজয়ের পর বুগ্‌রা খাঁকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। গিয়াস-উদ্দিন বলবন নিজ পুত্রের কর্তব্যকার্যে অবহেলা এবং আমোদ-প্রমোদ প্রিয়তার কথা জানিতেন। এজন্য তিনি দুইজন পরামর্শদাতাকে বুগ্‌রা খাঁর শাসনকার্যে যথাযথ পরামর্শ দিবার জন্য রাখিয়া গিয়াছিলেন। এই দুইজন পরামর্শদাতারই নাম ছিল ফিরুজ।* ইহা ভিন্ন তিনি বাংলা পরিত্যাগ করিবার পূর্বে বুগ্‌রা খাঁকে কতক উপদেশ লিখিতভাবে দিয়া গিয়াছিলেন। এই লিখিত উপদেশে তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া একথাও উল্লেখ করিয়াছিলেন যে, বুগ্‌রা খাঁ এই সকল উপদেশ মানিয়া চলিবেন না, উপরন্তু, আমোদ-প্রমোদেই নিমজ্জিত থাকিবেন, সেবিষয়ে সন্দেহ নাই। তথাপি তিনি পিতার কর্তব্য এইভাবে করিয়া গিয়াছিলেন।†

বুগ্‌রা খাঁর প্রথম জীবন

বাংলার শাসনকর্তা নিয়োগ

বুগ্‌রা খাঁ ছিলেন অত্যধিক আরামপ্রিয়। তিনি আরাম ও আমোদ-প্রমোদে নিমজ্জিত থাকিলেও তাঁহার অনুচরবৃন্দ সোনারগাঁও,সাতগাঁও প্রভৃতি অঞ্চল লক্ষ্মণাবতী রাজ্যভুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ১২৮৬ খ্রীষ্টাব্দে গিয়াস-উদ্দিন বলবন মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় বুগ্‌রা খাঁকে দিল্লীতে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ইতিপূর্বেই বলবনের প্রথম পুত্র মহম্মদ মোঙ্গলদের সহিত যুদ্ধে প্রাণ হারাইয়াছিলেন। বলবনের ইচ্ছা ছিল তাঁহার মৃত্যুর পর বুগ্‌রা খাঁ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু বুগ্‌রা খাঁ এই দায়িত্ব গ্রহণে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি দিল্লী হইতে পলায়ন করিয়া বাংলায় তাঁহার রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। গিয়াস-উদ্দিন বলবন মৃত্যুকালে তাঁহার নাবালক পৌত্র কাই খস্‌রুকে সিংহাসনের উত্তরাধিকার

রাজ্য বিস্তার

গিয়াস-উদ্দিন বলবনের মৃত্যু (১২৮৭)

* *History of Bengal*, (*D.U.*) Vol II, p. 70.

† *Idem.*

দিয়া গেলেন। কিন্তু উজীর নিজাম-উদ্দিন বুগ্‌রা খাঁর পুত্র কাইকোবাদকে দিল্লীর সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। এদিকে পিতার মৃত্যুর পর বুগ্‌রা খাঁ 'সুলতান নাসির-উদ্দিন মামুদ' উপাধি ধারণ করিয়া স্বাধীনভাবে বাংলায় রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

বুগ্‌রা খাঁর স্বাধীনতা ঘোষণা: 'সুলতান নাসির-উদ্দিন মামুদ' উপাধি ধারণ

দিল্লী সুলতানের উজীর নিজাম-উদ্দিন কাইকোবাদকে আমোদ-প্রমোদে সময় অতিবাহিত করিবার সুযোগদান করিয়া নিজে শাসনক্ষমতা হস্তগত করিয়া লইলেন। বুগ্‌রা খাঁ অর্থাৎ নাসির-উদ্দিন নিজ পুত্রের এই অকর্মণ্যতা দূর করিবার উদ্দেশ্যে বহু উপদেশপূর্ণ পত্রালাপ করিলেও যখন তাঁহার কোন চৈতন্য হইল না তখন বিরক্ত হইয়া শেষ পর্যন্ত তাঁহার বিরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। তিনি বিহার অধিকার করিয়া অযোধ্যার দিকে অগ্রসর হইলেন। পথিমধ্যে পিতা ও পুত্রের সাক্ষাৎ হইল। উভয়ের মধ্যে অবশ্য যুদ্ধ হইল না। কাইকোবাদ বুগ্‌রা খাঁকে বাংলার স্বাধীন সুলতান বলিয়া স্বীকার করিলেন। বুগ্‌রা খাঁ পুত্রকে শাসনকার্য সম্পর্কে সদুপদেশ দিয়া পিতার কর্তব্য পালন করিলেন। ইহার পর হইতে বাংলাদেশ একপ্রকার স্বাধীন দেশ হিসাবেই রহিয়া গেল। বুগ্‌রা খাঁর বিরুদ্ধে কাইকোবাদের এই অভিযানকালে কবি আমির খস্‌রু সঙ্গে ছিলেন। তিনি কিরাণ-উস্‌-সা-আদিন' নামক কবিতায় পিতা-পুত্রের মিলন কাহিনীর ঐতিহাসিক বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পরবর্তী কালে উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত গোলযোগ উপস্থিত হইলে গিয়াস-উদ্দিন তুঘ্‌লক সেই সুযোগে পুনরায় বাংলাদেশে দিল্লীর প্রভুত্ব স্থাপন করিলেন। তিনি বাংলাদেশকে তিনটি প্রদেশে ভাগ করিলেন, লক্ষ্মণাবতী, সাতগাঁও বা সপ্তগ্রাম এবং সোনারগাঁও ছিল এই তিনটি অংশের তিনটি পৃথক রাজধানী। কিন্তু বাংলাদেশকে এইভাবে ভাগ করিলেও তথাকার রাজনৈতিক জটিলতার অবসান হইল না। এই তিন অংশের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ লাগিয়া-ই রহিল। মোহম্মদ-বিন্‌-তুঘ্‌লক এই তিন অংশের তিনজন শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। কাদের খাঁ লক্ষ্মণাবতীর, আজম্‌-উল্‌-মুল্‌ক সাতগাঁওয়ের এবং বাহ্‌রাম খাঁ ও গিয়াস-

বুগ্‌রা খাঁর স্বাধীনতা স্বীকৃত

গিয়াস-উদ্দিনের আমলে বাংলায় দিল্লীর প্রভুত্ব পুনঃস্থাপন

উদ্দিন বাহাদুর শাহ্‌কে যুগ্মভাবে সোনারগাঁওয়ের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু বিভিন্ন অংশের শাসনকর্তাগণ বিভিন্ন সময়ে দিল্লীর আনুগত্য অস্বীকার করিয়া স্বাধীন সুলতানের ন্যায় শাসন চালাইতে লাগিলেন। শেষ পর্যন্ত ১৩৪২ খ্রীষ্টাব্দে* হাজী ইলিয়াস সমগ্র বাংলাদেশ নিজ শাসনাধীনে আনিয়া 'শামস্‌-উদ্দিন ইলিয়াস শাহ্‌' উপাধি ধারণ করিয়া স্বাধীনভাবে বাংলাদেশ শাসন করিতে লাগিলেন।

নাসির-উদ্দিন মামুদ, ১২২৭-২৯ (Nasiruddin Mahmud, 1227-29) ঃ গিয়াস-উদ্দিন ইওয়াজ খল্‌জীকে পরাজিত ও নিহত করিয়া নাসির-উদ্দিন স্বয়ং বাংলার শাসনকর্তৃপদে অধিষ্ঠিত হইলেন। তিনি অযোধ্যাকেও বাংলা প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করিলেন। নাসির-উদ্দিন গৌড় হইতে রাজধানী লক্ষ্মণাবতীতে স্থানান্তরিত করিলেন এবং গিয়াস-উদ্দিন ইয়াজ কর্তৃক সঞ্চিত অর্থ দিল্লীর উলেমাদের বণ্টন করিয়া দিলেন। এদিকে ইল্‌তুৎমিস খলিফা অলমুস্তানাসির বিল্লাহ্‌-এর নিকট হইতে খিলাৎ প্রাপ্ত হইলে উহার মধ্য হইতে একটি পোশাক, একটি লাল রংয়ের ছাতা ও একটি লাল সামিয়ানা নিজ পুত্র নাসির-উদ্দিনের নিকট প্রেরণ করিলেন। তিনি তাঁহাকে 'মালিক-উস্‌-শর্‌ক' (Lord of the East) উপাধিতেও ভূষিত করিলেন। কিন্তু এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই নাসির-উদ্দিন মৃত্যুমুখে পতিত হইলে সঙ্গে সঙ্গে গিয়াস-উদ্দিন ইওয়াজ খল্‌জীর অন্যতম বিশ্বস্ত খল্‌জী অনুচর মালিক ইখ্‌তিয়ার-উদ্দিন বল্‌কা খল্‌জী বাংলাদেশ হইতে দিল্লী সুলতানের সেনাবাহিনী বিতাড়িত করিয়া নিজে স্বাধীনভাবে রাজত্ব শুরু করেন। বাংলাদেশ দিল্লী সুলতানি শাসন হইতে এইভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল।

লক্ষ্মণাবতীতে রাজধানী স্থানান্তরিত

ইল্‌তুৎমিস কর্তৃক নিজ পুত্রের নিকট খিলাৎ প্রেরণ

নাসির-উদ্দিনের মৃত্যু ঃ ইখ্‌তিয়ার-উদ্দিন বল্‌কা খল্‌জীর স্বাধীনতা ঘোষণা

প্রায় দুই বৎসর পর সুলতান ইল্‌তুৎমিস ইখ্‌তিয়ার-উদ্দিন বল্‌কা খল্‌জীর বিরুদ্ধে সসৈন্যে অভিযানে অগ্রসর হইলেন। ইখ্‌তিয়ার-উদ্দিন ইল্‌তুৎমিসের সেনাবাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিয়া শেষ পর্যন্ত পরাজিত ও বন্দী হইলেন।

ইখ্‌তিয়ার-উদ্দিন বল্‌কার পরাজয় ও শিরশ্ছেদ

* Vide *History of Bengal* (*D. U.*) Vol. II, p. 103.

সুলতানের আদেশে তাঁহার শিরশ্ছেদ করা হইল। বাংলাদেশ পুনরায় দিল্লী সুলতানির অধীনে আসিল। বিহারের শাসনকর্তা আলা-উদ্দিন জানিকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হইল এবং সৈইফ-উদ্দিন অইবক্‌কে বিহারের শাসনভার দেওয়া হইল।

আলা-উদ্দিন জানির বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত

আলা-উদ্দিন জানি ছিলেন তুর্কীস্তানের জনৈক শাহ্‌জাদা। মোঙ্গল আক্রমণের ভয়ে তিনি ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজকীয় আচার-আচরণ, কর্মদক্ষতা প্রভৃতি তাঁহার উচ্চ বংশের পরিচয় বহন করিত। অল্পকালের মধ্যেই কোন অজ্ঞাত কারণে তিনি পদচ্যুত হন এবং বিহারের শাসনকর্তা মালিক সৈইফ্‌-উদ্দিন অইবক্‌ বাংলার শাসনভার গ্রহণ করেন। বদাউনের শাসনকর্তা তুঘান-তুঘ্‌রিল খাঁ বা তুঘ্‌রল-তুঘান খাঁকে বিহারের শাসনকর্তার পদে নিয়োগ করা হয়। সৈইফ্‌-উদ্দিন তিন বৎসরকাল অতিশয় দক্ষতার সহিত বাংলার শাসন-কার্যাদি পরিচালনা করেন। পূর্ববঙ্গের বিরুদ্ধে তিনি অভিযানও প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিযান সাফল্যলাভ না করিলেও তিনি সেই অভিযানে কয়েকটি হাতী ধরিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন। সেই হাতীগুলি তিনি ইল্‌তুৎমিসের নিকট উপঢৌকন হিসাবে প্রেরণ করিলে সুলতান খুশি হইয়া তাঁহাকে 'য়ুঘান-তৎ' (*Yughan-tat*) উপাধিতে ভূষিত করেন। কিন্তু ১২৩৬ খ্রীষ্টাব্দে (২৯শে এপ্রিল) সুলতান ইল্‌তুৎমিসের মৃত্যু ঘটিলে সমগ্র হিন্দুস্থানে এক ব্যাপক বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। ঐ সময়ে সৈইফ্‌-উদ্দিন অইবক্‌ও মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। সুলতান ইল্‌তুৎমিস এবং উহার অব্যবহিত পরে সৈইফ্‌-উদ্দিন অইবকের মৃত্যুতে বাংলাদেশে এক দারুণ বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। সেই সুযোগে আওর খাঁ অইবক্‌ নামে জনৈক তুর্কী মালিক লক্ষ্মণাবতী অধিকার করিয়া লইলেন। বিহারের শাসনকর্তা তুঘান-তুঘ্‌রিল খাঁ আওর খাঁর বিরুদ্ধে অভিযানে অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত করিলেন।

আলা-উদ্দিন জানির পদচ্যুতি সৈইফ্‌-উদ্দিন অইবকের শাসনকর্তা নিযুক্তি

সুদক্ষ শাসন

ইল্‌তুৎমিস ও সৈইফ্‌-উদ্দিন-এর মৃত্যু : ব্যাপক বিশৃঙ্খলা

আওর খাঁ আইবক্‌

তুঘান-তুঘ্‌রিল খাঁ স্বয়ং বিহার ও বাংলায় (রাঢ় ও বরেন্দ্র) স্বাধীনভাবে রাজত্ব শুরু করিলেন, কিন্তু তিনি মৌখিকভাবে রাজিয়ার আনুগত্য স্বীকারে ত্রুটি করিলেন না। মিনহাজ-ই-সিরাজ তুঘান-তুঘ্‌রিল খাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন। মিন্‌হাজ-উদ্দিন রচিত তবকৎ-ই-নাসিরীতে তুঘান খাঁর ভূয়সী প্রশংসা রহিয়াছে। তুঘান খাঁ দিল্লী সুলতানির আনুগত্য কখনও অস্বীকার করেন নাই। যখনই ইল্‌তুৎমিসের কোন বংশধর দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিতেন তখনই তুঘান তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিতে বিলম্ব করিতেন না। এইভাবে তিনি দিল্লীর রাজনৈতিক জটিলতা হইতে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন রাখিয়াছিলেন।

তুঘান্‌-তুঘ্‌রিল খাঁ (১২৩৬-৪৫)

দিল্লী সুলতানির আনুগত্য স্বীকার

তুঘান খাঁ নিজ অধিকার বিস্তারের উদ্দেশ্যে তিরহুত আক্রমণ করিয়াছিলেন। এই অভিযানের ফলে তিনি প্রভূত পরিমাণ ধনরত্ন লুণ্ঠন করিযাছিলেন বটে, কিন্তু তিরহুত অধিকার করিতে সমর্থ হন নাই। যাহা হউক, তুঘান খাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল অযোধ্যা, কারা, গঙ্গা-যমুনার দোয়াব অঞ্চল অধিকার করিয়া সমগ্র পূর্বভারতের সার্বভৌমত্ব লাভ করা। এই উদ্দেশ্যে তিনি এক বিশাল নৌবাহিনী গঠন করেন। ১২৪২ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গানদী পথে তিনি বিহারে উপস্থিত হন এবং বিনা বাধায় চুণার, বানারস, এলাহাবাদ এবং কারা পর্যন্ত অগ্রসর হন। সেই সময়ে দিল্লীর সুলতান ছিলেন আলা-উদ্দিন মাসুদ শাহ্‌। তুঘান তাঁহাকে স্তোকবাক্যে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে খিলাৎ লাভ করিয়াছিলেন (১২৪৩ খ্রীঃ)। কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরেই (নভেম্বর, ১২৪৩ খ্রীঃ) উড়িষ্যার রাজা প্রথম নরসিংহদেব বাংলাদেশ আক্রমণ করেন। কারা হইতে সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর লক্ষ্মণাবতী প্রত্যাবর্তনে যে কালক্ষেপ হইয়াছিল তাহার সুযোগ লইয়া উড়িষ্যারাজ বাংলাদেশ আক্রমণ করিয়া তুঘান খাঁর সেনাবাহিনীর যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করেন।* এই পরিস্থিতিতে তুঘান খাঁ দিল্লী

তুঘানের সামরিক অভিযান

উড়িষ্যারাজ প্রথম নরসিংহ কর্তৃক বাংলাদেশ আক্রমণ

*"The Muslims, sustained an overthrow, and a great number of those holy warriors attained martyrdom."—Minhaj, Vide *History of Bengal* (*D.U.*), Vol. II, p.49.

সুলতানের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। সুলতান আলা-উদ্দিন মাসুদ শাহ্ কারা ও মানিকপুরের শাসনকর্তা মালিক কারাকাশ খাঁ ও অযোধ্যার শাসনকর্তা মালিক তমর খাঁকে তুঘান খাঁর সাহায্যার্থে অগ্রসর হইতে আদেশ করিলেন। ইতিমধ্যে উড়িষ্যারাজ নরসিংহ লখ্‌নোর অধিকার করিয়া লক্ষ্মণাবতীর দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। কিন্তু রাজমহল পাহাড় পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া কারা ও অযোধ্যার শাসনকর্তাদের সেনাবাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হইবার ভয়ে উড়িষ্যার সৈন্য পশ্চাদপসরণ করিল। তমর খাঁ এই সুযোগে তুঘান খাঁকে পরাজিত করিয়া বাংলাদেশ অধিকার করিয়া লইলেন। সুলতান আলা-উদ্দিন মাসুদ শাহের পক্ষে তমর খাঁর ন্যায় পরাক্রমশালী ব্যক্তির বিদ্রোহ ও বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি বিধান করা সম্ভব ছিল না। পরবর্তী সুলতান দ্বিতীয় নাসির-উদ্দিন মামুদ তুঘ্‌রিল তুঘান খাঁকে অযোধ্যার শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত করিলেন, কিন্তু অযোধ্যায় পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার মৃত্যু হইল। ঠিক ঐ সময়ে তমর খাঁও মৃত্যুমুখে পতিত হইলে ১২৪৫-৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁহার স্বাধীন ও বিদ্রোহী শাসনের অবসান ঘটিল। মালিক আলা-উদ্দিন জানির পুত্র মালিক জালাল-উদ্দিন মাসুদ জানি বাংলা ও বিহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন। তিনি ১২৪৭-১২৫১ খ্রীঃ পর্যন্ত চারিবৎসর বাংলা ও বিহারের শাসনকার্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। ইহার পর অযোধ্যার শাসনকর্তা মালিক ইখ্‌তিয়ার-উদ্দিন উজবক বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন। ইতিমধ্যে উড়িষ্যারাজ প্রথম নরসিংহদেবের জামাতা রাঢ় অঞ্চলের একাংশ বর্তমান হুগলী জেলার উত্তর-পূর্ব অংশ লইয়া একটি শক্তিশালী সামন্তরাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার রাজধানী ছিল মদারণ। মিনহাজ-উদ্দিন ইহাকে 'মিদারণ' নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইখ্‌তিয়ার-উদ্দিন উজবক এই সামন্তরাজ্যটি জয় করিবার উদ্দেশ্যে তিনবার অভিযান করিয়া তৃতীয় অভিযানে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। তিনি দিল্লী সুলতানের নিকট সামরিক সাহায্য চাহিয়া নিরাশ হইলেন। তারপর নিজেই পুনরায় মদারণ আক্রমণ করিয়া শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করিলেন।

তমর খাঁ কর্তৃক বাংলাদেশ অধিকার স্বাধীন শাসন (১২৪৫-১২৪৭ খ্রীঃ)

জালাল-উদ্দিন মাসুদ-জানি (১২৪৭-৫১ খ্রীঃ)

ইখ্‌তিয়ার-উদ্দিন বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত

রাঢ় অঞ্চল হইতে উড়িষ্যারাজের আধিপত্য বিনাশ

ক্রমে সমগ্র রাঢ় তাঁহার রাজ্যভুক্ত হইল ইখ্‌তিয়ার-উদ্দিন ছিলেন স্বভাবতই বিদ্রোহভাবাপন্ন। তিনি অযোধ্যার শাসনকর্তা থাকাকালীন দুইবার বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন। সুলতান নাসির-উদ্দিনের শ্বশুর ও দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ উলুঘ খাঁর অনুরোধে নাসির-উদ্দিন দুইবারই তাঁহাকে মাপ করিয়াছিলেন। এইবার রাঢ় অঞ্চল জয় করিয়া তিনি পুনরায় সুলতান উপাধি ধারণ করিয়া দিল্লী হইতে স্বাধীন হইয়া গেলেন। তাঁহার নূতন নাম হইল 'সুলতান মুঘিস অল্ দুনিয়া ওয়াল-দিন আবুল মুজফ্‌ফর উজবক অল-সুলতান'। ইহার পর সুলতান মুঘিস-উদ্দিন উজবক অযোধ্যা প্রদেশটি জয় করিয়া লক্ষ্মণাবতী (বাংলা), বিহার ও অযোধ্যায় নিজ সার্বভৌমত্ব স্থাপন করিলেন। ইহা ভিন্ন তিনি কামরূপ জয় করিবার উদ্দেশ্যে অভিযান শুরু করিলেন। তিনি বর্তমান রংপুর জেলার ঘোরাঘাট ও গোয়ালপাড়া জেলার মধ্য দিয়া কামরূপ রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। কামরূপরাজ সুলতান মুঘিসকে কোনপ্রকার বাধাদান না করিয়া রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া গেলেন এবং বাৎসরিক করদানের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। সুলতান মুঘিস রাজধানীর যাবতীয় ধনরত্ন লুণ্ঠন করিলেন এবং সমগ্র কামরূপ রাজ্যটি নিজ রাজ্যভুক্ত করিবার আশায় বাৎসরিক করদানের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। ইহার পর তিনি কয়েকমাস কামরূপ রাজ্যেই অবস্থান করিলেন। কিন্তু বর্ষা শুরু হইবার সঙ্গে সঙ্গে কামরূপ রাজের হিন্দুপ্রজাবর্গ রাজধানীতে কোনপ্রকার খাদ্যদ্রব্য ও পশুর (ঘোড়া) খাদ্যাদি যাহাতে প্রবেশ করিতে না পারে সেই ব্যবস্থা করিল। এইভাবে সুলতান মুঘিস উজবককে অর্থ নৈতিকক্ষেত্রে অবরুদ্ধ করিয়া কামরূপরাজের সকল হিন্দু প্রজা সুলতানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল। এমতাবস্থায় কামরূপ হইতে পরিবার-পরিজন ও সেনাবাহিনীসহ পলাইতে গিয়া পথিমধ্যে কামরূপরাজের সেনাবাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হইলেন। তিনি বীরদর্পে যুদ্ধ করিয়া চলিলেন, কিন্তু আকস্মিকভাবে শত্রুর এক তীর আসিয়া তাঁহার বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলে তাঁহার জীবনের আশা নাই দেখিয়া

ইখ্‌তিয়ার-উদ্দিনের স্বাধীনতা ঘোষণা

লক্ষ্মণাবতী, বিহার ও অযোধ্যায় নিজ সার্বভৌমত্ব স্থাপন

কামরূপ অভিযান

কামরূপ অভিযানের ব্যর্থতা : মৃত্যু

নিজ সেনাবাহিনী ও পরিবার-পরিজনসহ আত্মসমর্পণ করিলেন। এইভাবে সুলতান মুঘিস-উদ্দিনের মৃত্যু হইলে লক্ষ্মণাবতী (বাংলা) পুনরায় সুলতান নাসির-উদ্দিনের আনুগত্য স্বীকার করিয়া লইল।

ইজ-উদ্দিন উজবকী ও তাজ-উদ্দিন আর্‌স্‌লান

পরবর্তী বাংলার শাসকগণের মধ্যে ইজ-উদ্দিন বলবন-ই-উজবকী, মালিক তাজ-উদ্দিন আর্‌স্‌লান খাঁ ও তাঁহার বংশধরগণের নাম উল্লেখযোগ্য। আর্‌স্‌লান খাঁ ও তাঁহার বংশধরগণ একপ্রকার স্বাধীনভাবেই বাংলাদেশে রাজত্ব করিয়া গিয়াছিলেন।

মুঘিস-উদ্দিন তুঘ্‌রিল খাঁ (১২৬৮-৮১ খ্রীঃ) (Mughisuddin Tughril Khan, 1268-81): পরবর্তী কালে মুঘিস-উদ্দিন তুঘ্‌রিল খাঁর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তুঘ্‌রিল খাঁ ছিলেন একজন সাহসী প্রত্যুৎপন্নমতিসম্পন্ন বীর তুর্কী। তিনি প্রথমে বাংলার শাসনকর্তা আমিন খাঁর সহকারী হিসাবে নিযুক্ত হন। আমিন খাঁ ছিলেন অযোধ্যার শাসনকর্তা। তাঁহাকে তদুপরি বাংলার শাসনকর্তাপদও দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু প্রকৃত শাসনকার্যের ভার রহিয়াছিল তুঘ্‌রিল খাঁর উপর। তুঘ্‌রিল খাঁ ছিলেন ক্ষমতাশালী শাসক ও দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। তিনি পূর্ববঙ্গের বহুদূর পর্যন্ত লক্ষ্মণাবতীর সীমা বিস্তার করেন এবং ঢাকার প্রায় পঁচিশ মাইল নিকটে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন (Qila-i-Tughral)। সেই সময়ে দিল্লী সুলতান ছিলেন গিয়াস-উদ্দিন বলবন।

আমিন খাঁর সহকারী হিসাবে নিযুক্ত

তুঘ্‌রিল খাঁ বাংলার শাসনকর্তার পদলাভেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছিল স্বাধীন বাংলার সুলতান হওয়া। এদিকে মোঙ্গল আক্রমণে সুলতান গিয়াস-উদ্দিন বলবন যখন ব্যতিব্যস্ত তখন সুযোগ বুঝিয়া তুঘ্‌রিল খাঁ স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। তিনি সুলতান মুঘিস-উদ্দিন নাম ধারণ করিয়া নিজ নামে মুদ্রা প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। তাঁহার রাজসভা জাঁকজমক ও রাজকীয়তায় দিল্লী সুলতানের রাজসভার সমকক্ষ ছিল।

স্বাধীনতা ঘোষণা

তুঘ্‌রিল খাঁর স্বাধীনতা ঘোষণায় গিয়াস-উদ্দিন বলবন অত্যন্ত বিচলিত

বলবন কর্তৃক তুঘ্‌রিল খাঁর বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ

হইলেন।* আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া তিনি তুঘ্‌রিলকে কিভাবে দমন করা যায় সেই চিন্তাই করিতে লাগিলেন।

বাংলার ইলিয়াসশাহী বংশ (Ilyas Shahi Dynasty of Bengal):

শামস্‌-উদ্দিন ইলিয়াস শাহ্‌, ১৩৪২-৫৭ খ্রীঃ (Shamsuddin Ilyas Shah, 1342-'57): ১৩৪২ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষণাবতীর সিংহাসনে 'শামস্‌উদ্দিন ইলিয়াস শাহ্‌' উপাধি ধারণ করিয়া ইলিয়াস শাহের আরোহণ বাংলার ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছিল। সেই সময়ে দিল্লীর সুলতান ছিলেন মহম্মদ-বিন-তুঘ্‌লক। তাঁহার অব্যবস্থিতচিত্ততার ফলে সমগ্র উত্তর-ভারতে তখন ব্যাপক অব্যবস্থা দেখা দিয়াছে। গোরখপুর, চম্পারণ, তিরহুত প্রভৃতি অঞ্চলের স্থানীয় হিন্দুরাজগণ সেই সুযোগে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছেন। ইলিয়াস শাহ্‌ নিজেও এই সুযোগ ছাড়িলেন না। তিরহুতের হিন্দুরাজ্যের মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হইলে ইলিয়াস শাহ্‌ সহজেই তিরহুত জয় করিয়া লইলেন। ইহার পর ১৩৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নেপাল আক্রমণ করিয়া কাঠমণ্ডু পর্যন্ত প্রবেশ করেন। স্বয়ম্ভূনাথ স্তূপ ও শাক্যমুনির পবিত্র ধ্বজা তিনি ভস্মীভূত করেন। কিন্তু অল্পকাল পরেই তিনি কাঠমণ্ডু হইতে সসৈন্যে অপসরণ করেন। কাঠমণ্ডুর পার্বত্য পরিবেশ ও বাংলাদেশের সহিত যোগাযোগের অসুবিধাহেতু নেপাল ইলিয়াস শাহ্‌ ও তাঁহার অনুচরবর্গকে তেমন আকৃষ্ট করিতে পারে নাই।

উত্তর-ভারতে অব্যবস্থা

তিরহুত জয়

নেপাল অভিযান

তিরহুত ও নেপাল অভিযানের সাফল্য ইলিয়াস শাহকে উৎসাহিত করিয়া তুলিল। তিনি উড়িষ্যার দিকে অভিযান শুরু করিলেন। উড়িষ্যার মেঘেশ্বর বলরাম, পুরীর জগন্নাথ ও কোনারকের সূর্যদেবের মন্দির সেই সময়ে প্রভূত পরিমাণ স্বর্ণ-রৌপ্যের

উড়িষ্যা অভিযান

*** Sultan Balban lost his sleep and appetite—as Barni says—when the news of Tughral's assumption of sovereignty in Bengal reached him." *History of Bengal* (D. U.) Vol. II. p. 61.**

ভাণ্ডারস্বরূপ ছিল। বাংলার মুসলমান সুলতানগণ এই সকল মন্দিরের ঐশ্বর্যে আকৃষ্ট হইলেও উড়িষ্যার তৃতীয় অনঙ্গভীমদেব, প্রথম নরসিংহ ও দ্বিতীয় নরসিংহ প্রভৃতি রাজগণের আমলে উড়িষ্যার নিরাপত্তা অব্যাহত ছিল। ইলিয়াস শাহের আমলে উড়িষ্যার রাজবংশ পূর্ব পরাক্রম হারাইয়াছিলেন। ইলিয়াস শাহ্ উড়িষ্যার মধ্য দিয়া সসৈন্যে চিল্‌কা হ্রদ পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন। উড়িষ্যা হইতে তিনি প্রভূত পরিমাণ ধনরত্ন ও ৪৪টি হাতী লইয়া নিজ রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। ইহার পর তিনি তাঁহার রাজ্যসীমা বানারস পর্যন্ত বিস্তার করিলেন। এইভাবে ইলিয়াস শাহের সামরিক অভিযানের সাফল্য তাঁহার অন্তরে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিবার আকাঙ্ক্ষা স্বভাবতই জাগিল।* ১৩৫৩ খ্রীষ্টাব্দে সোনারগাঁও-এর সুলতানকে পরাজিত করিয়া তিনি পূর্ববঙ্গও নিজ রাজ্যভুক্ত করিলেন। ফলে, তাঁহার সম্রাটপদ-লাভের আকাঙ্ক্ষা আরও বৃদ্ধি পাইল। কিন্তু সেই সময়ে মহম্মদ-বিন-তুঘ্‌লকের মৃত্যু হইলে ফিরুজ তুঘ্‌লক দিল্লীর সুলতান হইলেন এবং ১৩৫৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগেই সুলতান ইলিয়াস শাহ্‌কে দমন করিবার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার সেনাবাহিনীতে ৯০ হাজার অশ্বারোহী, এক বিশালসংখ্যক পদাতিক ও ধনুর্বিদ এবং এক হাজার রণতরী ছিল। সিরাজ আফিফ্-এর রচনা হইতে জানা যায় যে, বাংলার নৌবাহিনী গোগ্‌রা ও গঙ্গানদীর সঙ্গমস্থলে দিল্লী সুলতানের নৌবাহিনীকে বাধাদানে অগ্রসর হইয়াছিল। যাহা হউক, সুলতান ফিরুজ সকল বাধা অতিক্রম করিয়া ইলিয়াস শাহের রাজধানী পাণ্ডুয়া অধিকার করিয়া লইলেন। ইলিয়াস শাহ্ তাঁহার সুরক্ষিত 'একডালা' দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। দিল্লীর সুলতানের সেনাবাহিনী শত চেষ্টায়ও এই দুর্গটি অধিকার করিতে পারিল না। ফিরুজ তুঘ্‌লক কূটচালে ইলিয়াস শাহ্‌কে দুর্গের বাহিরে আনিবার উদ্দেশ্যে কয়েকজন সাধুকে গুপ্তচর হিসাবে তাঁহার নিকট পাঠাইলেন। এই সকল গুপ্তচরের নিকট হইতে দিল্লী সেনাবাহিনীর

সম্রাটপদ-লাভের আকাঙ্ক্ষা

সোনারগাঁও জয়

ফিরুজ শাহের বাংলাদেশ আক্রমণ

ফিরুজ তুঘ্‌লকের কূটচাল

* Vide *History of Bengal* (D.U.) Vol II. p. 105.

মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে জানিতে পারিয়া এবং তাহাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া ইলিয়াস শাহ্ ফিরুজ শাহের সহিত প্রকাশ্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে উৎসাহিত হইলেন। বস্তুত, একডালা দুর্গ হইতে ইলিয়াস শাহ্‌কে বাহিরে আনাই ছিল ফিরুজ তুঘ্‌লকের কূটনীতির উদ্দেশ্য। যুদ্ধে ইলিয়াস শাহের পরাজয় ঘটিলে তিনি পুনরায় 'একডালা' দুর্গে আশ্রয় লইলেন। ফিরুজ শাহ্ এই দুর্গটি অবরোধ করিয়াও শেষ পর্যন্ত অধিকার করিতে অকৃতকার্য হইলেন।

ইলিয়াস শাহের পরাজয় ও একডালা দুর্গে পুনরায় আশ্রয় গ্রহণ

'সিরাৎ-ই-ফিরুজশাহী' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, একডালা দুর্গের অভ্যন্তর হইতে মুসলমান নারীদের আর্তনাদে ও সনির্বন্ধতায় ফিরুজ শাহ্ এই দুর্গটি অধিকার করেন নাই। জিয়া-উদ্দিন বরণীর মতে ফিরুজ শাহ্ একডালা দুর্গ পুর্ণোদ্যমে আক্রমণ করিবার জন্য তাঁহার অনুচরবর্গের পরামর্শ উপেক্ষা করিয়া দিল্লী ফিরিয়া গিয়াছিলেন।* যাহা হউক, সম্মুখ যুদ্ধে জয়লাভ করিলেও ফিরুজ শাহ্ শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ অধিকার না করিয়াই দিল্লী ফিরিয়া গেলেন। ইলিয়াস শাহ্ স্বাধীন সুলতান হিসাবেই বাংলাদেশে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। ১৩৫৫ ও ১৩৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ইলিয়াস শাহ্ দিল্লী সুলতানের সহিত মিত্রতাসূচক উপহার প্রেরণ করিয়া দিল্লী সুলতানের বন্ধুত্ব অর্জন করিয়াছিলেন। পর বৎসর (১৩৫৭ খ্রীঃ) সুলতান ফিরুজ শাহ্ বাংলাদেশ হইতে কয়েকটি হাতী চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। ইলিয়াস শাহ্ মালিক তাজ-উদ্দিনের মারফৎ দিল্লীতে কয়েকটি হাতী প্রেরণ করিলে সুলতান ফিরুজ শাহ্ তাঁহাকে কয়েকটি তুর্কী ও আরবীয় ঘোড়া, খোরাসানী ফল এবং অপরাপর মূল্যবান দ্রব্য প্রতিদান হিসাবে প্রেরণ করিয়াছিলেন। দিল্লী সুলতানের বন্ধুত্ব অর্জন করিবার ফলে ইলিয়াস শাহ নির্বিঘ্নে কামরূপ জয়ের ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালের শেষভাগে ইলিয়াস শাহ্ কামরূপ জয় করিয়া তাঁহার সামরিক শক্তির শেষ

ফিরুজ শাহের দিল্লী প্রত্যাবর্তন—ইলিয়াস শাহের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা

ফিরুজ শাহের সহিত ইলিয়াস শাহের মিত্রতা

কামরূপ জয়

* *History of Bengal* (D. U.) Vol. II. p. 109.

পরিচয় দিয়া গিয়াছিলেন। ইলিয়াস শাহের ব্যক্তিগত জীবন, শাসন-ব্যবস্থা ও চরিত্র সম্পর্কে কোন ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় না। কিম্বদন্তী আছে যে, তিনি 'হাজিপুর' নামক শহর নির্মাণ ও ফিরুজাবাদে অর্থাৎ আদিনায় একটি জলাশয় খনন করাইয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্ব ঠিক কোন্ সময়ে শেষ হইয়াছিল সেবিষয়ে মতানৈক্য রহিয়াছে। তারিখ-ই-মুবারক শাহী ও সিরাৎ-ই-ফিরুজ-শাহী অনুসারে ১৩৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল। তাঁহার আমলের মুদ্রা হইতে অবশ্য জানা যায় যে, ১৩৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জীবনাবসান হইয়াছিল।*

তাঁহার রাজত্বের অবসান

ইলিয়াস শাহ্ বাংলাদেশের স্বাধীন সুলতানদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে বাংলাদেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা এবং তাহার ফলে সমৃদ্ধি বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। স্থাপত্যশিল্প এবং অপরাপর সাংস্কৃতিক কার্যকলাপে তিনি উৎসাহ দান করিয়াছিলেন।

সিকন্দর শাহ্, ১৩৫৭—১৩৮৯ (Sikandar Shah, 1357-1389) ঃ ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সিকন্দর শাহ্ বাংলার সুলতান হন। তিনিও তাঁহার পিতার ন্যায়ই সুদক্ষ ও পরাক্রমশালী ছিলেন। তাঁহার সিংহাসনারোহণের অব্যবহিত পরেই ফিরুজ তুঘ্লক পুনরায় বাংলাদেশ অধিকারের চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হন। শেষ পর্যন্ত সিকন্দর শাহ্ ও ফিরুজ তুঘ্লকের মধ্যে মিত্রতা স্থাপিত হয় এবং উভয় পক্ষে উপহার আদান-প্রদান হয় (১৩৫৯)। ঐ বৎসর হইতে প্রায় দুইশত বৎসর বাংলাদেশ দিল্লী হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। সিকন্দর শাহ্ ছিলেন সুদক্ষ শাসক। তাঁহার আমলে বাংলাদেশের শান্তি ও সমৃদ্ধি যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তিনি স্থাপত্যশিল্পের পৃষ্ঠ-পোষক ছিলেন। তাঁহার আমলেই আদিনা মস্জিদটি নির্মিত হইয়াছিল। এই মস্জিদটি দৈর্ঘ্যে ৫০৭ ফুট এবং প্রস্থে ২৮৫ ফুট। এইরূপ বিশাল আকৃতির আর কোন মস্জিদ সমগ্র ভারতে নাই।† 'রিয়াজ-উস্-সালাতিন'

* *History of Bengal.* (D. U.) Vol. II, p. 111.

† **"This sumptuous mosque extending 507 ft. from north to south and 285 ft. from east to west surpasses in sheer dimension any other building of its kind in India"** ***History of Bengal*** **(D.U.) Vol. II. p. 113.**

নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, এই মস্‌জিদটি নির্মাণে চারি বৎসর অপেক্ষাও অধিককাল ব্যয়িত হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন, এই মস্‌জিদটি নির্মাণে বহু সংখ্যক হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দির ও দেবদেবীর কারুকার্য খচিত বিভিন্ন অংশ লাগান হইয়াছিল। লক্ষ্মণাবতীর শ্রেষ্ঠ হিন্দু স্থাপত্যকার্য বিনাশ করিয়া সেগুলির অংশ দ্বারা এই মস্‌জিদটি নির্মিত হইয়াছিল।* আদিনা মস্‌জিদ ভিন্ন আখ্‌-ই সিরাজ-উদ্দিন মস্‌জিদ, কটোয়ালী দর্‌ওয়াজা প্রভৃতি স্থাপত্য-কার্যও সেই সময়ে সম্পন্ন হইয়াছিল। তাঁহার আমলের কতকগুলি অতি সুন্দর স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। দীর্ঘ ছত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিবার পর ১৩৮৯ খ্রীষ্টাব্দে নিজপুত্র গিয়াস-উদ্দিন আজমের সহিত যুদ্ধে তিনি নিহত হন।

গিয়াস্‌-উদ্দিন আজম শাহ্‌ (১৩৮৯—১৪০৯)

গিয়াস-উদ্দিন আজম পিতৃহন্তা হইলেও ক্ষমতাশালী শাসক ছিলেন। প্রচলিত আইন-কানুন মানিয়া তিনি দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিখ্যাত কবি হাফেজ-এর সহিত তিনি পত্র বিনিময় করিতেন। তাঁহার আমলে চীনদেশ হইতে এক দূত বাংলাদেশে আসিয়াছিলেন এবং তিনি নিজেও চীনদেশে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন।

সৈইফ্‌-উদ্দিন হাম্‌জা শাহ্‌ (১৪০৯—১০)

রাজা গণেশ (১৪১০—?)

যদু: জালাল-উদ্দিন মোহম্মদ (?—১৪৩১)

শামস্‌-উদ্দিন আহম্মদ শাহ্‌ (১৪৩১—৪২)

আজম শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সৈইফ্‌-উদ্দিন হাম্‌জা শাহ্‌ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্বকালে রাজা গণেশ নামে ভাতুরিয়া ও দিনাজপুরের জনৈক ব্রাহ্মণ জমিদার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনি দনুজমর্দন দেব উপাধি ধারণ করেন এবং স্বাধীনভাবে কিছুকাল রাজত্ব করিবার পর পুত্র যদুর হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু যদু অল্পকালের মধ্যেই ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া জালাল-উদ্দিন মোহম্মদ নাম ধারণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র শামস্‌-উদ্দিন আহম্মদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন যেমন অত্যাচারী তেমনি অকর্মণ্য। অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার অত্যাচারে অতিষ্ঠ

* "It is not improbable that the finest monuments of the Hindu Capital of Lakhnawti were demolished to produce this one Muhammadan mosque". Percy Brown, Vide *History of Bengal* (D. U.), Vol. II, p. 113.

হইয়া তাঁহারই কর্মচারিবৃন্দ তাঁহাকে হত্যা করে। ইহার পর হাজী ইলিয়াসের পৌত্র নাসির-উদ্দিন মামুদ শাহ্‌কে বাংলার সিংহাসনে স্থাপন করা হয়। এইভাবে রাজা গণেশের বংশধরদের হস্ত হইতে বাংলার শাসনভার পুনরায় ইলিয়াস শাহী বংশের হস্তে ন্যস্ত হয়।

নাসির-উদ্দিন মামুদ (১৪৪২—৫৯)

নাসির-উদ্দিন মামুদ শান্তিপ্রিয় শাসক ছিলেন। তাঁহার আমলে বাংলাদেশে পুনরায় শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসে। স্থাপত্যশিল্পেও তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তাঁহার আদেশে সাতগাঁও ও গৌড়ে কয়েকটি মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল। সতর বৎসর রাজত্বের পর তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র রুকন্‌-উদ্দিন বারবক্ শাহ্ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি আবিসিনীয়

রুকন্‌-উদ্দিন বারবক্ শাহ্ (১৪৫৯—৭৪)

বা হাবসী ক্রীতদাসদের এক বিরাট বাহিনী পোষণ করিতেন। এই বিদেশী ক্রীতদাসদের অনেককে তিনি উচ্চ কর্মচারিপদেও নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ক্রমে এই হাবসী ক্রীতদাসগণ বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থায় এক প্রবল প্রতিপত্তি ও প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

ইয়ুসুফ্ শাহ্ (১৪৭৪—৮১)

বারবক্ শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ইয়ুসুফ্ শাহ্ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তাঁহার আমলে সিলেট (Sylhet) বা শ্রীহট্ট জেলা মুসলমান অধিকারে আসে। ইয়ুসুফ্ শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সিকন্দর শাহ্ (২য়) কিছু কালের জন্য সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তাঁহার অকর্মণ্যতার জন্য

সিকন্দর শাহ্ (২য়), ফত্ শাহ্ (১৪৮১) (১৪৮১—৮৭)

তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া নাসির-উদ্দিনের অপর এক পুত্র জালাল-উদ্দিন ফত্ শাহ্‌কে সিংহাসনে স্থাপন করা হয়। জালাল-উদ্দিন হাবসীদের প্রভাব-প্রতিপত্তি খর্ব করিবার চেষ্টা করিতে গিয়া তাহাদেরই হস্তে প্রাণ হারাইলেন। হাবসী নেতা বারবক্ শাহ্ 'সুলতান শাহ্‌জাদা' উপাধি ধারণ করিয়া বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। কিন্তু বারবক্ শাহের ভাগ্যে অধিককাল রাজত্বভোগের সুযোগ মিলিল না। ইন্দিল খাঁ নামে অপর একজন হাবসী নেতার হস্তে তিনি নিহত হইলেন। ইন্দিল শাহ্ সৈইফ্-উদ্দিন ফিরুজ নাম ধারণ করিয়া বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ইন্দিল শাহের

মৃত্যুর পর ফত্‌শাহের এক পুত্রকে সিংহাসনে স্থাপন করা হইলে সিদি বদ্‌র নামে জনৈক হাবসী সিংহাসন দখল করিয়া লইলেন। এইভাবে হাবসী শাসনকালে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা উভয়ই বিনষ্ট হইল। সিদি বদ্‌র-এর রাজত্বকালে বিশৃঙ্খলা যখন চরমে পৌঁছিল তখন রাজকর্মচারীদের অনেকেই হাবসী শাসনের অবসান ঘটাইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিলেন। বদ্‌র-এর মন্ত্রী আলা-উদ্দিন হুসেনও বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা সম্মিলিতভাবে বদ্‌র-এর রাজধানী গৌড় অবরোধ করিলেন। অবরুদ্ধ অবস্থায়-ই বদ্‌র-এর মৃত্যু হইলে বাংলার অভিজাতবর্গ আলা-উদ্দিন হুসেনকে বাংলার সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। আলা-উদ্দিন হুসেন 'হুসেন শাহ্' নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁহার সিংহাসন আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায় শুরু হইল।

বাংলাদেশে হাব্‌সী শাসন (১৪৮৭—১৪৯৩)

হুসেনশাহী বংশ (Hussain Shahi Dynasty):

আলা-উদ্দিন হুসেন শাহ্, ১৪৯৩—১৫১৯ (Alauddin Hussain Shah): হুসেন শাহের সিংহাসনারোহণের সময় হইতে বাংলার স্বাধীন সুলতানির এক গৌরবোজ্জ্বল যুগের সূচনা হইয়াছিল। বাঙালী জাতির মনীষা ও সৃজনীশক্তি এই যুগে এক চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। হুসেন শাহ্ ছিলেন যেমন বিচক্ষণ, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সুদক্ষ শাসক তেমনি ছিলেন উদারচিত্ত, ন্যায়পরায়ণ, এবং শিল্প ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক। বাংলার স্বাধীন শাসকবর্গের মধ্যে হুসেন শাহ্ ছিলেন সর্বাধিক জনপ্রিয়।

হুসেন শাহের চরিত্র ও জনপ্রিয়তা

সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই হুসেন শাহ্ দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। তিনি হাবসীদের প্রভাব হইতে বাংলার রাজনৈতিক জীবন সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে বাংলাদেশ হইতে বিতাড়িত করিলেন। প্রাসাদ-রক্ষিগণও সুলতানদের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া উদ্ধত ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছিল। হুসেন শাহ্ তাহাদেরও দমন করিলেন।

হাব্‌সী বিতাড়ন ও প্রাসাদ-রক্ষী দমন

আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে শান্তি ও শৃঙ্খলা পুনঃস্থাপন করিয়া হুসেন শাহ্ বাংলার

হৃত রাজ্যাংশ পুনরুদ্ধারে মনোযোগী হইলেন। তিনি জৌনপুরের শর্কী সুলতান ইব্রাহিম লোদীর নিকট হইতে উত্তর-বিহার জয় করিলেন। ইহা ভিন্ন তিনি উড়িষ্যার সীমা পর্যন্ত বাংলার রাজ্য বিস্তার করিলেন। আসামের অহোম রাজ্যটি তিনি জয় করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই অহোমরাজ নিজ রাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়া লইয়াছিলেন। কোচবিহারের কাম্‌তাপুর নামক স্থানটিও তিনি জয় করিয়াছিলেন। হুসেন শাহ্‌ পূর্ববঙ্গের ত্রিপুরা রাজ্যটি জয় করিবার উদ্দেশ্যে পরপর চারিটি অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন। চতুর্থ অভিযানের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন তিনি স্বয়ং। কিন্তু এই সকল অভিযান ও পুনঃপুনঃ যুদ্ধের পর ত্রিপুরা রাজ্যের এক ক্ষুদ্র অংশ তিনি অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সোনারগাঁও-এ প্রাপ্ত একটি লিপি হইতে ইহা প্রমাণিত হয়।* এইভাবে রাজ্যসীমা বিস্তার করিয়াই হুসেন শাহ্‌ ক্ষান্ত রহিলেন না; রাজ্যসীমার নিরাপত্তা বিধানের জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থাও তিনি অবলম্বন করিলেন।

রাজ্যবিস্তার

হুসেন শাহের ব্যক্তিগত গুণাবলী এবং শাসনদক্ষতার ফলে তাঁহার প্রতি জনসাধারণের স্বাভাবিক শ্রদ্ধা ও আনুগত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। তাঁহার রাজ্যের কোন স্থানে কোনপ্রকার বিদ্রোহ বা বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় নাই। হুসেন শাহ্‌ কেবলমাত্র সামরিক এবং শাসন-সংক্রান্ত কার্যকলাপেই পারদর্শী ছিলেন এমন নহে; বিদ্যা ও বিদ্বানের প্রতি শ্রদ্ধা, স্থাপত্যশিল্পের প্রতি অনুরাগ, প্রজাহিতৈষণা প্রভৃতির জন্যও তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি রাজ্যের প্রতি জেলায় মস্‌জিদ ও হাসপাতাল স্থাপন করিয়াছিলেন। বিদ্বান ও ধর্মজ্ঞানীদের ভরণপোষণের জন্য তিনি ভাতার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। কুতব্‌-উল্‌-আলম নামে জনৈক ইস্‌লাম ধর্মজ্ঞানীর সমাধি এবং তাঁহার নামে স্থাপিত একটি বিদ্যালয় ও একটি হাসপাতালের ব্যয়সংকুলানের জন্য তিনি উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে হুসেন শাহ্‌ সকলকে সমান চক্ষে দেখিতেন। তাঁহার উজীর পুরন্দর খাঁ (গোপীনাথ বসু), রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামী, তাঁহার চিকিৎসক মুকুন্দ দাস,

শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা

পুরন্দর খাঁ, রূপ ও সনাতন গোস্বামী

* *History of Bengal (D.U.)* Vol. II, p. 148—49.

টেকশালের প্রধান কর্মচারী অনুপ প্রভৃতি সকলেই ছিলেন হিন্দু। রূপ ও সনাতন গোস্বামী ছিলেন হুসেন শাহের 'দবীর খাস'(Private Secretary)। হুসেন শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় বহুসংখ্যক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। রূপ গোস্বামী 'বিদগ্ধ মাধব' ও 'ললিত মাধব' নামে দুইখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। মালাধর বসু, বিপ্রদাস, বিজয় গুপ্ত, যশোরাজ খাঁ প্রভৃতি সেযুগের সাহিত্য স্রষ্টাদের অন্যতম ছিলেন। হুসেন শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় মালাধর বসু শ্রীমদ্ভাগবত বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। এজন্য হুসেন শাহ্ মালাধর বসুকে 'গুণরাজ খাঁ' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। হুসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় পরমেশ্বর কবীন্দ্র নামে জনৈক কবি মহাভারত বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। হুসেন শাহের সুশাসনে সমৃদ্ধ বাঙালী জনসাধারণের কৃতজ্ঞতা 'নৃপতি তিলক' ও 'জগৎ ভূষণ' এই দুই দুইটি উপাধিতে হুসেন শাহ্‌কে সম্মানিত করিবার মধ্যেই প্রকাশ পাইয়াছিল।*

মালাধর বসু, পরমেশ্বর কবীন্দ্র

হুসেন শাহ্ আশ্রিতের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনে কোন কার্পণ্য করেন নাই। জৌনপুরের শর্‌কী বংশের সুলতান হুসেন শাহ্ শর্‌কী সিকন্দর লোদী কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া আশ্রয়প্রার্থী হইলে হুসেন শাহ্ তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। ভাগলপুরের নিকট কোলগঙ্গ (Colgong) নামক স্থানে হুসেন শাহ্ শর্‌কী তাঁহার জীবনের অবশিষ্টকাল অতিবাহিত করিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন।

আশ্রিতের প্রতি অনুকম্পা

হুসেন শাহের আমলে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে যে সম্প্রীতি দেখা দিয়াছিল তাহার-ই নিদর্শনস্বরূপ 'সত্যপীর'-এর আরাধনার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। হুসেন শাহ বাংলার হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়কে একই সূত্রে গ্রথিত করিবার উদ্দেশ্যে এই উভয় ধর্মের সংমিশ্রণে সত্যপীরের আরাধনার প্রচলন করিয়াছিলেন। সত্যপীর হিন্দুদেবতা সত্যনারায়ণেরই এক বিকল্প সংস্করণ সন্দেহ নাই। সত্যনারায়ণের 'সিন্নি' কথাটি আজও বাংলাদেশের হিন্দুগণ ব্যবহার করিয়া থাকেন। অন্য কোন দেব-দেবীর প্রসাদকে 'সিন্নি' বলা হয় না, ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের সমন্বয়ের চেষ্টা—সত্যপীরের কল্পনা

* *History of Bengal (D. U.)* vol. II, p. 151.

মৃত্যু (১৫১৯)

১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার জনপ্রিয় স্বাধীন সুলতান হুসেন শাহের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র নসীর খাঁ 'নুসরৎ শাহ্' উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন।

নুসরৎ শাহ্, ১৫১৯-৩২ (Nusrat Shah): নুসরৎ শাহ্ পিতার ন্যায়ই উদারচিত্ত ও ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিলেন। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তিনি তাঁহার ভ্রাতাগণ পিতার নিকট হইতে যে সম্পত্তি উত্তরাধিকার-সূত্রে পাইয়াছিলেন তাহার পরিমাণ দ্বিগুণ করিয়া দিলেন। এইভাবে তিনি নিজ ভ্রাতাদের মধ্যে যাহাতে স্বার্থের সংঘাত শুরু হইতে না পারে সেই ব্যবস্থা করিলেন। তিনি পিতার আমলে শাসনকার্যাদি সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন তাহা রাজ্য-শাসন, সামরিক কর্তব্য সম্পাদন ও রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। কূটনীতিতেও তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি তিরহুত রাজ্য জয় করেন। শিল্প এবং সাহিত্যের প্রতি তাঁহারও যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তাঁহার আদেশে গৌড়ের কদম রসুল ও বড় সোনা মস্‌জিদ নির্মিত হইয়াছিল। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় মহাভারত বাংলা ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল।

চরিত্র

নুসরৎ শাহের সিংহাসনারোহণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দিল্লী সুলতানির পতন শুরু হইলে বিহারে 'লোহানী' ও 'ফর্‌মুলী' মালিকগণ জৌনপুর হইতে পাটনা পর্যন্ত বিহারের এক বিরাট অঞ্চলে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে শুরু করিলেন। নুসরৎ শাহ্ এই সকল বিদ্রোহীর সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া নিজের শক্তি বৃদ্ধি করিলেন। তারপর তিরহুত জয় করিয়া উত্তর-বিহার অঞ্চল সম্পূর্ণভাবে নিজ অধিকারে আনিলেন। গণ্ডক ও গঙ্গা নদীর সঙ্গমস্থলে হাজিপুর নামক স্থানে তিনি একটি সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করিয়া নিজ রাজ্যের নিরাপত্তা বিধান করিলেন। ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবর জয়লাভ করিলে নুসরৎ শাহ্ পূর্বাঞ্চলের আফগান সর্দারদের লইয়া মোগল আক্রমণ প্রতিহত করিবার ব্যবস্থা করিতে তৎপর হইলেন। কিন্তু বাবরের পুত্র হুমায়ুন কনৌজ, জৌনপুর প্রভৃতি জয় করিতে সমর্থ হইলে নুসরৎ শাহ্ মোগল বাহিনীর পরাক্রম বুঝিতে পারিয়া নিরপেক্ষতা নীতি অবলম্বন করিলেন এবং বাবরের নিকট নানাপ্রকার

রাজ্যবিস্তার ও রাজ্যের নিরাপত্তা বিধান

উপহার প্রেরণ করিয়া তাঁহার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করিলেন। কিন্তু গোপনে তিনি আফগান সর্দারদের সহিত মৈত্রী-নীতি অনুসরণ করিয়া চলিলেন। এইভাবে কূটকৌশলে একাধিকবার মোগল সম্রাটের প্রতি মৌখিক আনুগত্যের ভান করিয়া আফগানদের সহিত মিত্রতার মাধ্যমে মোগলদের বিরোধিতা করিয়া চলিলেন। ১৫২৯ খ্রীষ্টাব্দে লোদী বংশধর মামুদ, আফগান বীর শের খাঁ প্রভৃতির সহিত একযোগে তিনি মোগলদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই মৈত্রী সংঘ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলে নুসরৎ শাহ্ কূটকৌশলে মোগল সম্রাট বাবরের সহিত মিত্রতাবদ্ধ হইয়া সরাসরি মোগল আক্রমণ হইতে বাংলাদেশ রক্ষা করিয়া চলিতে সমর্থ হইলেন। ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে বাবরের মৃত্যুর পর নুসরৎ শাহ্ পুনরায় মোগল বিরোধী মিত্র-সংঘ গড়িয়া তুলিলেন। হুমায়ুন নুসরৎ শাহের বিরুদ্ধে অভিযানে অগ্রসর হইবার জন্য যখন প্রস্তুত হইতেছেন এমন সময় গুজরাটের বাহাদুর শাহ্ বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে তাঁহার সহিত যোগাযোগ স্থাপনের জন্য নুসরৎ শাহ্ মালিক মর্জন নামে জনৈক দূতকে পাঠাইলেন। এমতাবস্থায় হুমায়ুন প্রথমে বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধেই অগ্রসর হওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। এই সময়ে আততায়ীর হস্তে নুসরৎ শাহের মৃত্যু হইলে মোগল-বিরোধী সংঘ সম্পূর্ণভাবে ভাঙ্গিয়া গেল।

মোগলদের বিরুদ্ধে কূটনৈতিক সংগ্রাম

বাবরের মৃত্যুর পর নুসরৎ শাহ্ কর্তৃক পুনরায় মিত্র-সংঘ গঠন

তাঁহার মৃত্যু

নুসরৎ শাহের আমলে অহোম জাতির সহিত একাধিক যুদ্ধে বাংলার সেনাবাহিনীর পরাজয় ঘটিয়াছিল। নুসরৎ শাহের মৃত্যুর পরও সেই চেষ্টা অব্যাহত ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাংলার সুলতানগণ অহোমদের সহিত যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করিয়াছিলেন।

অহোম রাজ্যের সহিত যুদ্ধ

১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দে নুসরৎ শাহ্ নিজ প্রাসাদ-রক্ষী জনৈক ক্রীতদাসের হস্তে নিহত হন। অতঃপর তাঁহার পুত্র আলা-উদ্দিন ফিরুজ শাহ্ (১৫৩২-৩৩) সিংহাসনে আরোহণ করেন, কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই নুসরৎ শাহের ভ্রাতা গিয়াস-উদ্দিন মামুদ শাহ্ (১৫৩৩-১৫৫৮) কর্তৃক তিনি সিংহাসনচ্যুত হন। গিয়াস-উদ্দিন মামুদ শাহ্ শের শাহের হস্তে পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হন। গিয়াস-উদ্দিন মামুদই ছিলেন বাংলার হুসেনশাহী বংশের শেষ সুলতান।

দক্ষিণ ভারতের স্বাধীন রাজ্যসমূহ

(Independent Kingdoms of Southern India)

খান্দেশ (Khandesh) : তাপ্তী নদীর উপত্যকায় খান্দেশ মোহম্মদ-বিন্-তুঘ্‌লকের অধীনে দিল্লী সুলতানি সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ ছিল। ফিরুজ তুঘ্‌লক দিল্লী রাজসভায় জনৈক আমীরের বংশধর মালিক রাজা ফারুকীকে খান্দেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ফিরুজ শাহের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই মালিক ফারুকী স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। গুজরাটের সুলতান মুজফ্‌ফর শাহের সহিত যুদ্ধে তিনি একাধিকবার পরাজিত হন। বহ্‌মনী রাজ্যের সুলতানদের সহিতও তাঁহার সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। মালিক ফারুকী হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে সকল প্রজাকেই সমান চক্ষে দেখিতেন। পরবর্তী সুলতান মালিক নাসির সুরক্ষিত অসীরগড় দুর্গটি তখনকার হিন্দু রাজাকে পরাজিত করিয়া নিজ রাজ্যভুক্ত করেন। গুজরাটের সুলতানের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মালিক নাসির তাঁহার প্রভুত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বহ্‌মনী সুলতানদের হস্তেও মালিক নাসিরের পরাজয় ঘটিয়াছিল। পরবর্তী সুলতান আদিল খাঁ, মুবারক খাঁ, এবং দ্বিতীয় আদিল খাঁর আমলে খান্দেশ রাজ্য দুর্বল হইতে দুর্বলতর হইতে থাকে। দ্বিতীয় আদিল খাঁ খান্দেশের শক্তি ও প্রতিপত্তি ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং গণ্ডোয়ানা জয় করিতেও সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তী কালে খান্দেশ রাজ্য ক্রমেই শক্তিহীন হইতে থাকে। ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দে মোগল সম্রাট আকবর অসীরগড় দুর্গটি জয় করিয়া খান্দেশ মোগল সাম্রাজ্য-ভুক্ত করেন।

মালিক ফারুকী

খান্দেশ রাজ্যের শক্তিহীনতা

আকবরের খান্দেশ বিজয় (১৬০১)

বহ্‌মনী রাজ্য (Bahmani Kingdom) : মোহম্মদ-বিন্-তুঘ্‌লকের রাজত্বকালের শেষদিকে দেবগিরির অভিজাত সম্প্রদায় বিদ্রোহী হইয়া উঠেন। মোহম্মদ তুঘ্‌লকের শাসননীতিই ছিল এজন্য দায়ী। বিদ্রোহী অভিজাতবর্গ

দৌলতাবাদ দুর্গটি অধিকার করিয়া ইস্‌মাইল মুখ্‌ নামক তাঁহাদেরই এক নেতাকে তথাকার স্বাধীন সুলতান বলিয়া ঘোষণা করিলেন। বৃদ্ধ ইস্‌মাইল মুখ্‌ নবপ্রতিষ্ঠিত স্বাধীন রাজ্যের গুরুদায়িত্ব পালনে অক্ষমতা হেতু নিজেই জাফর খাঁ হাসানের অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করিলেন। জাফর খাঁ হাসান 'আলা-উদ্দিন বহ্‌মন শাহ্‌' উপাধি ধারণ করিয়া দৌলতাবাদের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন (১৩৪৭)।

বহ্‌মনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা (১৩৪৭)

বহ্‌মন শাহ্‌, ১৩৪৭—৫৮ (Bahman Shah): ফেরিস্তার বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, হাসান প্রথম জীবনে গাঙ্গু নামে দিল্লীর জনৈক ব্রাহ্মণ জ্যোতিষীর ভৃত্য ছিলেন। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ এই কাহিনী বিশ্বাস-যোগ্য মনে করেন না। কারণ অপর কোন সমসাময়িক রচনায় ফেরিস্তার উক্তির কোন সমর্থন নাই। আলা-উদ্দিন বহ্‌মন শাহ্‌ পারস্যের খ্যাতনামা বীর বহ্‌মন-এর বংশধর বলিয়া নিজের পরিচয় দিতেন। তাঁহার স্থাপিত সুলতান বংশও 'বহ্‌মনী বংশ' নামে পরিচিত।

বহ্‌মন শাহের পরিচয়

বহ্‌মন শাহ্‌ দৌলতাবাদ হইতে তাঁহার রাজধানী গুলবর্গায় (Gulbarga) স্থানান্তরিত করেন। ইহার পর তিনি মোহম্মদ তুঘ্‌লকের রাজত্বকালের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া নিজ রাজ্যসীমা বিস্তারে মনোযোগী হন। মোহম্মদ তুঘ্‌লকের মৃত্যুর পর ফিরুজ তুঘ্‌লক দাক্ষিণাত্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা মোটেই করেন নাই। ফলে বহ্‌মন শাহ্‌ নির্বিবাদে রাজ্যবিস্তার করিয়া চলিলেন। তিনি গোয়া, কোলাপুর, দভল প্রভৃতি বিভিন্ন স্থান জয় করিয়া বহ্‌মনী রাজ্যসীমা উত্তরে ওয়াইন-গঙ্গা নদী হইতে দক্ষিণে কৃষ্ণা নদী এবং পূর্বে ভোঙ্গীর হইতে পশ্চিমে দৌলতাবাদ পর্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছিলেন। মালব ও গুজরাটের বিরুদ্ধে তিনি সামরিক অভিযানে অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু উভয় অভিযানই বিফল হইয়াছিল।

রাজ্যবিস্তার

সুলতান বহ্‌মন শাহ্‌ বহ্‌মনী রাজ্যকে চারিটি 'তরফ্‌' বা প্রদেশে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকটিতে একজন করিয়া প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এবিষয়ে তিনি দিল্লী সুলতানির অনুকরণ করিয়াছিলেন বলা যাইতে পারে। বহ্‌মনী

শাসনব্যবস্থা

রাজ্যের চারিটি তরফ্ ছিল, যথা, গুলবর্গা, বেরার, বিদর ও দৌলতাবাদ। সমসাময়িক ইতিহাস গ্রন্থে বহ্মন শাহের শাসনব্যবস্থায় ভূয়সী প্রশংসা করা হইয়াছে।

মোহম্মদ শাহ্ (১ম), ১৩৫৮—৭৭ (Muhammad Shah) ঃ আলাউদ্দিন বহ্মন শাহের পুত্র মোহম্মদ শাহ্ (১ম) সুদক্ষ শাসক ছিলেন। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তিনি শাসন-সংক্রান্ত কার্যাদি বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করিয়া শাসনকার্যের দক্ষতা বহুগুণে বৃদ্ধি করিলেন। তাঁহার রাজত্বকালের সর্বপ্রধান উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল বরঙ্গল ও বিজয়নগর সাম্রাজ্যের সহিত অবিরাম সংঘর্ষ। রায়চুর দোয়াব অঞ্চলের অধিকার লইয়াই প্রধানতঃ এই দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই দুই দেশের সহিত যুদ্ধে মোহম্মদ শাহ্ জয়লাভ করিয়াছিলেন। বরঙ্গলের রাজা পরাজিত হইয়া গোলকুণ্ডা মোহম্মদ শাহ্কে অর্পণ করিতে এবং প্রভূত পরিমাণ ক্ষতিপূরণদানে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন বহ্মনী রাজ্যের আনুগত্যও তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইয়াছিল। বিজয়নগর সাম্রাজ্যও মোহম্মদ শাহের হস্তে পরাজিত হইয়াছিল এবং মোহম্মদ শাহের সৈন্য বিজয়নগর সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া চারি লক্ষ হিন্দুর প্রাণনাশ করিয়াছিল।

বরঙ্গল ও বিজয়নগর সাম্রাজ্যের সহিত বহ্মনী রাজ্যেব যুদ্ধ

মুজাহিদ শাহ্, ১৩৭৭—৭৮ (Mujahid Shah) ঃ বিজয়নগরের বিরুদ্ধে বহ্মনী রাজ্যের দ্বন্দ্ব মুজাহিদ শাহের আমলেও চলিয়াছিল। মুজাহিদ শাহ্ অবশ্য বিজয়নগর সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে কোন সাফল্যলাভ করিতে সমর্থ হন নাই।

বিজয়নগবেব সহিত যুদ্ধ

মোহম্মদ শাহ্, ১৩৭৯—৯৭ (Muhammad Shah) ঃ পরবর্তী সুলতান মোহম্মদ শাহ্ যুদ্ধ-বিগ্রহ পছন্দ করিতেন না। তিনি শান্তিপ্রিয় শাসক ছিলেন। শিল্প ও সাহিত্যের প্রতি তাঁহার অপরিসীম অনুরাগ ছিল। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় বহুসংখ্যক বিদ্যালয় ও মস্জিদ স্থাপিত হইয়াছিল। এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে তিনি বহু বিদ্বান ব্যক্তিকে তাঁহার সভায় আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা

মোহম্মদ শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রদের মধ্যে সিংহাসনের অধিকার লইয়া বিরোধ উপস্থিত হইলে আলা-উদ্দিন বহ্‌মন শাহের পৌত্র তাজ-উদ্দিন ফিরুজ বহ্‌মনী সিংহাসন অধিকার করেন।

অন্তর্বিরোধ

তাজ-উদ্দিন ফিরুজ শাহ্, ১৩৯৭—১৪২২ (Taj-uddin-Firuz Shah) : তাজ-উদ্দিন ফিরুজ শাহ্ ছিলেন অত্যন্ত ক্ষমতাশালী শাসক। তাঁহার আমলে রাজ্যের যাবতীয় বিশৃঙ্খলার অবসান ঘটে। ধর্ম বিষয়েও কোনপ্রকার অনাচার তিনি ঘটিতে দিতেন না। জ্ঞানী ও গুণীদের সহিত নানাপ্রকার আলোচনায় তিনি কালাতিপাত করিতে আনন্দ পাইতেন। তিনি নানা ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার চরিত্রের এই সকল গুণ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। তিনিও সমসাময়িক কলুষতায় নিমজ্জিত হইলেন। দাক্ষিণাত্যের হিন্দু রাজ্যগুলি, বিশেষতঃ বিজয়নগরের সহিত তিনি দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বিজয়নগরের সহিত তিনি দুইবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া তথাকার রাজার নিকট হইতে প্রভূত পরিমাণ অর্থ এমন কি এক রাজকন্যাকে নিজ হারেমের জন্য লইয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু তৃতীয় অভিযানে তিনি পরাজিত হইয়াছিলেন। বিজয়নগরের সেনাবাহিনী বহ্‌মনী রাজ্যের পূর্ব ও দক্ষিণাংশ অধিকার করিয়া লইয়াছিল। এই পরাজয়ের গ্লানিতে তাজ-উদ্দিন ফিরুজ শাহের দেহ ও মন উভয়ই ভাঙ্গিয়া পড়িল। শাসনকার্যের দায়িত্ব হইতে তিনি নিজেকে ক্রমেই সরাইয়া লইতে লাগিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি নিজ ভ্রাতা আহ্‌ম্মদ শাহ্ কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত ও নিহত হইলেন।

বিজয়নগরের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ

বিজয়নগরের সহিত যুদ্ধে পরাজয়

আহ্‌ম্মদ শাহ্, ১৪২২—৩৫ (Ahmmad Shah) : সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই আহ্‌ম্মদ শাহ্ বিজয়নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি বিজয়নগর সাম্রাজ্য আক্রমণ করিয়া তথাকার রাজা দেবরায়কে (২য়) প্রভূত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দানে বাধ্য করিলেন। দেবরায় আহ্‌ম্মদ শাহ্‌কে বাৎসরিক করদানে স্বীকৃত হইয়া চুক্তিবদ্ধ হইলেন। বিজয়নগরের বিরুদ্ধে করিয়া আহ্‌ম্মদ শাহের উৎসাহ স্বভাবতই বৃদ্ধি

বিজয়নগরের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ—বিজয়নগরের করদানে স্বীকৃতি

পাইল। তিনি বরঙ্গল আক্রমণ করিয়া উহা সম্পূর্ণভাবে পদানত করিলেন। কাকতীয় রাজবংশের শাসনের অবসান ঘটাইয়া তিনি বরঙ্গল বহ্‌মনী রাজ্যভুক্ত করিলেন। আহ্‌ম্মদ শাহ্‌ ছিলেন দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। তিনি গুজরাটের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং মালবের সুলতান হুসাং শাহ্‌কে পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এইভাবে বহ্‌মনী রাজ্যের সীমা ও শক্তি বৃদ্ধি করিয়া আহ্‌ম্মদ্‌ শাহ্‌ গুলবর্গা হইতে তাঁহার রাজধানী বিদরে স্থানান্তরিত করিলেন। আহ্‌ম্মদ শাহ্‌ ধর্মন্মোত্ত সংকীর্ণমনা দুর্ধর্ষ শাসক ছিলেন। কিন্তু বিদ্যা ও বিদ্বানের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধার অভাব ছিল না।

বরঙ্গল জয়

মালবের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ

তাঁহার চরিত্র

আলা-উদ্দিন আহ্‌ম্মদ, ১৪৩৫—৫৭ (Ala-ud-din Ahmmad) : আহ্‌ম্মদ শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র আলা-উদ্দিন আহ্‌ম্মদ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ইতিমধ্যে বিজয়নগরের রাজা দেবরায় (২য়) আহ্‌ম্মদ শাহের হস্তে পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে নূতনভাবে সামরিক সংগঠন সম্পন্ন করিয়া রায়চুর দোয়াব আক্রমণ করিলেন। কিন্তু আলা-উদ্দিন আহ্‌ম্মদ পিতার ন্যায়ই সমরকুশল সুলতান ছিলেন। তিনি দেবরায়কে পরাজিত করিয়া শান্তিস্থাপনে বাধ্য করিলেন। পূর্ব প্রতিশ্রুত বাৎসরিক করও দেবরায়-এর নিকট হইতে তিনি আদায়ের ব্যবস্থা করিলেন। আলা-উদ্দিন কোঙ্কনের কতিপয় হিন্দু সামন্তরাজকে পরাজিত করিয়া তাঁহাদের আনুগত্য আদায় করিয়াছিলেন। পিতার ন্যায় আলা-উদ্দিন আহ্‌ম্মদও একজন অতি কঠোর শাসক ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি স্থাপত্যশিল্প ও সাহিত্যের উদার পৃষ্ঠপোষকও ছিলেন।

বিজয়নগরের সহিত যুদ্ধ

কোঙ্কনের সামন্ত-রাজগণের আনুগত্য লাভ

পরবর্তী সুলতান হুমায়ুন শাহ্‌ (১৪৫৭-৬১) যেমন ছিলেন অকর্মণ্য তেমনি ছিলেন রক্ত-লোলুপ। তাঁহার অত্যাচারে বহ্‌মনী রাজ্যে দারুণ ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল। সাধারণ্যে তিনি 'জালিম্‌' (oppressor) নামে পরিচিতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে বহ্‌মনী রাজ্যের প্রজাবৃন্দ স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ

হুমায়ুন শাহ্‌ (১৪৫৭—৬১)

করিয়াছিল। কবি নাজির হুমায়ুন শাহের মৃত্যু ভগবানের আশীর্বাদ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। হুমায়ুনের নাবালক পুত্র নিজাম শাহের রাজত্বকালে (১৪৬১—৬৩) উড়িষ্যা ও তেলিঙ্গানার হিন্দুরাজগণ ও মালবের মামুদ খল্‌জী বহ্‌মনী রাজ্য আক্রমণ করেন। মামুদ খল্‌জী বহ্‌মনী রাজ্যের রাজধানী বিদর অবরোধ করিলে নিজাম শাহের অনুরোধে গুজরাটের সুলতান মামুদ বেগ্‌রা সাহায্য প্রেরণ করেন। এই সাহায্য পাওয়ার ফলেই মামুদ খল্‌জীকে বিতাড়িত করা সম্ভব হইয়াছিল। পরবর্তী সুলতান মোহ্‌ম্মদ (৩য়)-ও ছিলেন নাবালক। এই সময়ে মামুদ গাওয়ান নামে জনৈক পদস্থ কর্মচারী বৃদ্ধ মন্ত্রী খাজা জাহানকে হত্যা করাইয়া স্বয়ং 'খাজা জাহান' উপাধি ধারণ করিয়া মন্ত্রিপদ গ্রহণ করেন।

নিজাম শাহ্‌ (১৪৬১—৬৩)

মোহ্‌ম্মদ (৩য়) (১৪৬৩—৮২)

মামুদ গাওয়ান (Mahmud Gawan): মামুদ গাওয়ান ছিলেন একজন বিদেশী মুসলমান। কিন্তু তিনি বহ্‌মনী বাজ্যের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়া চরম আনুগত্য সহকারে নিজ কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাঁহার দূরদর্শিতা, কূটকৌশল, সমরকুশলতা, শাসনকার্যে দক্ষতার ফলেই বহ্‌মনী রাজ্য উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছিয়াছিল। তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন ছিল নিষ্কলুষ ও আড়ম্বরহীন। শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁহার অপরিসীম অনুরাগ ছিল। বিদরে তিনি একটি মহা-বিদ্যালয় ও একটি বিশাল গ্রন্থাগার স্থাপন করিয়াছিলেন।

গাওয়ানের চরিত্র

মামুদ গাওয়ান কোঙ্কনের হিন্দুরাজগণকে দমন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে কতিপয় সুরক্ষিত দুর্গ দখল করিয়া লইয়াছিলেন। রাজা সঙ্গমেশ্বরের নিকট হইতে 'খেলনা' নামক দুর্গটিও তিনি লাভ করিয়াছিলেন। কোঙ্কনের বহুসংখ্যক দুর্গ ও শহর গাওয়ান দখল করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন বলিয়া সমসাময়িক ইতিহাস-গ্রন্থ বুর্হান-ই-মা-সির (*Burhan-i-Ma'asir*)-এ উল্লিখিত আছে। কোঙ্কন হইতে গাওয়ান প্রভূত পরিমাণ ধনরত্ন, বহুসংখ্যক ঘোড়া, হাতী, ক্রীতদাস, ক্রীতদাসী প্রভৃতি লইয়া গিয়াছিলেন। বিজয়নগর রাজ্য হইতে গোয়া নামক বন্দরটি তিনি দখল করেন। তাঁহার মন্ত্রিত্বাধীনেই বহ্‌মনী রাজ্যের সেনাধ্যক্ষ রাজমহেন্দ্রী ও কোন্দবীর নামক দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন। গাওয়ান

তাঁহার কার্যাদি

১৪৭৮ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যা রাজ্য আক্রমণ করিয়া তথাকার রাজাকে কয়েকটি হাতী ও কতক পরিমাণ ধনরত্ন দানে বাধ্য করেন। কয়েক বৎসর পর (১৪৮১) গাওয়ান কাঞ্চী আক্রমণ করিয়া তথাকার মন্দিরস্থ যাবতীয় ধনরত্নাদি লুণ্ঠন করিয়াছিলেন।

তৃতীয় মামুদের রাজত্বকালে মন্ত্রী গাওয়ানের চেষ্টায় বহ্‌মনী রাজ্য উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছিয়াছিল। কিন্তু সুলতান নিজে ক্রমেই ব্যভিচার ও বিলাসিতায় নিমজ্জিত হইতে লাগিলেন। অবশেষে অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে যাঁহারা গাওয়ানের ক্ষমতা-বৃদ্ধিতে ঈর্ষান্বিত হইয়াছিলেন তাঁহাদের কুপরামর্শে মামুদ (৩য়) গাওয়ানকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। গাওয়ান বহ্‌মনী রাজ্যের ক্ষমতা ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুলতানের এইরূপ অকৃতজ্ঞতায় এবং স্বার্থান্ধ অভিজাত সম্প্রদায়ের চক্রান্তে তাঁহাকে প্রাণ হারাইতে হইল। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বহ্‌মনী রাজ্যের ক্ষমতা হ্রাস প্রাপ্ত হইল।

গাওয়ানের প্রতি অকৃতজ্ঞতা—তাঁহার প্রাণদণ্ড

মামুদ অল্পকালের মধ্যেই নিজের ভুল বুঝিতে পারিলেন। তাই জীবনের অবশিষ্টাংশ অনুশোচনায় কাটাইয়া ১৪৮২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

মামুদের মৃত্যু (১৪৮২)

বহ্‌মনী রাজ্যের পতন (Fall of the Bahmani Kingdom) : বৃদ্ধ মন্ত্রী গাওয়ানকে অন্যায়ভাবে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া তৃতীয় মামুদ যে ভুল করিয়াছিলেন সেজন্য মর্মবেদনা ও অনুতাপে নিজেও অল্পকালের মধ্যেই প্রাণ হারাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু বহ্‌মনী রাজ্যের ভবিষ্যৎ সর্বনাশের পথ তিনি বন্ধ করিয়া যাইতে পারেন নাই। পরবর্তী সুলতান মামুদ শাহ্ (১৪৮২—১৫১৮) যেমন ছিলেন অকর্মণ্য তেমনি ছিলেন দুর্বলচিত্ত। কোন সুযোগ্য মন্ত্রীরও তখন উদ্ভব হয় নাই। ফলে বহ্‌মনী রাজ্যের সংহতি রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। সেই সুযোগে দাক্ষিণাত্যের স্থানীয় অভিজাতবর্গ ও বিদেশীয়দের মধ্যে এক দারুণ দ্বন্দ্ব দেখা দিল। প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ স্ব স্ব স্বাধীন হইয়া উঠিলেন। ফলে সুলতানের ক্ষমতা নিজ রাজধানীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িল। সুযোগ বুঝিয়া ইয়ুসুফ্ আদিল শাহ বিজাপুরে আদিলশাহী বংশের প্রতিষ্ঠা

মামুদের (৩য়) পরবর্তী কালে রাজনৈতিক অব্যবস্থা

করিলেন (১৪৯০)। বেরারে ফতুল্লাহ্ ইমাদ্ শাহ্ ইমাদশাহী বংশের, আহম্মদ-নগরে নিজাম শাহ্ নিজামশাহী বংশের এবং গোলকুণ্ডায় কুতুব শাহ্ কুতবশাহী বংশের প্রতিষ্ঠা করিলেন। আর মামুদ শাহের পরবর্তী কয়েকজন সুলতান বিদর অর্থাৎ কেবলমাত্র রাজধানীতেই নামেমাত্র রাজত্ব করিতে লাগিলেন। বিদরের শাসনক্ষমতাও মন্ত্রী আমীর বারিদের হস্তগত হইয়াছিল। অবশেষে শেষ বহ্মনী সুলতান কলিমুল্লাহ্ ১৫২৫ খ্রীষ্টাব্দে বিদর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে আমীর বারিদের অধীনে বিদরে বারিদশাহী বংশের প্রতিষ্ঠা হইল। এইভাবে বহ্মনী রাজ্য পাঁচটি স্বাধীন অংশে বিভক্ত হইয়া পড়িল।

বহ্মনী রাজ্যের পাঁচটি স্বাধীন রাজ্যে বিভক্তি

আথেনেসিয়াস্ নিকিতিন (Athanasius Nikitin) নামক জনৈক রুশ পর্যটক বহ্মনী রাজ্যের রাজধানী বিদরে আসিয়াছিলেন। তিনি বহ্মনী রাজ্যের সাধারণ প্রজা ও অভিজাতবর্গের অবস্থা সম্পর্কে একটি বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিবরণ হইতে জানা যায় যে, অভিজাতবর্গ মাত্রেই বিত্তশালী ছিলেন। তাঁহারা বিলাস-ব্যসনে নিমজ্জিত থাকিতেন। জনসাধারণের বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলের লোকের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। আর সুলতান ছিলেন অত্যন্ত আড়ম্বরপ্রিয়। তিনি বিশাল সেনাবাহিনী, হস্তী-বাহিনী প্রভৃতি সমভিব্যাহারে শিকারে বাহির হইতেন। বিদর তখন অত্যন্ত জনবহুল শহর ছিল। বিদেশীয় অর্থাৎ খোরাসানী অভিজাতবর্গ দেশের শাসন-ব্যবস্থায় যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়াছিল।

আথেনেসিয়াস্ নিকিতিনের বিবরণ

দাক্ষিণাত্যের পাঁচটি স্বাধীন সুলতানি (The Five Sultanates of the Deccan) : বহ্মনী রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ হইতে বেরার, আহ্মদনগর, বিজাপুর, গোলকুণ্ডা এবং বিদর এই পাঁচটি স্বাধীন সুলতানির উৎপত্তি হইয়াছিল। এই পাঁচটি সুলতানির ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন।

পাঁচটি স্বাধীন সুলতানি : বেরার, আহম্মদনগর, বিজাপুর, গোলকুণ্ডা ও বিদর

(১) বেরার (Berar) : বহ্মনী রাজ্য হইতে বেরার প্রদেশটিই সর্বপ্রথম স্বাধীন হইয়া যায়। ফতুল্লাহ্ ইমাদ্ শাহ্ ছিলেন বেরারের শাসন-কর্তা। ১৪৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ইমাদ্ শাহ্ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং ইমাদশাহী

বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি প্রথম জীবনে হিন্দু ছিলেন, পরে বেরার প্রদেশের শাসনকর্তা খান-ই-জাহান-এর অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন। ক্রমে তিনি হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়া ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। খান-ই-জাহানের মৃত্যুর পর তিনিই বেরার প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। ১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দে বহ্‌মনী সুলতানের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া ফতুল্লাহ্‌ ইমাদ্‌ শাহ্‌ নিজেকে স্বাধীন করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ইমাদশাহী বংশ ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত টিকিয়া ছিল। ঐ বৎসর আহম্মদ-নগরের নিজামশাহী বংশ কর্তৃক বেরার অধিকৃত হয়।

ফতুল্লাহ্‌ ইমাদ্‌ শাহ্‌ কর্তৃক বেরার-এর ইমাদশাহী বংশের প্রতিষ্ঠা

বিজাপুর (Bijapur)ঃ ইয়ুসুফ্‌ আদিল খাঁ ছিলেন বিজাপুরের শাসনকর্তা। একজন সামান্য ক্রীতদাস হিসাবে জীবন শুরু করিয়া ইয়ুসুফ্‌ আদিল খাঁ নিজ প্রতিভাবলে বিজাপুরের শাসনকর্তার পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। ১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দে বেরার-এর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া তিনিও স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনিই ছিলেন বিজাপুরের আদিলশাহী বংশের স্থাপয়িতা।

ইয়ুসুফ্‌ আদিল খাঁ মুসলমান হইলেও হিন্দুদের প্রতি তিনি যথেষ্ট উদারতা প্রদর্শন করিতেন। তিনি স্বয়ং এক হিন্দু রমণীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার শাসনব্যবস্থায় বহু হিন্দু উচ্চ রাজকর্মচারিপদে নিযুক্ত হইয়াছিল। তাঁহার শাসন ছিল ধর্মনিরপেক্ষ। তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন ছিল নিষ্কলুষ। শাসনকার্যে তিনি ছিলেন সুদক্ষ। রাজকীয় কর্তব্য পালনে তিনি কখনও অবহেলা প্রদর্শন করিতেন না। রাজকর্মচারিবৃন্দ ও মন্ত্রিবর্গকে তিনি সর্বদা তাঁহাদের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থাকিতে উপদেশ দান করিতেন। তুর্কীস্তান, পারস্য প্রভৃতি বিভিন্ন দেশ হইতে জ্ঞানী-গুণীদের তিনি তাঁহার রাজসভায় আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন। ইয়ুসুফ্‌ আদিল খাঁর আমলে বিজয়নগরের রাজা নরসিংহ বিজাপুর আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইয়ুসুফ এই আক্রমণ সহজেই প্রতিহত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ইয়ুসুফ্‌ আদিল খাঁ কর্তৃক বিজাপুরের আদিলশাহী বংশের প্রতিষ্ঠা

আদিল খাঁর চরিত্র ও কার্যাদি

পরবর্তী শাসকদের দুর্বলতা

ইয়ুসুফ্ আদিল খাঁর পরবর্তী সুলতানগণ—ইস্‌মাইল আদিল খাঁ (১৫১০—৩৪), মল্লু (১৫৩৪), ইব্রাহিম আদিল শাহ্ (১ম) (১৫৩৪—৫৭) এবং আদিল শাহ্ (১৫৫৭—৭৯) প্রভৃতির আমলে বিজাপুরে নানাপ্রকার আভ্যন্তরীণ গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছিল। পরবর্তী সুলতান ইব্রাহিম আদিল শাহ্ (২য়) (১৫৭৯—১৬২৬)

দাক্ষিণাত্যের রাজ্যসমূহ
(ষোড়শ শতক)

ইব্রাহিম আদিল শাহ্ অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতান

ছিলেন এই বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতান। ইয়ুসুফ্ আদিল খাঁর পরই তাঁহার নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহার আমলেও বিজাপুরের শাসনব্যবস্থা প্রজাবর্গের মঙ্গলকামী ছিল। ধর্মের ব্যাপারেও ইব্রাহিম আদিল শাহ্ চরম সহিষ্ণুতা

মোগল সাম্রাজ্যভুক্তি (১৬৮৬)

প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু বিজাপুর রাজ্য ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া পড়িলেও ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেব কর্তৃক অধিকৃত হওয়ার পূর্বাবধি নিজ স্বাধীনতা বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল।

আহ্‌ম্মদনগর (Ahmadnagar): আহ্‌ম্মদনগরের নিজামশাহী বংশের স্থাপয়িতা ছিলেন আহ্‌ম্মদ নিজাম শাহ্। ১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া আহ্‌ম্মদনগরকে বহ্‌মনী রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করেন। ঐ সময়ে এই প্রদেশটি জুনার নামে পরিচিত ছিল। আহ্‌ম্মদ নিজাম শাহ্ সামরিক সুবিধার জন্য আহ্‌ম্মদনগর শহরটি স্থাপন করিয়া সেখানে নিজ রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। এই শহরের নাম হইতেই আহ্‌ম্মদনগর রাজ্যটির নামকরণ করা হইয়াছে। আহ্‌ম্মদ নিজাম শাহ্ ১৪৯৯

আহ্‌ম্মদ নিজাম শাহ কর্তৃক আহ্‌ম্মদ-নগরের নিজামশাহী বংশের প্রতিষ্ঠা

খ্রীষ্টাব্দে দৌলতাবাদ দখল করিতে সমর্থ হন। দৌলতাবাদ জয় করিবার ফলে তাঁহার রাজ্যের শক্তি ও মর্যাদা বহু-গুণে বৃদ্ধি পায়। তাঁহার মৃত্যুর পর (১৫০৮) তাঁহার পুত্র বুর্‌হান নিজাম শাহ্ সুলতান পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া-ছিলেন এবং নিজ শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিজয়নগরের সম্রাটের সহিত মিত্রতাবদ্ধ হইয়াছিলেন। পরবর্তী সুলতান হুসেন নিজাম শাহ্ বিজয়নগরের বিরুদ্ধে দাক্ষিণাত্যের মুসলমান রাজ্যগুলির সঙ্গে যোগদান করিয়াছিলেন। আহ্‌ম্মদনগরের পরবর্তী ইতিহাসের মধ্যে চাঁদবিবি কর্তৃক মোগল সৈন্যের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৬০০

মোগল সাম্রাজ্যভুক্তি (১৬৩৩)

খ্রীষ্টাব্দে মোগলবাহিনী আহ্‌ম্মদনগর বিধ্বস্ত করিয়াছিল বটে, কিন্তু ১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে উহা সম্পূর্ণভাবে মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করা সম্ভব হয় নাই। ঐ বৎসর (১৬৩৩) আহ্‌ম্মদনগর যখন মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়, শাহজাহান তখন দিল্লীর সম্রাট।

গোলকুণ্ডা (Golkunda): বরঙ্গলের কাকতীয় রাজবংশের উচ্ছেদ সাধন করিয়া বহ্‌মনী রাজ্য বরঙ্গল দখল করিয়াছিল। বরঙ্গলেই গোলকুণ্ডা রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। গোলকুণ্ডার কুতবশাহী বংশের

স্থাপয়িতা ছিলেন কুলী কুতব শাহ্। ইনি জাতিতে ছিলেন তুর্কী। ১৫১২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বহ্‌মনী রাজ্যের আনুগত্য অস্বীকার করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর (১৫৪৩) পর তাঁহার দুই পুত্র জম্‌সীদ ও ইব্রাহিম ক্রমান্বয়ে সুলতান পদে অধিষ্ঠিত হন। তাঁহাদের রাজত্বকালে গোলকুণ্ডা দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য সুলতানি রাজ্যের সহিত যুগ্মভাবে বিজয়নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল। ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেব কর্তৃক গোলকুণ্ডা মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

কুলী কুতব শাহ্ কর্তৃক গোলকুণ্ডা কুতবশাহী বংশের প্রতিষ্ঠা

মোগল সাম্রাজ্যভুক্তি (১৬৮৭)

বিদর (Bidar): বহ্‌মনী রাজ্যের প্রত্যেকটি প্রদেশই স্বাধীনতা ঘোষণা করিলে কেবলমাত্র রাজধানী বিদরে বহ্‌মনী বংশের শেষ সুলতানগণ নামেমাত্র রাজত্ব করিতেছিলেন। কিন্তু প্রকৃত শাসনক্ষমতা ছিল আমীর আলী বদ্‌র-এর হস্তে। ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে আলী বদ্‌র বহ্‌মনী বংশের শেষ সুলতান কলিমুল্লাহ্‌কে দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া বিদরে 'বারিদশাহী' বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। বিদর অবশ্য ১৬১৮ খ্রীষ্টাব্দে বিজাপুর রাজ্য কর্তৃক অধিকৃত হয়।

আমীর আলী বদ্‌র কর্তৃক বিদরে বারিদশাহী বংশের প্রতিষ্ঠা

বিজাপুর রাজ্যভুক্তি (১৬১৮)

বিজয়নগর সাম্রাজ্য (The Vijaynagar Empire): বিজয়নগর সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার প্রকৃত ইতিহাস সম্পর্কে কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছান সম্ভব হয় নাই। প্রচলিত কাহিনী-কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া মোটামুটি একথা বলা যাইতে পারে যে, সঙ্গম নামে জনৈক ব্যক্তির পাঁচ পুত্র তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণ তীরে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। এই পাঁচ ভ্রাতার মধ্যে হরিহর ও বুক্কই ছিলেন প্রধান। মাধব বিদ্যারণ্য নামে জনৈক ব্রাহ্মণপণ্ডিত এবং তাঁহার ভ্রাতা বেদের বিখ্যাত ভাষ্যকার সায়নাচার্য বিজয়নগরের ভিত্তি স্থাপনের প্রেরণা দান করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। বিজয়নগর সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে বা কাহারা সেবিষয়ে যথেষ্ট মতানৈক্য

বিজয়নগর সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা

থাকিলেও দক্ষিণ-ভারতের হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই যে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের পত্তন হইয়াছিল সেবিষয়ে সন্দেহ নাই। বিজয়নগর সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠায় দাক্ষিণাত্যের হিন্দুদের জাতীয়তাবোধের বিকাশ পরিলক্ষিত হয়।

বিজয়নগর সাম্রাজ্যের উত্থান দক্ষিণ-ভারতের ইতিহাসের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। দীর্ঘ তিন শতাব্দী ধরিয়া বিজয়নগর মুসলমান আক্রমণ হইতে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিল। দাক্ষিণাত্যে দিল্লী সুলতানদের প্রাধান্য নির্মূল হইয়া গেলে এবং সেই স্থলে বহ্‌মনী রাজ্য মুসলমান প্রাধান্য বিস্তারে অগ্রসর হইলে বিজয়নগর সেই চেষ্টা ব্যর্থ করিয়াছিল। জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ বিজয়নগরের হিন্দু রাজগণ ও প্রজাসাধারণের চেষ্টায় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বিজয়নগর এক বিশাল সাম্রাজ্যের মর্যাদা লাভে সমর্থ হইয়াছিল।

বিজয়নগর সাম্রাজ্যের গুরুত্ব

সঙ্গম বংশ (Sangama Dynasty) : বিজয়নগরের সর্বপ্রথম রাজবংশ সঙ্গমবংশ নামে পরিচিত। এই বংশের হরিহর ও বুক্ক মুসলমান শক্তির বিরুদ্ধে অক্লান্তভাবে যুঝিয়া বিজয়নগরের ভিত্তি দৃঢ় করিতে সমর্থ হন। তাঁহাদের চেষ্টায় হোয়সল রাজ্যের অধিকাংশই বিজয়নগরের অধিকারভুক্ত হয়। ইহা ভিন্ন পার্শ্ববর্তী আরও বহু স্থান হরিহর ও বুক্কের রাজত্বকালে বিজয়নগরের প্রাধান্যাধীনে আসে। হরিহর ও বুক্ক অবশ্য কোন রাজকীয় উপাধি ধারণ করেন নাই। বুক্ক চীন সম্রাটের নিকট এক দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন (১৩৭৪)। ইহা হইতেই তাঁহার স্বাধীন মর্যাদার পরিচয় পাওয়া যায়। বুক্কের শাসনকালেই তাঁহার পুত্র কুমার কম্পন মাদুরার মুসলমান সুলতানকে পরাজিত করিয়া মাদুরা বিজয়নগরের অন্তর্ভুক্ত করেন। বুক্ক বহ্‌মনী সুলতান মহম্মদ শাহ্‌ ও মুজাহিদ শাহের সহিত ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া নব-প্রতিষ্ঠিত বিজয়নগর সাম্রাজ্যের শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। ১৩৭৯ খ্রীষ্টাব্দে বুক্কের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় হরিহর রাজা হইলেন।

হরিহর ও বুক্ক

দ্বিতীয় হরিহর সর্বপ্রথম সম্রাটোচিত উপাধি ধারণ করেন। তিনি নিজেকে 'মহারাজাধিরাজ', 'রাজপরমেশ্বর' প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত করেন। দ্বিতীয় হরিহরের রাজত্বকালেও বহ্‌মনী রাজ্যের সহিত বিজয়নগর সাম্রাজ্যের যুদ্ধ চলিতে থাকে। রায়চুর দোয়াব দখল করিবার উদ্দেশ্যে তিনি ফিরুজ শাহ্‌

বহ্মনীর সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যুদ্ধে তাঁহার পরাজয় ঘটিয়াছিল এবং তিনি প্রভূত পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় হরিহর
(১৩৭৯-১৪০৪)

দ্বিতীয় হরিহরের রাজত্বকালে প্রায় সমগ্র দাক্ষিণাত্যে বিজয়নগরের প্রভুত্ব বিস্তার লাভ করে। মহীশূর, কাঞ্চী, কানাড়া, ত্রিচিনোপল্লী প্রভৃতি তাঁহার আমলেই বিজয়নগর সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। দ্বিতীয় হরিহর শিবের উপাসক ছিলেন, কিন্তু অপরাপর ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রতি তিনি সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রদের মধ্যে সিংহাসনাধিকার লইয়া দ্বন্দ্ব শুরু হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রথম দেবরায় সিংহাসন অধিকার করিলে পুনরায় দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসে।

প্রথম দেবরায়ের আমলেও বহ্মনী রাজ্যের সহিত বিজয়নগরের চিরাচরিত যুদ্ধনীতি অব্যাহত রহিল। বহ্মনী সুলতান ফিরুজ শাহ্ বিজয়নগর সাম্রাজ্য আক্রমণ করিয়া দেবরায়কে পর পর দুইবার পরাজিত করেন। ফলে দেবরায় ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রভূত পরিমাণ অর্থ এবং ফিরুজ-শাহের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ দিতে বাধ্য হন। কিন্তু ইহাতেও যুদ্ধের

প্রথম দেবরায়
(১৪০৬-২২)

অবসান ঘটিল না। দেবরায়ও এই পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে নিরস্ত রহিলেন না। বহ্মনী সুলতানের সহিত তৃতীয়বার যুদ্ধে তিনি জয়ী হইলেন এবং বহ্মনী রাজ্যের পূর্ব ও দক্ষিণাংশ বিজয়নগরের সেনাবাহিনী অধিকার করিয়া লইল। এই পরাজয়ের গ্লানি সহ্য করিতে না পারিয়া ফিরুজ শাহ্ অল্পকালের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। ১৪২২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম দেবরায়ের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় দেবরায় সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

দ্বিতীয় দেবরায় ছিলেন সঙ্গম বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট। তিনিও বহ্মনী রাজ্যের বিরুদ্ধে চিরাচরিত যুদ্ধনীতি অনুসরণ করিয়া চলিলেন, কিন্তু ইহাতে অকৃতকার্য হইয়া তিনি বিজয়নগরের সেনাবাহিনী পুনর্গঠনে মনোযোগী

দ্বিতীয় দেবরায়
(১৪২২-৪৬)

হইলেন। বহ্মনী রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আঁটিয়া উঠিবার জন্য তিনি নিজ সেনাবাহিনীতে মুসলমান সৈনিক নিযুক্ত করিলেন। ইহা ভিন্ন তিনি আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা, বাণিজ্য, নৌবহর প্রভৃতিরও উন্নতিসাধন করিলেন। লক্ষ্মণ নামে তাঁহার

জনৈক বিশ্বস্ত কর্মচারীকে তিনি সমুদ্রবাহী বাণিজ্য পরিচালনার ভার অর্পণ করিলেন। কিন্তু বহ্‌মনী রাজ্যের সহিত যুদ্ধে কৃতকার্য হইতে না পারিলেও দ্বিতীয় দেবরায়ের রাজত্বকালে বিজয়নগর সাম্রাজ্য সিংহলের উপকূল পর্যন্ত বিস্তারলাভ করিয়াছিল। তাঁহার রাজত্বকালে ইতালীয় পর্যটক নিকোলো কন্টি এবং পারসিক পর্যটক আব্দুর্ রজাক্ তাঁহার রাজধানীতে আসিয়াছিলেন। উভয়েই দেবরায়কে দাক্ষিণাত্যের শ্রেষ্ঠ রাজা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। উভয়েই বিজয়নগরের ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন।

মল্লিকার্জুন (১৪৪৬-৬৫)

দেবরায়ের মৃত্যুর পর মল্লিকার্জুন সিংহাসন লাভ করেন। তাঁহার রাজত্বকালে উড়িষ্যার হিন্দুরাজা বহ্‌মনী সুলতানের সহিত যুগ্মভাবে বিজয়নগর আক্রমণ করেন। মল্লিকার্জুন এই যুগ্ম আক্রমণ প্রতিহত করিয়া নিজরাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পরবর্তী সম্রাট দ্বিতীয় বিরূপাক্ষ অকর্মণ্য শাসক ছিলেন। তাঁহার দুর্বলতার সুযোগ লইয়া উড়িষ্যার রাজা পুরুষোত্তম গজপতি ও বহ্‌মনী সুলতান যুগ্মভাবে বিজয়নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ফলে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের কোন কোন অংশে বিদ্রোহ দেখা দিল। মামুদ গাওয়ান গোয়া দখল করিয়া লইলেন এবং পাণ্ড্যরাজ কাঞ্চী আক্রমণ করিলেন। এইভাবে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের সংহতি যখন আভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত আক্রমণে বিনষ্ট হইতে চলিয়াছে সেই সময়ে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের চন্দ্রগিরি প্রদেশের শাসনকর্তা নরসিংহ দ্বিতীয় বিরূপাক্ষকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৪৮৬)। নরসিংহ পূর্ব হইতেই বহিরাগত শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয়নগর সাম্রাজ্য রক্ষার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সাম্রাজ্যের সঙ্কট মুহূর্তে তিনি সিংহাসন অধিকার করিয়া যেমন এক নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিলেন তেমনি বিজয়নগর সাম্রাজ্যকেও এক নবজীবন দান করিলেন।

বিরূপাক্ষ (১৪৬৫—৮৬)

সালুভ বংশ (Saluva Dynasty) : নরসিংহ ছিলেন সালুভ বংশসম্ভূত। এজন্য তাহার স্থাপিত রাজবংশ সালুভ বংশ নামে পরিচিত। নরসিংহ সালুভ কর্তৃক বিজয়নগরের সিংহাসন অধিকার জনসাধারণ কর্তৃক

সমর্থিত হইল নরসিংহ ছিলেন প্রকৃত দেশপ্রেমিক; বিজয়নগরের স্বার্থসিদ্ধিই ছিল তাঁহার সিংহাসন আরোহণের মূল উদ্দেশ্য। তিনি প্রথমেই বিদ্রোহী প্রদেশগুলির উপর বিজয়নগরের প্রভুত্ব পুনঃস্থাপন করিলেন। অবশ্য বহ্‌মনী সুলতানদের হাত হইতে রায়চুর দোয়াব এবং উড়িষ্যারাজ পুরুষোত্তম গজপতির অধিকার হইতে উদয়গিরি তিনি পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হন নাই। তিনি তামিল রাজ্যগুলির বিভিন্ন অংশ জয় করিয়া বিজয়নগর সাম্রাজ্যের সীমা বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ইম্মদি নরসিংহ সম্রাট হইলেন বটে, কিন্তু শাসনকার্য পরিচালনার কোন ক্ষমতাই তাঁহার ছিল না। স্বভাবতই পিতার আমলের বিশ্বস্ত সেনানায়ক নরস নায়ক সাম্রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। নরস নায়কের শাসন-দক্ষতায় সাম্রাজ্যের সর্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রহিল। নরস নায়কের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বীর নরসিংহ পিতার পদ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার পিতা অপেক্ষা অধিকতর উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তিনি সালুভ বংশের অকর্মণ্য সম্রাটকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া নিজেই সিংহাসন দখল করিলেন। এইভাবে বিজয়নগরের দ্বিতীয় রাজবংশের অবসান ঘটিল।

নরসিংহ সালুভ (১৪৮৬—৯৩)

ইম্মদি নরসিংহ; নরস নায়ক

বীর নরসিংহ তুলুভ কর্তৃক সিংহাসন দখল (১৫০৫)

তুলুভ বংশ (Tuluva Dynasty) : বীর নরসিংহ ছিলেন তুলুভ বংশ-সম্ভূত। বীর নরসিংহ ধর্মপরায়ণ সুদক্ষ শাসক ছিলেন বলিয়া সমসাময়িক লিপি (inscription) ও বৈদেশিক পর্যটক নুনিজ-এর বর্ণনায় উল্লেখ রহিয়াছে। তুলুভ বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন বীর নরসিংহের ভ্রাতা কৃষ্ণদেব রায়।

বীর নরসিংহ—তুলুভ বংশের প্রতিষ্ঠাতা

বিজয়নগর সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সম্রাট কৃষ্ণদেব রায় ভারত ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ রাজগণের অন্যতম হিসাবে পরিগণিত। তিনি একাধারে দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, সমরকুশলী, সেনাপতি, অতিথি-পরায়ণ, উদারচিত্ত, পরধর্মসহিষ্ণু শাসক ছিলেন। পোর্তুগীজ পর্যটক পায়েজ (Paes) তাঁহার চরিত্রের

তুলুভ বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট কৃষ্ণদেব রায় (১৫০৫—৩০)

তাঁহার চরিত্র

বিভিন্ন গুণের উল্লেখ করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে, কৃষ্ণদেব রায় সকল ক্ষেত্রেই সমভাবে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করিয়াছিলেন।

শাসনকার্য গ্রহণ করিয়াই কৃষ্ণদেব রায় উড়িষ্যার রাজার বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে যাত্রা করিলেন। উড়িষ্যারাজ একাধিকবার বিজয়নগর আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং তিনি উদয়গিরি অধিকার করিতেও সক্ষম হইয়াছিলেন। তাই তাঁহাকে সমুচিত শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে কৃষ্ণদেব রায় উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া উদয়গিরি পুনরুদ্ধার করিলেন এবং ইহা ভিন্ন কোণ্ডবিধু নামক স্থানটিও জয় করিলেন। ইতিমধ্যে (১৪৯০) বহ্‌মনী রাজ্য বিচ্ছিন্ন হইয়া বিজাপুর, বেরার প্রভৃতি পাঁচটি স্বাধীন সুলতানির উদ্ভব হইয়াছিল। বিজাপুরের সুলতান তখন রায়চুর দোয়াবের অধিকার ভোগ করিতেছিলেন। কৃষ্ণদেব রায় বিজাপুরের সুলতানকে পরাজিত করিয়া রায়চুর দোয়াব দখল করিলেন। ইহা ছিল তাঁহার রাজত্বকালের সর্বপ্রধান ঘটনা। তিনি সাময়িকভাবে বিজাপুর রাজ্য দখল করিয়া গুলবর্গা দুর্গটি ধূলিসাৎ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণদেব রায় পরাজিত শত্রুর প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়া তাঁহার বিজয়গৌরব বহুগুণে বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তিনি উত্তরে উড়িষ্যা, বিজাপুর প্রভৃতি রাজ্যের দর্পচূর্ণ করিয়াছিলেন এবং দক্ষিণে নিজ সাম্রাজ্য সীমা সমুদ্রোপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছিলেন। ক্রমে ভারত মহাসাগরের কয়েকটি দ্বীপও তাঁহার প্রাধান্যাধীনে আসিয়াছিল।

তাঁহার কার্যাদি

কৃষ্ণদেব রায় কেবলমাত্র যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন এমন নহে, শাসনকার্যেও তিনি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। জীবনের শেষ কয়েক বৎসর তিনি সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ সংগঠনে ব্যয় করিয়াছিলেন। পোর্তুগীজ গবর্ণর অলবুকার্ক (Albuquerque) কে তিনি ভাটখাল নামক স্থানে একটি ঘাঁটি নির্মাণের অনুমতি দান করিয়াছিলেন (১৫১০)। পোর্তুগীজ পর্যটক পায়েজ (Paes) কৃষ্ণদেব রায়ের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণদেব রায়ের রাজত্বকালে বিজয়নগর সাম্রাজ্য উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছিয়াছিল। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্প ও সাহিত্যের উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। তিনি বৈষ্ণবধর্মের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। তিনি

শাসনদক্ষতা, শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা

দেবায়তনগুলির ব্যয়সঙ্কুলানের জন্য প্রভূত পরিমাণ অর্থ রাজকোষ হইতে ব্যয় করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণদেব রায়ের মৃত্যুর পর তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অচ্যুত রায় বিজয়-নগরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। পোর্তুগীজ পর্যটক নুনিজ (Nuniz) অচ্যুত রায়কে ভীরু, কাপুরুষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বস্তুত তিনি সেরূপ ছিলেন না। সমসাময়িক সাহিত্য ও লিপিতে তাঁহার সম্পর্কে যে সকল তথ্য পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে নুনিজের বর্ণনার অসারতা প্রমাণিত হয়। মাদুরার শাসনকর্তা বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে অচ্যুত রায় তাঁহাকে দমন করেন, ইহা ভিন্ন তিনি ত্রিবাঙ্কুরের রাজাকেও আনুগত্যাধীনে আনিতে সমর্থ হন। তাঁহার রাজত্বের প্রারম্ভে বিজাপুর সুলতান রায়চুর দোয়াব দখল করিয়া লইয়াছিলেন, অচ্যুত রায় তাহা পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হন। কিন্তু তাঁহার রাজত্বকালের প্রথম দিকে তিনি যে পরিমাণ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা ক্রমেই যেন হ্রাস পাইতে থাকে। তিনি ক্রমেই শাসনকার্যে শিথিলতা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন এবং তিরুমাল নামে তাঁহার দুই শ্যালক শাসনকার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। তাঁহার দুই শ্যালকের নামই ছিল তিরুমাল। তিরুমাল ভ্রাতৃদ্বয়ের উপর শাসনভার ন্যস্ত হওয়ায় রাজ্যের বিভিন্ন অংশের শাসকবর্গ অসন্তুষ্ট হইলেন। ফলে বেঙ্কট, তিরুমাল ও রাম নামে আরবিডু বংশের তিন ভ্রাতার নেতৃত্বে এক বিরোধী দলের সৃষ্টি হইল। এইভাবে আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বিবাদ-বিসম্বাদ দেখা দিলে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের পূর্ব মর্যাদা ও প্রতিপত্তি ক্রমে হ্রাসপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। অচ্যুত রায়ের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বেঙ্কট সিংহাসন আরোহণ করিলে অল্পকালের মধ্যেই সদাশিব নামে অচ্যুত রায়ের এক ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিলেন। সদাশিব রায় সিংহাসনে আরোহণ করিলেন বটে, কিন্তু রাজ্যশাসনের প্রকৃত ক্ষমতা রহিল মন্ত্রী রামরায়ের হস্তে। রামরায় ছিলেন আরবিডু বংশসম্ভূত।

অচ্যুত রায়

বেঙ্কট রায়, সদাশিব রায়

রামরায় ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন বটে, কিন্তু কূট-কৌশল এবং দূরদর্শিতার প্রয়োজন তিনি উপলব্ধি করেন নাই। তিনি বিজয়নগর সাম্রাজ্যের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য সচেষ্ট হইলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে দাক্ষিণাত্যের সুলতানি রাজ্যগুলির বিবাদে অংশ

রামরায়

গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তিনি এক এক সময়ে এক এক পক্ষে যোগদান করিয়া তাহাদের পরস্পর দ্বন্দ্বে লিপ্ত হইলেন। ইহাতে প্রথমে তিনি কতকটা সাফল্যও লাভ করিলেন। ফলে তিনি আরও উদ্ধত ও অপরিণামদর্শী হইয়া উঠিলেন। ১৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আহম্মদনগর ও গোলকুণ্ডার সুলতানদের সহিত যুগ্মভাবে বিজাপুর আক্রমণ করা স্থির করিলেন। কিন্তু বিজাপুরের মন্ত্রী আসদ খাঁর কূটচালে এই যুগ্ম আক্রমণের চেষ্টা ব্যর্থ হইল। ইহার কয়েক বৎসর পর (১৫৫৮) বিজাপুর, গোলকুণ্ডা ও বিজয়নগর যুগ্মভাবে আহম্মদনগর আক্রমণ করিল। এই আক্রমণকালে বিজয়নগরের সেনাবাহিনীর ঔদ্ধত্যে অতিষ্ঠ হইয়া আহম্মদনগরের প্রজাবৃন্দ বিজয়নগর সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রতিশোধগ্রহণে দৃঢ়সংকল্প হইল। রামরায়ের ব্যবহারে দাক্ষিণাত্যের সুলতানদের কেহই সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁহারা সকলে একযোগে বিজয়নগর আক্রমণ করা স্থির করিলেন। ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে একমাত্র বেরার ভিন্ন দাক্ষিণাত্যের অপরাপর সুলতানি রাজ্যের সম্মিলিত বাহিনী তালিকোটা নামক প্রান্তরে বিজয়নগরের সেনাবাহিনীকে আক্রমণ করিল। রামরায় বৃদ্ধ হইলেও স্বয়ং বিজয়নগরের সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব করিলেন, কিন্তু যুদ্ধে তাঁহার সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটিল। বিজয়নগরের গৌরবসূর্য তালিকোটার প্রান্তরে চিরতরে অস্তমিত হইল।

রামরায়ের অদূরদর্শিতা

তালিকোটার যুদ্ধ (১৫৬৫)

বিজয়ী মুসলমান সৈন্য বিজয়নগরে প্রবেশ করিয়া দীর্ঘ পাঁচ মাস ধরিয়া অবাধ লুণ্ঠন চালাইল। বুর্‌হান-ই-মা-সির এবং ফেরিস্তার বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, কল্পনাতীত পরিমাণ মণি-মুক্তা, ধনদৌলত, অসংখ্য হাতী, উট, ঘোড়া, ক্রীতদাস, ক্রীতদাসী বিজয়ী সৈন্যগণ কর্তৃক লুণ্ঠিত হইয়াছিল। সেনাবাহিনীর প্রত্যেক সৈনিকের ভাগে যে পরিমাণ সোনা, রূপা ও মণি-মুক্তা পড়িয়াছিল তাহাতে প্রত্যেকেরই ভাগ্য পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। বিজয়ী সেনাবাহিনী কেবলমাত্র মূল্যবান সামগ্রী লুণ্ঠন করিয়াই ক্ষান্ত ছিল না, বিজয়নগরকে তাহারা এক বিরাট ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিয়াছিল। পৃথিবীর ইতিহাসে বিজয়নগরের ন্যায় সমৃদ্ধ নগরীর এইরূপ আকস্মিক ধ্বংসস্তূপে পরিণতির দৃষ্টান্ত বিরল। নগরের যাবতীয় মন্দির, প্রাসাদ, হর্ম্যাদি ভস্মস্তূপে পরিণত করিয়াও বিজেতাদের

বিজয়নগর লুণ্ঠন

প্রতিহিংসাপরায়ণতার অবসান ঘটিল না। অবশেষে অগণিত নর-নারী, শিশু-বৃদ্ধের রক্তে বিজয়নগরের ধূলি রঞ্জিত করিয়া তাহারা লুণ্ঠন যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিল।* রামরায়ও শত্রুহস্তে নিহত হইলেন।

কিছুকাল পূর্বাবধি ধারণা ছিল যে, তালিকোটার যুদ্ধের ফলে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়াছিল। কিন্তু আধুনিক গবেষণায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, তালিকোটার যুদ্ধে বিজয়নগর শহরটি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইলেও বিজয়নগর সাম্রাজ্যের পতন ঘটে নাই। যাহা হউক, তালিকোটার যুদ্ধ ভারত-ইতিহাসের প্রধান যুদ্ধগুলির অন্যতম ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে দাক্ষিণাত্যে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের নিরঙ্কুশ হিন্দু প্রাধান্য স্থাপনের সুযোগ চিরতরে বিনষ্ট হইয়াছিল। বিজয়নগর সাম্রাজ্যের উপর এই আঘাত দাক্ষিণাত্যে তুর্কী প্রাধান্য বিস্তারের পথ সহজ করিয়া দিয়াছিল। তালিকোটার পরও আরবিড়ু বংশের অধীনে বিজয়নগর সাম্রাজ্য টিকিয়া থাকিলেও হিন্দু স্বাধীনতা ও সংস্কৃতি রক্ষার দায়িত্ব পালনের ক্ষমতা আর বিজয়নগরের ছিল না। ইহা ভিন্ন বিজয়নগরের শক্তিহীনতায় ভবিষ্যতে মারাঠা শক্তির উত্থানের পথও প্রস্তুত হইয়াছিল।

তালিকোটার যুদ্ধের ফলাফল

আরবিড়ু বংশ (Arbidu Dynasty): তালিকোটার যুদ্ধের পর রামরায়ের ভ্রাতা তিরুমাল বিজয়নগর হইতে পেনুগোণ্ডা নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করিয়া আরবিড়ু রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। দাক্ষিণাত্যের সুলতানগণের মধ্যে পুনরায় বিবাদ-বিসম্বাদ শুরু হইলে তিরুমাল বিজয়নগরের শক্তি ও প্রতিপত্তি

তিরুমাল

---

* "Never perhaps in the history of the world has such havoc been wrought so suddenly, on so splendid a city, teeming with a wealthy and industrious population in the full plentitude of prosperity one day and on the next seized, pillaged and reduced to ruins, amid scenes of savage massacre and horrors beggaring description." Sewel: *A Forgotten Empire*, vide *An Advanced History of India* p. 373.

বহুলাংশে পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইলেন। তিরুমালের মৃত্যুর পরও তাঁহার অনুসৃত নীতি তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় রঙ্গ অনুসরণ করিয়া চলিলেন। দ্বিতীয় রঙ্গের পর তাঁহার ভ্রাতা দ্বিতীয় বেঙ্কট সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ইনিই ছিলেন আরবিডু বংশের শেষ উল্লেখযোগ্য রাজা। দ্বিতীয় বেঙ্কট চন্দ্রগিরিতে নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁহার আমল পর্যন্ত বিজয়নগর সাম্রাজ্যের সংহতি রক্ষা সম্ভব হইয়াছিল। অবশ্য তিনিই রাজা উদেয়ারকে মহীশূর রাজ্য স্থাপনের অনুমতি দান করিয়া (১৬১২), বিজয়নগর সাম্রাজ্যের সংহতি বিনাশের পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বেঙ্কটের মৃত্যুর পর তৃতীয় রঙ্গ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার আমলে বহিরাগত আক্রমণ এবং আভ্যন্তরীণ গোলযোগের ফলে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের ভিত্তি ধ্বসিয়া পড়িতে লাগিল। প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের স্বার্থলোলুপতা এবং বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা রাজ্যের বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা বিজয়নগর সাম্রাজ্যের সর্বনাশ সাধন করিয়াছিল। বিজয়নগর সাম্রাজ্যের প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণের দেশাত্মবোধের অভাবহেতু বিজয়নগর সাম্রাজ্যের পতন অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছিল।

দ্বিতীয় রঙ্গ ও দ্বিতীয় বেঙ্কট

তৃতীয় রঙ্গ

বিজয়নগরের শাসন, সমাজ ও সংস্কৃতি (Administration, Society and Culture in Vijaynagar Empire):

শাসনব্যবস্থা (Administration): বিজয়নগর সাম্রাজ্যের উত্থান হইতে পতন পর্যন্ত দীর্ঘ ইতিহাস প্রধানত যুদ্ধ-বিগ্রহেরই ইতিহাস। এমতাবস্থায় বিজয়নগরের শাসনব্যবস্থায় সামরিক প্রভাব প্রতিফলিত হইলেও আশ্চর্য হইবার কারণ নাই। কিন্তু বিজয়নগরের সম্রাটগণ তাঁহাদের শাসনব্যবস্থা সামরিক প্রভাবমুক্ত রাখিয়া তাঁহাদের শাসনদক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। অবিরত যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকিয়াও বিজয়নগরের সম্রাটগণ এককেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থা স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

সামরিক প্রভাবমুক্ত শাসনব্যবস্থা

শাসনব্যবস্থা প্রধানত কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক, এই দুইভাগে বিভক্ত ছিল। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ কর্তা ছিলেন সম্রাট স্বয়ং। মধ্যযুগীয় রাজনৈতিক ধারণা অনুযায়ী

সম্রাটের ক্ষমতা ছিল স্বৈর ও সীমাহীন। সামরিক, বে-সামরিক ও বিচার-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যের চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন সম্রাট স্বয়ং। কিন্তু স্বৈরাচারী ক্ষমতার অধিকারী হইলেও সম্রাট স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না। প্রজার মঙ্গল এবং জনমতের প্রতি বিজয়নগরের সম্রাটগণ কখনও উদাসীন ছিলেন না। কৃষ্ণদেব রায় রচিত 'আমুক্ত মাল্যদা' নামক গ্রন্থে রাজকর্তব্য সম্বন্ধে বর্ণনা করিতে গিয়া বলা হইয়াছে যে, শাসন-কার্যে সম্রাট ধর্মীয় অনুশাসন দ্বারা পরিচালিত হইবেন। প্রজাবর্গের উপর গুরু করভার স্থাপন না করা, প্রজাবর্গের প্রতি উদারতা প্রদর্শন এবং তাহাদের নিরাপত্তা বিধান করা হইবে সম্রাটের প্রধান কর্তব্য। সুতরাং এ কথা মনে করা যাইতে পারে যে, বিজয়নগরের সম্রাটগণ এই সকল আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া রাজ্যশাসন করিতেন।

সম্রাটের ক্ষমতা

শাসনকার্যে সম্রাটকে সাহায্য করিবার জন্য একটি মন্ত্রিসভা ছিল। মন্ত্রিগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন সম্প্রদায় হইতেই সম্রাট কর্তৃক মনোনীত হইতেন। শাসনকার্যের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য সম্রাট ও মন্ত্রিসভার অধীনে একটি বিরাট দপ্তর ছিল। রাজ-কোষাধ্যক্ষ, বাণিজ্য সচিব, পুলিশবাহিনীর অধিকর্তা, 'ভাট' বা রাজপ্রশস্তি গায়ক প্রভৃতি ছিলেন বিভিন্ন পর্যায়ের রাজকর্মচারী। বিজয়নগরের রাজসভা বহুসংখ্যক পণ্ডিত, পুরোহিত, সাহিত্যিক, জ্যোতিষী, সঙ্গীতজ্ঞ দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল।

মন্ত্রিসভা

বিজয়নগর সাম্রাজ্য কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। এই সকল প্রদেশ আবার জেলা (ভেংটি), মহকুমা (নাড়ু), পরগণা (সীম), গ্রাম এবং স্থল (গ্রামের অংশ) প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেকটি প্রদেশে একজন করিয়া 'নায়ক' অর্থাৎ রাজপ্রতিনিধি শাসনকার্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। সাধারণত রাজ-পরিবারের সহিত সম্পর্কিত অথবা অভিজাত শ্রেণী হইতে নায়কগণ নিযুক্ত হইতেন। প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠিলেই বিজয়নগর সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়াছিল।

প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা

বিজয়নগরের গ্রাম্য শাসনব্যবস্থায় যথেষ্ট পরিমাণ স্বায়ত্তশাসনের সুযোগ

ছিল। গ্রাম্যসভার হস্তে পুলিশ, বিচার ও শাসন-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। গ্রাম পাহারা দিবার, এবং গ্রামের রাস্তাঘাট, পুল প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্য বেগার শ্রম গ্রহণের রীতি ছিল। 'মহানায়কাচার্য' নামে এক শ্রেণীর রাজকর্মচারী গ্রাম্য শাসন ও কেন্দ্রীয় শাসনের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করিতেন।

গ্রাম্য শাসনব্যবস্থা

ভূমি-রাজস্বই ছিল সরকারী আয়ের প্রধান উৎস। জমির উর্বরতার পর্যায়-ক্রমে রাজস্বের তারতম্য হইত। উর্বর জমি, বনাকীর্ণ জমি, প্রভৃতি বিভিন্ন পর্যায়ে জমিকে ভাগ করিয়া রাজস্ব নির্ধারণের সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। শুল্ক, খেয়া, পথকর, প্রভৃতি অপরাপর কর হইতেও সরকারী আয় হইত। রাজস্ব বা কর অর্থ অথবা ফসল দ্বারা দেওয়া চলিত। প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও রাজস্ব আদায়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারিগণ প্রায়ই প্রজাদের নিকট হইতে অবৈধভাবে অর্থ আদায়ের চেষ্টা করিতেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিগোচর করা হইলে উহার প্রতিকারের যথাবিহিত ব্যবস্থা করা হইত।

রাজস্ব

সম্রাট স্বয়ং সর্বোচ্চ বিচারক ছিলেন বটে, কিন্তু বিচারকার্যের জন্য সম্রাটের অধীনে বহুসংখ্যক বিচারালয় ও বিচারপতির ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। প্রচলিত রীতি-নীতি আইনের ন্যায় বলবৎ ছিল। এই সকল রীতি-নীতির উপর ভিত্তি করিয়াই বিচারকার্য সম্পাদন করা হইত।

বিচার ব্যবস্থা

আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা এবং বহিরাগত আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষার জন্য বিজয়নগর সাম্রাজ্যে এক বিশাল সেনাবাহিনী গঠন করা হইয়াছিল। দাক্ষিণাত্যের সুলতানিগুলির সহিত অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করিবার প্রয়োজন ছিল বলিয়া বিজয়নগরের সম্রাটগণ বাধ্য হইয়াই এক বিশাল সামরিক বাহিনী পোষণ করিতেন। হিন্দু ও মুসলমান, উভয় সম্প্রদায়ের লোক-ই সেনাবাহিনীতে গ্রহণ করা হইত। পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনী, উষ্ট্রবাহিনী, হস্তীবাহিনী ও গোলন্দাজবাহিনী লইয়া বিজয়নগরের বিশাল সেনাবাহিনী গঠিত ছিল।

সামরিক ব্যবস্থা

উপরোক্ত আলোচনা হইতে বিজয়নগরের শাসনব্যবস্থা যে সুষ্ঠু ও সংহতি-

বদ্ধ ছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ যথেষ্ট পরিমাণ স্বাধীনতা ভোগ করিতেন বলিয়াই কেন্দ্রীয়-শাসনের দুর্বলতার সুযোগ তাঁহারা গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন বিজয়নগর সাম্রাজ্যের বাণিজ্য বিস্তারের যে সুযোগ ছিল তাহা গ্রহণ করিবার মতো উপযুক্ত ব্যবস্থা বিজয়নগর সম্রাটগণ অবলম্বন করেন নাই। বিজয়নগরের পতনের পশ্চাতে এই দুইটি বিশেষ ত্রুটিই পরিলক্ষিত হয়।

ত্রুটি

সমাজ-জীবন (Social life) : সমসাময়িক লিপি (inscription), সাহিত্য, এবং বৈদেশিক পর্যটকদের বিবরণ হইতে বিজয়নগরের সমাজ-জীবন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। সমাজে ব্রাহ্মণগণ সর্বাধিক সম্মানের অধিকারী ছিলেন। রাজনীতি ক্ষেত্রেও ব্রাহ্মণদের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। স্ত্রীজাতি সমাজ-জীবনের সকল ক্ষেত্রেই পুরুষের সঙ্গে সমান অংশ গ্রহণ করিতেন। সমাজে স্ত্রীজাতির যথেষ্ট সম্মান ছিল। শিক্ষা, শিল্প, সঙ্গীত এমন কি মল্লযুদ্ধ, অসিচালনা প্রভৃতিতেও স্ত্রীজাতি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিতেন। পোর্তুগীজ পর্যটক নুনিজের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, বিজয়নগরের সম্রাটগণ স্ত্রী-মল্লযোদ্ধা পোষণ করিতেন। প্রাসাদের অভ্যন্তরে যাবতীয় খরচপত্রের হিসাব রক্ষার কাজেও স্ত্রীলোক নিযুক্ত করা হইত। স্ত্রী-জ্যোতিষীর সংখ্যাও যথেষ্ট ছিল এবং রাজ-পত্নীগণ সঙ্গীতশাস্ত্রে পারদর্শিনী ছিলেন।

সমাজে ব্রাহ্মণদের স্থান

স্ত্রীজাতির সামাজিক মর্যাদা

ব্রাহ্মণগণ নিরামিষভোজী ছিলেন। অপরাপর শ্রেণীর লোক প্রায় সকল প্রকার মাংস ভক্ষণ করিতেন। বিজয়নগরবাসীরা মাছ খাইতে ভালবাসিতেন। সমাজের নিম্নস্তরের অনার্যগণ বিড়াল, গিরগিটি প্রভৃতিরও মাংস খাইত।

খাদ্য

বিজয়নগরবাসীদের অনেকে বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন। রাজা কৃষ্ণদেব রায় ও অচ্যুত রায়ও ছিলেন বিষ্ণুর ভক্ত। বিজয়নগরে হিন্দু ধর্মের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইলেও বৌদ্ধ ও জৈন [illegible] সংখ্যাও নেহাৎ কম ছিল না। ইহা ভিন্ন খ্রীষ্টান, ইহুদি এবং আফ্রিকাবাসী মুসলমান প্রভৃতিও বিজয়নগরে নির্বিবাদে বাস করিত।

ধর্ম

সংস্কৃতি (Culture) : বিজয়নগর সাম্রাজ্য হিন্দু সাহিত্য ও সংস্কৃতির উৎকর্ষের জন্য বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। বিজয়নগরের সম্রাটগণের পৃষ্ঠপোষকতায় সংস্কৃত, তেলেগু, তামিল ও কানাড়ী ভাষার যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। বেদের বিখ্যাত ভাষ্যকার সায়ন ও তাঁহার ভ্রাতা মাধববিদ্যারণ্য বিজয়নগর সাম্রাজ্যের স্থাপনের প্রেরণা দান করিয়াছিলেন। বিদ্বান, সঙ্গীতজ্ঞ, দার্শনিক প্রভৃতি জ্ঞানী-গুণীদের জন্য বিজয়নগরের সম্রাটগণ মুক্তহস্তে ব্যয় করিতেন। আটজন খ্যাতনামা কবি 'অষ্টদিগ্‌গজ' কৃষ্ণদেব রায়ের রাজসভা অলংকৃত করিয়াছিলেন। পেড্ডন ছিলেন কৃষ্ণদেব রায়ের রাজকবি। কৃষ্ণদেব রায় নিজেও একজন সুসাহিত্যিক ছিলেন। তিনি 'আমুক্ত-মাল্যদা' নামে একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সঙ্গীত, নৃত্য, নাটক, তর্কশাস্ত্র, দর্শন প্রভৃতি নানা বিষয়ের উপর বহু গ্রন্থ ঐ সময়ে রচিত হইয়াছিল। রাজপরিবার ও রাজকর্মচারীদের মধ্যেও বহু সাহিত্যিক তাঁহাদের সাহিত্যসেবা দ্বারা বিজয়-নগরের কৃষ্টির উৎকর্ষ সাধনে সাহায্য করিয়াছিলেন। দক্ষিণ-ভারতীয় কৃষ্টি বিজয়নগর সাম্রাজ্যে চরম অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছিল।

সাহিত্য

স্থাপত্যশিল্পেও বিজয়নগর যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। তালিকোটার যুদ্ধের পর বিজয়ী সৈন্যের বর্বরতায় বিজয়নগরের সুদৃশ্য প্রাসাদ, মন্দির ও হর্ম্যাদি ধূলিসাৎ হইয়াছিল, তথাপি সেই ধ্বংসাবশেষ বিজয়নগরের স্থাপত্য শিল্পের উৎকর্ষের সাক্ষ্য আজিও বহন করিতেছে। কৃষ্ণদেব রায়ের রাজত্বকালে নির্মিত বিখ্যাত 'হাজার মন্দির' হিন্দু স্থাপত্যশিল্পের এক অতি সুন্দর নিদর্শন হিসাবে আজিও বিদ্যমান। বিঠলস্বামী মন্দিরটিও বিজয়নগরের স্থাপত্যের উৎকর্ষের সাক্ষ্য বহন

শিল্প

চিত্রশিল্প, সঙ্গীতশাস্ত্র প্রভৃতিও বিজয়নগরে যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছিল। কৃষ্ণদেব রায় এবং রামরায় সঙ্গীত-বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। জনসাধারণকে আনন্দ দান করিবার জন্য অভিনয়ের ব্যবস্থাও বিজয়নগরে ছিল।

চিত্রশিল্প ও সঙ্গীত-শাস্ত্র

বিজয়নগরের সম্রাটগণ ধর্মব্যাপারে সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদের কৃষ্টি ও মানসিক উৎকর্ষের পরিচয় দিয়াছিলেন। নিজেরা

পরধর্ম সহিষ্ণুতা

হিন্দুধর্মাবলম্বী হইলেও বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান, খ্রীষ্টান ও ইহুদিদিগের ধর্ম-পালনের স্বাধীনতা তাঁহারা দান করিয়াছিলেন।

বিদেশী পর্যটকদের বর্ণনা (Foreign Travellers' accounts):

নিকোলো কন্টি, আব্দুর রজাক, পায়েজ ও নুনিজ

বিজয়নগর সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধির কালে ইতালীয় পর্যটক নিকোলো কন্টি, পারসিক পর্যটক আব্দুর রজাক এবং পোর্তুগীজ পর্যটক পায়েজ ও নুনিজ বিজয়নগরে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের বর্ণনা হইতে বিজয়নগরের শক্তি ও সমৃদ্ধি, সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়।

নিকোলো কন্টি (১৪২০) বিজয়নগরের সম্রাটকে ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আব্দুর রজাক (১৪৪২—৪৩) বিজয়নগরের সমৃদ্ধি সম্পর্কে উল্লেখ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, বিজয়নগরের অগণিত

বিজয়নগরের ঐশ্বর্যের বর্ণনা

অধিবাসীর প্রত্যেকেই মণিমুক্তা অলঙ্কার হিসাবে ব্যবহার করিত। রাজকোষে সঞ্চিত সোনা ও মণিমুক্তার পরিমাণ ছিল অশ্রুতপূর্ব। রাজকোষের একটি বিরাট গহ্বর সোনা দ্বারা পূর্ণ ছিল। পোর্তুগীজ পর্যটক ডোমিনিগো পায়েজ (Dominigos Paes) রাজকোষের ঐশ্বর্যের অনুরূপ বর্ণনা দিয়াছেন। তিনি বিজয়নগরের বিশাল সেনাবাহিনী ও বহুসংখ্যক যুদ্ধহস্তীর কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। খাদ্যদ্রব্যের প্রাচুর্যের কথা উল্লেখ করিয়া পায়েজ বলিয়াছেন যে, 'বিজয়নগর পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা খাদ্যদ্রব্যসমৃদ্ধ নগরী'।* এডোয়ার্ডো বারবোসা (Edoardo Barbosa) নামে অপর একজন পর্যটক বিজয়নগরকে অত্যন্ত জন-বহুল নগর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বিজয়নগর ব্যবসায়-বাণিজ্যের একটি অতি সমৃদ্ধ কেন্দ্র, একথাও তিনি বলিয়াছেন। বিজয়নগরের বণিকগণ পেগু হইতে হীরা, চুণী প্রভৃতি আমদানি করিত। চীন ও আলেকজান্দ্রিয়া হইতে রেশম, মালাবার হইতে কর্পূর, গোলমরিচ, সিন্দুর, কস্তুরী, চন্দন প্রভৃতিও তাহারা বিজয়নগরে আমদানি করিত।†

---

* "This is the best provided city in the world" *Paes*, vide *An Advanced History of India*, p. 374.

† "The city of Vijaynagar is described as "of great extent, highly populous, and the seat of an active commerce in country-diamonds, rubies from Pegu, silks from China and Alexandria and cinnabar, camphor, musk, pepper and sandal from Malabar" *Edoardo Barbosa*, vide *An Advanced History of India*, p. 375.

নগরের পথে এবং বাজারে মণিমুক্তা বিক্রয় হইত। জনসাধারণের সকলেই হাত, কান, গলা, কোমর ও কব্জীতে গহনা পরিধান করিত। ইহা হইতে জনসাধারণের অর্থ-নৈতিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা করা যায়।

মণিমুক্তার প্রাচুর্য—উন্নত অর্থ নৈতিক অবস্থা

বিজয়নগর সাম্রাজ্যের সর্বত্রই কৃষি খুব উন্নতিলাভ করিয়াছিল। কৃষির উন্নতির উপরই বিজয়নগরের অধিবাসিবৃন্দের সমৃদ্ধি নির্ভরশীল ছিল। কৃষির সুবিধার্থে সেচের ব্যবস্থা রাষ্ট্র হইতে করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। বস্ত্রশিল্প, মৃৎশিল্প, ধাতুশিল্প, খনিশিল্প প্রভৃতি ছিল বিজয়নগর সাম্রাজ্যের প্রধান শিল্প। বিভিন্ন শিল্পের শিল্পকারদের এবং ব্যবসায়ীদের পৃথক পৃথক সঙ্ঘ (Guild) ছিল। আব্দুর রজাকের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, বিজয়নগর সাম্রাজ্যে ছোট বড় প্রায় তিন শত বাণিজ্য-বন্দর ছিল। মালাবার উপকূলের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দর ছিল কালিকট। বাণিজ্য-বন্দরগুলির মাধ্যমে বিজয়নগরের বণিকগণ ব্রহ্মদেশ, মালয় দ্বীপপুঞ্জ, চীন, পারস্য, আরব, দক্ষিণ-আফ্রিকা, আবিসিনিয়া, পোর্তুগাল প্রভৃতি দেশের সহিত বাণিজ্য করিত। বিজয়নগর তথা সমগ্র দক্ষিণ-ভারতের বাণিজ্যপোত মাত্রেই মালদ্বীপে (Maldive Islands) প্রস্তুত হইত। বিজয়নগর হইতে লোহা, সোরা, চাউল, চিনি, মসলা, কাপড় প্রভৃতি রপ্তানি হইত এবং বিদেশ হইতে ঘোড়া, হাতী, প্রবাল, তামা, পারদ, মখমল, রেশম প্রভৃতি বিজয়নগরে আমদানি করা হইত। বিদেশী পর্যটকদের বর্ণনা হইতে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান যে খুব উন্নত ছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্য খুব কম ছিল। জনসাধারণকে অত্যধিক পরিমাণ কর দিতে হইত সেই কথা সমসাময়িক লিপি হইতে প্রমাণিত হয়।

কৃষি ও শিল্প

বাণিজ্য

সোনা, রূপা ও তামার প্রস্তুত মুদ্রা বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে প্রচলিত ছিল। মুদ্রার ছাপ হইতে, বিজয়নগর রাজগণের ধর্ম-সম্পর্কে অনুমান করা যায়।

মুদ্রা

অপরাপর রাজ্যসমূহ

(Other Kingdoms)

উড়িষ্যা (Orissa) ঃ একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে অনন্তবর্মন্ চোড়গঙ্গ নামে জনৈক রাজা উড়িষ্যাকে এক অতি প্রতিপত্তিশালী রাজ্যে পরিণত করেন। সমসাময়িক লিপি হইতে জানা যায় যে, তাঁহার রাজ্য গঙ্গা নদী হইতে গোদাবরী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অনন্তবর্মন ধর্ম, শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার আমলেই পুরীর জগন্নাথ মন্দিরটি নির্মিত হইয়াছিল। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় সংস্কৃত ও তেলেগু ভাষায় বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। চোড়গঙ্গের বংশধরগণ মুসলমান আক্রমণ প্রতিহত করিয়া দীর্ঘকাল স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে প্রথম নরসিংহ (১২৩৮—৬৪) ছিলেন অত্যন্ত ক্ষমতাশালী রাজা। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় কোণারকের সূর্য মন্দিরটি নির্মিত হইয়াছিল। এই মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আজও দর্শকের বিস্ময় উৎপাদন করে।

অনন্তবর্মন্
(১০৭৬—১১৪৮)

প্রথম নরসিংহ
(১২৩৮—৬৪)

পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অনন্তবর্মন্ প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ কপিলেন্দ্র নামে জনৈক ক্ষমতাশালী ব্যক্তি কর্তৃক ক্ষমতাচ্যুত হয়। কপিলেন্দ্র উড়িষ্যার লুপ্তপ্রায় গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হন। বিজয়-নগর ও বহ্‌মনী রাজ্যের সহিত দ্বন্দ্বে সাফল্য লাভ করিয়া তিনি উড়িষ্যার রাজ্যসীমা কাবেরী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিজয়নগরের অন্তর্গত উদয়গিরি নামক স্থানটি তিনি দখল করিয়াছিলেন।

কপিলেন্দ্র

পরবর্তী রাজা পুরুষোত্তম গজপতি (১৪৭০—৯৭) দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলির সহিত দ্বন্দ্বে পরাজিত হইয়া রাজ্যের দক্ষিণাংশ হারাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার রাজত্বকালের

পুরুষোত্তম গজপতি
(১৪৭০—৯৭)

শেষভাগে তিনি এই সকল স্থান পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হন, তবে রাজা কপিলেন্দ্র-এর আমলে উড়িষ্যার রাজ্যসীমা যতদূর বিস্তৃত ছিল ঠিক ততদূর পর্যন্ত তিনি পুনরধিকার করিতে পারিয়াছিলেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ রহিয়াছে।

পুরুষোত্তম গজপতির পুত্র প্রতাপরুদ্র (১৪৯৭—১৫৪০) উড়িষ্যার রাজ্যসীমা রক্ষা করিতে সক্ষম হন নাই। তাঁহার সিংহাসনারোহণকালে উড়িষ্যা বাংলার হুগলী ও মেদিনীপুর জেলা হইতে মাদ্রাজের গুণ্টুর জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু বিজয়নগর ও গোলকুণ্ডার সহিত যুদ্ধে আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া গোদাবরী নদীর দক্ষিণস্থ রাজ্যাংশ তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। গোলকুণ্ডার সুলতান ১৫২২ খ্রীষ্টাব্দে একবার উড়িষ্যা রাজ্য আক্রমণও করিয়াছিলেন। প্রতাপরুদ্র ছিলেন শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক। উড়িষ্যায় শ্রীচৈতন্য কর্তৃক বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের ফলে উড়িষ্যাবাসী ক্রমেই সামরিক শক্তি হারাইয়াছিল মনে করা ভুল হইবে না।

প্রতাপরুদ্র (১৪৯৭-১৫৪০)

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে কপিলেন্দ্র কর্তৃক স্থাপিত রাজবংশ প্রতাপরুদ্রের মন্ত্রী গোবিন্দ কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইলেন। গোবিন্দ কর্তৃক স্থাপিত রাজবংশ ভোই বংশ নামে পরিচিত। কিন্তু এই বংশের রাজত্বও অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। ১৫৫৯ খ্রীষ্টাব্দে মুকুন্দ হরিচন্দন ভোই বংশকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া নিজে শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি উড়িষ্যার লুপ্ত গৌরব ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করেন এবং ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু পর্যন্ত মুসলমান আক্রমণের বিরুদ্ধে নিজ স্বাধীনতা বজায় রাখিতে সমর্থ হন। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাংলার কর্‌রাণী সুলতান কর্তৃক উড়িষ্যা রাজ্য অধিকৃত হয়। ঐ সময়ে কালাপাহাড় নামে মুসলিম ধর্মে ধর্মান্তরিত হিন্দু সেনাপতি জগন্নাথের মন্দির অপবিত্র করিয়াছিল এবং জগন্নাথদেবের মূর্তি চূর্ণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল।

মুকুন্দ হরিচন্দন

কর্‌রাণী সুলতান কর্তৃক উড়িষ্যা জয

মেবার (Mewar): রাজপুত রাজ্যগুলির মধ্যে মেবার ছিল সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। গুহিলা রাজপুতগোষ্ঠীর নেতা বাপ্পারাও কর্তৃক মেবার রাজ্যটি খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে স্থাপিত হইয়াছিল। আরব সেনাপতি মোহম্মদ-বিন্-

কাসিম মেবার-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করিয়াছিলেন। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আলা-উদ্দিন খল্‌জী মেবারের রাজধানী চিতোর আক্রমণে সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বীর হামীর দেব মুসলমান অধিকার হইতে চিতোর উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হামীর দেবের মৃত্যুর (১৩৮২) পর মেবারের সিংহাসন লইয়া এক অন্তর্দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। ১৪৪০ খ্রীষ্টাব্দে রাণা কুম্ভের মেবারের সিংহাসন আরোহণের পূর্বাবধি মেবার রাজ্যে কোন শান্তি ছিল না। রাণা কুম্ভ ভারত-ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ নৃপতিদের অন্যতম, সন্দেহ নাই। তিনি গুজরাট ও মালবের সুলতানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মালবের সুলতান মামুদ খল্‌জীকে তিনি শোচনীয়ভাবে পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি প্রতিবেশী মুসলমান নৃপতিদের মেবার বিজয়ের চেষ্টাও ব্যাহত করিয়াছিলেন। মেবার রাজ্যের নিরাপত্তা বিধানের জন্য তিনি মোট ৩২টি দুর্গ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এগুলির মধ্যে কুম্ভলগড় দুর্গ টিই ছিল প্রধান। তাঁহার আদেশে নির্মিত জয়স্তম্ভ স্থাপত্যশিল্পের অপূর্ব নিদর্শন হিসাবে আজিও বিদ্যমান। রাণা কুম্ভ স্বয়ং একজন কবি এবং সুসাহিত্যিক ছিলেন। তিনি নিজ পুত্র উদয়করণ কর্তৃক নিহত হন। পিতৃহন্তা উদয়কে সিংহাসনে স্থাপন করা সমীচীন হইবে না মনে করিয়া রাজপুতগণ তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রায়মল্লকেই রাণা বলিয়া স্বীকার করিলেন। রায়মল্লের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রাণা সঙ্গ বা সংগ্রাম মেবারের সিংহাসনে আরোহণ (১৫০৯) করিলে মেবারের ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা হয়। তিনি দিল্লী, মালব, গুজরাট প্রভৃতি রাজ্যের বিরুদ্ধে ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া তাঁহার অনন্যসাধারণ সামরিক প্রতিভার পরিচয় দান করিয়াছিলেন। এই সকল যুদ্ধের অধিকাংশ-গুলিতেই তিনি জয়লাভ করিয়াছিলেন। রাণা সঙ্গ এক জীবনে শতাধিক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার শরীরে ৮০টি ক্ষত-চিহ্ন ছিল। দিল্লী সুলতানির পতনের পর ভারতবর্ষে রাজপুত প্রাধান্য স্থাপন করাই ছিল তাঁহার জীবনের আদর্শ। এই উদ্দেশ্যে তিনি মেবারের সৈন্যবল ও অর্থবল বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। বাবর পানিপথের যুদ্ধে (১৫২৬) জয়ী হইয়া ভারতবর্ষে

মেবার রাজ্যের প্রতিষ্ঠা

হামীর দেব

রাণা কুম্ভ

রাণা সঙ্গ বা সংগ্রাম সিংহ

আধিপত্য স্থাপনে সচেষ্ট হইলে স্বভাবতঃই সংগ্রাম সিংহের সহিত তাঁহার যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠিল। ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে খানুয়ার যুদ্ধে তিনি বাবরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। বৃদ্ধ সংগ্রাম সিংহ তখন এক চক্ষুহীন ও পঙ্গু। যুদ্ধে তাঁহার পরাজয় ঘটিল। এই যুদ্ধে পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে রাজপুত প্রাধান্য স্থাপনের আশা চিরতরে নির্বাপিত হইল।

বাবরের হস্তে সংগ্রাম সিংহের পরাজয়

সিন্ধু রাজ্য (Kingdom of Sind) ঃ চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সিন্ধুদেশ আলা-উদ্দিনের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। মোহম্মদ-বিন্-তুঘ্লকের রাজত্ব-কালেও সিন্ধুদেশ দিল্লী সুলতানির অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু মোহম্মদ তুঘ্লকের রাজত্বকালের শেষভাগে সিন্ধুদেশ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই বিদ্রোহ দমন করিতে গিযা মোহম্মদ তুঘ্লকের মৃত্যু ঘটিয়াছিল। ফিরুজ তুঘ্লক বহু চেষ্টায় সিন্ধুদেশ পুনরধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহার পর হইতে সিন্ধুদেশ এক প্রকার স্বাধীনভাবেই চলিতেছিল। ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দে কান্দাহারের শাসনকর্তা শাহ্ বেগ আর্ঘুন্ বাবরের হস্তে পরাজিত হইয়া ভাগ্যান্বেষণে বাহির হন। ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সিন্ধুদেশ জয় করিয়া সেখানে আর্ঘুন্ বংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

আর্ঘুন বংশেব প্রতিষ্ঠা

কামরূপ (Kamrup) ঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে যখন মুসলমান অধিকার স্থাপিত হয় তখন আসাম কয়েকটি ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এগুলির মধ্যে কামরূপ রাজ্যটিই ছিল সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। ইহা 'কাম্তা রাজ্য' নামেও পরিচিত ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কাম্তা রাজ্যের শক্তি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। কাম্তাপুর নামে উহার এক নূতন রাজধানী স্থাপিত হয়। ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে কাম্তা বা কামরূপ রাজ্য বাংলার স্বাধীন সুলতান হুসেন শাহ্ কর্তৃক অধিকৃত হয়, কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই কামরূপ পুনরায় স্বাধীনতা অর্জনে সমর্থ হয়।

হুসেন শাহ্ কর্তৃক কামরূপ অধিকাব

কামরূপের পুনরায় স্বাধীনতা অর্জন

ষষ্ঠ অধ্যায়

সুলতানি আমলে শাসন, সমাজ ও সংস্কৃতি

(Administration, Society and Culture under the Sultanate)

শাসনব্যবস্থা (Administrative System): তুর্কী-আফগান শাসনাধীনে ভারতবর্ষ একটি ইসলাম ধর্মাশ্রয়ী রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছিল। সুলতান ছিলেন এই ধর্মাশ্রয়ী (theocratic) রাষ্ট্রের রাজনৈতিক এবং ধর্মনৈতিক শক্তির প্রতীকস্বরূপ। তাঁহার রাজনৈতিক ও ধর্মনৈতিক ক্ষমতা ছিল একমাত্র কোরাণের বিধি-নিষেধ দ্বারা সীমাবদ্ধ। ইস্‌লাম ধর্মানুসারে সমগ্র মুসলমান জগতের অধিকর্তা ছিলেন বাগদাদের খলিফা। ভারতের সুলতানদের মধ্যে কেহ কেহ অন্ততঃ মৌখিকভাবে হইলেও খলিফার প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছিলেন। ভারতের সুলতানগণ ছিলেন স্বৈরাচারী। তাঁহাদের ক্ষমতার প্রকৃত উৎস ছিল তাঁহাদের সামরিক শক্তি। শাসনকার্যের সমালোচনার কোন প্রশ্নই তখন ছিল না। সুলতান একাধারে ছিলেন সর্বোচ্চ শাসনকর্তা, সেনাপতি, আইন-প্রণেতা এবং সর্বোচ্চ বিচারক। বস্তুতঃ তখনকার শাসনব্যবস্থার মূল প্রকৃতি ছিল সামরিক। হিন্দুরাজ্যগুলির বিরোধিতা, মোঘলদের আক্রমণ এই দুইয়ের স্বাভাবিক ফলস্বরূপই সুলতানি শাসনের প্রকৃতি ঐরূপ হইয়াছিল। সুলতান-পদ বংশানুক্রমিক ছিল বটে, কিন্তু উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত কোন নির্দিষ্ট আইনকানুন না থাকায় সুলতানগণ মৃত্যুর পূর্বে উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যাইতেন। কোন কোন ক্ষেত্রে উত্তরাধি-কারীর অকর্মণ্যতাহেতু অভিজাতবর্গ কর্তৃক সুলতান নির্বাচিত হইতেন। কিন্তু এই নির্বাচনের মধ্যে কোন প্রকারের গণতান্ত্রিকতা ছিল মনে করা ভুল হইবে। এই ব্যাপারে অভিজাতবর্গের স্বার্থই-ছিল প্রধান যুক্তি। সুলতানি শাসনের মূল প্রকৃতির অপর বৈশিষ্ট্য ছিল সামন্ততান্ত্রিকতা। প্রাদেশিক

ধর্মাশ্রয়ী রাষ্ট্র

শাসনের প্রকৃতি

শাসনকর্তাগণ বা সামরিক নেতাগণ জায়গীর ভোগ করিতেন। ফলে সামন্ততান্ত্রিক শাসনের সহজাত ত্রুটি হিসাবে কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতা দেখা দিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ ও সামরিক নেতাগণ স্ব স্ব প্রধান হইবার চেষ্টা করিতেন।

সুলতানি শাসনকে প্রধানতঃ দুইটি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে, যথা, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক। কেন্দ্রীয় শাসন তথা সমগ্র রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ছিলেন সুলতান স্বয়ং। শাসনকার্য, বিচার, আইন-প্রণয়ন, যুদ্ধ-পরিচালনা প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার যে স্বৈর ক্ষমতা ছিল একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু স্বৈরাচারী শাসকের পক্ষেও বিশ্বস্ত কর্মচারীর সাহায্য গ্রহণ করা প্রয়োজন হয়। এই কারণে দিল্লীর সুলতানগণও বিভিন্ন পর্যায়ের রাজকর্মচারী নিযুক্ত করিতেন। এই সকল রাজকর্মচারী সুলতান কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন এবং তাঁহার খুশিমত পদচ্যুত হইতেন।

সুলতানের স্বৈর ক্ষমতা

মজ্‌লিস-ই-খালওয়াৎ (Majlis-i-khalwat) নামে সুলতানগণের বিশ্বস্ত অনুচর ও বন্ধু-বান্ধবদের একটি সভা ছিল। শাসনকার্যে কোন জটিল সমস্যা উপস্থিত হইলে এই সভার মতামত গ্রহণ করা হইত, কিন্তু এই সভার মতামত অনুযায়ী সুলতানকে কাজ করিতে হইবে এইরূপ কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। মালিক, আমীর, খাঁ প্রভৃতি অভিজাতবর্গ যে কক্ষ বা সভায় সুলতানের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন উহা 'বার্‌-ই-খাস' (Bar-i-Khas) এবং যে কক্ষে বসিয়া সুলতান বিচার করিতেন উহা 'বার্‌-ই-আম' (Bar-i-Am) নামে অভিহিত হইত।

'মজ্‌লিস্‌-ই-খালওয়াৎ' বা মন্ত্রণাসভা

'বার্‌-ই-খাস্‌' ও 'বার্‌-ই-আম'

রাজকর্মচারিবর্গের সর্বপ্রধান ছিলেন প্রধানমন্ত্রী বা ওয়াজীর (Wazir)। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য কতকগুলি পৃথক পৃথক বিভাগের সৃষ্টি করা হইয়াছিল। ওয়াজীর ছিলেন রাজস্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত, ইহা ভিন্ন তিনি অপরাপর বিভাগগুলিরও পরিদর্শনের দায়িত্ব প্রাপ্ত ছিলেন। রাজস্ব বিভাগের নাম ছিল দিওয়ান-ই-ওয়াজীরাৎ। ইহা ভিন্ন আপীল বিভাগ বা দিওয়ান-ই-রিসালৎ, সামরিক বিভাগ বা দিওয়ান-ই-আরজ, ক্রীতদাস বিভাগ বা দিওয়ান্‌-ই-বন্দেগান্‌, সরকারী চিঠি-

ওয়াজীর বা প্রধানমন্ত্রী

পত্রাদি প্রেরণ বিভাগ বা দিওয়ান-ই-ইন্‌শান্‌, বিচার, গুপ্তসংবাদ ও ডাক বিভাগ বা দিওয়ান-ই-কাজা-ই-মমালিক, প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগ ছিল। প্রত্যেক বিভাগ এক একজন উচ্চপদস্থ রাজ-কর্মচারীর অধীন ছিল। সরকারী ভাতা, কৃষি, অনাদায়ীকৃত রাজস্ব, টেকশাল, কারখানা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার কার্যাদি পরিচালনার ভার বিভিন্ন বিভাগের উপর ন্যস্ত ছিল। ইস্‌লাম ধর্মনীতি কার্যকরী করিবার জন্য সদর-ই-সুদুর, হিসাব পরীক্ষার জন্য মুস্তাফি-ই-মমালিক, নৌবাহিনীর তদারকের জন্য আমীর-ই-বেহ্‌র, সৈনিকদের বেতন দিবার জন্য বক্‌সি-ই-ফৌজ, প্রভৃতি রাজকর্মচারী ছিলেন। প্রধান বিচারপতি বা কাজী-উল-কাজাৎ ছিলেন বিচারবিভাগের ভারপ্রাপ্ত।

বিভিন্ন সরকারী বিভাগ

বিভিন্ন পর্যায়ের রাজকর্মচারি

মুফ্‌তিগণ প্রধান বিচারপতিকে কোরাণের আইন বিশ্লেষণে সাহায্য করিতেন। জমি-সংক্রান্ত বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার রাজস্ববিভাগের কর্মচারীগণ দ্বারা সম্পন্ন হইত। রাজস্ববিভাগের অধিকাংশ কর্মচারীই ছিলেন হিন্দু। দণ্ডবিধি ছিল অত্যন্ত কঠোর। কিন্তু ফিরুজ শাহ্‌ তুঘ্‌লক দণ্ডবিধির কঠোরতা কতক পরিমাণে হ্রাস করিয়াছিলেন।

দণ্ডবিধির কঠোরতা

দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষার ভার ছিল কটোওয়ালের উপর। মুহ্‌তসিব জনসাধারণের আচার-আচরণের উপর দৃষ্টি রাখিতেন এবং বাজারে ওজন প্রভৃতি ঠিক দেওয়া হইতেছে কিনা প্রভৃতি দেখিতেন। আমীর-ই-দাদ নামে কর্মচারীর কর্তব্য ছিল অপরাধীদিগকে কাজীর নিকট বিচারের জন্য উপস্থিত করা। দেশের বিভিন্ন অংশ হইতে সংবাদাদি সংগ্রহের জন্য বহুসংখ্যক গুপ্তচর নিযুক্ত ছিল। গ্রাম এলাকার বিচার ও শাসনভার ছিল গ্রাম্য পঞ্চায়েতের উপর। গ্রাম্য চৌকিদার গ্রামে পুলিশের কাজ করিত।

আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষা

গ্রাম্য শাসন

সুলতানি আমলে রাজস্ব হানাফি আইন বিধির (**Hanafi School**) নির্দেশ অনুযায়ী আদায় করা হইত। মুসলমান প্রজাবর্গের নিকট হইতে জাকৎ বা ধর্মকর আদায় করা হইত। অ-মুসলমানগণকে জিজিয়া কর দিতে হইত। জমিদার ও হিন্দু সামন্তগণের নিকট হইতে খারাজ বা ভূমিকর আদায় করা হইত। যুদ্ধের সময় লুণ্ঠিত সামগ্রীর এক-পঞ্চমাংশ কর হিসাবে গ্রহণ করা হইত। ইহাকে 'খামস্‌' বলা

রাজস্ব

হইত। এই সকল রাজস্ব ও কর ভিন্ন গোচারণ কর, গৃহকর প্রভৃতি নানা প্রকার করও আদায় করা হইত। সুলতানের নিজস্ব জমির রাজস্ব, জায়গীর-দারদের নিকট হইতে প্রাপ্ত কর প্রভৃতিও সরকারী আয়ের উৎস ছিল।

প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ নায়েব-সুলতান নামে পরিচিত ছিলেন। সুলতানি আমলে মোট প্রদেশের সংখ্যা বিভিন্ন সময়ে বিশ হইতে পঁচিশ পর্যন্ত ছিল। কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় সুলতান যে স্থান অধিকার করিতেন প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থায় ঠিক অনুরূপ স্থান অধিকার করিতেন প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ। প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণও যুদ্ধ, শাসন ও বিচার-সংক্রান্ত

প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা

ক্ষমতাপ্রাপ্ত ছিলেন। প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে শাসনের ব্যয় সঙ্কুলান করিয়া উদ্বৃত্ত অর্থ কেন্দ্রীয় রাজকোষে প্রেরণ করিতে হইত। সুলতানি সাম্রাজ্য ছিল সামন্ততান্ত্রিক। ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতার সুযোগে দূরবর্তী প্রদেশের শাসনকর্তা মাত্রেরই স্বাধীন হইবার মনোবৃত্তি পরিলক্ষিত হয়। প্রদেশ ভিন্ন হিন্দু সামন্তরাজগণের অধীনেও যথেষ্ট পরিমাণ জমি ছিল। এই সকল সামন্তরাজ সুলতানকে বাৎসরিক করদানের বিনিময়ে বংশপরম্পরায় ভূ-সম্পত্তি ভোগ করিতে পারিতেন।

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, সুলতানগণের শক্তির উৎস ছিল তাঁহাদের সমরবাহিনী। স্বভাবতঃই বিশাল সাম্রাজ্যের উপর প্রভুত্ব বজায় রাখিবার এবং বহিরাগত শত্রুর হাত হইতে দেশরক্ষার প্রয়োজনে সুলতানগণকে এক

সুলতানি সেনাবাহিনী

সুবিশাল সেনাবাহিনী পোষণ করিতে হইত। পদাতিক, অশ্বারোহী ও হস্তী-আরোহী সৈন্য লইয়া সুলতানি সেনাবাহিনী গঠিত ছিল। এই তিন প্রকার সৈন্যের মধ্যে অশ্বারোহী সৈনিক-গণই ছিল সর্বাধিক শক্তিশালী। যুদ্ধে জয়-পরাজয় অশ্বারোহী সৈনিকদের উপরই বিশেষভাবে নির্ভর করিত।

সুলতানি সেনাবাহিনী আরব, তুর্কী, আফগান, পারসিক, ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমান সৈন্য লইয়া গঠিত ছিল। সৈন্যসংখ্যার অধিকাংশই বিদেশীয় ছিল বলিয়া সেনাবাহিনী দেশপ্রেম বা জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ

আলা-উদ্দিন কর্তৃক স্থায়ী সেনাবাহিনী গঠন

ছিল না। সামরিক বিভাগ দিওয়ান-ই-আরিজ নামক বিভাগের অধীন ছিল। সুলতান আলাউদ্দিনের পূর্বাবধি কোন স্থায়ী সেনাবাহিনী পোষণের ব্যবস্থা ছিল না, তিনিই সর্বপ্রথম বেতন-

ভোগী স্থায়ী সৈন্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সামরিক ব্যবস্থার সর্বোচ্চে ছিলেন স্থলতান স্বয়ং। তাঁহার অধীনে নানা পর্যায়ের সেনাপতি ছিলেন। মালিক ও খাঁ-দের মধ্য হইতে সেনাপতি নিযুক্ত হইতেন। সেনাপতির নিম্ন পর্যায়ের সামরিক কর্মচারী ছিলেন সিপাহ্-শলার। প্রত্যেক সিপাহ্-শলার-এর অধীনে দশজন করিয়া সার্-ই-খইল থাকিতেন। সার্-ই-খইলদের প্রত্যেকে দশজন করিয়া অশ্বারোহী সৈন্যের নেতা ছিলেন। এইভাবে সামরিক কাঠামো উপর হইতে নীচের দিকে ঠিক পিরামিডের ন্যায় ক্রমশঃ প্রসারিত হইয়াছিল। স্থলতানি সেনাবাহিনীতে কোন গোলন্দাজ সৈন্য ছিল না বলিলেই চলে, তবে 'বলিস্ত' (**Balista**) নামক এক প্রকার প্রস্তর-নিক্ষেপক যন্ত্রের ব্যবহারের কথা জানা যায়।

'বলিস্ত'-এর ব্যবহার

সমাজ-জীবন (Social Life) : মুসলমান আক্রমণের পূর্বাবধি বিভিন্ন সময়তরঙ্গে যে-সকল ভিন্ন ভিন্ন জাতির লোক ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল ভারতের হিন্দুসমাজ তাহাদিগকে আপন করিয়া লইয়াছিল ; কিন্তু মুসলমান আক্রমণকারীদের ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। তুর্কী বিজেতাদের বিজয়ের অহঙ্কার ইহার জন্য প্রধাণতঃ দায়ী ছিল। ইহা ভিন্ন মুসলমান আক্রমণকারীদের ধর্মান্ধতা এবং বলপূর্বক হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করিবার চেষ্টা এবং হিন্দু মন্দির ও ঐশ্বর্য লুণ্ঠনাদি হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের সামাজিক সংমিশ্রণের পথ রুদ্ধ করিয়াছিল। ইহাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মুসলমানগণ যখন ভারতবর্ষ জয় করে তখন তাহাদেরও একটি স্থনির্দিষ্ট সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে, অপর পক্ষে হিন্দু সমাজেও রক্ষণশীলতা-প্রসূত সংকীর্ণতা দেখা দিয়াছে। স্বভাবতঃই এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক সংমিশ্রণের পরিবর্তে পার্থক্যই দেখা দিয়াছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হিন্দুদের প্রতি বৈষম্যমূলক ব্যবহারও ইহার জন্য দায়ী ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মুসলমান শাসনাধীনে হিন্দুগণ নিজদেশেই বিদেশী বলিয়া বিবেচিত হইত। ইস্লামীয় রাষ্ট্রে তাহারা ছিল 'জিম্মি'—অর্থাৎ বিশেষ শর্তাধীনে বসবাস করিবার অধিকারপ্রাপ্ত। জিজিয়া কর প্রদানই এই বিশেষ শর্তগুলির প্রধান ছিল। হিন্দু নির্যাতন মুসলমান আইনজ্ঞদের (**jurists**) দ্বারা সমর্থিত হইত। মিশরের জনৈক ইস্লামীয় আইনবিশারদ আলা-

হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের পার্থক্য

ইসলামীয় রাষ্ট্রে হিন্দুদের স্থান

উদ্দিনকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন: "শুনিলাম আপনি নাকি হিন্দুদের এমন অবস্থা করিয়াছেন যে, তাহারা মুসলমানদের দ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করিয়াছে। এইরূপ কাজ করিয়া আপনি ইস্‌লাম ধর্মের অশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। একমাত্র একাজের জন্যই আপনার সকল পাপ স্খালন হইবে।"*

ইস্‌লামীয় আইন-বিশারদ ও উলেমাদের সংকীর্ণতা

উলেমাদের ধর্মান্ধতা এবং শাসনব্যবস্থার উপর প্রভাব-বিস্তার সুলতানি শাসনের সংকীর্ণতার এবং মুসলমানদের মনে হিন্দু বিদ্বেষের সৃষ্টি করিয়াছিল। স্বভাবতই হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সামাজিক একতার মাধ্যমে বৃহত্তর ভারতীয় সমাজ গড়িয়া উঠিবার সুযোগ বিনষ্ট হইয়াছিল।

কিন্তু দীর্ঘকাল পাশাপাশি বসবাসের ফলে হিন্দু ও মুসলমান সমাজ পরস্পর পরস্পরকে কতক পরিমাণে প্রভাবিত করিয়াছিল ইহা অনস্বীকার্য। হিন্দুদের মধ্যে হইতে বহু সংখ্যক লোক ইস্‌লাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার ফলে হিন্দু সমাজের আচার-আচরণ মুসলমান সমাজে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। ধর্মান্তরিত হিন্দুগণ মুসলমান সমাজে বিবাহাদির ব্যাপারে শ্রেণীগত বৈষম্যের

মুসলমান সমাজের উপর হিন্দু সমাজের প্রভাব

প্রচলন করিয়াছিল। ইস্‌লাম ধর্মে কোনপ্রকার জাতিভেদ নাই বটে, কিন্তু ভারতীয় মুসলমানগণ বিবাহাদি ব্যাপারে রক্ষণশীলতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ইহা প্রধানতঃ হিন্দু সমাজেরই প্রভাবের ফল। হিন্দু সমাজের সাধুসন্তদের অনুকরণে মুসলমান সমাজেও পীরদের উদ্ভব ঘটিয়াছিল। সুলতানদের অনেকে হিন্দু পত্নী গ্রহণ করিবার ফলেও হিন্দু-সমাজের আচার-আচরণের অনেক কিছু মুসলমান সমাজে বিস্তারলাভ করিয়াছিল।

সুলতানি আমলে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই স্ত্রীজাতি পুরুষদের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল হইয়া পড়েন। পারিবারিক জীবনের বাহিরে

* "I have heard you have degraded the Hindus to such an extent that their wives and children beg their bread at the doors of Muslims. You are, in doing so, rendering a great service to religion. All your sins will be pardoned by reason of this single act." *An Egyptian juirist to Alauddin*, vide Sinha and Banerjee, p. 317

অপর কোন কিছুতে অংশ গ্রহণের পূর্বরীতি সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত হয়। সম্ভ্রান্ত পরিবারের স্ত্রীলোকদের মধ্যে বিদ্যা-চর্চার রীতি ছিল। রূপমতী ও পদ্মাবতী ঐ যুগের বিদুষী রমণীদের দৃষ্টান্তস্বরূপ। পর্দা প্রথা মুসলমান সমাজেই প্রচলিত ছিল, কিন্তু ক্রমে সম্ভ্রান্ত হিন্দু রমণীদের মধ্যেও উহার প্রচলন হইয়াছিল। স্ত্রীজাতির উপর নানাপ্রকার অবিচার-অত্যাচারের দৃষ্টান্তের অভাব না থাকিলেও মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে তখন স্ত্রীজাতিকে যথেষ্ট সম্মানের চক্ষে দেখা হইত। হিন্দু সমাজে 'সতী' প্রথা এবং 'জৌহর' প্রথা প্রচলিত ছিল। সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের স্ত্রীলোকদের কেহ কেহ 'সতী' হইয়াছেন অর্থাৎ স্বামীর মৃত্যুর পর নিজেও আত্মাহুতি দিয়াছেন এইরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে।

স্ত্রীজাতির স্থান

মুসলমান আমলে হিন্দুদের জাতিভেদ প্রথা পূর্বাপেক্ষা অধিকতর কঠোর হইয়া উঠিয়াছিল। ইস্‌লামের প্রভাব হইতে হিন্দু সমাজ ও ধর্মকে রক্ষা করিবার উপায় হিসাবেই এই কঠোরতা অবলম্বন করা হইয়াছিল, বলা বাহুল্য। ইবন্ বতুতা হিন্দু সমাজের নৈতিকতা ও আতিথেয়তার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

হিন্দু সমাজে জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা বৃদ্ধি

স্থলতানি আমলে ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী পোষণের রীতির ব্যাপকতা পরিলক্ষিত হয়। মুসলমান আমীর, মালিক, খাঁ প্রভৃতি ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী পোষণ করা আভিজাত্যের চিহ্ন বলিয়া মনে করিতেন। স্থলতানেরও বিশাল সংখ্যক ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী থাকিত। অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে মধ্যে মদ্যপান ও ব্যভিচার স্থলতানি আমলের শেষভাগে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

ক্রীতদাস প্রথার ব্যাপকতা

মুসলমান অভিজাতবর্গ (Muslim Nobility) : মধ্যযুগে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই অভিজাত শ্রেণীর সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি শাসনব্যবস্থার উপর নানাভাবে প্রতিফলিত হইত। স্থলতানি আমলে মুসলমান অভিজাত সম্প্রদায়ও শাসনব্যবস্থার উপর এক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সামাজিক ও রাজনৈতিক মর্যাদা ও প্রতিপত্তির দিক্ দিয়া মুসলমান অভিজাত শ্রেণী কেবলমাত্র স্থলতানের নিম্নে ছিলেন।

তাঁহাদের মধ্য হইতেই প্রাদেশিক শাসনকর্তা, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী প্রভৃতি নিযুক্ত করা হইত। সময় সময় তাঁহারা সুলতান নির্বাচনও করিতেন। এইরূপ অভিজাতবর্গকে যথাসম্ভব ক্ষমতাহীন করিয়া রাখাই ছিল দূরদর্শী সুলতানমাত্রেরই অন্যতম প্রধান কর্তব্য। বলবন বা আলা-উদ্দিন খল্‌জীর ন্যায় সুলতানগণ অভিজাত শ্রেণী দমন শাসনকার্যের অন্যতম মূলনীতি হিসাবে অনুসরণ করিতেন। দুর্বল সুলতানদের আমলে অভিজাত শ্রেণীর প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইত। ফিরুজ তুঘ্‌লকের আমলে অথবা লোদী বংশের শাসনকালে অভিজাত শ্রেণীর প্রাধান্য এই কথার সত্যতা প্রমাণ করে।

অভিজাত শ্রেণীর সামাজিক ও রাজনৈতিক মর্যাদা ও প্রতিপত্তি

পাশ্চাত্ত্য দেশে অভিজাত শ্রেণীর আভিজাত্য ছিল বংশানুক্রমিক। রাজক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করিয়া শাসনব্যবস্থাকে জনকল্যাণকামী করিতে তাঁহারা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু সুলতানি আমলের মুসলমান অভিজাত শ্রেণীর আভিজাত্য বংশানুক্রমিক ছিল না। বিভিন্ন দেশীয় লোক সুলতানের অনুগ্রহ লাভ করিয়া অভিজাত শ্রেণীতে উন্নীত হইত। তুর্কী, আরবীয়, মিশরীয়, হাব্‌সী, আফগান প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির লোক লইয়া গঠিত অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে সংহতি, দেশাত্মবোধ বা পরস্পর সহিষ্ণুতা কিছুই ছিল না। স্বার্থসিদ্ধিই ছিল তাঁহাদের রাজনৈতিক কার্যকলাপের মূল উদ্দেশ্য। সুলতানের স্বেচ্ছাচার রোধ করিবার মতো ক্ষমতা বা মনোবৃত্তি তাঁহাদের ছিল না। তাঁহাদের পরস্পর দ্বন্দ্ব ও বিবাদ-বিসম্বাদের ফলে শাসনব্যবস্থায় দুর্বলতা দেখা দিয়াছিল। সুলতানি সাম্রাজ্যের পতনের জন্য মুসলমান অভিজাতবর্গের ঔদ্ধত্য, স্বার্থ-দ্বন্দ্ব ও স্ব স্ব প্রাধান্যের আকাক্ষা সর্বাধিক পরিমাণে দায়ী ছিল।

অভিজাত শ্রেণীর স্বার্থপরতা

অর্থনৈতিক অবস্থা (Economic Condition) : সুলতানি আমলে ভারতবর্ষের সকল অংশের অর্থনৈতিক অবস্থাও একরূপ ছিল না, এই কারণে ঐ সময়ের কোন নিখুঁত অর্থনৈতিক চিত্র অঙ্কন করা সম্ভব নহে। তবে সমসাময়িক বিবরণ, সাহিত্য, লোকগীতি, বিদেশী পর্যটকদের বর্ণনা প্রভৃতি হইতে তৎকালীন অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে একটি মোটামুটি ধারণা লাভ করা যায়।

নিখুঁত অর্থনৈতিক চিত্র অঙ্কনের অসুবিধা

ভারতবর্ষ চিরকালই কৃষিপ্রধান দেশ। সুলতানি আমলে কৃষিই ছিল লোকের প্রধান উপজীবিকা। সুলতানি শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণের *অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন বা উৎপন্ন সম্পদের ন্যায্য বণ্টনের ব্যবস্থা করা সরকারী দায়িত্ব বলিয়া কোনকালেই* বিবেচিত হইত না। তবে একাধিক সুলতান কৃষির উন্নয়নের প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ফিরুজ তুঘ্‌লকের সেচব্যবস্থা এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য। শহর এলাকায় এবং গ্রামাঞ্চলে নানাপ্রকার শিল্পেরও যথেষ্ট উন্নতি ঘটিয়াছিল। অবশ্য ইহার পশ্চাতে পৃষ্ঠপোষকতাও যে না ছিল এমন নহে। সুলতান ও অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য একমাত্র দিল্লীতে 'সরকারী কারখানায়' (Royal *Karkhanas*) চারি হাজার তাঁতি নিযুক্ত ছিল। এইভাবে অপরাপর সামগ্রী প্রস্তুতেরও ব্যবস্থা ছিল।

কৃষি

শিল্পোৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে কাপড়, ছাপা শাড়ী ও ধুতী, রেশম ও পশমের বস্ত্রাদি, চিনি, কাগজ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আমীর খুস্‌রভ্‌, বিদেশীয় পর্যটক মাহুয়ান (Mahuan), বার্‌থেমা (Barthema), এডোয়ার্ডো বারবোসা (Edoardo Barbosa) প্রভৃতি বাংলাদেশে প্রস্তুত সামগ্রী বিশেষভাবে বয়নশিল্পের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। বাংলাদেশ ও গুজরাট সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ স্থতীদ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করিত। সুলতানি আমলে বহির্বাণিজ্যের যথেষ্ট প্রসার হইয়াছিল। ইওরোপের বিভিন্ন দেশ, চীন, মালয় দ্বীপপুঞ্জ, আফগানিস্তান, মধ্য-এশিয়া, পারস্য, তিব্বত, ভুটান, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি অঞ্চলের সহিত জলপথে ভারতবর্ষের বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বণিকগণ ভারতীয় ঐশ্বর্যের লোভে নানাপ্রকার দ্রব্যসম্ভার লইয়া উপস্থিত হইত। পর্যটক বার্‌থেমা বাংলাদেশকে বস্ত্র, খাদ্যশস্য, চিনি, আদা, মাংস প্রভৃতির প্রাচুর্যের দিক দিয়া পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দেশ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।* ইবন্‌ বতুতাও বাংলাদেশে জিনিসপত্রের দাম যে অতি

শিল্প

বাণিজ্য

বাংলাদেশের সমৃদ্ধি

---

*"...the richest country is Bengal in world for cotton, ginger, sugar, grain and flesh of every kind." *Barthema*, vide *An Advanced History of India*, p. 398.

সস্তা ছিল, একথার উল্লেখ করিয়াছেন। বাংলাদেশ অপেক্ষা অধিকতর সস্তায় জিনিসপত্র বিক্রয় হইতে তিনি কোথাও দেখেন নাই একথাই তিনি লিখিয়াছেন।

উপরি-উক্ত বিবরণ হইতে একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, সুলতানি আমলে জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা যথেষ্ট উন্নত ছিল। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা ছিল ইহার বিপরীত। সুলতান ও অভিজাত সম্প্রদায় আরাম ও ঐশ্বর্যে জীবন যাপন করিতেন, কিন্তু জনসাধারণ যাহারা শাসকসম্প্রদায়ের অর্থ ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী যোগাইত তাহাদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। অসহনীয় করভার, আবওয়াব (অতিরিক্ত কর), আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য-চলাচলের অসুবিধা প্রভৃতির ফলে কৃষক ও শ্রমজীবী সম্প্রদায় অতিশয় দুর্দশাগ্রস্ত ছিল। আমীর খুস্‌রভ্ কৃষকদের অবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন—রাজমুকুটের প্রতিটি মুক্তা যেন দরিদ্র কৃষকদের রক্ত বিগলিত অশ্রুকণা।*

কৃষক ও শ্রমজীবীদের দুর্দশা

সুলতানি আমলের প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষ হইতে বহুবার বিভিন্ন বিদেশী আক্রমণকারী প্রভূত পরিমাণে ধনরত্নাদি লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। সুলতান মামুদের লুণ্ঠন, মোহম্মদ-বিন্-তুঘ্‌লকের অমিতব্যয়িতা, তৈমুরের লুণ্ঠন প্রভৃতি ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক কাঠামো বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছিল, সন্দেহ নাই।

বিদেশী আক্রমণকারী-দের লুণ্ঠন

সুলতানি আমলে গ্রামাঞ্চল মাত্রই স্বয়ং-সম্পূর্ণ ছিল। খাদ্যদ্রব্য, বস্ত্র, প্রভৃতি প্রয়োজনীয় যাবতীয় সামগ্রী গ্রামবাসিগণ নিজ নিজ গ্রামেই উৎপাদন করিয়া লইত, এজন্য তাহাদিগকে পর-মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইত না।

স্বয়ং-সম্পূর্ণ গ্রামাঞ্চল

শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি (Art, Literature and Culture) : সামাজিক বা রাজনৈতিক জীবনে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মিলন ও মিশ্রণ নানাকারণে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। মুসলমানগণের পূর্বে গ্রীক, শক,

* "Every pearl in the royal crown is but the crystallised drop of blood fallen from the tearful eyes of the poor peasants." —*Amir Kusrav*, Ibid, p. 399.

হুণ প্রভৃতি যে সকল বিদেশীয় এদেশে আসিয়াছিলেন তাঁহারা ক্রমে ভারতীয় তথা হিন্দু সমাজের সহিত এমনভাবে মিশিয়া গিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের পৃথক অস্তিত্ব বলিয়া কিছু ছিল না। ভারতীয় আচার-আচরণ, ধর্ম্ম-কর্ম্ম, ভাব-ভাষা, রীতিনীতি সব কিছু গ্রহণ করিয়া তাঁহারা সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় সমাজদেহে বিলীন হইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু মুসলমানগণের ক্ষেত্রে তাহা সম্ভব হয় নাই। আরব মরুভূমি হইতে নিষ্ক্রান্ত মুসলমান সভ্যতা এক দুর্জয় শক্তি লইয়া যখন দেশবিদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তখন স্থানীয় সমাজ ও সভ্যতাকে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করিয়াই উহা নিজের স্থান করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু ভারতীয় সভ্যতাকে যেমন উহা সম্পূর্ণভাবে কবলিত করিতে পারে নাই, ভারতীয় সভ্যতাও তেমনি মুসলমান সভ্যতাকে গ্রাস করিতে সমর্থ হয় নাই। তাই ভারতীয় তথা হিন্দু সভ্যতা ও মুসলমান সভ্যতা উভয়ই পাশাপাশি বিদ্যমান রহিল। দীর্ঘকাল পাশাপাশি থাকিবার ফলে এই দুই সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যোগাযোগ স্থাপিত হইল। পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন সভ্যতার জন্মভূমি এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার মিলনক্ষেত্র আরব দেশে উৎপত্তি ঘটিবার ফলে মুসলমান সভ্যতা এক শক্তিশালী, উন্নত সভ্যতা হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিল। স্বভাবতই হিন্দু ও মুসলমান এই দুই শক্তিশালী ও উন্নত অথচ সম্পূর্ণ পৃথক সভ্যতার পরস্পর প্রভাবে এক অতি অপূর্ব শিল্প, বিশেষত স্থাপত্য শিল্প গড়িয়া উঠে। হিন্দু ও মুসলমান প্রতিভার যুগ্ম প্রচেষ্টায় উদ্ভূত ভারতীয় শিল্প ও স্থাপত্য যুগযুগান্তর ধরিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের দর্শক ও পর্যটকদের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া আসিতেছে।*

হিন্দু ও মুসলমান সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরস্পর প্রভাবের ফল

শিল্প ও স্থাপত্য (Art and Architecture): হিন্দু ও মুসলমান প্রতিভার সংমিশ্রণে উদ্ভূত শিল্প ও স্থাপত্যের কি পরিমাণ কোন্ সভ্যতার দান তাহা অনুমান করা সহজসাধ্য নহে। কোন কোন ঐতিহাসিক, যথা,

*"The very contrasts which existed between them, the wide divergences in their culture and their religions, make the history of their impact peculiarly instructive and lend an added interest to the art and above all to the architecture with their united genius called into being." *The Cam. Hist. of India*, Vol. III, p. 568.

ফার্‌গুসন্ (Fergusson) এই শিল্প ও স্থাপত্যকে মুসলমান শিল্পপদ্ধতিরই ভারতীয় সংস্করণ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। আবার হ্যাভেল প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ ইহাকে হিন্দু শিল্পপদ্ধতিরই সামান্য পরিবর্তিত ধরণ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিকমাত্রেই ইহাকে হিন্দু ও মুসলমান শিল্প ও স্থাপত্যপদ্ধতির সংমিশ্রণে উদ্ভূত বলিয়া মনে করেন। অবশ্য সর্বক্ষেত্রেই উভয় সম্প্রদায়ের দান সম-পরিমাণ ছিল মনে করা সঙ্গত হইবে না।* হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন শিল্প ও স্থাপত্যের উপর মুসলমান শিল্প ও স্থাপত্যের প্রভাবের ফলেই এই মিশ্রিত শিল্প ও স্থাপত্যের উদ্ভব ঘটিয়াছিল। স্থানীয় প্রভাব, ব্যক্তি বিশেষের রুচিজ্ঞান, প্রভৃতির পার্থক্যের ফলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশের শিল্প ও স্থাপত্যে বিভিন্নতা দেখা দিয়াছিল।

স্থলতানি যুগের শিল্প ও স্থাপত্য সম্পর্কে বিভিন্ন মত

জৌনপুর, গুজরাট, বাংলাদেশ, বিজাপুর প্রভৃতি স্থানের শিল্প ও স্থাপত্য নিদর্শনগুলির মধ্যে গঠনসৌষ্ঠবের যে পার্থক্য বিদ্যমান তাহা স্থানীয় প্রভাব ও প্রয়োজন এবং নির্মাতার রুচিজ্ঞানের পার্থক্যের ফলেই ঘটিয়াছে বলা বাহুল্য। ঠিক অনুরূপ কারণেই ইস্‌লাম প্রাধান্যাধীন বিভিন্ন দেশের মধ্যে শিল্পরীতির পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

ভারতীয় ও মুসলমান শিল্প ও স্থাপত্য রীতির সংমিশ্রণ

ভারতীয় ও ইস্‌লামীয় শিল্প এবং স্থাপত্য রীতির সংমিশ্রণের অন্যতম কারণ ছিল মুসলমান স্থলতান ও প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ কর্তৃক হিন্দু স্থপতি ও শিল্পকার নিয়োগ। ইহা ভিন্ন ভারতে মুসলমান অধিকার বিস্তারের প্রথম দিকে হিন্দু ও জৈন মন্দিরগুলির ভগ্নাবশেষ মস্‌জিদ প্রভৃতি নির্মাণে ব্যবহৃত হইয়াছিল। ইহার ফলেও হিন্দু ও মুসলমান স্থাপত্য-রীতির সংমিশ্রণের স্থযোগ ঘটিয়াছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে হিন্দু, জৈন ও

ভারতীয় ও মুসলমান স্থাপত্যের সংমিশ্রণের কারণ

* "Broadly speaking, Indo-Islamic architecture derives its character from both sources, though not always in an equal degree." *The Cambridge History of India*, Vol. III, p. 568.

"Indo-Islamic art is not merely a local variety of Islamic art nor is it merely a modified form of Hindu art...*Sir John Marshall*. Vide. *An Advanced History of India*, p. 410.

বৌদ্ধ মন্দিরগুলির সামান্য পরিবর্তন সাধন করিয়াই মস্‌জিদ, সৌধ প্রভৃতি নির্মিত হইয়াছিল। ইহাও ভারতীয় ও ইস্‌লামীয় শিল্প ও স্থাপত্যরীতির সংমিশ্রণের পথ সহজ করিয়াছিল। হিন্দু ও মুসলমান স্থাপত্যে আলঙ্কারিক কারুকার্যাদি এবং স্তম্ভ নির্মাণ-পদ্ধতির মৌলিক সামঞ্জস্য ছিল। ফলে এই দুই শিল্প ও স্থাপত্যের স্বাভাবিক সংমিশ্রণ সহজ হইয়াছিল।

শিল্প ও স্থাপত্য নিদর্শন

সুলতানি যুগের শিল্প ও স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনের মধ্যে কুতব মিনার, নিজাম-উদ্দিন আউলিয়ার দরগা, কুতব মিনারের আলাই দরওয়াজা, অতাল মস্‌জিদ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশে ইট ও পাথর একই সঙ্গে ব্যবহার করিয়া একপ্রকার শিল্পরীতি গড়িয়া উঠে। হিন্দু মন্দির, হিন্দু শিল্প ও স্থাপত্যে ব্যবহৃত পদ্ম প্রভৃতি আলঙ্কারিক কারুকার্যের অনুকরণে মধ্যযুগে বহু মস্‌জিদ নির্মিত হইয়াছিল। পাণ্ডুয়ার আদিনা মস্‌জিদ, হুসেন শাহের আমলে নির্মিত ছোট সোনা মস্‌জিদ, নুসরৎশাহের আমলে নির্মিত বড় সোনা মস্‌জিদ ও কদম রসুল প্রভৃতি সুলতানি যুগে বাংলাদেশের শিল্প ও স্থাপত্যের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। গুজরাট, জৌনপুর, মালব প্রভৃতি স্থানে ঐ যুগের শিল্প ও স্থাপত্যের নিদর্শন আজিও বিদ্যমান। গুলবর্গার জামি মস্‌জিদ, দৌলতাবাদের চাঁদমিনার প্রভৃতি ঐ যুগের শিল্প-নিদর্শন হিসাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

বাংলার শিল্প ও স্থাপত্য নিদর্শন

কিন্তু বিজয়নগর, উড়িষ্যা, মেবার প্রভৃতি রাজ্য ইস্‌লামের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তৃতির বিরুদ্ধে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির রক্ষক হিসাবে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। এই সকল রাজ্যে সম্পূর্ণ হিন্দু শিল্পরীতি অনুসারে নির্মিত মন্দিরাদি ঐ যুগের শিল্প ও স্থাপত্যের নিদর্শনস্বরূপ আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে। পুরীর জগন্নাথ মন্দির, কোণারকের সূর্যমন্দির, বিজয়নগরের 'হাজার মন্দির' ও 'বিঠলস্বামী মন্দির' প্রভৃতি এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

সম্পূর্ণ হিন্দু শিল্প ও স্থাপত্য

সাহিত্য ও ধর্ম (Literature & Religion): ভারতীয় তথা হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং ইস্‌লামীয় সংস্কৃতির পরস্পর প্রভাবের সুফল কেবল-মাত্র শিল্প ও স্থাপত্যেই প্রকাশ পাইয়াছিল, এমন নহে। সাহিত্য ও ধর্মের

ক্ষেত্রেও ইহার সুফল দেখা গিয়াছিল। ধর্মান্ধ, সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি-সম্পন্ন সুলতানদের কথা বাদ দিলেও দিল্লীর সুলতানদের এবং প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের মধ্যে অনেকেই আরবী, ফার্সী, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন। বাংলার স্বাধীন সুলতানির আমলে বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি উন্নয়নের ঐকান্তিক চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়।

সাহিত্যে ও মুসলমান ও

দিল্লীর সুলতানগণ আরবী ও ফার্সী, ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। কোন কোন সুলতান সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যেরও পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন এইরূপ দৃষ্টান্তও আছে। গিয়াস-উদ্দিন বলবন আমীর খুস্রু বা খুসরভ্‌কে তাঁহার সভায় স্থান দিয়াছিলেন। আমীর খুস্রু প্রথমে আশ্রয়প্রার্থী হিসাবেই বলবনের সভায় আসিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন সমসাময়িককালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ। তিনি 'হিন্দুস্তানের তোতাপাখী' নামে পরিচিতি লাভ করিয়াছিলেন। খুস্রুর রচনায় বহু হিন্দি শব্দ স্থান পাইয়াছিল। খুস্রু ভিন্ন সুলতানি আমলের অন্যতম বিখ্যাত কবি ছিলেন হাসান দেহ্‌লবি।

কবিতা ও সাহিত্য

সুলতানি আমলে ইতিহাস-সাহিত্য রচনার এক অভূতপূর্ব আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। মিন্‌হাজ-উস্‌-সিরাজ, জিয়া-উদ্দিন বরণী, সাম্‌স্‌-ই-সিরাজ আফিফ্‌, আজ-উদ্দিন খালিদ-খানী প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ তাঁহাদের রচনায় সুলতানি আমলের ধারাবাহিক ইতিহাস জানিবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। সুলতানি যুগে আরবী ও ফার্সী ভাষার সাহিত্যই বিশেষভাবে আলোচিত হইত বটে, কিন্তু সুলতান এবং মুসলমান লেখকদের কেহ কেহ সংস্কৃত ভাষার প্রতিও অনুরাগ প্রদর্শন করিতেন। গজনীর সুলতান মামুদের রাজসভা ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে আসিবার পর অল্‌বেরুণী দীর্ঘকাল সংস্কৃত সাহিত্য ও হিন্দু দর্শন আলোচনায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। নগরকোট দুর্গ জয় করিয়া জ্বালামুখী মন্দিরে প্রাপ্ত তিন শত সংস্কৃত গ্রন্থ ফিরুজ তুঘ্‌লকের আদেশে ফার্সী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। লোদী বংশের সুলতান সিকন্দর লোদীও কিছু কিছু সংস্কৃত গ্রন্থ ফার্সী ভাষায় অনূদিত

ইতিহাস-সাহিত্য

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য

করাইয়াছিলেন। বাংলার স্বাধীন সুলতান হুসেন শাহের মন্ত্রী রূপ গোস্বামী পঁচিশখানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এগুলির মধ্যে 'বিদগ্ধ মাধব' ও 'ললিত মাধব' গ্রন্থদ্বয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কাশ্মীরের সুলতান জৈন-উল্ আবিদীনও সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সুলতানি যুগের হিন্দুগণও সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা ত্যাগ করেন নাই। অবশ্য পূর্বেকার তুলনায় ঐ যুগে সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা কতক পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল, বলা বাহুল্য। ঐ যুগের সংস্কৃত সাহিত্যসেবীদের মধ্যে পার্থসারথি মিশ্র, জয়সিংহ সুরী, রবিবর্মণ, বিদ্যানাথ, বামন ভট্টবাণ, গঙ্গাধর, রূপ গোস্বামী, পদ্মনাভ দত্ত, বিদ্যাপতি উপাধ্যায়, বাচস্পতি, রঘুনাথ, সায়নাচার্য, মাধব বিদ্যারণ্য প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মুসলমান মনীষীদের অনেকে সংস্কৃত ভাষাও আয়ত্ত করিয়াছিলেন। মালিক মোহম্মদ জয়সীর 'পদ্মাবৎ কাব্য' এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্য : হিন্দি, ব্রজভাষা, মারাঠী, বাংলা ও তেলেগু

প্রাদেশিক ভাষার মধ্যে হিন্দি; ব্রজভাষা, মারাঠী, বাংলা, তেলেগু প্রভৃতির যথেষ্ট উৎকর্ষ ঐ যুগে সাধিত হইয়াছিল। রামানন্দ ও কবীর তাঁহাদের কবিতার দ্বারা হিন্দি ভাষার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছেন। কবীরের 'দোঁহা' এবিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মারাঠী ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নে নামদেবের যথেষ্ট দান রহিয়াছে। ব্রজভাষায় রচিত ভজনের দ্বারা মীরাবাঈ ঐ ভাষার যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন। চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস, মালাধর বসু, পরমেশ্বর কবীন্দ্র, শ্রীকর নন্দী প্রভৃতি লেখকগণ ঐ যুগে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। বিদ্যাপতি মিথিলাবাসী হইলেও বাংলাদেশের কবি হিসাবেই সাধারণ্যে পরিচিত। বাংলার স্বাধীন সুলতানির আমলেও বাংলা সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি ঘটিয়াছিল।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

হুসেন শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় রামায়ণ ও মহাভারত বাংলা ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। নুসরৎ শাহের আমলেও মহাভারতের বাংলা অনুবাদ করা হইয়াছিল। কৃত্তিবাসের বাংলা রামায়ণ বাংলাদেশের অমূল্য সম্পদ। হুসেন শাহের আমলে মালাধর বসু ভাগবতের বাংলা অনুবাদ করিয়াছিলেন। এইজন্য হুসেন শাহ মালাধর বসুকে 'গুণরাজ খাঁ' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন।

হুসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খাঁ মহাভারত বাংলা ভাষায় অনুবাদ করাইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র ছুটি খাঁ মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বের বাংলা অনুবাদ করাইয়াছিলেন।

ধর্মের ক্ষেত্রেও হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির পরস্পর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। হুসেন শাহের আমলে সত্যপীরের কল্পনা ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ইহা ভিন্ন ইস্‌লামের প্রভাবে একদিকে যেমন হিন্দু সমাজের রক্ষণশীলতা ও জাতিভেদ প্রথা কঠোরতর হইয়াছিল তেমনি অপরদিকে উহার ফলে 'ভক্তিবাদ' নামক উদার ধর্মনীতিরও উদ্ভব ঘটিযাছিল। স্মৃতি-সম্পর্কে রচিত গ্রন্থাদি যথা, মাধব বিদ্যারণ্যের পরাশর স্মৃতির টীকা 'কালনির্ণয়', বিশ্বেশ্বরের 'মদন পারিজাত' প্রভৃতি ঐ যুগের রক্ষণশীলতার সাক্ষ্য বহন করে। অপরদিকে সর্বধর্মের সমতা, ভগবান এক এবং অদ্বিতীয়, ভক্তি ও প্রেমের মাধ্যমে ভগবৎপ্রাপ্তি প্রভৃতি মূলনীতির উপর গঠিত 'ভক্তিবাদ'ও ঐ সময়ে প্রচারিত হয়। ভক্তিবাদের প্রচারকগণের মধ্যে রামানন্দ, বল্লভাচার্য, শ্রীচৈতন্য, কবীর ও নানকের নাম ভারতের ধর্মনৈতিক ইতিহাসে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে।

দুইটি বিপরীতমুখী প্রভাব : রক্ষণশীলতা ও উদার ভক্তিবাদ

রামানন্দ (Ramananda) : বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তক রামানুজের শিষ্য রামানন্দ এলাহাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্ম এবং মৃত্যুকাল সম্পর্কে মতদ্বৈধ আছে। তিনি কনৌজী ব্রাহ্মণ পরিবারসম্ভূত ছিলেন। রামানন্দ রাম ও সীতার উপাসক ছিলেন। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে তিনি সকলকেই তাঁহার শিষ্যরূপে গ্রহণ করিতেন। তিনি উত্তর-ভারতের যাবতীয় তীর্থস্থান ভ্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু হিন্দুধর্মের গোঁড়ামি তিনি পছন্দ করিতেন না। ভগবদ্‌ প্রেমে ছোট বড় বা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোন প্রভেদ আছে একথা তিনি স্বীকার করিতেন না। তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে মুসলমান, হিন্দু, মুচি প্রভৃতি সকল ধর্ম ও শ্রেণীর লোক ছিলেন। কবীর ছিলেন তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে প্রধান। রামানন্দ হিন্দি ভাষায় তাঁহার ধর্ম প্রচার করিতেন।

পরিচয়

রামানন্দের ধর্মমত ; রামের উপাসনা

বল্লভাচার্য, ১৪৭৯-১৫৩১ (Ballavacharyya) : বল্লভাচার্য এক

তেলেগু ব্রাহ্মণ পরিবারে ১৪৭৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। হিন্দুদের পুণ্য তীর্থ কাশীধামে তাঁহার জন্ম হয়। বারাণসীতে শিক্ষা সমাপন করিয়া তিনি বিজয়নগরের সম্রাট কৃষ্ণদেবরায়ের রাজসভায় কিছুকাল অতিবাহিত করেন। বিজয়নগরের রাজসভায় তিনি শৈব পণ্ডিতগণকে ধর্মালোচনায় পরাজিত করিয়া খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি ছিলেন কৃষ্ণের উপাসক। ইহা ভক্তিবাদেরই প্রকারভেদ মাত্র। তিনি মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থ ভ্রমণ করিয়া বারাণসীতে ফিরিয়া আসেন এবং সেখানে তাঁহার ধর্ম প্রচার করিতে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে নিজ আত্মার সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন অর্থাৎ পৃথিবীর সকল সুখ-ভোগ ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট আত্মাকে উৎসর্গ করাই ছিল তাঁহার ধর্মের মূলকথা। ভগবদ্‌গীতা ও ব্রহ্মসূত্রের টীকা এবং 'শুদ্ধ অদ্বৈত' নামে একেশ্বরবাদ সম্পর্কে একখানি গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে নানাপ্রকার ভোগবিলাস দেখা দিয়াছিল।

পরিচয়

শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা

শ্রীচৈতন্য, ১৪৮৫-১৫৩৩ (Sree Chaitanya): ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্য বাংলাদেশের নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা জগন্নাথ মিশ্রের আদি বাসস্থান ছিল শ্রীহট্ট জেলার ঢাকা দক্ষিণ নামক গ্রামে। শিশুকাল হইতে শ্রীচৈতন্য বিদ্যানুরাগী ও ধর্মভাবাপন্ন ছিলেন। চব্বিশ বৎসর বয়সে তিনি সংসারধর্ম ত্যাগ করিয়া উত্তর এবং দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করিয়া জীবনের শেষ কয়েক বৎসর পুরীতে অতিবাহিত করেন। ভক্তিবাদের প্রচারকদের মধ্যে শ্রীচৈতন্য-ই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ ভগবানের প্রতি গভীর প্রেমের মাধ্যমেই মানুষ সংসারের মায়া কাটাইতে পারে—ইহাই শ্রীচৈতন্যের ধর্মের মূলকথা। তিনি জাতিভেদ মানিতেন না। জাতি-ধর্ম, ছোট-বড়-নির্বিশেষে সকলের নিকটই তিনি ভগবৎ-প্রেমের বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। মুসলমান সম্প্রদায়েরও অনেকে তাঁহার ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্মের বাণী বাংলার ধর্মজগতে এক প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। শ্রীচৈতন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া পূজিত হইয়া থাকেন।

পরিচয়

শ্রীকৃষ্ণ প্রেম

কবীর (Kabir): রামানন্দের প্রধান শিষ্য ছিলেন কবির। প্রথম

জীবনে কবীর ছিলেন মুসলমান। তাঁহার জন্ম ও মৃত্যুকাল নিশ্চিত-ভাবে জানা যায় না। কিংবদন্তী আছে যে, কবীর ব্রাহ্মণের সন্তান ছিলেন। নিরু নামে এক মুসলমান তাঁতী তাঁহাকে লালনপালন করে। প্রথমে কবীর তাঁতীর কাজই গ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁহার মন সংসার অপেক্ষা ধর্মের দিকেই অধিকতর আকৃষ্ট হয়। হিন্দুদর্শন এবং সুফী ফকির ও কবিদের প্রভাব তাঁহাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। তিনি রামানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং হিন্দি ভাষায় তাঁহার ধর্ম প্রচার করিতে শুরু করেন।

পরিচয়

হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা তিনি তাঁহার ধর্মপ্রচারের মাধ্যমে করিয়া গিয়াছিলেন। রাম ও আল্লাহ্ এক এবং অদ্বিতীয় ইহাই ছিল তাঁহার মূল বাণী। হিন্দু ও মুসলমান একই মৃত্তিকা দ্বারা নির্মিত দুইটি পাত্র বিশেষ—এই কথা তিনি বলিতেন। তাঁহার রচিত 'দোঁহা' দার্শনিক তত্ত্বে সমৃদ্ধ। হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্মানুষ্ঠানের কোনটারই তিনি সমর্থন করিতেন না। অন্তরকে পাপমুক্ত রাখা এবং ভগবানের প্রতি আন্তরিক ভক্তি প্রদর্শনই হইল সর্বধর্মের সার—এই ছিল তাঁহার ধারণা। বহু হিন্দু ও মুসলমান কবীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ধর্মমত

নানক (Nanak): নানক লাহোরের নিকটবর্তী তালবন্দী গ্রামে ১৪৫৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন শিখধর্মের প্রবর্তক। সর্ব-ধর্ম সহিষ্ণুতার নীতি প্রচার করিয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে আন্তরিক মিলনের চেষ্টাতেই তিনি তাঁহার জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্মমতেও কবীরের নীতির পরিচয় পাওয়া যায়। কবীরের ন্যায় তিনিও হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই, একথা বলিতেন। আন্তরিকভাবে ভগবানের উপাসনা ও চিত্তকে শুদ্ধ রাখা—এই ছিল তাঁহার প্রচারিত ধর্মপালনের পন্থা। হিন্দু বা ইসলাম ধর্মের অর্থহীন কুসংস্কার, অনুষ্ঠান প্রভৃতি তিনি সমর্থন করিতেন না। ধর্মপথে অগ্রসর হইবার জন্য গুরুর সাহায্য একান্ত প্রয়োজন একথা তিনি বিশ্বাস করিতেন। হিন্দু এবং মুসলমান, উভয় সম্প্রদায়ের লোকই তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল।

পরিচয়

ধর্মমত

নামদেব (Namadeva): মারাঠী সন্ত নামদেবও ভক্তিবাদ প্রচার

করিয়াছিলেন ধর্মমত

তিনি নীচজাতিসম্ভূত ছিলেন। তিনি ছিলেন বিষ্ণুর উপাসক। ভগবান এক এবং অদ্বিতীয় এই কথা তিনি প্রচার করিতেন। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই, হিন্দুধর্ম বা ইসলাম ধর্ম, একই লক্ষ্যে পৌঁছিবার দুইটি পথ ভিন্ন অপর কিছু নহে এই কথাই তিনি বলিতেন। ভগবানকে প্রেমের দ্বারা লাভ করিতে হইবে। ইহাতে হিন্দু বা মুসলমানের মধ্যে পার্থক্যের কোন প্রশ্ন নাই। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রীতি ও ঐক্যের চেষ্টা তিনিও করিয়া গিয়াছিলেন।

সপ্তম অধ্যায়

মোগল-আফগান দ্বন্দ্ব

(Mughul-Afghan Contest)

ইব্রাহিম লোদীর অত্যাচারী শাসন—দৌলত খাঁ ও আলম খাঁ কর্তৃক বাবরকে আমন্ত্রণ

পানিপথের প্রথম যুদ্ধ, ১৫২৬ (The First Battle of Panipat) : লোদীবংশের সুলতান ইব্রাহিম লোদীর অত্যাচারী শাসনে অতিষ্ঠ হইয়া অভিজাতবর্গ প্রকাশ্যভাবে সুলতানি শাসন অমান্য করিতে লাগিলেন। এই সময়ে লাহোরের শাসনকর্তা দৌলত খাঁর পুত্র দিলওয়ার খাঁর প্রতি ইব্রাহিম লোদীর দুর্ব্যবহার দৌলত খাঁকে ইব্রাহিম লোদীর শাসন অবসান ঘটাইবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করিয়া তুলিল। ইব্রাহিম লোদীর পিতৃব্য আলম খাঁ দিল্লীর সিংহাসনের দাবিদার ছিলেন। তিনিও দৌলত খাঁর সহিত যোগদান করিলেন। উভয়ে কাবুলের আমীর বাবরকে ভারত আক্রমণের জন্য আহ্বান করিলেন। বাবর পূর্ব হইতেই হিন্দুস্তানে রাজ্যবিস্তারের আশা পোষণ করিতেছিলেন। সুতরাং এই আমন্ত্রণ তিনি সানন্দে গ্রহণ করিলেন। তৎকালীন ভারতের রাজনৈতিক বিভেদ ও স্বার্থদ্বন্দ্ব বাবরের অভিযানের সাফল্যের সহায়ক হইয়াছিল

বলা বাহুল্য। পানিপথের রণাঙ্গনে বাবর ও ইব্রাহিম লোদীর মধ্যে যুদ্ধ হইল। ইব্রাহিমের সৈন্যসংখ্যা বহুগুণে অধিক থাকা সত্ত্বেও বাবরের সুশিক্ষিত অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ বাহিনীর আক্রমণের সম্মুখে তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। ইব্রাহিম লোদী যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারাইলেন। পানিপথের যুদ্ধে (২১শে এপ্রিল, ১৫২৬) জয়লাভ করিয়া বাবর দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিলেন। এইভাবে ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন হইল।

পানিপথের প্রথম যুদ্ধ (১৫২৬)—ইব্রাহিম লোদীর পরাজয় ও মৃত্যু: মোগল সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন

বাবর, ১৪৮৩-১৫৫০ (Babur): জহির-উদ্দিন মোহম্মদ ইতিহাসে বাবর নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। ১৪৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ফর্‌ঘনা (Farghana) নামক রুশ-তুর্কীস্তানের এক অতি ক্ষুদ্ররাজ্যে আমীর উমর শেখ মির্জার পুত্র বাবর জন্মগ্রহণ করেন। পিতার দিক হইতে তিনি তৈমুরের ও মাতার দিক হইতে চিঙ্গিজ খাঁর বংশধর ছিলেন। এশিয়ার এই দুই দুর্ধর্ষ বিজেতার রক্ত যাহার ধমনীতে প্রবাহিত, তিনি বাল্যকাল হইতেই দুঃসাহসী ও যুদ্ধামোদী হইবেন, ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। বাবরের বাল্যজীবন তাঁহার অনন্যসামান্যা বুদ্ধিমতী ও বিদুষী মাতামহীর প্রভাবাধীনে অতিবাহিত হইয়াছিল। তাঁহার প্রভাবে বাল্যজীবনে শিক্ষালাভের সুযোগ হওয়ায় বাবর স্বভাবতই সাহসী, ধর্মভীরু ও সদাচারী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তুর্কী ও ফার্‌সী ভাষায়ও তাঁহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল।

পিতৃপরিচয়

পিতার আকস্মিক মৃত্যুতে মাত্র একাদশ বৎসর বয়সে বাবর ফর্‌ঘনার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ফর্‌ঘনা রাজ্য তখন চতুর্দিকে শত্রুদ্বারা পরিবেষ্টিত। বাবরের সিংহাসনে আরোহণের অতি অল্পকালের মধ্যেই সমরকন্দের সিংহাসন লইয়া তৈমুরের বংশধরগণের মধ্যে বিবাদ শুরু হইয়াছিল। বাবর বাল্যকাল হইতেই তৈমুরের সাম্রাজ্য পুনঃসঞ্জীবিত করিবার স্বপ্ন দেখিতেন। তিনিও সমরকন্দের সিংহাসন দখলের চেষ্টা শুরু করিলেন। তখন তাহার বয়স চৌদ্দ বৎসর মাত্র। তিনি সাময়িকভাবে সমরকন্দ জয় করিতেও (১৪৯৭) সমর্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু ঠিক ঐ সময়ে ফর্‌ঘনায় তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হইলে তিনি সমরকন্দ ত্যাগ

প্রথম জীবন

বাবরের আক্রমণকালে
ভারতবর্ষ
০ ২০০ ৪০০
মাইল
কাবুল
কাশ্মীর
পেশোয়ার
দিল্লী
পানিপথ
রাজপুতানা
আগ্রা
খানুয়া
চিতোর
মালব
গুজরাট
সিন্ধু
জৌনপুর
গঙ্গা নং
যমুনা নং
ব্রহ্মপুত্র নং
বঙ্গদেশ
উড়িষ্যা
গোণ্ডোয়ানা
বেরার
নর্মদা নং
আহমদনগর
বিজাপুর
গোলকুণ্ডা
বিজয়নগর
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
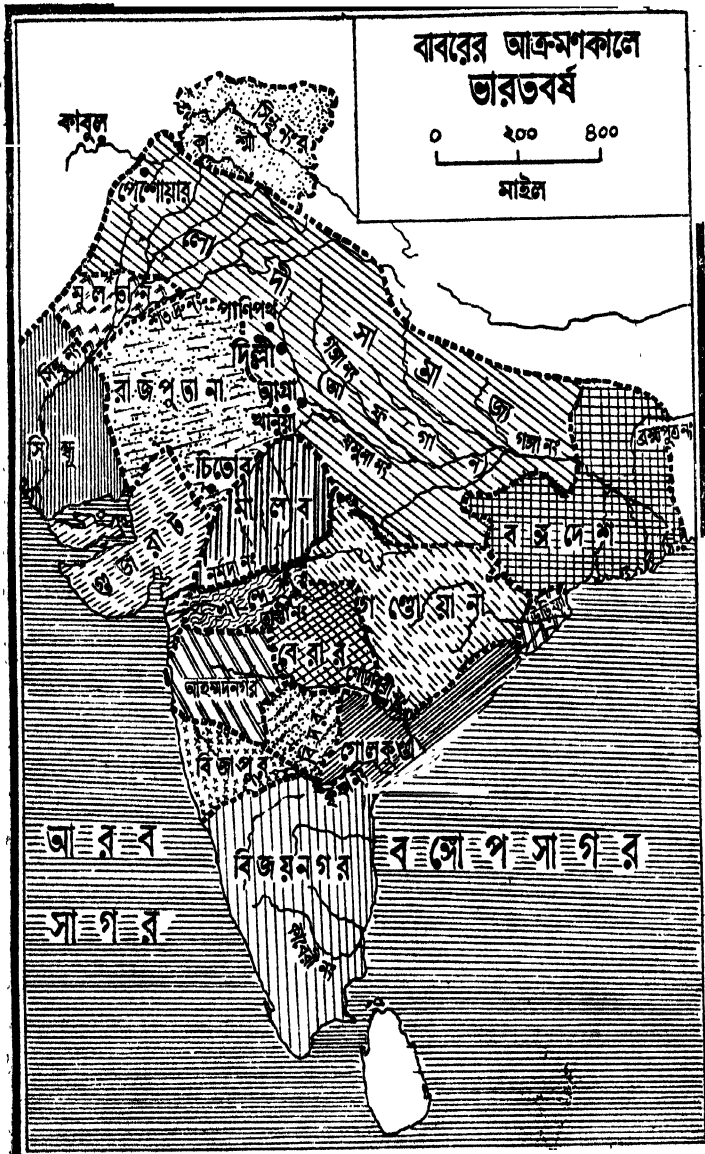
করিয়া নিজ রাজধানীতে ফিরিয়া আসেন। সঙ্গে সঙ্গেই সমরকন্দ তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়া যায়। অবশ্য ইহার অল্পকালের মধ্যেই তিনি পুনরায় সমরকন্দ জয় করেন। কিন্তু উজবেগ দলপতি সাহেবানী খাঁর নেতৃত্বে উজবেগগণ বাবরের সহিত দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হয়। ১৫০৩ খ্রীষ্টাব্দে আখ্‌চিয়ান নামক স্থানে সাহেবানী খাঁর হস্তে তিনি সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হন। ফলে, তিনি কেবলমাত্র সমরকন্দ হইতেই নহে, পৈতৃক রাজ্য ফর্‌ঘনা হইতেও বিতাড়িত হন। হৃতসর্বস্ব হইয়া বাবর যখন স্থান হইতে স্থানান্তরে ভাগ্যান্বেষণে ঘুরিতেছিলেন ঐ সময়েই তিনি হিন্দুস্তান জয়ের সংকল্প গ্রহণ করেন। এক বৎসর রাজ্যহারাভাবে নানা দুঃখ-দুর্দশায় কাটাইয়া তিনি জীবনের বহু কঠোর এবং মূল্যবান অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। পর বৎসর (১৫০৪) তিনি উজবেগ শাসনের বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহের সুযোগ লইয়া কাবুল রাজ্য দখল করেন। এইভাবে বাবর নিজেকে পুনরায় রাজকীয় মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন। পারস্যের শাহ্ ইস্‌মাইল সফবীর সহায়তা লইয়া তিনি সাহেবানী খাঁকে পরাজিত করিবার চেষ্টা করিয়া পুনরায় পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হন। এইভাবে দুর্ধর্ষ উজবেগদের পরাভূত করা অসম্ভব দেখিয়া বাবর দক্ষিণ-পূর্ব অর্থাৎ হিন্দুস্তানের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

রাজ্যচ্যুত বাবরের কাবুল অধিকার

ভারতজয়ের পরিকল্পনা

রাজ্যবিস্তারের পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার পক্ষে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন, অন্তর্দ্বন্দ্বে দুর্বলীকৃত ভারতবর্ষ তখন বাবরকে সুযোগ দান করিয়াছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে বাবর কয়েকটি প্রাথমিক অভিযানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বজৌর (Bajour) দুর্গ, ঝিলামের তীরে ভির (Bhira) নামক স্থান এবং চীনাব নদীর অববাহিকা অঞ্চল প্রভৃতি তিনি একপ্রকার বিনা বাধায়-ই জয় করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে তিনি তাঁহার মন্ত্রীদের পরামর্শে সুলতান ইব্রাহিম লোদীর নিকট এক দূত প্রেরণ করিয়া পূর্বে তুর্কীদের অধিকারে যে সকল স্থান ছিল সেগুলি দাবী করিয়াছিলেন। লাহোরের শাসনকর্তা দৌলত খাঁ বাবরের দূতকে কিছুকাল বন্দী করিয়াই রাখিয়াছিলেন। ইহার পর বাবরের দূত দিল্লীর সুলতানের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়াই স্বদেশে ফিরিয়া গিয়াছিল। যাহা হউক, ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে প্রাথমিক অর্থাৎ

ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে প্রাথমিক অভিযান

পরীক্ষামূলক [কয়েকটি অভিযানের পর বাবর ভারত আক্রমণের সুযোগের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ।এই সময়ে দৌলত খাঁ লোদী তাঁহাকে হিন্দুস্তান আক্রমণের জন্য আহ্বান জানাইলে বাবর স্বভাবতই উহা সানন্দে গ্রহণ করিলেন।। ইতিমধ্যে তিনি বাদাক্‌শান ও কান্দাহার জয় করিয়া হুমায়ুনকে বাদাক্‌শানের এবং কাম্‌রানকে কান্দাহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

দৌলত খাঁ লোদীর আমন্ত্রণ

।১৫২৪ খ্রীষ্টাব্দে বাবর সসৈন্যে পাঞ্জাবে উপস্থিত হইলেন। তিনি প্রথমেই লাহোর অধিকার করিলেন। দৌলত খাঁ ও আলম খাঁ বাবরের সহায়তা চাহিয়াছিলেন, প্রভু হিসাবে বাবরকে তাঁহারা আহ্বান করেন নাই। সুতরাং বাবরের লাহোর জয় তাঁহাদের মনঃপূত হইল না। তাঁহারা দেখিলেন যে, বাবরকে সাহায্যকারী মিত্র হিসাবে আমন্ত্রণ করিয়া তাঁহারা হিন্দুস্তানের এক নূতন প্রভু ডাকিয়া আনিয়াছেন। স্বভাবতই দৌলত খাঁ ও আলম খাঁ বাবরের বিরোধিতা শুরু করিলেন। বাবর এইরূপ পরিস্থিতিতে ভারত জয় পূর্ণোদ্যমে শুরু না করিয়া কাবুলে ফিরিয়া গেলেন। পর বৎসর (১৫২৫) পুনরায় তিনি সসৈন্যে পাঞ্জাবে উপস্থিত হইলেন। দৌলত খাঁ এইবার বাবরের প্রভুত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। ইহার পর বাবর পানিপথের প্রান্তরে দিল্লীর সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত ও নিহত করিলেন (১৫২৬ খ্রীঃ)। পানিপথের যুদ্ধের ফলে লোদী-বংশের শাসনের অবসান ঘটিল এবং দিল্লী সুলতানির স্থলে মোগল প্রভুত্ব স্থাপিত হইল। বাবরের ব্যক্তিগত জীবনের সাফল্যের দিক দিয়া বিবেচনা করিলেও পানিপথের যুদ্ধজয় এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সেবিষয়ে সন্দেহ নাই। বাবর এই জয়ের জন্য ভগবানের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে মক্কা ও মদিনায় শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রেরণ করিলেন, এবং কাবুলের প্রতি নর-নারীকে একটি করিয়া রৌপ্য মুদ্রা দান করিয়া বিজয়-উৎসব সম্পন্ন করিলেন।।কিন্তু পানিপথের যুদ্ধের ফলে হিন্দুস্তানের প্রভুত্ব বাবরের হস্তে চলিয়া গিয়াছিল মনে করা উচিত হইবে না। কারণ, তখনও আফগান দলপতিগণ এবং সংগ্রাম সিংহের অধীনে রাজপুতগণ বাবরের অবিজিত শত্রু হিসাবে রহিয়াছিলেন। বস্তুতঃ, পানিপথের যুদ্ধের পরই বাবরের

দৌলত খাঁ ও আলম খাঁর বিরোধিতা—বাবরের ভারত ত্যাগ

পানিপথের প্রথম যুদ্ধ (১৫২৬)

পানিপথের যুদ্ধে জয়-লাভের ফলাফল

ভারত বিজয় শুরু হইয়াছিল বলা উচিত হইবে।* পানিপথের যুদ্ধজয় মোগল সাম্রাজ্য স্থাপনের সর্বপ্রথম পদক্ষেপ ছিল মাত্র।

আফগান অভিজাতবর্গ দমন

বাবর প্রথমেই দোয়াব অঞ্চলের পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণের আফগান অভিজাতবর্গকে দমন করিবার কার্যে হস্তক্ষেপ করিলেন। দোয়াব অঞ্চলের আফগান অভিজাতদের দমন করিয়া তিনি নিজ বিশ্বস্ত অনুচরবর্গকে আফগানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। তাঁহার পুত্র হুমায়ুন ও অভিজাতবর্গের চেষ্টায় জৌনপুর, ঢোলপুর, গাজীপুর, কাল্পি, বিয়ানা, গোয়ালিওর প্রভৃতি স্থান মোগল সাম্রাজ্য-ভুক্ত হইল। এদিকে বাবর আগ্রায় থাকিয়া রাণা সংগ্রাম সিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। রাজপুত নেতা মেবারের রাণা সঙ্গ বা সংগ্রাম সিংহের সহিত বাবরের সংঘর্ষ অনিবার্য ছিল। তুর্কী-আফগান

রাণা সংগ্রাম সিংহের সহিত যুদ্ধের কারণ

সুলতানির পতনোন্মুখতার সুযোগে হিন্দুস্তানে রাজপুত প্রাধান্য স্থাপন ছিল রাজপুত বীরশ্রেষ্ঠ রাণা সংগ্রাম সিংহের আকাঙ্ক্ষা। সুতরাং তিনি বাবরকে নির্বিবাদে হিন্দুস্তানের প্রভুত্ব অর্জন করিতে দিবেন, এই আশা করা সম্ভব ছিল না। বাবর তাঁহার জীবনস্মৃতিতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, রাণা সংগ্রাম সিংহ কাবুলে দূত পাঠাইয়া তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন যে, তিনি দিল্লী আক্রমণ করিলে সংগ্রাম সিংহ আগ্রার দিকে আক্রমণ শুরু করিবেন। কিন্তু কার্যত সংগ্রাম সিংহ তাহা করেন নাই।† ইহা হইতে বাবর সংগ্রাম সিংহের সহায়তার

---

* "the magnitude of Babur's task could be properly realised when we say that it actually began with Panipath. Panipath set his foot on the path of empire-building, and in this path the first obstacle was the opposition of the Afghan tribes.". Vide *An Advanced History of India*, p. 427.

† "Although Rana Sanga, the Pagan, when I was in Kabul, had sent me an ambassador with professions of attachment and had arranged with me that, if I would march from that quarter into the vicinity of Delhi, he would march from the other side upon Agra, yet when I defeated Ibrahim, and took Delhi and Agra, the Pagan during all my operations did not make a single

পরিবর্তে যে তাঁহার বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে হইবে তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

রাণা সংগ্রাম সিংহ ছিলেন শতাধিক রণাঙ্গনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বীর যোদ্ধা। তাই বিদেশীয় আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষার জন্য রাণা এক বিশাল রাজপুত সংঘ গঠন করিলেন। চান্দেরী, অম্বর, মাড়বার, গোয়ালিওর, আজমীর প্রভৃতি দেশের রাজগণ এবং আরও বহু সংখ্যক রাজপুত দলপতি, মেওয়াটের হাসান খাঁ এবং সুলতান সিকন্দর লোদীর পুত্র মামুদ লোদী প্রভৃতি সংগ্রাম সিংহের সহিত যোগদান করিলেন। রাণা সংগ্রাম সিংহের সামরিক প্রস্তুতি বাবরের ক্ষুদ্র সেনাবাহিনীর মধ্যে ভীতির সঞ্চার করিল। বাবর নিজ সেনাবাহিনীকে উৎসাহিত করিবার জন্য তাহাদিগকে মানুষ মাত্রেই যে মরণশীল তাহা স্মরণ করাইয়া দিয়া সসম্মানে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণদান করিয়া শহীদ হওয়া—কাপুরুষতা অপেক্ষা শতগুণে শ্রেয়ঃ এই কথা বুঝাইলেন। বাবর কর্তৃক এইভাবে সেনাবাহিনীকে উৎসাহদান ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়নের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। বাবরের প্রেরণায় তাঁহার সেনাবাহিনী যুদ্ধে প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইল। খানুয়ার রণাঙ্গনে বাবর ও সংগ্রাম সিংহের মধ্যে এক ভীষণ যুদ্ধ হইল (১৬ মার্চ, ১৫২৭)। আট লক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য ও পাঁচশত হাতী লইয়া গঠিত বিশাল সেনাবাহিনী লইয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও একমাত্র যুদ্ধ কৌশলের অপকর্ষতার ফলে রাণা সংগ্রামের সম্মিলিত বাহিনীর শোচনীয় পরাজয় ঘটিল। খানুয়ার যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার ফলে ভারতে রাজপুত প্রাধান্য স্থাপিত হওয়ার আশা চিরতরে বিনষ্ট হইল। শক্তিশালী রাজপুত সংঘ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ায় মোগল শক্তি প্রতিহত করিবার মতো আর কোন উপযুক্ত শক্তি রহিল না। খানুয়ার যুদ্ধে জয়লাভ করিবার ফলে বাবরের প্রাধান্য দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত হইল। এই যুদ্ধের পর হইতেই মোগল সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক কেন্দ্র কাবুল হইতে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হইল। দিল্লীর সিংহাসন হইতে

রাণা সংগ্রামের সম্মিলিত বাহিনী

বাবরের সেনাবাহিনীর ভীতি: বাবর কর্তৃক উৎসাহ দান

খানুয়ার যুদ্ধ (১৫২৭)

খানুয়ার যুদ্ধের ফলাফল

---

movement." *Babur's Memoirs,* II, p. 254, Vide Iswari Prasad's *A short History of Muslim Rule in India* Vol. II, p. 299.

বিচ্যুত হইবার আশঙ্কা আর বাবরের রহিল না।* খানুয়ার যুদ্ধের পরে আর যে সকল যুদ্ধে বাবর অবতীর্ণ হইয়াছিলেন সেগুলির উদ্দেশ্য ছিল সাম্রাজ্য বিস্তার, সিংহাসনের নিরাপত্তা বিধান নহে।।

চান্দেরী দুর্গ জয়

পর বৎসর (১৫২৮) বাবর মেদিনী রাওয়ের অধীন দুর্ভেদ্য রাজপুত দুর্গ চান্দেরী অবরোধ করিলেন। মেদিনী রাও বীরত্ব সহকারে দীর্ঘকাল যুদ্ধ করিয়া অবশেষে পরাজিত হইলেন। এই পরাজয়ের অল্পকালের মধ্যে বৃদ্ধ রাণা সঙ্গ বা সংগ্রাম সিংহের মৃত্যু ঘটিল। রাজপুত সংঘের পুনরুজ্জীবনের আশাও চিরতরে বিলুপ্ত হইল।

রাজপুত শক্তির বিনাশ সাধন করিয়া বাবর আফগান দলপতিদের দমনের পূর্ণ সুযোগ লাভ করিলেন। গোগ্‌রা বা ঘাগ্‌রা নদীতীরে তিনি বাংলা ও বিহারের আফগানদের সম্মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। আফগানদের সম্মিলিত বাহিনী সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইল (৬ মে, ১৫২৯)।

গোগ্‌রার যুদ্ধ (১৫২৯)

এই যুদ্ধে জয়লাভের ফলে উত্তর-ভারতের এক বিরাট অংশ বাবরের অধিকারভুক্ত হইল। তাঁহার সাম্রাজ্য হিমালয় হইতে গোয়ালিওর এবং অক্ষু নদী হইতে গোগ্‌রা নদী পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিল। পর বৎসর (১৫৩০, ডিসেম্বর ২৬) বাবরের মৃত্যু হইল। তাঁহার মৃত্যু সম্পর্কে সমসাময়িক মুসলমান ঐতিহাসিক আবুল ফজ্‌ল এক

* "In the first place, the menace of Rajput supremacy which had loomed large before the eyes of Muhammadans in India for the last few years was removed once for all. The powerful confederacy which depended so largely for its unity upon the strength and reputation of Mewar, was shattered by a single great defeat and ceased henceforth to be a dominant factor in the politics of Hindustan. Secondly, the Mughal empire of India was soon firmly established......And it is significant of the new stage in his career which this battle marks that never afterwards does he have to stake his throne and life upon the issue of stricken field........It is now fighting for his throne.........henceforth the centre of gravity of his power is shifted from Kabul to Hindustan." Rushbrook-Williams : *Empire Builders of the Sixteenth century*, pp. 156—157.

অদ্ভুত ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। বাবরের জ্যেষ্ঠ পুত্র হুমায়ুন কঠিন পীড়ায় শয্যাশায়ী হইলে তিনি নাকি হুমায়ুনের শয্যাপার্শ্বে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া পুত্রের পীড়া নিজের দেহে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার পর হইতে হুমায়ুন ক্রমেই আরোগ্যলাভ করিতে থাকেন এবং বাবরের স্বাস্থ্য ক্রমেই ভাঙ্গিয়া পড়িতে থাকে এবং পুত্রের আরোগ্যলাভের তিন মাসের মধ্যেই বাবরের মৃত্যু ঘটে। আধুনিক ঐতিহাসিকদের অনেকেই ইহাকে নিছক কাহিনী বলিয়াই মনে করেন।

বাবরের মৃত্যু (১৫৩০)

সামান্য কয়েক বৎসরের মধ্যে (১৫২৬—'৩০) বাবর যে বিশাল সাম্রাজ্য গঠন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন উহার আভ্যন্তরীণ শাসন-সম্পর্কে কোন প্রকার নূতন আইন-কানুন প্রণয়ন বা ব্যবস্থা অবলম্বন তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না, কারণ এই কয়েক বৎসর তাঁহার যুদ্ধ-বিগ্রহেই কাটিয়াছিল। তিনি হিন্দুস্তানে প্রচলিত শাসনব্যবস্থার কোন পরিবর্তন সাধন না করিয়া উহাই চালু রাখিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সাম্রাজ্যকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিয়া জায়গীরদারদের অধীনে স্থাপন করিয়াছিলেন। তুর্কী-আফগান আমলে জায়গীরদারগণ যে পরিমাণ স্বায়ত্তশাসন ভোগ করিতেন, সেই পরিমাণ স্বাধীনতা অবশ্য বাবর তাঁহার সামন্তদিগকে দান করেন নাই। রাজস্বনীতির দিক দিয়া বিচার করিলে বাবরের শাসনের ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। বাবরের অমিতব্যয়িতা এবং তাঁহার শাসনকালের প্রথমদিকে আভ্যন্তরীণ অব্যবস্থার ফলে রাজকোষ শূন্য হইয়া গিয়াছিল। দলিলপত্রের উপর হইতে কর উঠাইয়া দেওয়া এবং দিল্লী ও আগ্রায় প্রাপ্ত ধন-দৌলত মুক্তহস্তে অনুচরবর্গের মধ্যে বিতরণ সরকারের আর্থিক দুরবস্থার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। পরবর্তী সম্রাট হুমায়ুনের শাসনকালে এই আর্থিক দুরবস্থার কুফল প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল। বস্তুত, বাবর আভ্যন্তরীণ শাসনের কাঠামোকে নূতনভাবে গঠন করা দূরে থাকুক, উহাকে দুর্বলতর করিয়া গিয়াছিলেন।

বাবরের শাসনব্যবস্থা —তুর্কী-আফগান শাসনের অনুকরণ

তাঁহার শাসনব্যবস্থার ত্রুটি

বাবর মধ্যযুগীয় ইতিহাসের যাবতীয় অনন্যসাধারণ ব্যক্তিদের অন্যতম প্রধান ছিলেন। তাঁহার চরিত্রে সামরিক প্রতিভা, বীরসুলভ দুঃসাহসিকতা, লৌহ-কঠিন প্রতিজ্ঞা, রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি, বিদ্যানুরাগ প্রভৃতি গুণের এক

অপূর্ব সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্মানুরাগ, বন্ধুপ্রীতি, আশ্রিতের প্রতি অনুকম্পা, সঙ্গীতানুরাগ এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যবোধ তাঁহার চরিত্রের অপরাপর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল। কিন্তু চিঙ্গিজ্ খাঁ ও তৈমুরের বংশোদ্ভূত হইলেও নৃশংসতা, ব্যাপক হত্যা, লুণ্ঠন বা ধ্বংস-সাধনের তিনি কোনকালেই পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহার দৈহিক বল যেমন ছিল অসাধারণ তাঁহার মানসিক বল, ধৈর্য, আত্মপ্রত্যয় ও কার্যক্ষমতাও ছিল তেমনি অপরিসীম। সামরিক নেতা হিসাবে তিনি কঠোর নিয়মানুবর্তিতার পক্ষপাতী ছিলেন। বিজিত শত্রুর প্রতি উদারতা, স্বজাতির প্রতি ভ্রাতৃভাব, সন্তানের প্রতি গভীর মমত্ববোধ তাঁহার চরিত্রকে শ্রদ্ধার্হ করিয়া তুলিয়াছিল।

তাঁহার চরিত্র

সমরকুশল, বীর যোদ্ধা হইলেও বাবরের সাহিত্যানুরাগ ছিল সুগভীর। তুর্কী ও ফার্সী ভাষায় তাঁহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। ফার্সী ভাষায় তিনি বহু কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বরচিত 'জীবনস্মৃতি' (*Memoirs*) তাঁহার সাহিত্যানুরাগের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাঁহার 'জীবনস্মৃতি' পাঠ করিলে তাঁহার সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও কল্পনাপ্রবণতার পরিচয় পাওয়া যায়।

তাঁহার সাহিত্যানুরাগ—'জীবনস্মৃতি' রচনা

হুমায়ুন ও শের শাহ্ (Humayun & Sher Shah) : মৃত্যু-শয্যায় বাবর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হুমায়ুনকে দিল্লীর সিংহাসনের উত্তরাধিকার দান করিয়া গিয়াছিলেন এবং হুমায়ুনকে তাঁহার ভ্রাতাদের প্রতি উদারতা ও স্নেহ প্রদর্শন করিতে অনুরোধ করিয়া গিয়াছিলেন।

বাবর কর্তৃক হুমায়ুন উত্তরাধিকারী মনোনীত

সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই (ডিসেম্বর ২৯, ১৫৩০) হুমায়ুন তাঁহার তিন ভ্রাতা কামরান্, হিন্দাল ও আস্‌করীকে সাম্রাজ্যের তিন অংশে শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। কাবুল ও কান্দাহারের শাসনভার কামরান্‌কে দেওয়া হইল। কামরান্ পূর্ব হইতেই এই দুই স্থানের শাসনভার প্রাপ্ত ছিলেন। হিন্দালকে আল্‌ওয়ার এবং আস্‌করীকে সম্বলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হইল। কিন্তু কামরান্ সামরিক শক্তি প্রয়োগ করিয়া পাঞ্জাব

হুমায়ুনের ভ্রাতৃপ্রীতি : ভ্রাতাদের মধ্যে রাজ্য-বণ্টন

ও হিসার ফিরুজা নিজ এলাকাভুক্ত করিলেন। হুমায়ুন ভ্রাতৃবিরোধ এড়াইবার উদ্দেশ্যে কামরান্ কর্তৃক অধিকৃত স্থানসমূহে তাঁহার দাবি ত্যাগ করিলেন।

হুমায়ুন সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই নানাবিধ জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইলেন। উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত কোন নির্দিষ্ট আইন বা রীতি না থাকায় হুমায়ুনের ভ্রাতারা সিংহাসন লাভের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিপত্তি শুধু ভ্রাতাদের সিংহাসন লাভের আকাঙ্ক্ষা হইতেই সৃষ্টি হইয়াছিল এমন নহে, সাম্রাজ্যের সর্বত্র আফগান দলপতিগণ মোগল সাম্রাজ্যের বিরোধিতা শুরু করিলেন। রাজপুতগণ বাবর কর্তৃক সাময়িকভাবে পরাজিত হইলেও তাহাদের ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে তিনি বিনাশ করিতে পারেন নাই। গুজরাটের শাসনকর্তা বাহাদুর শাহ্ও মোগল শাসনের বিরোধিতা শুরু করিলেন। তিনি রাজপুতদের বিরুদ্ধে সাফল্য লাভ করিয়া ক্রমেই আগ্রার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বাংলার আফগান দলপতিগণও হুমায়ুনের সিংহাসন লাভের সঙ্গে সঙ্গেই পুনরায় শক্তিসঞ্চয়ের চেষ্টা শুরু করিলেন। রাজসভার অভিজাতবর্গও সিংহাসন-সংক্রান্ত অধিকার লইয়া ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। সেনাবাহিনীর আনুগত্যের উপরও সম্পূর্ণভাবে আস্থা স্থাপন করা সম্ভব ছিল না। বিভিন্ন জাতির লোক লইয়া গঠিত সেনাবাহিনী কোনরূপ দেশপ্রেম বা জাতীয়তাবোধে স্বভাবতই উদ্বুদ্ধ ছিল না। স্বার্থসিদ্ধিই ছিল তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

হুমায়ুনের বিপত্তি

এইরূপ পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যের সংহতি ও নিরাপত্তা বজায় রাখিতে প্রয়োজন ছিল একজন সামরিক প্রতিভাসম্পন্ন দূরদর্শী শাসকের। কিন্তু হুমায়ুনের এই সকল গুণের কোন কিছুই ছিল না। প্রথমেই তিনি নিজ অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়া নিজের দুর্বলতা প্রকট করিয়া তুলিলেন। কামরান্ বলপূর্বক পাঞ্জাব, হিসার ফিরুজা প্রভৃতি স্থান দখল করিলে তিনি ঐ সকল স্থানের উপর কামরানের অধিকার স্বীকার করিয়া লইলেন। ভ্রাতার প্রতি স্নেহ ও ভ্রাতৃবিরোধের অনিচ্ছা এবং সর্বোপরি মৃত্যুশয্যায় শায়িত পিতার শেষ অনুরোধের প্রতি শ্রদ্ধা-বশতই তিনি তাঁহার ভ্রাতাদের, বিশেষত কামরান্‌কে ক্ষমা করিলেন। কিন্তু

হুমায়ুনের অদূরদর্শিতা

সাম্রাজ্যের সংহতি বা নিরাপত্তার দিক দিয়া তিনি যে মারাত্মক ভুল করিলেন সে বিষয়ে দ্বিমত নাই। হিসার ফিরুজা দখল করিবার ফলে কামরান্ পাঞ্জাব ও দিল্লীর সংযোগ-পথ বিচ্ছিন্ন করিতে সমর্থ হইলেন। সিন্ধু অঞ্চলে এইভাবে হুমায়ুনের প্রাধান্য বিনাশপ্রাপ্ত হইলে মোগল সাম্রাজ্যের প্রয়োজনীয় সৈন্য সংগ্রহের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অঞ্চল হইতে তিনি বঞ্চিত হইলেন।

দিল্লী-পাঞ্জাব সংযোগ-পথ বিচ্ছিন্ন ও সৈন্য সংগ্রহের স্থান হইতে বঞ্চিত

আফগানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে হুমায়ুন প্রথম দিকে সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। লোদীবংশের মামুদ লোদীকে আফগান দলপতি ও অভিজাতগণ পুনরায় দিল্লীর সিংহাসনে স্থাপনের চেষ্টা করিতেছিলেন। বুন্দেলখণ্ডের রাজাও আফগানদের সাহায্য দান করিতেছিলেন। হুমায়ুন প্রথমে বুন্দেলখণ্ডের প্রসিদ্ধ কালিঞ্জর দুর্গ অবরোধ করিলেন, কিন্তু রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে আফগানগণ অত্যধিক উদ্ধত হইয়া উঠিলে তাহাদিগকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে তিনি কালিঞ্জর দুর্গের অবরোধ উঠাইয়া লইলেন। লক্ষ্ণৌর নিকটে দৌরাহ (Dourah) নামক স্থানে তিনি আফগানদিগকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিলেন এবং ইহার অব্যবহিত পরেই তিনি জৌনপুর হইতে সুলতান মামুদ লোদীকে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইলেন। তারপর তিনি চুণার দুর্গটি অবরোধ করিলেন। এই দুর্গটি তখন শের খাঁর অধিকারে ছিল। শের খাঁ হুমায়ুনের নিকট মৌখিক আনুগত্য প্রদর্শন করিয়া রক্ষা পাইলেন। হুমায়ুন চুণারের দুর্গটি শের খাঁর অধীনে রাখিয়া গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। চুণার দুর্গটি শের খাঁর অধীনে রাখিয়া গিয়া হুমায়ুন তাঁহার অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। কারণ শের খাঁ এই সুযোগে নিজ শক্তি বৃদ্ধি করিয়া হুমায়ুনের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী শত্রুতে পরিণত হইয়াছিলেন।

কালিঞ্জর দুর্গ অবরোধ

'দৌরাহ্'-এর যুদ্ধে জয়লাভ

চুণার দুর্গ অবরোধ—হুমায়ুনের অদূরদর্শিতা

গুজরাটের বাহাদুর শাহ্ ছিলেন হুমায়ুনের অন্যতম প্রধান শত্রু। তিনি মালব রাজ্য জয় করিয়া এবং খান্দেশ, বেরার ও আহম্মদনগরের সুলতানদের যুদ্ধে পরাজিত করিয়া নিজ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির পরিচয় দিয়াছিলেন।

বাহাদুর শাহ্ প্রথম হইতেই হুমায়ুনের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি হুমায়ুনের শত্রু বহু আফগান দলপতিকেও আশ্রয় দান করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন মাহদী খাঁজা নামে হুমায়ুনের এক শ্যালককে দিল্লী সিংহাসনের দাবিদার বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু বাহাদুর শাহ্ যখন মেবারের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন তখন রাণী কর্ণাবতী হুমায়ুনের সাহায্য প্রার্থনা করেন। হুমায়ুন নিজ অদূরদর্শিতা হেতু নিজ শত্রু বাহাদুর শাহ্‌কে দমনের এই সুযোগ গ্রহণ করিলেন না। বাহাদুর শাহ্ যখন তুর্কী, পোর্তুগীজ প্রভৃতি বিভিন্ন দেশীয় গোলন্দাজদের সাহায্য লইয়া চিতোর দুর্গটি বিধ্বস্ত করিয়া রাজপুতগণকে দমন করিতে সক্ষম হইলেন তখন হুমায়ুনের তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযানে অগ্রসর হইবার সময় হইল। মান্দাসোর-এর নিকট বাহাদুর শাহ্ ও হুমায়ুনের মধ্যে এক যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে বাহাদুর শাহ্ সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইলেন এবং মোগল সেনাবাহিনী কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া দিউ-তে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। মালব এবং গুজরাটের একাংশ হুমায়ুন কর্তৃক অধিকৃত হইল। এই বিজয়ের পর হুমায়ুন কিছুকাল আনন্দোৎসবে অতিবাহিত করিলেন। সেই সুযোগে বাহাদুর শাহ্ পোর্তুগীজদের সাহায্যলাভে সমর্থ হইলেন এবং হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য চেষ্টা শুরু করিলেন। কিন্তু হুমায়ুনের পক্ষে বাহাদুর শাহ্‌কে বাধা দিবার কোন সময় ছিল না। সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে আফগান দলপতিগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে তাঁহাকে সেদিকে মনোযোগ দিতে হইল। বাহাদুর শাহ্ সেই সুযোগে মালব ও তাঁহার রাজ্যের যে অংশ হুমায়ুন কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল তাহা সহজেই পুনরধিকার করিতে সমর্থ হইলেন।

গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শাহ্ ও হুমায়ুনের সংঘর্ষ

হুমায়ুনের সামরিক সাফল্য

বাহাদুর শাহ্ কর্তৃক হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, হুমায়ুন চুণার দুর্গ অবরোধ করিয়া শের খাঁর মৌখিক আনুগত্য প্রদর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণভাবে দমনের চেষ্টা করেন নাই। শের খাঁ ইহার সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণে ত্রুটি করিলেন না। গুজরাটে হুমায়ুন যখন বাহাদুর শাহের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত তখন শের খাঁ নিজ শক্তি বৃদ্ধি করিয়া অতর্কিতে বাংলাদেশ আক্রমণ করিলেন। বাংলাদেশের

শের খাঁ কর্তৃক বাংলাদেশ আক্রমণ

সিংহাসনে তখন মামুদ শাহ্ অধিষ্ঠিত। তিনি ছিলেন দুর্বলচেতা শাসক, দেশরক্ষার জন্য আফগান শত্রুর বিরুদ্ধে যুঝিবার মতো শক্তি বা সাহস তাঁহার ছিল না। তিনি তের লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা ও কিউল হইতে সকৃরিগলী পর্যন্ত যাবতীয় স্থান শের খাঁকে দিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু ইহাতে আফগান আক্রমণ হইতে বাংলাদেশ রক্ষা পাইল না। শের খাঁ পুনরায় বাংলা আক্রমণ করিলেন(১৫৩৭) এবং বাংলার রাজধানী গৌড় অবরোধ করিলেন। হুমায়ুন শের খাঁর উত্তরোত্তর শক্তিবৃদ্ধিতে শঙ্কিত হইয়া তাঁহাকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে সসৈন্যে যাত্রা করিলেন। কিন্তু তিনি বাংলাদেশের সুলতানের সহিত একযোগে শের খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার সামরিক সুবিধা উপলব্ধি না করিয়া শের খাঁর কর্মকেন্দ্র চুণার আক্রমণ করিলেন। শের খাঁ তখন গৌড় অবরোধে ব্যস্ত। তথাপি দীর্ঘ ছয় মাসের পূর্বে হুমায়ুনের পক্ষে চুণার দুর্গটি জয় করা সম্ভব হইল না। এদিকে ঐ দীর্ঘ সময়ের সুযোগ লইয়া শের খাঁ গৌড় জয় সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইলেন। তারপর তিনি রোটাস্ দুর্গটি জয় করিয়া ক্রমেই নিজ শক্তি বৃদ্ধি করিয়া চলিলেন। ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে চুণার দুর্গটি জয় করিয়া হুমায়ুন গৌড়ে উপস্থিত হইলেন। শের খাঁ ছিলেন দূরদর্শী সামরিক নেতা। তিনি হুমায়ুনের সহিত সম্মুখযুদ্ধে অগ্রসর হইলেন না। বর্ষা নামিবার ফলে হুমায়ুন বাংলাদেশে দীর্ঘ ছয় মাস বাধ্য হইয়াই যখন অবস্থান করিতেছিলেন তখন শের খাঁ চুণার দুর্গটি পুনরধিকার করিলেন। ইহা ভিন্ন বাণারস, জৌনপুর প্রভৃতি স্থান জয় করিয়া তিনি কনৌজ পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন। এই সকল স্থান জয় করিবার ফলে হুমায়ুনের বাংলা হইতে আগ্রা প্রত্যাবর্তনের পথ অবরুদ্ধ হইল। হুমায়ুন এই সংবাদে আশঙ্কিত হইয়া সসৈন্যে আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে বক্সারের নিকটবর্তী চৌসা নামক স্থানে শের খাঁ হুমায়ুনকে বাধা দান করিলেন। এই যুদ্ধে হুমায়ুন সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইলেন (১৫৩৯)। বহু সংখ্যক মোগল সৈন্য গঙ্গা নদী অতিক্রম করিতে গিয়া জলে ডুবিয়া প্রাণ

শের খাঁর দ্বিতীয় বার বাংলা আক্রমণ

হুমায়ুন কর্তৃক শের খাঁর বিরুদ্ধে অভিযান—তাঁহার অদূরদর্শিতা

শের খাঁ কর্তৃক চুণার পুনরুদ্ধার, বাণারস, জৌনপুর প্রভৃতি অধিকার

চৌসার যুদ্ধ (১৫৩৯)

হারাইল, অনেকে শের খাঁর সেনাবাহিনী কর্তৃক ধৃত হইল। হুমায়ুন কোনপ্রকারে প্রাণ লইয়া আগ্রায় ফিরিয়া গেলেন। এই যুদ্ধে জয়লাভের ফলে শের খাঁর রাজ্য কনৌজ হইতে আসামের সীমা, রোটাস হইতে বীরভূম পর্যন্ত বিস্তৃত হইল। দিল্লীর সম্রাটের বিরুদ্ধে এই জয়লাভে শের খাঁর মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল। তিনি 'শের শাহ্' উপাধি ধারণ করিয়া রাজকীয় মর্যাদায় নিজেকে ভূষিত করিলেন এবং নিজ নামে মুদ্রা প্রচলনের ব্যবস্থা করিলেন।

শের খাঁর 'শের শাহ্' উপাধি ধারণ

চৌসার যুদ্ধে অতর্কিতে আক্রান্ত হইয়া হুমায়ুনের শোচনীয় পরাজয় ঘটিয়াছিল। ইহার পর বৎসর তিনি সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হইয়া কনৌজের নিকটে বিলগ্রাম নামক স্থানে শের শাহ্‌কে আক্রমণ করিলেন (১৫৪০)। কিন্তু এই যুদ্ধেও হুমায়ুন শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইলেন। এইবারও কোনপ্রকারে প্রাণ লইয়া তিনি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে সমর্থ হইলেন। এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে হুমায়ুন হিন্দুস্তানের সিংহাসন ত্যাগ করিয়া আশ্রয়ের সন্ধানে দেশবিদেশে ঘুরিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বিলগ্রামের যুদ্ধে শের শাহের জয়লাভ বাবর-প্রতিষ্ঠিত মোগল সাম্রাজ্যের অবসান ঘটাইয়া পুনরায় আফগান প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিল।

বিলগ্রামের যুদ্ধ (১৫৪০) —হুমায়ুন সিংহাসনচ্যুত

মোগল সাম্রাজ্যের এই দুর্দিনেও হুমায়ুনের ভ্রাতাগণ সংঘবদ্ধভাবে শের শাহের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার কোন প্রয়োজন উপলব্ধি করিলেন না। হুমায়ুন নিজ ভ্রাতা কামরানের সাহায্য লাভের আশায় লাহোরে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু কামরান্ শের শাহের সাফল্যে ভীত হইয়া কাবুলে পলায়ন করিলেন এবং শের শাহ্‌কে পাঞ্জাব দান করিয়া তাঁহার সহিত চুক্তিবদ্ধ হইলেন। হৃতসর্বস্ব, হতভাগ্য হুমায়ুন সিন্ধুদেশে সৈন্য সংগ্রহের চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হইলেন। মাড়বারের রাজার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াও তিনি বিফলমনোরথ হইলেন। বহু দুঃখ-দুর্দশার মধ্য দিয়া তিনি স্থান হইতে স্থানান্তরে আশ্রয়ের সন্ধানে ঘুরিতে লাগিলেন। অবশেষে অমরকোটের রাণা প্রসাদ তাঁহাকে আশ্রয় দান করিলে সেখানে তিনি কিছুকাল

আশ্রয়ের সন্ধানে হুমায়ুনের দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ

অমরকোটে আশ্রয়-লাভ—আকবরের জন্ম (১৫৪২)

অবস্থান করিলেন। এখানে অবস্থানকালেই তাঁহার পুত্র আকবরের জন্ম হয়। রাণা প্রসাদ হুমায়ুনকে সিন্ধুদেশ জয় করিতে সাহায্যদানে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে রাণা প্রসাদ সাহায্যদানে অস্বীকৃত হন। ইহার পর হুমায়ুন কান্দাহারে নিজ ভ্রাতা আস্‌করীর সাহায্য লাভের আশায় গমন করেন। কিন্তু আস্‌করীর রাজ্যে তাঁহার জীবন নিরাপদ নহে বিবেচনা করিয়া হুমায়ুন অবশেষে পারস্যের শাহ্‌ তহ্‌মাস্প (Shah Tahmasp)-এর সভায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। শাহ্‌ তহ্‌মাস্প হুমায়ুনকে ১৪,০০০ হাজার সৈন্য দিয়া সাহায্য করিলেন। এই সামরিক সাহায্য লইয়া হুমায়ুন কাবুল ও কান্দাহার জয় করিলেন (১৫৪৫)। কামরান্‌ হুমায়ুনের হস্তে বন্দী হইলেন, তাঁহার চক্ষু দুইটি উৎপাটন করিয়া তাঁহাকে মক্কায় প্রেরণ করা হইল। আস্‌করীও মক্কায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, হিন্দাল এক নৈশ আক্রমণে প্রাণ হারাইলেন। এই-ভাবে প্রাথমিক বিজয় সম্পন্ন করিয়া ১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দে হুমায়ুন হিন্দুস্তানের সিংহাসন পুনরুদ্ধারের জন্য অগ্রসর হইলেন। ইতিমধ্যে শের শাহের মৃত্যু হইয়াছিল। তাঁহার অযোগ্য বংশধরগণ হিন্দুস্তানের প্রভুত্ব লইয়া নিজেদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদে লিপ্ত থাকার ফলে হুমায়ুনের সিংহাসন পুনরুদ্ধারের কাজ সহজ হইল। তিনি অনায়াসে লাহোর অধিকার করিলেন (১৫৫৫)। বিদ্রোহী আফগানগণ পাঞ্জাবের শাসনকর্তা সিকন্দর শূরকে সুলতান বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল। হুমায়ুন সিকন্দর শূরকে শিরহিন্দের যুদ্ধে পরাজিত করিয়া দিল্লী ও আগ্রা পুনরুদ্ধার করিলেন (১৫৫৫)। এইভাবে জীবনের শেষদিকে তিনি তাঁহার হৃত সাম্রাজ্যের কতকাংশ পুনরুদ্ধার করিয়া পুনরায় মোগল প্রাধান্যের সূত্রপাত করিলেন। পর বৎসর (১৫৫৬) গ্রন্থাগার হইতে নামিবার সময় সিঁড়ি হইতে পড়িয়া গিয়া তিনি আহত হন এবং তাহার ফলেই শেষ পর্যন্ত তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

পারস্য-সম্রাট তহ্‌মাস্প-এর সহায়তা লাভ

কাবুল ও কান্দাহার জয়

শের শাহের উত্তরাধিকারীদের অন্তর্দ্বন্দ্ব

শিরহিন্দ্‌-এর যুদ্ধে জয়লাভ (১৫৫৫)—মোগল সাম্রাজ্যের পুনঃস্থাপন

হুমায়ুনের মৃত্যু (১৫৫৬)

হুমায়ুন শান্তস্বভাব, দয়াবান্ ও স্নেহপ্রবণ সম্রাট ছিলেন। নিজ ভ্রাতাদের প্রতি তাঁহার মমত্ববোধ ছিল অপরিসীম। কামরানের শত্রুতার প্রমাণ পাইয়াও তিনি তাঁহার প্রতি কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে রাজী হন নাই। রাজসভার অভিজাতবর্গ হুমায়ুনকে মোগল সাম্রাজ্যের প্রধান শত্রু কামরানের প্রাণনাশ করিবার সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইলে হুমায়ুন উত্তর দিয়াছিলেন যে, যদিও বুদ্ধির বিচারে তিনি এবিষয়ে অভিজাতবর্গের সহিত একমত তথাপি অন্তরের দিক দিয়া তিনি তাঁহাদের পরামর্শ গ্রহণে অক্ষম।* সাহসিকতা ও বীরত্বের দিক দিয়াও হুমায়ুন প্রশংসার যোগ্য ছিলেন। পিতার সামরিক অভিযানে তিনি যথেষ্ট ক্ষমতার পরিচয় দান করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার চরিত্রের প্রধান ত্রুটি ছিল তাঁহার আলস্য, অহিফেন সেবন ও রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা। উপস্থিত পরিস্থিতি অনুযায়ী দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বনে এবং দৃঢ়তার সহিত কর্তব্য সম্পাদনে তিনি অপারগ ছিলেন। দয়াপ্রদর্শনে তিনি পাত্রাপাত্র বিচার করিতেন না। নব-প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য রক্ষা করিবার এবং আফগানদের বিরোধিতা দমন করিয়া সাম্রাজ্যের সংহতি বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় দূরদর্শিতা, কুটকৌশল বা ধৈর্য তাঁহার ছিল না। কিন্তু হুমায়ুনের চরিত্রে সাহিত্যানুরাগ, গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা এবং অপরাপর বৈজ্ঞানিক বিষয় সম্পর্কে ঔৎসুক্য প্রভৃতি গুণের অভাব ছিল না। জীবনের ঘোর দুর্দিনেও তাঁহার অমায়িকতা, দয়াপ্রবণতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের কোন অভাব পরিলক্ষিত হয় নাই।

হুমায়ুনের চরিত্র

হুমায়ুনের কৃতিত্ব-বিচার (A Critical Estimate of Humayun) : বাবরের মৃত্যুকালে মোগল সাম্রাজ্য কাবুল, কান্দাহার, পাঞ্জাব, উত্তর-বিহার এবং বর্তমান উত্তরপ্রদেশের সমগ্র অংশ লইয়া গঠিত ছিল। ইহা ভিন্ন রাজপুত রাজ্যগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মেবার রাজ্যটি বাবরের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিল। নব-প্রতিষ্ঠিত এই বিশাল সাম্রাজ্যের শাসন ও সংহতি স্থাপনের পূর্বেই বাবরের মৃত্যু ঘটিয়াছিল। স্বভাবতই এই দায়িত্ব তাঁহার পুত্র হুমায়ুনের উপর পড়িয়াছিল। হুমায়ুন যখন

হুমায়ুনের সিংহাসন আরোহণ কালে মোগল সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি

*"Though my head inclines to your words, my heart does not." *Humayun*, Vide, *A short History of Muslim Rule*, Ishwari Prasad, Vol. II, p. 347.

সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন তাঁহার সমস্যা ছিল নানাবিধ। বাবর আফগান নেতৃবর্গকে সাময়িকভাবে দমন করিতে সমর্থ হইলেও তাঁহাদের শক্তি নির্মূল করিতে পারেন নাই। রাজপুতদের ক্ষেত্রেও একথা সমভাবে প্রযোজ্য। ইহা ভিন্ন গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শাহ্ ছিলেন মোগল সাম্রাজ্যের প্রধান শত্রু। তদুপরি নিজ ভ্রাতাগণও সিংহাসন লাভের জন্য উৎসুক ছিলেন। এই সকল জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য যে পরিমাণ কূটনৈতিক জ্ঞান, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা এবং সামরিক সাহসিকতার প্রয়োজন ছিল, হুমায়ুনের সেই সকল গুণ মোটেই ছিল না।

হুমায়ুনের সমস্যা

(১) প্রথমেই তিনি সাম্রাজ্যের তিন অংশে তিন ভ্রাতাকে একপ্রকার স্বাধীন শাসক হিসাবেই স্থাপন করিলেন। ভ্রাতৃত্বের বিচারে ইহা প্রশংসনীয় হইলেও রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির দিক হইতে সমর্থনযোগ্য ছিল না। তদুপরি কামরান্ সামরিক শক্তি প্রয়োগ করিয়া পাঞ্জাব ও হিসার ফিরুজা দখল করিলে হুমায়ুন এই দুই স্থানেও কামরানের অধিকার স্বীকার করিয়া লইয়া ভ্রাতৃবিরোধ এড়াইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার ফলে তিনি কেবল পাঞ্জাব ও দিল্লীর যোগাযোগ পথের অধিকারই হারাইলেন না, সামরিক বাহিনীর প্রয়োজনীয় সৈন্য সংগ্রহের সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট অঞ্চলটিও তাঁহার অধিকারচ্যুত হইল। সাম্রাজ্যের সংহতি ও নিরাপত্তার দিক হইতে বিচার করিলে হুমায়ুন যে মারাত্মক ভুল করিয়াছিলেন তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

কামরানের প্রতি উদারতা—হুমায়ুনের অদূরদর্শিতা

(২) কালিঞ্জর দুর্গ অবরোধ করিতে গিয়া তিনি আফগানদের দমনের জন্য সেই অবরোধ উঠাইয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। চান্দেরী দুর্গ জয় করিবার কালে বাবর ঠিক অনুরূপ অবস্থায় দুর্গটির জয় সমাধা করিয়া তারপর আফগানদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছিলেন। চুণার দুর্গটি অবরোধ করিতে গিয়া হুমায়ুন শের খাঁর মৌখিক আনুগত্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সেই দুর্গের অধিকারে রাখিয়া আসিয়া অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। শের খাঁ ইহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতে ত্রুটি করেন নাই।

কালিঞ্জর দুর্গের অবোরধ—উন্মোচন

চুণার দুর্গ শের খাঁর অধীনে স্থাপনের ত্রুটি

(৩) গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শাহ্ যখন মেবারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র

অভিযানে অগ্রসর হইয়াছিলেন তখন মেবারের রাণী কর্ণাবতী হুমায়ুনের সাহায্য প্রার্থনা করেন। হুমায়ুন নিজ শত্রু বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে মেবারের সহিত যুগ্মভাবে যুদ্ধে অবতীর্ণ না হইয়া বাহাদুর শাহ্‌কে চিতোর জয়ের সুযোগ দান করিয়া নিজ অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তারপর বাহাদুর শাহ্‌ যখন রাজপুতদিগকে পরাভূত করিয়া অধিকতর শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন তখন হুমায়ুন তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে সাময়িকভাবে সাফল্যলাভ করিতে সক্ষম হইলেও হুমায়ুন তাঁহাকে মালব ও গুজরাটের একাংশ পুনরধিকারে বাধা দিতে পারেন নাই।

হুমায়ুনের অদূরদর্শিতা

(৪) শের খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াও হুমায়ুন সামরিক অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। শের খাঁকে বাংলাদেশে আক্রমণ না করিয়া চুণার দুর্গ জয় করিতে অগ্রসর হওয়া তাঁহার নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। চুণার অবরোধে দীর্ঘ ছয় মাস অতিবাহিত করিয়াও তিনি শের খাঁকে বাংলাদেশের রাজধানী গৌড় জয়ের সুযোগ দিয়াছিলেন। তারপর স্বয়ং গৌড়ে উপস্থিত হইয়া সহজেই যখন গৌড় অধিকার করিতে সমর্থ হইলেন তখনও সময়ের মূল্য না বুঝিয়া তিনি অযথা কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। বর্ষা নামিলে স্বভাবতই তিনি গৌড়েই অবস্থান করিতে বাধ্য হইলেন। এই সুযোগে শের খাঁ চুণার দুর্গটি পুনরুদ্ধার করিলেন। ইহা ভিন্ন রোটাস, বাণারস প্রভৃতি স্থান জয় করিয়া তিনি কনৌজ পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন। আগ্রা ফিরিয়া যাওয়ার পথ প্রায় অবরুদ্ধ হইয়াছে সংবাদ পাইয়া হুমায়ুনের আলস্য কাটিল। তিনি সসৈন্যে আগ্রায় ফিরিবার পথে শের খাঁ কর্তৃক অতর্কিতে আক্রান্ত হইয়া শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইলেন। শের খাঁকে পরাজিত করিবার শেষ চেষ্টাও তাঁহার বিফলতায় পর্যবসিত হইল। কনৌজের বা বিলগ্রামের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তিনি রাজ্যচ্যুত হইলেন। এইভাবে দৃঢ়সংকল্প, সামরিক ও রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির অভাব এবং পরাজিত শত্রুর প্রতি অবিবেচকের ন্যায় দয়াপ্রদর্শন প্রভৃতির ফলে হুমায়ুন রাজ্যহারা হইলেন। অবশ্য শের খাঁর

সামরিক অদূরদর্শিতা

শের শাহের সহিত যুদ্ধ : রাজনৈতিক ও সামরিক অদূরদর্শিতার দৃষ্টান্ত

কনৌজ বা বিলগ্রামের যুদ্ধে পরাজয় —রাজ্যচ্যুতি

ন্যায় বিচক্ষণ এবং সামরিক প্রতিভাসম্পন্ন শত্রুর সহিত যুঝিবার মত সামরিক প্রতিভাও হুমায়ুনের ছিল না, একথাও স্বীকার্য।

দীর্ঘ পনর বৎসর রাজ্যহারা অবস্থায় দেশ হইতে দেশান্তরে নানা দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে কাটাইয়া অবশেষে পারস্যের সম্রাট তহ্‌মাস্প-এর সাহায্যে তিনি নিজ হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা তাঁহার চরিত্রের কতক পরিবর্তন সাধন করিয়াছিল। তিনি অকৃতজ্ঞ ভ্রাতা কামরান্‌কে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া অনিচ্ছা-সত্ত্বেও তাঁহার চক্ষু উৎপাটনের আদেশ দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু হিন্দুস্তানের সিংহাসন পুনরধিকারে তাঁহার সামরিক দক্ষতার পরিচয় অপেক্ষা শের শাহের উত্তরাধিকারীদের আত্মকলহ ও ব্যাপক অরাজকতার পরিণামই পরিলক্ষিত হয়। আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার সুযোগে হুমায়ুন পিতৃরাজ্যের একাংশ পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। দীর্ঘ পনর বৎসরের দুঃখ-দুর্দশা তাঁহাকে কতদূর বাস্তববাদী ও দূরদর্শী করিতে পারিয়াছিল সেই পরিচয় দিবার পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

রাজ্য পুনরুদ্ধার

অহিফেনসেবী, সামরিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে অদূরদর্শী হুমায়ুন দয়া-দাক্ষিণ্য, স্নেহপরায়ণতা, অমায়িকতা এবং সর্বোপরি শিক্ষা, শিল্প ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলীরও অধিকারী ছিলেন।

চরিত্রের সদ্‌গুণাবলী

শের শাহ্‌, ১৫৩৯—১৫৪৫ (Sher Shah): শের শাহের জীবনী যেমন বিস্ময়কর তেমনি চিত্তাকর্ষক। পানিপথ ও গোগ্‌রা-র যুদ্ধের পর বিধ্বস্ত ও বিক্ষিপ্ত আফগান শক্তি শের শাহকেই কেন্দ্র করিয়া পুনরুজ্জীবিত হইয়াছিল। শের শাহের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে আফগানদের অন্তরে মোগল প্রভুত্বের অবসান ঘটাইয়া আফগান প্রাধান্য পুনঃস্থাপনের প্রেরণার সৃষ্টি হইয়াছিল।

শের শাহের জীবনীর গুরুত্ব

শের শাহের আদি নাম ছিল ফরিদ। তিনি ছিলেন আফগান জাতির শূর উপদলসম্ভূত। ফরিদের পিতামহ ইব্রাহিম প্রথমে মহাবৎ খাঁ ও দাউদ খাঁ নামক পাঞ্জাবের দুইজন জায়গীরদারের অধীনে কার্য গ্রহণ করেন। এই সূত্রে তিনি বাজ্‌ওয়ারা (Bāzwara or Bejoura) বসবাস করিবার কালে তাঁহার পৌত্র ফরিদের জন্ম হয়

পিতৃপরিচয়

(১৪৭২)। ফরিদের পিতার নাম ছিল হাসান। কিছুকাল পরে হাসান স্বয়ং সাসারামের জায়গীর প্রাপ্ত হন। ঐ সময় হইতে ফরিদ পিতার সহিত সাসারামে-ই বাস করিতেন।

বাল্যজীবন

ফরিদের বাল্যজীবন সুখের ছিল না। হাসান তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী ফরিদের বিমাতার প্রভাবাধীন থাকায় ফরিদ পিতৃস্নেহ হইতে বঞ্চিত ছিলেন। অবশ্য ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতির পক্ষে পিতার এইরূপ উপেক্ষা এবং বিমাতার বিদ্বেষ ফরিদের পক্ষে শাপে বর হইয়াছিল। তিনি বাল্যকালেই গৃহত্যাগ করিয়া জৌনপুরে চলিয়া যান। সেখানে তিনি আরবী ও ফার্সী ভাষা শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন। অল্পকালের মধ্যেই উভয় ভাষায়-ই তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি জন্মিল। তাঁহার স্মৃতি-

শিক্ষা

শক্তি ছিল অনন্যসাধারণ। তিনি গুলিস্তাঁ, বোস্তাঁ, সিকন্দরনামা প্রভৃতি গ্রন্থ আদ্যন্ত কণ্ঠস্থ করিয়া লইলেন। ইতিহাস, সাহিত্য, বীরত্বের কাহিনী প্রভৃতি পাঠে তিনি অতিশয় আনন্দলাভ করিতেন। ফরিদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও প্রতিভার পরিচয় পাইয়া বিহারের শাসনকর্তা জামাল খাঁ হাসানকে ফরিদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে অনুরোধ জানাইলেন। হাসান ফরিদকে সাদরে আহ্বান করিলেন এবং

সাসারামের শাসক হিসাবে পারদর্শিতা

তাঁহাকে সাসারাম ও খোয়াসপুরের শাসনকার্যের দায়িত্ব দান করিলেন। কিন্তু এই দুই স্থানের শাসনকার্যে ফরিদের পারদর্শিতা তাঁহার বিমাতার হিংসার উদ্রেক করিল। ফলে, ফরিদ স্বেচ্ছায় সাসারাম ত্যাগ করিয়া ভাগ্যান্বেষণে আগ্রায় উপস্থিত হইলেন। ইতিমধ্যে পিতা হাসানের মৃত্যু হইলে ফরিদ দিল্লীর সুলতানের নিকট হইতে পিতার জায়গীর লাভ করিলেন। ইহার পর তিনি

বহর খাঁ লোহানীর অধীনে চাকরি: 'শের খাঁ' উপাধি লাভ

বিহারের স্বাধীন সুলতান বহর খাঁ লোহানীর অধীনে চাকরি গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে একবার বহর খাঁর সহিত শিকারে বাহির হইয়া কাহারও বিনা সাহায্যে একটি 'শের' অর্থাৎ বাঘ মারিয়াছিলেন বলিয়া বহর খাঁ ফরিদকে 'শের খাঁ' উপাধিতে ভূষিত করেন। ঐ সময় হইতেই তিনি শের খাঁ নামে পরিচিতি লাভ করেন। বহর খাঁ শের খাঁর সততা ও কর্মদক্ষতায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে নিজ 'ভকীল' অর্থাৎ সহকারী নিযুক্ত করেন এবং নিজ পুত্র

জালাল খাঁর শিক্ষার দায়িত্ব শের খাঁর উপর ন্যস্ত করেন। এই সময়ে তাঁহার উন্নতিতে ঈর্ষান্বিত হইয়া অভিজাতবর্গের কয়েকজন বহর খাঁর নিকট তাঁহার বিরুদ্ধে গোপনে নানাপ্রকার অভিযোগ করিলে শের খাঁকে সাসারামের জায়গীরচ্যুত করা হয়। তখন শের খাঁ বহর খাঁর রাজসভা ত্যাগ করিয়া মোগল সম্রাট বাবরের অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন। বাবর তাঁহার কাজে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সাসারামের জায়গীর ফিরাইয়া দিবার ব্যবস্থা করেন। অল্পকাল পরেই বহর খাঁর মৃত্যু হইলে শের খাঁকে জালাল খাঁর অভিভাবক হিসাবে শাসনভার গ্রহণের জন্য আহ্বান করা হইল।

জালাল খাঁর অভিভাবক নিযুক্ত; চুণার দুর্গ অধিকার

নাবালক জালাল খাঁর অভিভাবকত্ব করিতে গিয়া শের খাঁ নিজেই বিহারের সুলতান হইয়া উঠিলেন। ইতিমধ্যে চুণার দুর্গের অধিপতি তাজ খাঁর বিধবা পত্নী মালিকাকে বিবাহ করিয়া শের খাঁ চুণার দুর্গ টি অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন (১৫৩০)। পর বৎসর (১৫৩১) সম্রাট হুমায়ুন শের খাঁর ক্ষমতাবৃদ্ধিতে শঙ্কিত হইয়া তাঁহাকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে চুণার দুর্গ টি অবরোধ করেন। সুচতুর শের খাঁ মৌখিকভাবে হুমায়ুনের প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন। ইহার অব্যবহিত পরে হুমায়ুন গুজরাটের বাহাদুর শাহকে দমন করিতে অগ্রসর হইলে শের খাঁ নিজ ক্ষমতাবৃদ্ধির সুযোগ পাইলেন। এদিকে তাঁহার উত্তরোত্তর ক্ষমতাবৃদ্ধিতে জালাল খাঁ এবং বিহারের লোহানী অভিজাতবর্গ শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা বাংলাদেশের সুলতান মামুদ শাহের সাহায্য লইয়া শের খাঁকে দমন করিতে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। শের খাঁ

সুরজগড়ের যুদ্ধজয় (১৫৩৪)

অনায়াসে মামুদ শাহ্ ও লোহানী অভিজাতবর্গের যুগ্ম-বাহিনীকে কিউল নদীর তীরে সুরজগড়ের যুদ্ধে (১৫৩৪) শোচনীয়ভাবে পরাজিত করিয়া বিহারের সম্পূর্ণ স্বাধীন সুলতান হইলেন। সুরজগড়ের যুদ্ধ শের খাঁর জীবনের এক যুগান্তকারী ঘটনা। এই যুদ্ধে জয়লাভের ফলে একদিকে যেমন তিনি নামে এবং কার্যত বিহারের সুলতানপদে অধিষ্ঠিত হইলেন, অপর দিকে এই যুদ্ধে তাঁহার ক্ষমতার পরিচয় পাইয়াই আফগান অভিজাতবর্গ তাঁহার নেতৃত্বাধীনে সমবেত হইলেন।

হুমায়ুনের কর্মব্যস্ততার সুযোগ লইয়া শের খাঁ আকস্মিকভাবে বাংলাদেশ

গৌড় আক্রমণ : তের লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা ও কিউল হইতে সকরিগলী পর্যন্ত স্থান লাভ

আক্রমণ করিয়া বাংলার রাজধানী গৌড়ের নিকট সসৈন্যে উপস্থিত হইলেন। বাংলার দুর্বলচেতা সুলতান মামুদ শাহ্ শের খাঁকে বাধাদানের তেমন কোন চেষ্টা না করিয়াই তের লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা এবং কিউল হইতে সকৃরি-গলী পর্যন্ত যাবতীয় স্থান শের খাঁকে সমর্পণ করিয়া তাঁহার সহিত শান্তি স্থাপন করিলেন। কিন্তু ইহাতেই মামুদ শাহের বিপদ কাটিল না। ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে শের খাঁ পুনরায় বাংলাদেশ আক্রমণ করিয়া গৌড় অবরোধ করিলেন। ইতিমধ্যে হুমায়ুন বাহাদুর শাহকে দমন করিয়া আগ্রায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। শের খাঁর ক্ষমতা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইতেছে উপলব্ধি করিয়া তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু মামুদ শাহের সহিত যুগ্মভাবে শের শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করিয়া তিনি প্রথমেই চুণার দুর্গ অবরোধ করিলেন। দীর্ঘ ছয় মাস ধরিয়া অবরুদ্ধ চুণার দুর্গটি আত্মরক্ষা করিয়া চলিল। সেই সুযোগে শের খাঁ গৌড় জয় করিতে সমর্থ হইলেন (১৫৩৮)। চুণার দুর্গ জয় করিয়া হুমায়ুন গৌড়ে উপস্থিত হইলেন। সামরিক কূটকৌশলী শের খাঁ হুমায়ুনের সহিত সম্মুখ সমরে অগ্রসর না হইয়া বাংলা-দেশ ত্যাগ করিলেন এবং রোটাস, বাণারস, জৌনপুর প্রভৃতি জয় করিয়া কনৌজ পর্যন্ত সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। চুণার দুর্গটিও তিনি পুনরুদ্ধার করিলেন। এই সকল স্থান শের খাঁর অধিকারভুক্ত হওয়ায় হুমায়ুনের আগ্রা প্রত্যাবর্তনের পথ প্রায় অবরুদ্ধ হইল। দীর্ঘ ছয়মাস গৌড়ে অতিবাহিত করিয়া হুমায়ুন তাঁহার প্রত্যাবর্তনের পথ সম্পূর্ণভাবে রুদ্ধ হইবার পূর্বেই আগ্রা ফিরিবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে দুইমাস ধরিয়া মোগলবাহিনী ও শের খাঁর মধ্যে খণ্ড যুদ্ধ চলিল। অবশেষে শের খাঁ কূটকৌশলের [illegible] গ্রহণ করিলেন। তিনি হুমায়ুনের সহিত সন্ধির প্রস্তাব প্রেরণ করিলেন। এই প্রস্তাব যখন বিবেচনাধীন তখন তিনি অতর্কিতে মোগল শিবির আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধে মোগল পক্ষের শোচনীয় পরাজয় ঘটিল। বক্সারের নিকট চৌসা নামক

দ্বিতীয়বার গৌড় আক্রমণ (১৫৩৭)

হুমায়ুনের চুণার অধিকার ও গৌড় জয়

শের খাঁ কর্তৃক রোটাস, বাণারস ও জৌনপুর জয়—চুণার পুনরুদ্ধার

চৌসার যুদ্ধ (১৫[illegible])

স্থানে এই যুদ্ধ হইয়াছিল (১৫৩৯)। ই সংখ্যক মোগল সৈন্য শের খাঁ কর্তৃক ধৃত হইল, ততোধিক সৈন্য গঙ্গা অতিক্রম করিতে গিয়া প্রাণ হারাইল। কিন্তু হুমায়ুন কোনপ্রকারে নিজ প্রাণ রক্ষা করিতে সক্ষম হইলেন। চৌসার যুদ্ধে মোগল সম্রাট হুমায়ুনের বিরুদ্ধে জয়লাভ করিবার ফলে শের খাঁর মর্যাদা ও প্রতিপত্তি উভয়ই বৃদ্ধি পাইল। তিনি শের শাহ্ উপাধি ধারণ করিয়া নিজ নামাঙ্কিত মুদ্রার প্রচলন করিলেন। পর বৎসর (১৫৪০) হুমায়ুন পুনরায় শের শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। উভয়পক্ষে কনৌজের অনতিদূরে বিলগ্রাম নামক স্থানে তুমুল যুদ্ধ হইল। এইবারও শের শাহ্ হুমায়ুনকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করিতে সমর্থ হইলেন। এই যুদ্ধ কনৌজ, বিলগ্রাম, গঙ্গানদীর যুদ্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিত। এই যুদ্ধে জয়লাভের ফলে শের শাহ্ হিন্দুস্তানের সার্বভৌমত্বের অধিকারী হইলেন, আর হুমায়ুন প্রাণরক্ষার্থ সিংহাসন ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন।

'শের শাহ্' উপাধি ধারণ

কনৌজ বা বিলগ্রামের যুদ্ধ (১৫৪০)

হুমায়ুনের ভ্রাতাগণ এই দুর্দিনে তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইলেন না। কামরান্ পাঞ্জাব প্রদেশটি শের শাহের নিকট ত্যাগ করিয়া তাঁহার সহিত ইতিপূর্বেই সন্ধি স্থাপন করিয়াছিলেন। সিন্ধু এবং মুলতানও শের শাহের সাম্রাজ্যভুক্ত হইল। এই সময়ে (১৫৪১) বাংলার শাসনকর্তা বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে শের শাহ্ দ্রুত বাংলাদেশে উপস্থিত হইলেন। তিনি বিদ্রোহী শাসনকর্তাকে অপসারিত করিয়া তাঁহারই এক বিশ্বস্ত অনুচরকে বাংলার শাসনভার দান করিলেন। কিন্তু বাংলাদেশ যাহাতে ভবিষ্যতে বিদ্রোহ ঘোষণা না করিতে পারে সেজন্য বাংলাদেশের সীমা হ্রাস করিয়া তথাকার শাসন ও সামরিক ব্যবস্থা, প্রভৃতির তিনি পরিবর্তন সাধন করিলেন। তিনি বাংলাদেশকে ১৯টি সরকারে বিভক্ত করিলেন এবং বাংলার শাসনকর্তাকে 'আমীন-ই-বাংলা' উপাধি দান করিলেন। এই উপাধি হইতেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, বাংলার শাসনব্যবস্থার সামরিক প্রকৃতির পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল এবং উহা সম্পূর্ণভাবে বে-সামরিক শাসনে পরিণত হইয়াছিল।

সিন্ধু ও মুলতান জয়

বাংলাদেশের বিদ্রোহ-দমন : বাংলার শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্তন-সাধন

বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থার যথাযথ পরিবর্তন সাধন করিয়া শের শাহ্ গোয়ালিওর আক্রমণ করিলেন। দীর্ঘ দুই বৎসর যুঝিয়া তিনি গোয়ালিওর দখল করিতে সমর্থ হইলেন। ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে মালব তাঁহার অধিকারভুক্ত হইল। মালবের রায়সিন দুর্গটির অধিপতি পুরণমল তখনও শের শাহের প্রভুত্ব স্বীকার করিলেন না। শের শাহ্ স্বভাবতই এই দুর্গটি আক্রমণ করিলেন। দুইমাস অবরুদ্ধ অবস্থায় যুদ্ধ করিয়া অবশেষে পুরণমল বিনা বাধায় পরিবার-পরিজন ও নিজ সেনাবাহিনীসহ মালবের সীমা অতিক্রম করিতে পারিবেন এই প্রতিশ্রুতি শের শাহের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া দুর্গটি ত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু দুর্গ ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিবার সঙ্গে সঙ্গে শের শাহের সেনাবাহিনী পুরণমল ও তাঁহার অনুচরদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। রাজপুত সৈনিকগণ নিজেদের স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাগণ মুসলমানদের হস্তে পতিত হইবার পূর্বে নিজেরাই তাহাদের হত্যা করিলেন এবং প্রত্যেকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যুদ্ধ করিয়া প্রাণ বিসর্জন দিলেন। শের শাহের এই প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গ তাঁহার চরিত্র মসিলিপ্ত করিয়াছে সন্দেহ নাই।

গোয়ালিওর, মালব ও রায়সিন দুর্গ জয়

শের শাহের প্রতারণার সাহায্য গ্রহণ

১৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দে শের শাহ্ মেবারের রাণা মালদেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। শের শাহ্ কূটকৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যুদ্ধে জয়ী হইলেন। ইহার পর শের শাহ্ আজমীর হইতে আবু পর্যন্ত যাবতীয় স্থান নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করিলেন। পর বৎসর (১৫৪৫) কালিঞ্জর দুর্গ জয় করিতে গিয়া এক বিস্ফোরণের ফলে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

রাজপুতানা জয়

মৃত্যু (১৫৪৫)

শের শাহের শাসনব্যবস্থা (Sher Shah's Administrative System): শের শাহ্ সাহসী বীর, সমরকুশল সেনাপতি, সমরবিজয়ী নেতা ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু শাসক হিসাবে তাঁহার দক্ষতা তাঁহার অপরাপর গুণাবলীকে ছাড়াইয়া গিয়াছিল। মাত্র পাঁচ বৎসর রাজত্ব করিয়া তিনি শাসনব্যবস্থার যে পরিমাণ উন্নতিসাধন করিয়া গিয়াছিলেন তাহা ভারত-ইতিহাসে শের শাহ্‌কে অমরত্ব দান করিয়াছে। ঐ অল্প সময়ের মধ্যে নানাপ্রকার জনকল্যাণ-মূলক সংস্কার এবং শাসনব্যবস্থার প্রতিক্ষেত্রে উন্নতি সাধন করিয়া তিনি

শের শাহের অসাধারণ শাসনদক্ষতা

শের শাহের সাম্রাজ্য
০ ২০০ ৪০০
মাইল
আগ্রা
বিলগ্রাম
কনৌজ
গোয়ালিওর
নর্মদা নং
মহানদী
বঙ্গোপসাগর
সাগর

তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দান করিয়াছিলেন। সামরিক প্রতিভার সহিত এইরূপ শাসনদক্ষতার সংমিশ্রণের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। শাসন-ব্যাপারে তাঁহার কার্যাদির সুফল তাঁহার রাজত্বকালে পরিলক্ষিত হইয়াছিল. ইহা ভিন্ন, তাঁহার নীতি অনুসরণ করিয়াই পরবর্তী কালে মোগল সম্রাট আকবর অধিকতর সুদক্ষ শাসনব্যবস্থা স্থাপনে সক্ষম হইয়াছিলেন।

শের শাহ্ আলা-উদ্দিনের শাসনপদ্ধতির কতক মূলনীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু অধিকাংশই ছিল তাঁহার নিজস্ব উদ্ভাবন। ভারতের প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয়,—হিন্দু এবং মুসলমান শাসনপদ্ধতির কতক কতক মৌলিক নীতি গ্রহণ করিয়া শের শাহ্ স্বীয় প্রতিভার দ্বারা সেগুলিকে আধুনিক রূপে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। ইংরাজ ঐতিহাসিক কীনি (Mr. Keene) শের শাহের শাসনপদ্ধতির প্রশংসা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, কোন শাসকই—এমন কি ব্রিটিশ সরকারও শাসনকার্যে শের শাহের ন্যায় পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন নাই।* হিন্দু ও মুসলমান শাসনপদ্ধতি এবং হিন্দু ও মুসলমান প্রজাবর্গের মধ্যে সমন্বয়সাধন করাই ছিল শের শাহের শাসনব্যবস্থার মূলনীতি।†

হিন্দু ও মুসলমান শাসনপদ্ধতির অভূতপূর্ব সংমিশ্রণ

শের শাহের শাসনব্যবস্থা যে স্বৈরতান্ত্রিক ছিল সেবিষয়ে মতদ্বৈধের অবকাশ নাই। রাজ্যের সমগ্র শাসনক্ষমতা শের শাহের নিজ হস্তে কেন্দ্রীভূত ছিল। কিন্তু স্বৈরতন্ত্র হইলেও শের শাহের শাসনব্যবস্থা স্বেচ্ছাতন্ত্র ছিল না। তাঁহার শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণের অংশ গ্রহণ করিবার কোনও সুযোগ ছিল না বা সেইরূপ কোন নীতি স্বীকৃত ছিল না। কিন্তু জনকল্যাণ সাধনই ছিল শের শাহের

স্বৈরতন্ত্র হইলেও স্বেচ্ছাতন্ত্র নহে

* "No government—not even the British has shown so much wisdom as did this Pathan." Mr. Keene, Vide *An Advanced History of India* pp. 439-40.

† 'The whole of his brief administration was based on the principle of union'. Mr. Keene, Vide Lane-Poole, *Mediaeval India under Mohammedan Rule,* p.

শাসনব্যবস্থার মূল নীতি। মুসলমান শাসনের ইতিহাসে শের শাহ্-ই সর্বপ্রথম জনসাধারণের কল্যাণ ও তাহাদের সমর্থনের ভিত্তিতে সাম্রাজ্য ও শাসনব্যবস্থা গঠনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন প্রকৃত প্রজাহিতৈষী শাসক। ইওরোপের ইতিহাসে অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে সকল প্রজাহিতৈষী, জ্ঞানদীপ্ত, স্বৈরাচারী শাসকের পরিচয় পাওয়া যায়, ষোড়শ শতাব্দীর ভারত-ইতিহাসে শের শাহ্ তাঁহাদের অগ্রদূত হিসাবে নিজ পরিচয় রাখিয়া গিয়াছিলেন।*

প্রজাহিতৈষী শাসন

শাসনকার্যের সুবিধার জন্য শের শাহ্ তাঁহার সাম্রাজ্যকে ৪৭টি সরকারে বা ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। প্রত্যেকটি 'সরকার' আবার বহুসংখ্যক পরগণায় বিভক্ত করা হইয়াছিল। প্রত্যেক পরগণায় একজন করিয়া শিকদার, আমীন, মুন্সীফ্, খাজাঞ্চী বা কোষাধ্যক্ষ, হিন্দু হিসাব-লেখক ও ফার্সী হিসাব-লেখক ছিলেন। শিকদার ছিলেন পরগণার সামরিক অধিকর্তা। কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশ কার্যকরী করা, প্রয়োজনবোধে আমীনকে সামরিক সাহায্য দান করা ছিল তাঁহার কর্তব্য। আমীন ছিলেন সর্বোচ্চ বে-সামরিক কর্মচারী। পরগণার রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়ের ভার ছিল তাঁহার উপর।

৪৭টি সরকার : পরগণা

পরগণার রাজকর্মচারিগণ—শিকদার, আমীন, মুন্সীফ্, খাজাঞ্চী, হিন্দু ও ফার্সী হিসাব-লেখক

প্রত্যেকটি সরকারের উপর একজন করিয়া শিকদার-ই-শিক্দারান্, মুন্সীফ্-ই-মুন্সীফান্ থাকিতেন। সরকারের অধীন পরগণাগুলির শাসনকার্য পরিদর্শনের ভার ছিল তাঁহাদের উপর। সমগ্র দেশের শাসনকার্য পরিদর্শন করিতেন শের শাহ্ স্বয়ং।

সরকারের রাজকর্মচারিগণ : শিকদার-ই-শিক্দারান্, মুন্সীফ্-ই-মুন্সীফান্

* "In spite of limitations which hampered a sixteenth century king in India he brought to bear upon his task, the intelligence, the ability, the devotion of the despots of the eighteenth century in Europe." Ishwari Prasad, *A short History of Muslim Rule in India*, p. 334.

একই স্থানে অধিককাল কাজে নিযুক্ত থাকিবার ফলে রাজস্ব-কর্মচারিগণের মধ্যে যাহাতে স্থানীয় প্রভাব-প্রতিপত্তি জন্মিতে না পারে সেইজন্য প্রতি তিন বৎসর অন্তর তাঁহাদিগকে একস্থান হইতে অন্যস্থানে বদলি করিবার রীতি ছিল।

রাজস্ব-কর্মচারীদের বদলির ব্যবস্থা

শের শাহের রাজস্ব-নীতি :

রাজস্ব আদায় সম্পর্কে শের শাহ্ কতকগুলি যুক্তিসম্মত উদার নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। পূর্বে রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারণে জমি জরিপের কোন ব্যবস্থা ছিল না। কানুনগো নামক রাজস্ব-কর্মচারীদের মৌখিক বিবরণের উপর নির্ভর করিয়া জমির রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারিত হইত। কিন্তু শের শাহ্ জমির নির্ভুল জরিপের ব্যবস্থা করিলেন। তারপর জমির উৎপাদিকা শক্তির অনুপাতে বিভিন্ন খণ্ডের বিভিন্ন পরিমাণ রাজস্ব নির্ধারণ করিলেন। মকদ্দম, চৌধুরী, পাটোয়ারী প্রভৃতি কর্মচারীদের মারফৎ রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা ছিল বটে, কিন্তু প্রজাবর্গ সরাসরি রাজকোষে রাজস্ব জমা দিতে পারিত। উৎপন্ন ফসলের এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব হিসাবে গ্রহণ করা হইত। শের শাহ্ 'কবুলিয়ত' ও 'পাট্টা'র প্রচলন করেন। কৃষকগণ তাহাদের অধিকার ও দায়িত্ব বর্ণনা করিয়া 'কবুলিয়ত' নামক দলিল সম্পাদন করিয়া দিত আর সরকারের পক্ষ হইতে জমির উপর কৃষকের স্বত্ব স্বীকার করিয়া 'পাট্টা' দেওয়া হইত। রাজস্ব নির্ধারণে যথাসম্ভব উদারতা প্রদর্শন করা হইত, কিন্তু নির্ধারিত রাজস্ব আদায়ে কোন প্রকার বিলম্ব বা অবহেলা প্রদর্শনের অবকাশ ছিল না। অবশ্য কোন প্রাকৃতিক দুর্দৈবের ফলে ফসল না জন্মিলে কৃষকদের রাজস্ব মকুব করা হইত, এমন কি প্রয়োজনবোধে সরকার হইতে ঋণদানের ব্যবস্থাও ছিল। শের শাহের ভূমি-বণ্টন ও রাজস্ব-নির্ধারণ ব্যবস্থা ভারতীয় রাজস্ব ব্যবস্থার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। পরবর্তী কালের ভূমি-বণ্টন ও রাজস্ব-নীতি বহুলাংশে শের শাহ্ প্রচলিত রাজস্ব-নীতির উপরই গড়িয়া উঠিয়াছিল। শের শাহের রাজস্ব-নীতির উৎকর্ষ অতি অল্প সময়ের মধ্যে সরকারী আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধিতেই পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

জমি জরিপ

'কবুলিয়ত' ও 'পাট্টা'

রাজস্ব : ফসলের এক-তৃতীয়াংশ

শের শাহের রাজস্ব-নীতির সাফল্য

শুল্ক ও মুদ্রানীতির সংস্কার

শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য শের শাহ্ আন্তঃ-প্রাদেশিক শুল্ক উঠাইয়া দিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন তিনি মুদ্রানীতিরও সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন।

সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সংযোগ স্থাপন এবং একস্থান হইতে দ্রুত অপর স্থানে যাইবার সুবিধার জন্য শের শাহ্ বহু সুন্দর ও প্রশস্ত রাস্তা নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এগুলির মধ্যে 'গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড্' নামক রাস্তাটিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই রাস্তাটি পূর্ববঙ্গ হইতে সিন্ধুদেশ পর্যন্ত একটানা চলিয়া গিয়াছে। 'গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড্' ভিন্ন আগ্রা হইতে যোধপুর, আগ্রা হইতে বুরহানপুর পর্যন্ত বিস্তৃত রাস্তাগুলিও উল্লেখযোগ্য। এই সকল রাস্তা নির্মাণের ফলে দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। পথিকদের সুবিধার জন্য শের শাহ্ রাস্তার উভয় পার্শ্বে ছায়াপ্রদ বৃক্ষ রোপণ করাইয়াছিলেন, এবং সরাইখানা স্থাপন করাইয়াছিলেন।

প্রশস্ত ও দীর্ঘ রাস্তা নির্মাণ—'গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড্'

ডাক চলাচলের ব্যবস্থা, গুপ্তচর নিয়োগ

সংবাদ সরবরাহের উদ্দেশ্যে তিনি ঘোড়ার পিঠে করিয়া একস্থান হইতে অপর স্থানে ডাক চলাচলের ব্যবস্থা করেন। দেশের বিভিন্ন অংশের সংবাদ সংগ্রহের জন্য শের শাহ্ বহু গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

শের শাহের সামরিক পদ্ধতি আলা-উদ্দিন খল্‌জীর সামরিক সংগঠনের অনুকরণে গঠিত ছিল। দেশের বিভিন্ন অংশে সেনানিবাস স্থাপন করিয়া সৈন্য মোতায়েন রাখিবার নীতি শের শাহ্ গ্রহণ করিয়াছিলেন। দিল্লী এবং রোটাসের সেনানিবাস ছিল সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। সেনানিবাসে যে সৈন্যদল মোতায়েন থাকিত উহা 'ফৌজ' নামে অভিহিত হইত। ফৌজদার ছিলেন 'ফৌজের' অধিনায়ক। আফগান দলপতিদের কেহ কেহ নিজস্ব সেনাবাহিনী পোষণের অধিকার প্রাপ্ত ছিলেন। উপরোক্ত ব্যবস্থা ভিন্ন সম্রাটের সরাসরি অধীনে পঁচিশ হাজার পদাতিক এবং দেড় লক্ষ অশ্বারোহীর এক বিশাল বাহিনী ছিল। এই সেনাবাহিনীর নিয়মানুবর্তিতা ও সমর দক্ষতা ছিল অসাধারণ। যুদ্ধের সময় অথবা সেনাবাহিনী যাতায়াতের ফলে কৃষকদের ফসলের কোন ক্ষতি হইলে শের শাহ্ সেই ক্ষতি পূরণ করিয়া দিতেন।

সামরিক-ব্যবস্থা

দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার জন্য শের শাহ্ পুলিশ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। গ্রামের মোড়ল এবং গ্রামের সাধারণ লোকের উপর তিনি গ্রামের এলাকার অধীনে অপরাধমূলক কার্যাদির খবরাখবর সংগ্রহের এবং অপ-রাধীদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছিলেন।

পুলিশ-ব্যবস্থা

শের শাহের বিচার-ব্যবস্থাও ছিল খুবই উন্নত ধরণের। প্রতি পরগণার দেওয়ানী বিচারের ভার ছিল আমীনদের উপর। ফৌজদারী বিচারের ভার ছিল কাজী ও মীর আদলের উপর। কয়েকটি পরগণার উপর একজন করিয়া মুন্‌সীফ্-ই-মুন্‌সীফান্ দেওয়ানী বিচারের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন এবং কাজী-ই-কাজাতান্ বা প্রধান কাজী ছিলেন ফৌজদারী বিচারের ভারপ্রাপ্ত। বিচার-ব্যবস্থার সর্বোপরি ছিলেন সম্রাট স্বয়ং। আইনের চক্ষে সকলেই ছিল সমান। বিচার ব্যাপারে জাতি, ধর্ম বা ব্যক্তির মধ্যে কোনপ্রকার বৈষম্য করা হইত না। শের শাহের দণ্ডবিধি ছিল অত্যন্ত কঠোর। অপরাধ প্রমাণিত হইলে অপরাধীকে কঠোর দণ্ডভোগ করিতে হইত। এমন কি চুরি, ডাকাতির অপরাধেও প্রাণদণ্ড দিবার ব্যবস্থা ছিল।

বিচার-ব্যবস্থা

দণ্ডবিধির কঠোরতা

ধর্মের ব্যাপারে সকলেই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিত। হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির উপর শের শাহ্ তাঁহার শাসন-ব্যবস্থাকে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার শাসনব্যবস্থায় বহু হিন্দু উচ্চ রাজকর্মচারিপদে নিযুক্ত ছিলেন। ব্রহ্মজিৎ গৌড় ছিলেন শের শাহের সেনাপতি। শের শাহ্-ই ছিলেন সর্বপ্রথম মুসলমান সম্রাট যিনি জনসাধারণের স্বাভাবিক আনুগত্যের ভিত্তিতে সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা গঠন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ধর্মবিষয়ে সহিষ্ণুতা

শের শাহের কৃতিত্ব (Estimate of Sher Shah): মধ্যযুগীয় ভারত-ইতিহাসে শের শাহের ন্যায় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শাসক অন্য কেহ ছিলেন না। তিনি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। বিজেতা, শাসক এবং সংস্কারক হিসাবে শের শাহ্ সমভাবে সুদক্ষ ছিলেন। সামান্য জায়গীরদারের পুত্র হইয়াও একমাত্র নিজ কর্মপ্রচেষ্টা ও অধ্যবসায়ের দ্বারা তিনি এক বিশাল

সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্রে অনন্যসাধারণ বিভিন্ন গুণাবলীর এক অভূতপূর্ব সমাবেশ ঘটিয়াছিল। সামরিক প্রতিভা ও সাহিত্যানুরাগের এক অভূতপূর্ব সমন্বয় তাঁহার চরিত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।

তাঁহার চরিত্র

তাঁহার স্মরণশক্তি ছিল অসাধারণ। গুলিস্তাঁ, বোস্তাঁ, সিকন্দর নামা প্রভৃতি গ্রন্থের আদ্যোপান্ত তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি নিজে গোঁড়া মুসলমান ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু পরধর্মের প্রতি উদারতা প্রদর্শনের মতো উদারতা তাঁহার চরিত্রে ছিল। নিজ আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা, নিজ কর্তব্য সম্পাদনে নিরলসতা, প্রজার প্রতি বাৎসল্য, হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে সম-ব্যবহার প্রভৃতি সদ্‌গুণের জন্য শের শাহ্ ভারত-ইতিহাসে এক শ্রদ্ধার আসন অধিকার করিয়া রহিয়াছেন।

বহুবিধ ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্য দিয়া জীবনের পথে অগ্রসর হইয়া তিনি নিজেকে ভারত সম্রাটের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু নিজ অবস্থার এইরূপ অভাবনীয় পরিবর্তন তাঁহার চরিত্রে কোন ঔদ্ধত্যের সৃষ্টি করে নাই। যুদ্ধ জয় করিতে গিয়া কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। রায়সিন দুর্গের অধিপতি পূরণমল আত্মসমর্পণ করিলে

পূরণমলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা

তিনি তাঁহাকে নিজ সেনাবাহিনী ও পরিবার-পরিজন লইয়া মালব ত্যাগের প্রতিশ্রুতি দান করিয়াও সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন এবং অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া পূরণমলের সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করেন। শের শাহের চরিত্রে এই বিশ্বাসঘাতকতা কলঙ্ক লেপন করিয়াছে সন্দেহ নাই, তথাপি প্রতারণা বা বিশ্বাসঘাতকতা তাঁহার

বিশ্বাসঘাতকতা তাঁহার চরিত্রের প্রকৃত পরিচয় নহে

চরিত্রের প্রকৃত পরিচয় নহে। বিজিত শত্রুর প্রতি অনুকম্পা, বিজিত দেশ ও জনসাধারণের প্রতি সহৃদয় ব্যবহার দ্বারা তিনি তাঁহার বিজয় গৌরবকে অধিকতর গৌরবময় করিয়া তুলিয়াছিলেন। একমাত্র মোগল সম্রাট আকবরকে বাদ দিলে ভারতবর্ষের মুসলমান যুগের শ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন শের শাহ্ একথা ঐতিহাসিক মাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন।

শের শাহ্ অনন্যসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন সামরিক নেতা ছিলেন। তাঁহার সামরিক দূরদৃষ্টি ছিল অসাধারণ। মোগল সৈন্যের সহিত সম্মুখযুদ্ধে বিজয়-লাভ করা সহজ হইবে না মনে করিয়া তিনি বাংলাদেশে হুমায়ুনকে বাধা দান

করেন নাই। চুণার দুর্গ অবরোধকালে যেমন তিনি মৌখিকভাবে হুমায়ুনের বশ্যতা স্বীকার করিয়া পরাজয়ের সম্ভাবনা এড়াইয়াছিলেন তেমনি তিনি বাহাদুর শাহের সহিত হুমায়ুনের যুদ্ধের সুযোগ লইয়া নিজ শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। আবার তিনি প্রায় সেই কৌশল অবলম্বন করিয়াই হুমায়ুনকে বিনা বাধায় বাংলার রাজধানীতে প্রবেশ করিতে দিয়া সেই অবকাশে রোটাস, বাণারস প্রভৃতি স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। চৌসা এবং বিলগ্রামের যুদ্ধেও শের শাহ্ তাঁহার সামরিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যুদ্ধজয়ে তিনি কূটকৌশলের আশ্রয় লইতেন। মারবাড়ের মালদেবকে তিনি কূটকৌশলের সাহায্যে পরাজিত করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি অপরাপর রাজপুত নেতাদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি সম্বলিত কতকগুলি জাল চিঠি মালদেবের নিকট প্রেরণ করিয়া নিজ কার্যসিদ্ধি করিয়াছিলেন। মানবতার দৃষ্টিতে নিন্দনীয় হইলেও বিজেতার ভূমিকায় এইরূপ আচরণ সমর্থনযোগ্য নহে, একথা বলা চলে না। বরং ইহা শের শাহের সামরিক কূটকৌশলেরই পরিচায়ক। শক্তি ও সামর্থ্যহীন জায়গীরদারের অবহেলিত পুত্র শের শাহের পক্ষে বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হওয়া বিজেতা হিসাবে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতার পরিচায়ক, বলা বাহুল্য।

সামরিক নেতা হিসাবে শের শাহ্

শাসক হিসাবে শের শাহ্ মোগল সম্রাট আকবরের পথপ্রদর্শক ছিলেন। তিনি ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় শাসন-প্রণালীর শ্রেষ্ঠ নীতিগুলি গ্রহণ করিয়া নিজ প্রতিভা ও উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে এক আধুনিক ও যুক্তিসম্মত শাসনব্যবস্থা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। শাসনব্যবস্থাকে সুষ্ঠু, সুদক্ষ ও জনহিতকর করিয়া তোলাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। সামান্য পাঁচ বৎসর রাজত্ব করিয়াই তিনি এবিষয়ে অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজস্ব-নীতি যেমন ছিল বিজ্ঞান-সম্মত তেমনি জনহিতৈষী। জমির উর্বরতার উপর রাজস্ব নির্ধারণের ব্যবস্থা করিয়া এবং প্রজাবর্গের মৌলিক কতকগুলি অধিকার স্বীকার করিয়া তিনি রাজস্ব-ব্যবস্থার চরম উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন।

প্রজাবর্গের হিতসাধন—শাসনের মূল আদর্শ

শের শাহ্-ই ছিলেন সর্বপ্রথম সুলতান যিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ভারতে স্থায়ী সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রধান শর্ত-ই ছিল ধর্ম-নিরপেক্ষ শাসন-

ব্যবস্থার প্রচলন করা। স্বয়ং ধর্মপরায়ণ মুসলমান হইয়াও তিনি শাসনকার্যে

ধর্ম-নিরপেক্ষ শাসন ব্যবস্থা

কোনরূপ ধর্মান্ধতা প্রদর্শন করেন নাই। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল প্রজার প্রতি সমান ব্যবহার করিয়া এবং শাসনব্যবস্থাকে জনসাধারণের আন্তরিক সমর্থনের উপর নির্ভরশীল করিয়া শের শাহ্ মধ্যযুগীয় ভারত-ইতিহাসে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করিয়াছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান প্রজাদের মধ্যে কোনপ্রকার বৈষম্যমূলক ব্যবহার

প্রজামাত্রেরই সমান অধিকার

তাঁহার আমলে ছিল না। হিন্দুদের মধ্যে বহু যোগ্য ব্যক্তি শের শাহের শাসনব্যবস্থায় দায়িত্বপূর্ণ রাজকর্মচারিপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মজিৎ গৌড় ছিলেন তাঁহার অন্যতম প্রধান সেনাপতি। শের শাহের বিচার-ব্যবস্থায় জাতি-ধর্মের কোন প্রভেদ করা হইত না। তাঁহার শাসনব্যবস্থা সমসাময়িক ও পরবর্তী কালের ঐতিহাসিকদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। ঐতিহাসিক

ঐতিহাসিক কীনির মন্তব্য

কীনি (Mr. Keene) বলেন যে, শের শাহ্ শাসনকার্যে যে দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা ভারতের অপর কোন শাসক এমন কি ব্রিটিশ সরকারও প্রদর্শন করিতে পারেন নাই।*

জনসাধারণের অর্থনৈতিক উন্নতিসাধনের উদ্দেশ্যে শের শাহ্ শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতির উৎসাহ দান করিয়াছিলেন। এজন্য তিনি আন্তঃপ্রাদেশিক শুল্ক উঠাইয়া দিয়া এবং রাস্তাঘাট নির্মাণ করাইয়া আধুনিক অর্থনৈতিক জ্ঞানের

জনকল্যাণকর কার্যাদি

পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার আমলে নির্মিত 'গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড্' অদ্যাপি তাঁহার কার্যের সাক্ষ্য বহন করিতেছে। ব্যবসায়-বাণিজ্য ভিন্ন সেনাবাহিনীর চলাচলের জন্যও এই রাস্তা অত্যন্ত কার্যকরী ছিল। ঘোড়ার পিঠে ডাক চলাচলের ব্যবস্থা, পুলিশ ব্যবস্থার সংগঠন, সামরিক বাহিনীর উন্নতিবিধান, বিচার-ব্যবস্থার সংস্কার করিয়া শের শাহ্ তাঁহার বিভিন্নমুখী প্রতিভার পরিচয় দান করিয়াছিলেন।

ধর্মাধিষ্ঠান ও ধর্মজ্ঞানীদের সাহায্যার্থে তিনি মুক্তহস্তে দান করিতেন।

তাঁহার দানশীলতা

দরিদ্র অবলম্বনহীন নরনারীদের সাহায্যের ব্যবস্থাও তিনি করিয়াছিলেন। [illegible]বর্গের অবহেলায়

*Vide *An Advanced History of India* pp. 439-40.

কোন ধর্মজ্ঞানী, ধর্মাধিষ্ঠান বা দরিদ্র প্রজা যাহাতে সাহায্য হইতে বঞ্চিত না হইতে পারে সেজন্য তিনি স্বয়ং এবিষয়ে লক্ষ্য রাখিতেন।

শের শাহের অক্লান্ত কর্মনিষ্ঠা, তাঁহার প্রজাহিতৈষণা, তাঁহার স্থাপত্য-শিল্পানুরাগ এবং সর্বোপরি প্রজাবর্গের প্রতি তাঁহার পিতৃতুল্য দায়িত্ববোধ তাঁহাকে ভারত-ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ নৃপতিদের অন্যতম হিসাবে শ্রদ্ধার আসন দান করিয়াছে। তিনি স্বৈরাচারে বিশ্বাসী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ক্ষমতা কখনও স্বেচ্ছাচারে পরিণত হয় নাই। তিনি ছিলেন প্রকৃত প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচারী (benevolent despot)। একমাত্র সম্রাট্ আকবর ভিন্ন অপর কোন মুসলমান শাসক জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে প্রজাবর্গের এইরূপ সর্ববিধ কল্যাণ সাধন করেন নাই। ঐতিহাসিক ডক্টর স্মিথ্ (Dr. Smith) বলেন যে, শের শাহ্ যদি আরও কিছুকাল বাঁচিয়া থাকিতেন তাহা হইলে মোগল সম্রাটদের আর অভ্যুত্থান ঘটিত না।*

প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচার (Benevolent despotism)

*"If Sher Shah had been spared he would have established his dynasty and the great Moghuls would not have appeard on the stage of history". Smith, *Oxford Hsitory of India*, p. 329.

অষ্টম অধ্যায়

মোগল-শ্রেষ্ঠ সম্রাট আকবর

(Akbar the Great Moghul)

আকবরের প্রথম জীবন (Early life of Akbar): শের শাহের হস্তে পরাজিত, হৃতসর্বস্ব সম্রাট হুমায়ুন যখন নিজ ভ্রাতৃবর্গ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া অবশেষে অমরকোটের রাণা প্রসাদের রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন তখন (১৫৪২) আকবরের জন্ম হয়। রাজ্যহারা, গৃহহারা পিতার চরম দুর্দশাকালে জন্মগ্রহণকারী এই শিশু-ই যে একদিন ভারত-সম্রাট্ আকবর হিসাবে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন একথা কোন ভবিষ্যৎদ্রষ্টার কল্পনায়ও সম্ভবত আসে নাই।

জন্ম (২৩ নভেম্বর, ১৫৪২)

হৃত সাম্রাজ্যের একাংশ—পাঞ্জাব, দিল্লী ও আগ্রা—পুনরুদ্ধার করিবার অব্যবহিত পরেই যখন হুমায়ুন মৃত্যুমুখে পতিত হন (১৫৫৬) তখন আকবরের বয়স তের বৎসর কয়েক মাস মাত্র। শিরহিন্দের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াই (১৫৫৫) হুমায়ুন পুত্র আকবরকে তাঁহার ভাবী উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন হুমায়ুন বালক আকবরকে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা-পদেও নিযুক্ত করিয়াছিলেন। হুমায়ুনের বিশ্বস্ত বন্ধু ও অনুচর বৈরাম খাঁ ছিলেন আকবরের অভিভাবক। হুমায়ুনের মৃত্যুকালে আকবর পাঞ্জাবে ছিলেন হুমায়ুনের মৃত্যু-সংবাদ পাওয়ামাত্র সুচতুর বৈরাম খাঁ কালবিলম্ব না করিয়া আকবরকে দিল্লীর সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করিলেন (১৪, ফেব্রুয়ারি, ১৫৫৬)। তের বৎসরের বালক আকবর স্বভাবতই শাসন-কার্যের দায়িত্ব গ্রহণের উপযুক্ত ছিলেন না। তাঁহার নাবালকত্বে তাঁহার পিতৃবন্ধু ও অভিভাবক বৈরাম খাঁ শাসনকার্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন।

আকবরের সিংহাসন লাভ (১৫৫৬, ১৪ই ফেব্রুয়ারি): বৈরাম খাঁর অভিভাবকত্ব

আকবরের সমস্যা (Akbar's Problems): হুমায়ুনের মৃত্যুকালে মোগল সাম্রাজ্য কেবলমাত্র পাঞ্জাব, দিল্লী ও আগ্রার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

হুমায়ুন তাঁহার উত্তরাধিকারীকে দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করিয়া যাইবার সুযোগ পান নাই। সেইজন্য হিন্দুস্তানের সম্রাটের প্রকৃত ক্ষমতা ও মর্যাদা লাভ করিতে তাঁহার পুত্র আকবরকে বহু যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। রাজ্যের চতুর্দিকে তখন বিরুদ্ধ শক্তির উত্থান ঘটিয়াছে। পশ্চিমদিকে কাবুল অঞ্চলে আকবরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মির্জা মোহম্মদ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। কাশ্মীর ও হিমালয় অঞ্চলের রাজ্যগুলি তখন নিজ নিজ স্বাধীন রাজার অধীনে ছিল। সিন্ধু ও মুলতান শের শাহের দুর্বল বংশধরদের আমলে স্বাধীন হইয়া গিয়াছিল। বাংলাদেশ ও গঙ্গা উপত্যকায় তখনও আফগান প্রাধান্য বজায় ছিল। মালব, গুজরাট, উড়িষ্যা প্রভৃতিও দিল্লীর প্রাধান্য অস্বীকার করিয়া স্বাধীন হইয়া উঠিয়াছিল।

হুমায়ুনের মৃত্যুকালে মোগল সাম্রাজ্যের অবস্থা

দক্ষিণ-ভারতে তখন খান্দেশ, বেরার, আহম্মদনগর, বিদর, গোলকুণ্ডা প্রভৃতি রাজ্য বিদ্যমান ছিল। পোর্তুগীজ বণিকগণ গোয়া ও দিউ নামক স্থানে নিজেদের প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি বিস্তারে ব্যগ্র। এদিকে শের শাহের বিশাল সাম্রাজ্যও তাঁহারই বংশধরগণের মধ্যে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল এবং তাঁহাদের মধ্যে আত্মকলহেরও অন্ত ছিল না। ইঁহাদের মধ্যে শের শাহের ভ্রাতুষ্পুত্র আদিল শাহ্-ই ছিলেন প্রধান। তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন হিমু। আগ্রার উপকণ্ঠ হইতে মালবদেশ ও জৌনপুর পর্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। আদিল শাহ্ চুণারে অবস্থান করিতেছিলেন। আর শের শাহের অপর ভ্রাতুষ্পুত্র সিকন্দর শূর পাঞ্জাব অঞ্চলে নিজ বাহুবলে একটি স্বতন্ত্র রাজ্য গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। শের শাহের উত্তরাধিকারিগণের দুর্বল শাসনের সুযোগে প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছিলেন। জনসাধারণকে শাসনের নামে শোষণ করিয়া তাঁহারা দেশের সর্বত্র এক দারুণ অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটাইয়াছিলেন। তদুপরি ঐ সময়ে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। ফলে জনসাধারণের দুর্দশার আর অন্ত ছিল না।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা

আদিল শাহ্ শূর ও মন্ত্রী হিমু

অর্থনৈতিক দুরবস্থা

পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ, ১৫৫৬ (Second Battle of Panipat): হুমায়ুনের আকস্মিক মৃত্যুর সুযোগ লইয়া আদিল শাহ্ শূরের হিন্দু মন্ত্রী হিমু মোগল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিবার জন্য অগ্রসর

হইলেন। তিনি অনায়াসে তর্দী বেগকে পরাজিত করিয়া দিল্লী ও আগ্রা দখল করিলেন। আকবরের অভিভাবক বৈরাম খাঁ তর্দী বেগকে আগ্রা ও দিল্লীর শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তর্দী বেগকে পরাজিত করিয়া হিমু আদিল শাহের অধীনতা অস্বীকার করিয়া 'রাজা বিক্রমজিৎ' উপাধি ধারণ করিলেন এবং স্বাধীনভাবে রাজত্ব শুরু করিলেন। কাজেই বৈরাম খাঁ ও আকবর হিমুর বিরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। পানিপথের প্রান্তরে আকবর ও হিমুর সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে হিমুর দক্ষিণ চক্ষু তীরবিদ্ধ হওয়ায় তিনি সংজ্ঞা হারাইলেন। তাঁহার সৈন্যবাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল এবং যুদ্ধে তাঁহার পরাজয় ঘটিল। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তিনি ধৃত হইলেন এবং বৈরাম খাঁর আদেশে নিহত হইলেন। কাহারও কাহারও মতে বৈরাম খাঁর নির্দেশে আকবর হিমুর শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন। কিন্তু এবিষয়ে মতদ্বৈধ রহিয়াছে। অনেকের মতে আকবর পরাজিত, আহত ও শৃঙ্খলিত শত্রু হিমুর শিরশ্ছেদ করিতে অস্বীকার করিলে বৈরাম খাঁ স্বয়ং হিমুকে হত্যা করেন।*

হিমু কর্তৃক দিল্লী ও আগ্রা অধিকার

পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে হিমুর পরাজয় (১৫৫৬)

পানিপথের প্রান্তরে ত্রিশ বৎসর পূর্বে আকবরের পিতামহ বাবর যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া মোগল সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন। আবার এই প্রান্তরেই যুদ্ধে জয়ী হইয়া আকবর মোগল সাম্রাজ্যের কেন্দ্র-স্থল দিল্লী ও আগ্রা পুনরুদ্ধার করিয়া মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ়ভাবে স্থাপন করিলেন। মোগল সাম্রাজ্যের ইতিহাসে পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ এক স্মরণীয় ঘটনা। এই যুদ্ধে জয়লাভের ফলে আফগানদের হিন্দুস্তানের প্রভুত্বলাভের আকাঙ্ক্ষা চিরতরে নির্বাপিত হইল। পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধের ফলেই মোগল সাম্রাজ্যের প্রকৃত ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল এবং মোগল সাম্রাজ্য বিস্তার শুরু হইয়াছিল বলা যাইতে পারে।

যুদ্ধের ফলাফল

পরবৎসর (১৫৫৭) সিকন্দর শূর আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। আকবর তাঁহাকে জায়গীর দান করিয়া তাঁহার প্রতি প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করিলেন

---

* "How can I strike a man who is as good as dead ?"—*Akbar*, Vide Lane-Poole, p. 241.

বটে, কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই সিকন্দর বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে তাঁহাকে জায়গীরচ্যুত করা হইল। তখন সিকন্দর আত্মরক্ষার্থ বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং এখানে অবস্থানকালেই তাঁহার মৃত্যু হইল। (১৫৫৯)। ইতিমধ্যে (১৫৫৬) আদিল শাহ্ শূরেরও মৃত্যু ঘটিয়াছিল। সুতরাং মোগল সাম্রাজ্যের বিরোধিতা করিতে আফগানদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আর কেহই রহিলেন না।

আফগান শক্তি বিধ্বস্ত

পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধের কয়েক বৎসরের মধ্যেই (১৫৫৮-৬০) গোয়ালিওর, আজমীর, জৌনপুর প্রভৃতি পুনরায় মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হইল। রণথম্ভোর নামক রাজপুতশক্তির অন্যতম কেন্দ্রটিও ঐ সময়ে আক্রমণ করা হইয়াছিল, কিন্তু উহা অধিকার করা সম্ভব হয় নাই।

গোয়ালিওর, আজমীর, জৌনপুর প্রভৃতি স্থান পুনরধিকার

বৈরাম খাঁ (Bairam Khan): পাঞ্জাবের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইবার সময় হইতেই বালক আকবর পিতৃবন্ধু বৈরাম খাঁর অভিভাবকত্বাধীনে ছিলেন। হুমায়ুনের মৃত্যুর পর বৈরাম খাঁর সাহায্যেই আকবর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। সিংহাসনে আরোহণের পরও চারি বৎসর (১৫৫৬-৬০) আকবর বৈরাম খাঁর অভিভাবকত্বাধীনে রহিলেন। পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে হিমুকে পরাজিত করিয়া দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিবার ব্যাপারেও আকবর ছিলেন বৈরাম খাঁর নিকট সম্পূর্ণ ঋণী। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আকবরের ব্যক্তিত্বও যে বিকাশলাভ করিতেছিল তাহা বৈরাম খাঁ বুঝিতে পারেন নাই। তিনি অভিভাবকরূপে শাসনক্ষমতা লাভ করিবার ফলে ক্রমেই ক্ষমতালিপ্সু হইয়া উঠিলেন। কিশোর আকবর তখন যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন মাত্র। বৈরাম খাঁর সর্বময় কর্তৃত্ব ক্রমেই তাঁহার নিকট অসহনীয় হইয়া উঠিল। আকবরের মাতা হামিদা বানু ও ধাত্রী মাহম্ অনগ বা অনখ এবং অপরাপর অনেকের প্ররোচনায় বৈরাম খাঁর প্রতি আকবরের বিতৃষ্ণা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে আকবর বৈরাম খাঁকে পদচ্যুত করিয়া স্বয়ং শাসনভার গ্রহণ করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। বৈরাম খাঁকে মক্কায় প্রেরণ করা স্থির হইল। পীর মোহম্মদ নামে জনৈক রাজকর্মচারীর উপর বৈরাম খাঁকে সাম্রাজ্যের সীমা পর্যন্ত

বৈরাম খাঁর সর্বময় কর্তৃত্ব

তাঁহার পদচ্যুতি (১৫৬০)

পৌঁছাইয়া দিবার ভার দেওয়া হইলে বৈরাম খাঁ বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। কারণ পীর মোহম্মদ ছিলেন বৈরামের ব্যক্তিগত শত্রু। ইহা ভিন্ন তিনি বৈরামের অধীনে নিম্নপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। আকবর বৈরাম খাঁকে সহজেই দমন করিলেন এবং তাঁহার পূর্ব কার্যাদির কথা স্মরণ করিয়া তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন ও মক্কা যাইবার অনুমতি দিলেন। অবশ্য বৈরাম খাঁ মক্কা পর্যন্ত পৌঁছিবার অবকাশ পাইলেন না। গুজরাটের পাটন নামক স্থানে এক গুপ্ত ঘাতকের হস্তে তাঁহার মৃত্যু হইল। বৈরাম খাঁকে পদচ্যুত করা এবং পীর মোহম্মদের উপর তাঁহাকে দেশ হইতে বহিষ্কারের ভার দেওয়া আকবরের পক্ষে কতদূর উচিত হইয়াছিল সেবিষয়ে মতদ্বৈধ রহিয়াছে। তবে একথা বলা যাইতে পারে যে, বৈরাম খাঁ প্রধানতঃ রাজপরিবারে তাঁহার বিরোধী দলের চক্রান্তেই ক্ষমতাচ্যুত হইয়াছিলেন।

আততায়ীর হস্তে মৃত্যু

আকবর বৈরাম খাঁর নিকট নানাবিষয়ে ঋণী ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু বৈরাম খাঁর ক্ষমতা-লিপ্সা ও সর্বময় কর্তৃত্বের অবসানেরও যে প্রয়োজন ছিল সেবিষয়ে আকবর উদাসীন না থাকিয়া দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন, বলা যাইতে পারে। ইহা ভিন্ন বৈরাম খাঁর প্রতি ব্যক্তিগত ব্যবহারের দিক দিয়া বিচার করিলে আকবর যে তাঁহার প্রতি যথেষ্ট উদারতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহাও স্বীকার করিতে হইবে।

বৈরাম খাঁর প্রতি আকবেরর ব্যবহার

বৈরাম খাঁর অধীনতামুক্ত হইলেও আকবর নিজ ধাত্রী মাহম্-অনগ ও তাঁহার পুত্র আদম খাঁ এবং অপরাপর আত্মীয়-পরিজনের প্রভাবাধীন অবস্থায় আরও দুই বৎসর কাটাইতে বাধ্য হইলেন। ক্রমে পীর মোহম্মদ ও আদম খাঁর ঔদ্ধত্য এমন বৃদ্ধি পাইল যে, ১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দে আকবর আদম খাঁকে হত্যা করিতে বাধ্য হইলেন। অল্পকালের মধ্যেই আদম খাঁর মাতা মাহম্ অনগর মৃত্যু হইলে আকবর শাসনকার্যের ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন। অবশ্য শাসনকার্যাদি সম্পূর্ণভাবে তাঁহার করায়ত্ত হইতে আরও দুই বৎসর লাগিল। এইভাবে অন্তঃপুরের প্রভাবমুক্ত হইয়া আকবর সাম্রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করিলেন।

অন্তঃপুরের প্রভাবাধীনে আকবর (১৫৬০-৬৪)

আকবরের সাম্রাজ্য বিস্তার (Expansion of Akbar's Empire): আকবর যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন মোগল

সাম্রাজ্য পাঞ্জাব, দিল্লী ও আগ্রার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এই স্বল্পপরিসর সাম্রাজ্য ঘোর সাম্রাজ্যবাদী আকবরের উচ্চাকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি সাধন করিতে পারিল না। সমগ্র হিন্দুস্তানের একচ্ছত্র সম্রাট হওয়া-ই ছিল আকবরের উদ্দেশ্য। তাঁহার নাবালকত্বে বৈরাম খাঁ মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ়ভাবে স্থাপন করিয়াছিলেন; কিন্তু রাজ্য বিস্তারের সুযোগ তখনও উপস্থিত হয় নাই। বৈরাম খাঁর পদচ্যুতির পর আকবরের সেনাপতি আদম খাঁ ও পীর মহম্মদ মালব রাজ্য জয় করেন (১৫৬১)। মালবের স্বাধীন শাসক বাজবাহাদুর পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। ফলে মালব দেশ মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই বাজবাহাদুর মালব পুনরধিকার করিতে সমর্থ হন। পরে অবশ্য বাজবাহাদুর আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিয়া তাঁহার সভাসদ্‌পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

মালব বিজয় (১৫৬১)

আকবর ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে শাসনকার্য সম্পূর্ণভাবে স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াই সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দে অসীরগড় নামক দুর্গটি জয় করা পর্যন্ত প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল ক্রমাগত তিনি মোগল সাম্রাজ্যের পরিসর বৃদ্ধি করিয়াই চলিয়াছিলেন। কৌটিল্য-নীতিতে বিশ্বাসী আকবর মনে করিতেন যে, 'রাজা মাত্রেরই প্রতিবেশী রাজ্যগুলি জয় করিতে সচেষ্ট থাকা প্রয়োজন, নতুবা তাঁহার নিজ রাজ্যই প্রতিবেশীরাজগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইবে।'*

আকবরের রাজ্যবিস্তার নীতি

১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে আকবর কারা প্রদেশের শাসনকর্তা আসফ খাঁকে গণ্ডোয়ানা জয় করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। সাম্রাজ্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা-ই ছিল এই যুদ্ধের একমাত্র যুক্তি। ডক্টর স্মিথ্‌ বলেন, গণ্ডোয়ানার স্বাধীনতা-ই ছিল উহার একমাত্র অপরাধ। গণ্ডোয়ানার রাজা বীরনারায়ণ ছিলেন নাবালক। রাণীমাতা দুর্গাবতী বীরনারায়ণের পক্ষে শাসনকার্য পরিচালনা করিতেছিলেন। মোগলবাহিনীর সহিত যুঝিবার মতো সামরিক বল না থাকিলেও তাঁহার মনোবলের অভাব

গণ্ডোয়ানা অধিকার (১৫৬৪)

* "A monarch should be ever intent on conquest, otherwise his neighbours rise in arms against him. The army should be exercised in warfare, lest from want of training they become self-indulgent."—*Akbar*, vide Smith's *Oxford History of India*, p. 347 : *An Advanced History of India*, p. 448.

ছিল না। ভারতীয় বীরাঙ্গনাদের মধ্যে রাণী দুর্গাবতী অন্যতমা। দেশের স্বাধীনতা বিসর্জন দেওয়া অপেক্ষা যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জনই শ্রেয়ঃ মনে করিয়া তিনি আসফ্ খাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। যুদ্ধে জয়লাভের আশা যখন আর রহিল না তখন তিনি আত্মহত্যা করিয়া শত্রুর কবলে পড়িবার অপমান এড়াইলেন।* বালকপুত্র বীরনারায়ণ বীরের ন্যায়ই যুদ্ধে প্রাণবিসর্জন দিয়া নিজ নামের সার্থকতা প্রমাণ করিলেন। গণ্ডোয়ানা রাজ্যের একাংশ মোগল শাসনাধীনে স্থাপিত হইল, আর অপরাংশ তথাকার রাজপরিবারেরই জনৈক উত্তরাধিকারীর হস্তে মোগল সাম্রাজ্যাধীনে রাখা হইল।

রাণী দুর্গাবতী ও বীরনারায়ণ

এই সময়ে মালবের শাসনকর্তা আব্দুল্লা খাঁ উজবেগ্ ও জৌনপুরের শাসনকর্তা খান জামান বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। তাঁহাদের অনুকরণে আকবরের ভ্রাতা মির্জা হাকিমও নিজেকে হিন্দুস্তানের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন। আকবর একে একে এই তিনটি বিদ্রোহই সম্পূর্ণভাবে দমন করিয়া বিদ্রোহীদের উপযুক্ত শাস্তিবিধান করিলেন।

আব্দুল্লা খাঁ, খান জামান ও মির্জা হাকিমের বিদ্রোহ

১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে বাবরের হস্তে খানুয়ার যুদ্ধে পরাজয়ের পরও রাজপুতশক্তি সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হয় নাই। আকবর এই শৌর্যশালী রাজপুতজাতিকে স্ববশে আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মোগল সাম্রাজ্যকে দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করিতে এবং সাম্রাজ্যের সীমা বিস্তার ও নিরাপত্তা বিধানে রাজপুতজাতির সৌহার্দ্যের মূল্য উপলব্ধি করিবার মতো দূরদর্শিতা সম্রাট আকবরের ছিল। ইহা ভিন্ন রাজপুতানার মধ্য দিয়াই উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষের সহিত ভারতের অপরাপর অংশের বাণিজ্যপথ ছিল। তিনি এই সকল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে প্রথম হইতেই রাজপুতজাতির প্রতি সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার করিতে ত্রুটি করিলেন না। ১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দে অম্বরের (জয়পুর) বিহারীমল্ল আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন তিনি আকবরের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিয়া মোগলদের সহিত আত্মীয়তাসূত্রে

অম্বরের বিহারীমল্ল কর্তৃক আকবরের বশ্যতা স্বীকার (১৫৬২)

* "Choosing death rather than dishonour, she stabbed herself to the heart so that 'her end was as noble and devoted as her life had been useful.'" Vide Smith : *Akbar the Great Mogul*, p. 51.

আবদ্ধ হইয়াছিলেন। বিহারীমল্ল, তাঁহার পুত্র ভগবান দাস ও পৌত্র মানসিংহ আকবরের সেনাবাহিনীতে উচ্চ কর্মচারিপদ গ্রহণ করিয়া মোগল সাম্রাজ্য বিস্তারে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। একদিন রাজপুত শক্তির নেতা ও প্রতীকস্বরূপ মেবারের রাণা সংগ্রাম সিংহ আকবরের পিতামহ বাবরের বিরুদ্ধে ভারতের প্রভুত্বলাভের আশায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু আকবরের রাজত্বকালে মেবারের সেই শক্তি ও মর্যাদাবোধ আর ছিল না। সংগ্রাম সিংহের পুত্র রাণা উদয় সিংহ যেমন ছিলেন দুর্বলচেতা তেমনি অকর্মণ্য। অবশ্য বিহারীমল্লের ন্যায় তিনি আকবরের বশ্যতা স্বীকারে বা তাঁহার নিকট নিজকন্যা সম্প্রদানে রাজী হইলেন না। ১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দে আকবর চিতোর অবরোধ করিলে রাণা উদয় সিংহ পলায়ন করিলেন এবং পার্বত্য অঞ্চলে আত্মগোপন করিলেন। কিন্তু রাজপুত বীর জয়মল্ল ও পত্ত অসামান্য বীরত্ব সহকারে মোগলবাহিনীর সহিত শেষ পর্যন্ত যুঝিয়া প্রাণ হারাইলেন। রাজপুত সৈনিকগণও দেশের স্বাধীনতার জন্য একে একে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিলেন। যুদ্ধে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী দেখিয়া রাজপুত রমণীগণ 'জৌহর ব্রত' অবলম্বন করিয়া জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ বিসর্জন দিলেন। আকবর যুদ্ধে জয়ী হইলেন এবং চিতোর মোগলবাহিনী কর্তৃক সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হইল।

চিতোর আক্রমণ : জয়মল্ল ও পত্তের বীরত্ব

চিতোরের পতন অপরাপর রাজপুত রাজগণের মধ্যে দারুণ ভীতির সঞ্চার করিল। তাঁহাদের অনেকেই আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিয়া তাঁহার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইলেন। রণথম্ভোর, বিকানীর, কালিঞ্জর, জয়সল্মীর প্রভৃতি একে একে আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিল। কিন্তু মেবার রাজ্যের রাজধানী চিতোর বিধ্বস্ত হইলেও মেবার আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিল না। ইতিমধ্যে উদয় সিংহের মৃত্যুর পর (১৫৭২) তাঁহার পুত্র রাণা প্রতাপ মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। রাজপুত বীরত্বের ইতিহাসে রাণা প্রতাপের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর রাণা প্রতাপ সর্বপ্রকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়া এবং বিপদ ও মৃত্যুকে উপেক্ষা করিয়া স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থে মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে যুঝিয়া চলিলেন। যে মাতৃভূমি

রণথম্ভোর, বিকানীর, কালিঞ্জর, জয়সল্মীর প্রভৃতির বশ্যতা স্বীকার

তিনি পান করিয়াছেন তাহার মর্যাদা রক্ষা করিবেন এই শপথ তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন।* ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে মানসিংহ ও আসফ্ খাঁ প্রতাপ সিংহকে আক্রমণ করিবার জন্য প্রেরিত হইলেন। হল্‌দিঘাট-এ উভয় পক্ষের মধ্যে এক তুমুল যুদ্ধ বাধিল। কিন্তু অমিতবিক্রমে যুদ্ধ করিয়াও রাণা প্রতাপ শেষ পর্যন্ত মোগলবাহিনীর হস্তে পরাজিত হইলেন। প্রতাপ তাঁহার এক বিশ্বস্ত অনুচরের সাহায্যে কোনপ্রকারে প্রাণ রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন এবং পর্বতারণ্যে আত্মগোপন করিলেন। কিন্তু তাঁহার স্বাধীনতাস্পৃহা তখনও নির্বাপিত হইল না। মোগলবাহিনী একে একে মেবারের দুর্গগুলি অধিকার করিয়া লইল। দুঃখ-দুর্দশা ও দারিদ্র্যের চরমে পৌঁছিয়াও রাণা প্রতাপ মুহূর্তের জন্যও আত্মসমর্পণের কথা কল্পনায়ও আনিলেন না। আশ্রয়হীনভাবে পর্বতারণ্যের একস্থান হইতে অন্য স্থানে মোগল সেনা কর্তৃক পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াও তিনি নিজরাজ্য পুনরুদ্ধারের আশা ত্যাগ করিলেন না। মৃত্যুর (১৫৯৭) পূর্বে তিনি মোগলদের হাত হইতে কয়েকটি দুর্গ পুনরধিকার করিয়া তিনি যে মাতৃস্তন্য বৃথা পান করেন নাই সেই প্রমাণ দিয়াছিলেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে প্রতাপ রাজপুত দলপতিদের নিকট হইতে দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জনের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়া মেবারের স্বাধীনতা রক্ষার শেষ ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। রাণা প্রতাপের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রাণা অমর সিংহের বিরুদ্ধে মানসিংহ মোগলবাহিনীসহ অভিযানে অগ্রসর হইলেন। যুদ্ধে অমর সিংহ পরাজিত হইলেন (১৫৯৯)। কিন্তু ইহাতেও সমগ্র মেবার মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করা সম্ভব হইল না। এই যুদ্ধের পর আকবর মেবারের বিরুদ্ধে আর কোন অভিযান প্রেরণ করেন নাই।

রাণা প্রতাপ : হল্‌দিঘাট-এর যুদ্ধ (১৫৭৬)

রাণা প্রতাপের মৃত্যু (১৫৯৭)

রাণা অমর সিংহের পরাজয়

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ১৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দে চিতোরের পতনের সঙ্গে সঙ্গে

---

* "The magnitude of the peril confirmed the fortitude of Pratap who vowed in the words of the bard to make his Mother's milk resplendent and he amply redeemed his pledge." Vide, *An Advanced History of India*, p. 450.

কালিঞ্জর ও রণথম্ভোর মোগল সম্রাট আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। ইহার পর মোগলবাহিনী গুজরাট জয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। গুজরাট উপকূলের সমৃদ্ধ বন্দরগুলির অর্থনৈতিক গুরুত্ব আকবরের গুজরাট জয়ের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি করিয়াছিল। গুজরাটের সুলতান তৃতীয় মুজফ্‌ফর শাহ্‌ অতি অকর্মণ্য শাসক ছিলেন। দেশে প্রকৃত শাসন বা শৃঙ্খলা বলিয়া কিছুই ছিল না। এমতাবস্থায় মুজফ্‌ফর শাহের বিরোধী পক্ষের নেতা ইত্তিমাদ খাঁ আকবরের সহায়তা প্রার্থনা করিলেন। ফলে, আকবরের গুজরাট জয়ের সুযোগ স্বভাবতই বৃদ্ধি পাইল। ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে আকবর স্বয়ং গুজরাট জয়ে অগ্রসর হইলেন। যুদ্ধে তৃতীয় মুজফ্‌ফর শাহ্‌ অতি সহজেই পরাজিত হইলেন এবং গুজরাট মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হইল।

গুজরাট জয় (১৫৭২)

গুজরাট জয় করিয়া আকবর সুরাট অধিকার করিলেন (১৫৭৩)। ঐ সময়ে পোর্তুগীজগণ আকবরের বন্ধুত্ব অর্জন করিল এবং তাহারা মক্কা যাত্রীদের পথের নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করিল। ইহার পর আকবর দিল্লীতে ফিরিয়া আসিলে গুজরাটে এক বিদ্রোহ দেখা দিল। আকবর দ্রুত এই বিদ্রোহ দমন করিয়া গুজরাটে নিজ প্রভুত্ব পুনঃস্থাপন করিলেন। ডক্টর স্মিথের মতে গুজরাট জয় আকবরের রাজত্বকালের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। গুজরাটের সম্পদ, গুজরাটের সমৃদ্ধ বন্দর প্রভৃতি আকবরের সাম্রাজ্যাধীন হওয়ায় অর্থনৈতিক দিক দিয়া গুজরাট জয় এক যুগান্তর আনিয়াছিল। ইহা ভিন্ন ইওরোপীয় বণিকদের সহিতও মোগল সাম্রাজ্যের যোগাযোগ ঘটিয়াছিল। কিন্তু গুজরাট জয়ের ফলে যে নৌ-শক্তি গঠনের সুযোগ আকবরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল তাহা তিনি বা তাঁহার উত্তরাধিকারিবর্গের কেহই গ্রহণ না করিয়া যে অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহার ফলেই নৌ-শক্তিতে বলীয়ান ইওরোপীয় জাতি ভারতবর্ষে প্রাধান্য বিস্তারের সুযোগ লাভ করিয়াছিল।

সুরাট জয় (১৫৭৩), পোর্তুগীজদের মিত্রতা লাভ

গুজরাট জয়ের গুরুত্ব

গুজরাট জয়ের পর আকবর বাংলাদেশ জয় করিতে অগ্রসর হন। বাংলা-দেশে তখন সুলেমান কর্‌রানী নামে জনৈক আফগান সর্দার রাজত্ব করিতেন। সুলেমান কর্‌রানী উড়িষ্যারাজ্যও জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি

আকবরের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া তাঁহার নিকট উপযুক্ত উপঢৌকন প্রেরণ করেন। কিন্তু সুলেমানের পুত্র দাউদ রাজা হইয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং নিজ নামে মুদ্রা প্রচলিত করেন। এমন কি তিনি গুজরাটে আকবরের যুদ্ধ-ব্যস্ততার সুযোগ লইয়া মোগল সাম্রাজ্যের পূর্ব সীমান্তবর্তী জমানিয়া দুর্গটি অধিকার করিয়া লইলেন। ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দে আকবর দাউদের বিরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। দাউদকে পাটনা ও হাজীপুর হইতে সহজেই বিতাড়িত করিয়া আকবর দিল্লী প্রত্যাবর্তন করিলেন। মনিম খাঁ ও রাজা টোডরমল্লের সেনাপতিত্বে মোগলবাহিনী একে একে মুঙ্গের, তেলিয়াগড়ী, কোলকঙ্গ বা কোলগাঁ, ভাগলপুর প্রভৃতি স্থান অধিকার করিল। দাউদ উড়িষ্যায় পলায়ন করিলেন। কিন্তু বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত তুকারই নামক স্থানে তিনি মোগলবাহিনীর হস্তে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইয়া মোগল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিলেন কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যে তিনি আবার বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে রাজমহলের নিকট আর এক যুদ্ধে (১৫৭৬) মোগলবাহিনীর হস্তে পরাজিত ও নিহত হইলেন। ফলে বাংলাদেশ আকবরের সাম্রাজ্যভুক্ত হইল।

বাংলাদেশ (১৫৭৪-৭৬) ও উড়িষ্যা বিজয় (১৫৯২)

এইভাবে বাংলাদেশ মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হইলেও ঢাকা ও ময়মনসিংহের ঈশা খাঁ, যশোরের প্রতাপ রায় বা প্রতাপাদিত্য, বিক্রমপুরের কেদার রায় প্রভৃতি স্থানীয় প্রভাবশালী জমিদারগণ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়া চলিলেন।* উড়িষ্যা আরও কিছুকাল একপ্রকার স্বতন্ত্রভাবে থাকিয়া ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হইল।

ঈশা খাঁ, প্রতাপাদিত্য, কেদার রায় প্রভৃতি

আকবরের ধর্ম নৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের (১৫৭৮-৮০) ফলে বাংলাদেশ ও জৌনপুরে বিদ্রোহ দেখা দিল। দেওয়ান শাহ্ মনসুর সম্রাট আকবরের আদেশে সাম্রাজ্যের সর্বত্র বে-আইনিভাবে দখলীকৃত সরকারী ভুমির পুনরুদ্ধারকল্পে তদন্ত শুরু করিলেন। ফলে, বাংলাদেশের মোট রাজস্বের পরিমাণ এক-চতুর্থাংশ এবং বিহারের রাজস্বের এক-পঞ্চমাংশ বৃদ্ধি

* কেদার রায়, ঈশা খাঁ, প্রতাপাদিত্য বা প্রতাপ রায় প্রভৃতি ঐ সময়কার বারোজন স্থানীয় জমিদার 'বারো ভুঁইয়া' নামে পরিচিত।

পাইল। বাংলার শাসনকর্তা মুজফ্‌ফর খাঁ ইহাতে অসন্তুষ্ট হইলেন। বাংলাদেশে নিযুক্ত সেনাবাহিনীর ভাতা শতকরা পঞ্চাশ ভাগ এবং বিহারের সৈনিকদের ভাতা মাত্র ত্রিশ ভাগ বৃদ্ধি করায় বিহারের সেনাবাহিনীর মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হইল। ইহা ভিন্ন আকবরের 'সুলহ্‌-ই-কুল' (*Sulh-i-kul*) বা সকল ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধা ও সহিষ্ণুতার নীতি গোঁড়া মুসলমানদের একাংশের মনঃপূত হইল না। ফলে, জৌনপুরের কাজী আকবরের এইরূপ নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা ইস্‌লাম ধর্মাবলম্বীমাত্রেরই উচিত বলিয়া এক ফতোয়া জারী করিলেন।

আকবরের ধর্মনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের ফলে বাংলা ও জৌনপুরে বিদ্রোহ (১৫৮০-৮৪)

বাংলাদেশ ও জৌনপুরের বিদ্রোহিগণ আকবরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কাবুলের শাসনকর্তা মির্‌জা মোহম্মদ হাকিমের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিতেছিল। বাংলা ও জৌনপুরে বিদ্রোহ দেখা দিলে মির্‌জা মোহম্মদও বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। টোডরমল, আজিজ কোকা এবং শাহ্‌বাজ খাঁ বাংলাদেশ ও জৌনপুরের বিদ্রোহ দৃঢ়হস্তে দমন করিলেন। আকবর স্বয়ং মির্‌জা মোহম্মদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। এদিকে মির্‌জা মোহম্মদ সসৈন্যে লাহোর পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন এবং লাহোরে মানসিংহ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হইয়া কাবুলে ফিরিয়া গেলেন। আকবর কাবুলের দিকে অগ্রসর হইলে মির্‌জা মোহম্মদ পর্বতারণ্যে আত্মগোপন করিলেন। কাবুল পুনরায় আকবরের সাম্রাজ্যভুক্ত হইল। মির্‌জা মোহম্মদ আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিলে পুনরায় তাঁহাকে কাবুলের শাসনভার দেওয়া হইল। ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে কাবুল সম্পূর্ণভাবে মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হইল।

কাবুলে আকবরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মির্‌জা মোহম্মদের বিদ্রোহ

কাবুলের মোগল সাম্রাজ্যভুক্তি

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত চিরকালই ভারতবর্ষের শাসকদের এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। ঐ পথেই বারবার মোঙ্গল আক্রমণকারিগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছে। বলবনের আমল হইতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত রক্ষার নীতি দিল্লী সুলতানদের শাসন-ব্যবস্থার মূলনীতির অন্যতম হিসাবে পরিগণিত ছিল। আকবর কর্তৃক কাবুল মোগল সাম্রাজ্যের অংশরূপে অধিকৃত হইলে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নীতি

রক্ষার প্রয়োজন স্বভাবতই বৃদ্ধি পাইল। রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থ-নৈতিক গুরুত্বের দিক দিয়া উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত রক্ষার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কিন্তু কাশ্মীরের পশ্চিম সীমা হইতে আরম্ভ করিয়া সিন্ধুদেশের উপকূল রেখা পর্যন্ত দীর্ঘ বারোশত মাইল বিস্তৃত সীমার নিরাপত্তা বিধান করা সহজসাধ্য ছিল না। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের দুর্ধর্ষ আফগান জাতিকে দমন করিতে পারিলেই উহার নিরাপত্তা বিধান করা সম্ভব ছিল। আকবর উজবেগ্ দলপতি আবদুল্লা খাঁর আনুগত্য লাভে এবং ইয়ুসুফ্জাই ও রোশ্নিয়া প্রভৃতি আফগান উপদল-গুলিকে দমন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

আফগান উপদলগুলির দমন

১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে আকবর বিহারীমল্লের পুত্র ভগবান দাস ও কাসিম খাঁকে কাশ্মীর রাজ্য জয় করিতে প্রেরণ করিলেন। কাশ্মীরের সুলতান ইয়ুসুফ্ শাহ্ ও তাঁহার পুত্র ইয়াকুবকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া ভগবান দাস ও কাসিম খাঁ কাশ্মীর মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করিলেন।

কাশ্মীর জয় (১৫৮৬)

১৫৯০-৯১ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধু এবং ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দে বেলুচিস্তান মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। কান্দাহার অবশ্য বিনা যুদ্ধেই আকবরের অধীনতা স্বীকার করে। এইভাবে ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই আকবরের সাম্রাজ্য ব্রহ্মপুত্র হইতে হিন্দুকুশ এবং হিমালয় হইতে নর্মদা পর্যন্ত বিস্তারলাভ করে।

সিন্ধু (১৫৯০-৯১), বেলুচিস্তান (১৫৯৫) জয় : কান্দাহারের মোগল-সাম্রাজ্যভুক্তি (১৫৯৫)

উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের একচ্ছত্র অধিপতি হইয়া আকবর দাক্ষিণাত্য বিজয়ে অগ্রসর হইলেন। ঐ সময়ে দাক্ষিণাত্যে বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, আহ্মদনগর, বিদর ও খান্দেশ, এই কয়টি মুসলমান সুলতানি রাজ্য ছিল। এগুলির মধ্যে মোগল সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি এবং নিরাপত্তার দিক দিয়া খান্দেশ জয় করা একান্ত প্রয়োজন ছিল। খান্দেশের অসীরগড় দুর্গটি ছিল দাক্ষিণাত্যের প্রবেশপথে অবস্থিত। ১৫৯১ খ্রীষ্টাব্দে আকবর খান্দেশ, আহ্মদনগর, বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা—এই চারিটি রাজ্যে পৃথক পৃথক দূত প্রেরণ করিয়া তাহাদের আনুগত্য-লাভের চেষ্টা করিলেন। আকবরের দাক্ষিণাত্য বিজয়ের ইচ্ছার পশ্চাতে এক অখণ্ড ভারত-সাম্রাজ্য স্থাপন এবং দাক্ষিণাত্যে পোর্তুগীজ শক্তি

দাক্ষিণাত্য বিজয়

দমনের উদ্দেশ্য ছিল। যাহা হউক, তাঁহার প্রেরিত দূতগণ বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিল। একমাত্র খান্দেশের সুলতান আলি খাঁ ভিন্ন দাক্ষিণাত্যের অপর কোন সুলতান বিনা যুদ্ধে মোগল সম্রাটের বশ্যতা মানিয়া লইতে স্বীকৃত হইলেন না। কিন্তু দেশরক্ষার ইচ্ছা থাকিলেও দাক্ষিণাত্যের সুলতানদের শক্তি বা সামর্থ্য কিছুই ছিল না। দীর্ঘকাল আত্মকলহে লিপ্ত থাকায় তাঁহারা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। আকবর কূটনীতির দ্বারা দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলি মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করিতে অকৃতকার্য হইয়া দ্বিতীয় পুত্র মুরাদ ও আব্দুর্ রহিমের নেতৃত্বে আহ্‌ম্মদনগরের বিরুদ্ধে এক সামরিক অভিযান প্রেরণ করিলেন। মোগল সৈন্য ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দে আহ্‌ম্মদনগর অবরোধ করিল। আহ্‌ম্মদনগরের সুলতানের নাবালকত্বে বিজাপুরের বিধবা রাণী ও আহ্‌ম্মদনগরের সুলতানের পিতৃস্বসা (পিসি) চাঁদবিবি আহ্‌ম্মদনগরের শাসনকার্য পরিচালনা করিতেছিলেন। চাঁদবিবি ছিলেন কূটনীতি ও রণনীতিতে অসামান্য প্রতিভার অধিকারিণী। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মোগলদের সহিত চাঁদবিবির সন্ধি স্থাপিত হইল। এই সন্ধির শর্তানুসারে বেরার মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হইল এবং আহ্‌ম্মদনগর আকবরের আনুগত্য স্বীকার করিল। ইহার কিছুকাল পরে আহ্‌ম্মদনগরের স্বার্থান্বেষী অভিজাত সম্প্রদায়ের চক্রান্তে চাঁদবিবি ক্ষমতাচ্যুত হইলেন। চাঁদবিবির সতর্কবাণী উপেক্ষা করিয়া তাঁহারা আকবরের সহিত স্বাক্ষরিত চুক্তি ভঙ্গ করিলেন। তাঁহারা বিজাপুর হইতে সামরিক সাহায্য গ্রহণ করিয়া বেরার হইতে মোগল প্রভুত্ব দূর করিতে চাহিলেন। শীঘ্রই তাঁহাদের চক্রান্তে চাঁদবিবি নিহত হইলেন। ফলে, আহ্‌ম্মদনগরের দুর্বলতা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল। ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে আহ্‌ম্মদনগর মোগলবাহিনী কর্তৃক বিধ্বস্ত হইল এবং আহ্‌ম্মদনগরের একাংশ মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হইল।

খান্দেশ ভিন্ন অপরাপর রাজ্য আকবরের বশ্যতা স্বীকারে অস্বীকৃত

আহ্‌ম্মদনগর অবরোধ—চাঁদবিবির কৃতিত্ব

আহ্‌ম্মদনগরের বশ্যতা স্বীকার

আহ্‌ম্মদনগর কর্তৃক চুক্তি-ভঙ্গ

আহ্‌ম্মদনগরের একাংশ মোগল সাম্রাজ্যভুক্তি (১৬০০)

ইতিমধ্যে খান্দেশের নূতন সুলতান বাহাদুর শাহ্‌ মোগল আধিপত্যে অতিষ্ঠ হইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। তিনি তাঁহার সুরক্ষিত অসীরগড় দুর্গ হইতে আকবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবেন স্থির করিয়া সেই দুর্গে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অসীরগড়ের

খান্দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা

ন্যায় সুরক্ষিত দুর্গ তখন ভারতবর্ষে খুব বেশি ছিল না। আকবর স্বয়ং সসৈন্যে খান্দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। প্রথমেই তিনি খান্দেশের রাজধানী বুরহানপুর অধিকার করিলেন এবং তারপর অসীরগড় দুর্গটি অবরোধ করিলেন। কিন্তু এই দুর্গটি জয় করা সহজসাধ্য নহে দেখিয়া আকবর বাহাদুর শাহ্‌কে সন্ধি স্থাপনের জন্য আহ্বান জানাইলেন। নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়া আকবর তাঁহাকে নিজ শিবিরে আনিতে সক্ষম হইলেন, কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া তিনি তাঁহাকে বন্দী করিলেন। এমন কি তাঁহাকে নিজ সামরিক কর্মচারীদের নিকট যুদ্ধ ত্যাগ করিবার নির্দেশসম্বলিত এক পত্র লিখিতেও বাধ্য করা হইল। কিন্তু ইহাতেও কোন ফল হইল না দেখিয়া আকবর অবশেষে খান্দেশের রাজকর্মচারীদিগকে প্রভূত পরিমাণ উৎকোচদানে বশীভূত করিয়া অসীরগড় দুর্গ জয় করিতে সমর্থ হইলেন। আহ্‌মদনগরের বিজিত অংশ, বেরার ও খান্দেশকে তিনটি সুবায় সংগঠিত করিয়া যুবরাজ দানিয়ালের অধীনে স্থাপন করা হইল। ইহাতে আকবরের সাম্রাজ্য দক্ষিণে কৃষ্ণানদী পর্যন্ত বিস্তারলাভ করিল। এদিকে পিতার অনুপস্থিতিতে যুবরাজ সেলিম পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু আকবর দিল্লী ফিরিয়া আসিয়া শীঘ্রই পুত্রকে স্ববশে আনিতে সক্ষম হইলেন।

অসীরগড় দুর্গজয় (১৬০১)

সেলিমের বিদ্রোহ দমন

আকবরের শাসনব্যবস্থা (Akbar's Administration): হিমালয় হইতে কৃষ্ণানদী এবং হিন্দুকুশ হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট আকবর কেবলমাত্র সমরবিজয়ী নেতা হিসাবেই নিজ পরিচয় রাখিয়া যান নাই, এই বিশাল সাম্রাজ্যে সুষ্ঠু ও সুদক্ষ শাসনের জন্য তিনি এক অতি উৎকৃষ্ট শাসন-প্রণালী প্রবর্তন করিয়া নিজ অসামান্য প্রতিভার পরিচয়ও দিয়াছিলেন। তাঁহার শাসনব্যবস্থায় কোন কোন বিষয়ে শের শাহের শাসনপদ্ধতির অনুকরণ পরিলক্ষিত হইলেও তিনি নিজ প্রতিভাবলে ভারতীয় এবং আরবীয়-পারসিক (Perso-Arabic) শাসনপদ্ধতির এক অপূর্ব সমন্বয় সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই শাসনব্যবস্থার মূল উদ্ভাবক তিনি ছিলেন না, একথা সত্য, কিন্তু ভারতীয় ও বৈদেশিক শাসনব্যবস্থার সংমিশ্রণে এক অতি সুদক্ষ শাসনব্যবস্থা গড়িয়া

ভারতীয় ও বৈদেশিক শাসনপদ্ধতির অভূতপূর্ব সমন্বয়

আকবরের সাম্রাজ্য
(১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দ)
০ ২০০ ৪০০
মাইল
কাবুল
পেশোয়ার
শ্রীনগর
লাহোর
মুলতান
পানিপথ
দিল্লী
আগ্রা
কনৌজ
লক্ষ্ণৌ
আজমীর
এলাহাবাদ
কাশী
পাটনা
গৌড়
উজ্জয়িনী
অসীরগড়
বুরহানপুর
আহম্মদনগর
নর্মদা নং
মহানদী
গোদাবরী নং
আ র ব
সা গ র
ব ঙ্গো প সা গ র
১ কাবুল
২ লাহোর
৩ মুলতান
৪ দিল্লী
৫ আগ্রা
৬ অযোধ্যা
৭ এলাহাবাদ
৮ আজমীর
৯ গুজরাট
১০ মালব
১১ বিহার
১২ বঙ্গদেশ
১৩ খান্দেশ
১৪ বেরার
১৫ আহম্মদনগর
১৬ উড়িষ্যা
১৭ কাশ্মীর
১৮ সিন্ধু
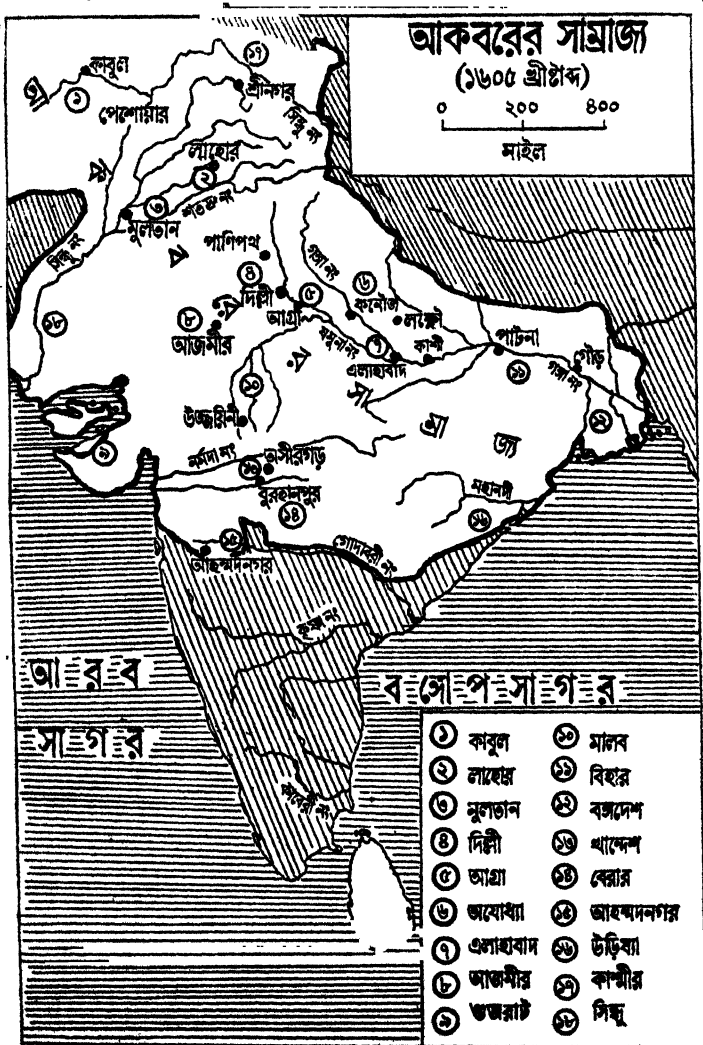
তুলিবার জন্য যে অসামান্য প্রতিভার প্রয়োজন আকবরের তাহা ছিল। আকবরের শাসনপদ্ধতি সমসাময়িক ও পরবর্তী কালের দেশীয় ও বিদেশীয় ঐতিহাসিকদের ভূয়সী প্রশংসা লাভ করিয়াছে। পরবর্তী কালে তাঁহার শাসননীতি ইংরেজ শাসকগণও আংশিকভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। আকবরের শাসনব্যবস্থা জনগণের সমর্থনের উপর নির্ভরশীল ছিল; কারণ উদারতা, ধর্মসহিষ্ণুতা ও প্রজার মঙ্গলসাধনই ছিল এই শাসনব্যবস্থার মূলনীতি। প্রচলিত রীতি-নীতি, গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন প্রভৃতি চিরাচরিত প্রথার সব কিছুই আকবরের শাসনব্যবস্থায় স্বীকৃত ছিল।

আকবরের শাসন-ব্যবস্থার মূলনীতি

শাসনব্যবস্থার সর্বোচ্চে ছিলেন সম্রাট স্বয়ং। আইনতঃ তিনি সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। সম্রাটের আদেশ আইনের ন্যায়ই বলবৎ ছিল। তিনি ছিলেন সর্বোচ্চ বিচারপতি ও সর্বপ্রধান সেনাপতি। কিন্তু কার্যত উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের পরামর্শ ও স্বীয় প্রজাহিতৈষণা তাঁহার শাসন-কার্যাদি নিয়ন্ত্রণ করিত। আকবর স্বৈরাচারী শাসক ছিলেন, কিন্তু তিনি নিজ ক্ষমতাকে দায়িত্বজ্ঞানহীন স্বেচ্ছাচারিতায় পর্যবসিত করেন নাই। মোগল তথা মুসলমান যুগে সর্বোচ্চ শাসকের ব্যক্তিগত চরিত্র ও মানসিক উৎকর্ষ-অপকর্ষের প্রভাব সমগ্র শাসনব্যবস্থায় প্রতিফলিত হইত। স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা মাত্রেই একথার সত্যতা পরিলক্ষিত হয়। আকবরের চরিত্রের স্বাভাবিক উদারতা সর্বধর্মের প্রতি তাঁহার চরম সহিষ্ণুতা, প্রজাবর্গের প্রতি জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সম-ব্যবহারের নীতি তাঁহার শাসনব্যবস্থায় প্রতিফলিত হইয়াছিল। উলেমাদের প্রভাবমুক্ত ধর্ম-নিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থায় স্থাপন করিয়া আকবর প্রকৃত ভারত সম্রাটের মর্যাদা লাভ করিয়াছিলেন। আকবরের অসাধারণ ব্যক্তিত্বই ছিল তাঁহার শাসনব্যবস্থার দক্ষতা, সংস্কার-নীতি প্রভৃতি সব কিছুর উৎসস্বরূপ।

সম্রাটের ক্ষমতা

(১) 'ওয়াজীর' বা 'দেওয়ান' ছিলেন রাজকর্মচারিবর্গের সর্বপ্রধান। রাজস্ব আয়-ব্যয়-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যভার দেওয়ানের উপর ন্যস্ত ছিল। রাজস্ব বিভাগ ভিন্ন আকবরের শাসনব্যবস্থায় আরও বহু বিভাগ ছিল। (২) 'মীর বক্শী' ছিলেন সামরিক বিভাগের বেতন-বণ্টন ও হিসাবপত্রের ভারপ্রাপ্ত

দেওয়ান,

মীর বক্শী,

সর্বোচ্চ কর্মচারী। সৈনিক সংগ্রহের এবং মনসব্দার প্রভৃতি কর্মচারিবর্গের তালিকা রক্ষা করাও তাঁহার দায়িত্ব ছিল। (৩) 'খান্-ই-সামান' ছিলেন সম্রাটের গৃহপরিচালনার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। (৪) 'কাজী-উল-কাজাৎ' বা প্রধান কাজী ছিলেন সম্রাটের অধীনে সর্বোচ্চ বিচারপতি। (৫) 'সদ্র-ই-সুদুর' নামক কর্মচারী ধর্ম এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠান ও সরকারী দান বিভাগের অধিকর্তা ছিলেন। (৬) 'মুহ্‌তসিব' জনসাধারণের মধ্যে নৈতিকতা ও ধর্মভাবের প্রসার সাধন করিতেন। ইস্‌লাম ধর্মপ্রবর্তক হজরত মোহম্মদ প্রচারিত ধর্মনীতি যাহাতে কোন ইস্‌লাম ধর্মাবলম্বী কর্তৃক অবহেলিত না হয় ইনি সে বিষয়ে নজর রাখিতেন। (৭) এই সকল প্রধান কর্মচারী ভিন্ন 'দারোগা-ই-তোপখানা', 'দারোগা-ই-ডাকচৌকি', মুস্তাফী, মীর বাহ্‌রি, ওয়াক্-ই-নবীশ, মীর আর্‌জ, মীর মঞ্জিল, মীর তোজক প্রভৃতি আরও নানা পর্যায়ের বহু রাজকর্মচারী ছিলেন।

খান্-ই-সামান, কাজী-উল্-কাজাৎ, সদর-ই-সুদুর, মুহ্‌তসিব

অপরাপর রাজ-কর্মচারিগণ

শহর এলাকার শান্তিরক্ষার ভার ছিল 'কটোয়াল' নামক রাজকর্মচারিগণের উপর। আইন-ই-আক্‌বরীতে কটোয়ালের কর্তব্য সম্পর্কে এক দীর্ঘ তালিকা দেওয়া আছে।* কটোয়াল আধুনিককালের পুলিশ সুপারের কাজ করিতেন। রাত্রিতে শহর এলাকায় পাহারা, শহর এলাকায় নির্মিত প্রত্যেক বাড়ীর এবং রাস্তার হিসাব, অপরিচিত লোকের উপর নজর রাখিবার জন্য গুপ্তচর নিয়োগ করা প্রভৃতি ছিল কটোয়ালের কর্তব্য। ইহা ভিন্ন নাগরিকদের আয়-ব্যয় সম্পর্কে খোঁজ রাখা, চোর ধরা, বেওয়ারিশ সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুত করা, নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন বিধবাকে বলপূর্বক মৃত স্বামীর সহিত সহমরণে বাধ্য করা হইতেছে কিনা এই সকল বিষয়ের দায়িত্বও ছিল কটোয়ালের উপর। কিন্তু কটোয়ালের কর্তব্য ইহাতেই শেষ হইত না। তাঁহার উপর আরও বহুবিধ কাজের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। এই পরিমাণ দায়িত্বপালন কোন কটোয়ালের পক্ষেই সম্ভব ছিল বলিয়া মনে হয় না। স্যর্ যদুনাথ সরকার এই কারণে মন্তব্য

শহর এলাকায় শান্তি-রক্ষক : কটোয়াল

কটোয়ালের বহুবিধ দায়িত্ব ও কর্তব্য

* Vide *Akbari* ; vol. II, pp. 41—43, *Jarret.*

করিয়াছেন যে, আইন-ই-আক্‌বরীতে কটোয়ালের কর্তব্যের তালিকা কটোয়ালের কর্তব্যের আদর্শ হিসাবেই লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। নাগরিকদের ধন-প্রাণের নিরাপত্তা বিধান করা-ই ছিল কটোয়ালের প্রধান কর্তব্য। চুরি-ডাকাতি হইলে অপরাধীকে খুঁজিয়া বাহির করা তাঁহার কর্তব্য ছিল এবং এই কর্তব্য পালনে কোনপ্রকার ত্রুটি হইলে কটোয়ালকে হৃত সম্পত্তি পূরণ করিয়া দিতে হইত।

জেলার শান্তিরক্ষার ভার ছিল ফৌজদারের উপর। ফৌজদারের অধীন 'ফৌজ' অর্থাৎ সৈন্য থাকিত। যে-কোন বিদ্রোহ বা শান্তিভঙ্গের চেষ্টা ফৌজদার তাঁহার ফৌজের সাহায্যে দমন করিবার দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন।

জেলার শান্তিরক্ষা : ফৌজদার

গ্রামাঞ্চলে শান্তিরক্ষার ভার ছিল গ্রাম্য মোড়লের উপর। এবিষয়ে মোগল যুগে কোন নূতন পন্থা অনুসৃত হয় নাই। প্রাচীনকাল হইতেই এদেশে গ্রামের নিরাপত্তার ভার গ্রাম-প্রধানের উপর ন্যস্ত ছিল।

গ্রামাঞ্চলের শান্তি-রক্ষা : গ্রাম-প্রধান

সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ শাসক ছিলেন সম্রাট স্বয়ং। বিভিন্ন প্রদেশ হইতে প্রেরিত বিশেষ কতকগুলি মোকদ্দমার বিচার সম্রাট স্বয়ং করিতেন। ইহা ভিন্ন সাম্রাজ্যের যে-কোন অংশে বা যে-কোন বিচারালয়ের বিচারের বিরুদ্ধে আপীল তিনি শুনিতেন। কয়েকটি নির্দিষ্ট দিনে জনসাধারণের যে কেহ সম্রাটের নিকট সরাসরি বিচারপ্রার্থী হইতে পারিত।

বিচার-ব্যবস্থা—সম্রাট সর্বোচ্চ বিচারক

সম্রাটের নিম্নে বিচারকার্যের ভার ছিল সদ্‌র-ই-সুদুরের উপর। ধর্ম-সংক্রান্ত এবং দেওয়ানী বিচার-ই ছিল তাঁহার প্রধান দায়িত্ব। কাজী-উল্‌-কাজাৎ সাম্রাজ্যের বিচার-ব্যবস্থার সর্বোচ্চ পরিচালক ছিলেন। বিচারকার্যে দক্ষতা ও ন্যায়পরায়ণতা যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সেবিষয়ে তিনি দৃষ্টি রাখিতেন।

সদ্‌র-ই-সুদুর ও কাজী-উল্‌-কাজাৎ

কাজী, মুফ্‌তি ও মীর আদ্‌ল ছিলেন বিচার বিভাগের অপরাপর উল্লেখযোগ্য রাজকর্মচারী। কাজী সাক্ষ্য গ্রহণ প্রভৃতি করিতেন, মুফ্‌তি আইন বিশ্লেষণ এবং দণ্ডাদেশ দান করিতেন।

কাজী, মুফ্‌তি, মীর আদ্‌ল

মোগল সম্রাট আকবরের আমলে কোনপ্রকার লিখিত আইন-কামুন ছিল না। বিচারকগণ কোরাণের নির্দেশ ও নীতির উপর নির্ভর করিয়া বিচারকার্য সম্পন্ন করিতেন। কেবলমাত্র জাহাঙ্গীর প্রবর্তিত বারোটি আইন এবং ঔরংজেবের আমলে রচিত 'ফতোয়া-ই-আলমগীরী' ভিন্ন কোন লিপিবদ্ধ আইন-কামুন মোগলযুগে ছিল না।

আইন-কামুন

সম্রাট স্বয়ং বিচারকার্যে ন্যায়, সততা ও আইনের চক্ষে সকলের সমান অধিকার এই সকল নীতি অনুসরণ করিয়া চলিতেন। খ্রীষ্টধর্মযাজক ফাদার মন্‌সেরেট (Father Monserrate) আকবরের ব্যক্তি-নিরপেক্ষ বিচারকার্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। রাজকর্মচারিবর্গের কর্তব্যকর্মে অবহেলা অথবা কোনপ্রকার অন্যায় আচরণ তিনি ক্ষমা করিতেন না। ব্যভিচার, স্ত্রীজাতির বিরুদ্ধে অপরাধ প্রভৃতির কোন ক্ষমা ছিল না। আকবরের বিচার ব্যক্তিগত প্রভাবমুক্ত ছিল। ন্যায় ও সততা-ই ছিল তাঁহার বিচারের মূল নীতি। অযথা বা অপাত্রে দয়া প্রদর্শনের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। আকবর বলিতেন যে, তিনি স্বয়ং যদি কোন অন্যায় কার্য করেন তাহা হইলে তিনি নিজেকে শাস্তি দিতেও কুণ্ঠিত হইবেন না।*

বিচার ব্যাপারে ন্যায়, সততা ও ব্যক্তি-নিরপেক্ষতা

মোগল শাসনব্যবস্থার ন্যায্য বিচার করিবার নীতি অনুসৃত হইত বটে, কিন্তু প্রকৃতক্ষেত্রে কাজীগণ ন্যায্য-বিচার করিতেন একথা বলা চলে না। সার্ যদুনাথ বলেন যে, কাজীগণ সর্বদাই বিচার-বিভ্রাট করিতেন বলিয়াই 'কাজীর বিচার' কথাটির উদ্ভব হইয়াছিল। কাজীর বিচারে জনসাধারণের যে কোনপ্রকার শ্রদ্ধা ছিল না তাহাই 'কাজীর বিচার' কথাটিতে প্রকাশ পাইয়াছিল। সে সময়ে কোন জেলখানা ছিল না, সুতরাং দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে দুর্গে বন্দী করিয়া রাখা হইত।

'কাজীর বিচার'

* **"If I were guilty of an unjust act, I would rise in judgement against myself"** ***Akbar*, vide, *An Advanced History of India*, p. 559.**

গ্রাম্য-পঞ্চায়েতের বিচার

গ্রামাঞ্চলের বিচারকার্যাদি গ্রাম্য-পঞ্চায়েৎ কর্তৃক সম্পন্ন হইত। এই ব্যবস্থা মোগলযুগের বহু পূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল।

আকবরের রাজস্বনীতি সমসাময়িক ও পরবর্তী ঐতিহাসিকদের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। শাসনব্যবস্থার অপরাপর সকল বিভাগে যেমন আকবরের ব্যক্তিগত প্রভাব ও ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন পরিলক্ষিত হইত তেমনি রাজস্ব বিভাগেও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। শের শাহের আমলে যে রাজস্ব-নীতির সংস্কার সাধিত হইয়াছিল উহার সুফল পরবর্তী কালের অব্যবস্থায় লোপ পাইয়াছিল। সুতরাং আকবর ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে টোডরমলকে দেওয়ান-ই-আস্‌রফ্-এর পদে নিযুক্ত করিলে পুনরায় রাজস্বনীতির সংস্কারকার্যে হস্তক্ষেপ করা হইল। টোডরমলের রাজস্ব সংস্কারের প্রধান নীতিই ছিল জমির উৎপাদিকা শক্তির উপর রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারণ করা। তিনি সমগ্র জমি জরিপ করাইয়া উর্বরতা এবং কতকাল যাবৎ চাষ-আবাদ করা হইতেছে এই সকল ভিত্তিতে সমগ্র চাষের জমিকে চারিভাগে ভাগ করিলেন যথা: (১) 'পোলাজ' অর্থাৎ যে সকল জমি প্রতি বৎসর চাষ করা চলিত (২) 'পরাউতি' অর্থাৎ যে সকল জমি কিছুকাল চাষের পর উর্বরতা সঞ্চয়ের জন্য কিছুকাল পতিত রাখিতে হইত; (৩) 'চাচর' অর্থাৎ যে সকল জমি তিন বা চারি বৎসর যাবৎ পতিত পড়িয়া আছে; এবং (৪) 'বঞ্জর' অর্থাৎ যে সকল জমি পাঁচ বৎসরের অধিককাল পতিত পড়িয়া আছে। 'পোলাজ' ও 'পরাউতি' জমিকে টোডরমল উৎপন্ন ফসলের পরিমাণের ভিত্তিতে পুনরায় উত্তম, মধ্যম ও অধম—এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন। প্রত্যেক কৃষকের অধীনেই এই তিন পর্যায়ের জমিই থাকিত। টোডরমল এই তিন প্রকার জমির মোট উৎপন্ন ফসলের এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব হিসাবে ধার্য করিলেন। আর 'চাচর' ও 'বঞ্জর' এই দুই প্রকার জমির রাজস্ব অতি সামান্য পরিমাণে ধার্য করা হইল, কিন্তু জমির উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে রাজস্বও ক্রমবর্ধিত হইবে এইরূপ ব্যবস্থাও করা হইল।

আকবরের রাজস্ব-নীতি

টোডরমলের দক্ষতা

চাষের জমি চারি পর্যায়ে বিভক্ত—'পোলাজ', 'পরাউতি', 'চাচর' ও 'বঞ্জর'

রাজস্ব: মোট ফসলের এক-তৃতীয়াংশ হিসাবে ধার্য

জমির রাজস্ব উৎপন্ন ফসলে অথবা অর্থের দ্বারা দেওয়া চলিত। উপরোক্ত রাজস্বব্যবস্থা সমগ্র উত্তর-ভারত এবং গুজরাটে প্রবর্তন করা হইয়াছিল। এই ব্যবস্থার কতক পরিবর্তন সাধন করিয়া দাক্ষিণাত্যে প্রচলন করা হয়।

আকবরের সাম্রাজ্য পনরটি সুবায় বিভক্ত

রাজস্ব আদায় এবং শাসনকার্যের সুবিধার জন্য আকবর তাঁহার সাম্রাজ্যকে পনরটি সুবায় বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক সুবায় একজন করিয়া শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। সুবার শাসনকর্তা সাহেব সুবা, সুবাদার বা নাজির নামে অভিহিত হইতেন। প্রত্যেক সুবায় একজন করিয়া দেওয়ান থাকিতেন। দেওয়ান ছিলেন রাজস্ব আদায়ের ভারপ্রাপ্ত। দেওয়ান ও নাজিম বা সুবাদার পরস্পর পরস্পরের উপর দৃষ্টি রাখিতেন। ইঁহারা উভয়েই ছিলেন পরস্পর স্বাধীন।

সুবাদার ও দেওয়ান

দেওয়ান আদায়ীকৃত রাজস্ব হইতে শাসনকার্যের প্রয়োজনীয় ব্যয় সুবাদারকে দিতেন এবং উদ্‌বৃত্ত অর্থ কেন্দ্রীয় রাজকোষে প্রেরণ করিতেন। সুবাদার এবং দেওয়ান উভয়ই সম্রাট কর্তৃক মনোনীত হইতেন। সুতরাং একে অপরের উপর কোনপ্রকার প্রাধান্য বিস্তারে সমর্থ হইতেন না। ফলে, দেওয়ান বা সুবাদার কেহই অত্যধিক শক্তিশালী হওয়ার সুযোগ পাইতেন না।

মনসব্‌দারী প্রথা

মন্‌সব্‌দারী প্রথা ছিল আকবরের শাসনব্যবস্থার অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। আকবর কোন স্থায়ী সেনাবাহিনী পোষণ করিতেন না। প্রয়োজনবোধে দেশের যাবতীয় সুস্থ ও সবল ব্যক্তি দেশরক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ করিবে ইহাই ছিল আকবরের সামরিক নীতির মূল কথা। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এই নীতির কোন সার্থকতা ছিল না। প্রকৃতক্ষেত্রে আকবরের মন্‌সব্‌দারগণই সামরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিতেন। আকবর যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন যুদ্ধবিগ্রহের কালে প্রয়োজনবোধে সৈনিক সংগ্রহ করা হইত, তখন তন্তুবায়, ছুতার, মুদী, প্রভৃতি নানা বৃত্তির লোক সেনাবাহিনীতে যোগদান করিত। ফলে, সেনাবাহিনীতে নিয়মানুবর্তিতা, দক্ষতা প্রভৃতি কিছুই ছিল না। আকবর সামরিক সংস্কার সাধন করিবার উদ্দেশ্যে শাহ্‌বাজ খাঁকে মীর বক্‌শী পদে নিযুক্ত করিলেন এবং এজন্য স্বয়ং একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিলেন। ইহা মন্‌সব্‌দারী প্রথা নামে পরিচিত। মোট তেত্রিশ পর্যায়ের মন্‌সব্‌দারী ছিল।

প্রত্যেক মন্‌সব্‌দার তাঁহার পর্যায় অনুযায়ী নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য, ঘোড়া, হাতী প্রভৃতি প্রস্তুত রাখিতে বাধ্য থাকিতেন। সর্বোচ্চ পর্যায়ের মন্‌সব্‌দার মোট দশ হাজার সৈন্য এবং সর্বনিম্ন মন্‌সব্‌দার মোট দশজন সৈন্য প্রস্তুত রাখিবার দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। মন্‌সব্‌দারগণ সামরিক কর্তব্য ভিন্ন বেসামরিক কর্তব্য করিতেও বাধ্য ছিলেন। এজন্য তাঁহারা সরকার হইতে বেতন পাইতেন।

মন্‌সব্‌দারগণের পর্যায় ভাগ

মন্‌সব্‌দারগণ পর্যায় অনুযায়ী সম্মানের অধিকারী ছিলেন। মানসিংহ, টোডরমল, কিলিচ্‌ খাঁ ছিলেন সর্বোচ্চ পর্যায়ের মন্‌সব্‌দার। যুদ্ধবিগ্রহের কালে মন্‌সব্‌দারগণ সৈন্যসহ উপস্থিত হইতে বাধ্য ছিলেন। মন্‌সব্‌দারী প্রথা ছিল ইওরোপের সামন্ত-প্রথারই অনুরূপ।

তাঁহাদের কর্তব্য

মন্‌সব্‌দারগণ ভিন্ন 'দাখিলী' (Dakhili) ও 'অহ্‌দী' (Ahadi) নামে অপর দুই শ্রেণীর সামরিক কর্মচারী ছিলেন। 'অহ্‌দী' নামক সামরিক কর্মচারিগণকে সম্ভ্রান্ত পরিবার হইতে মনোনীত করা হইত। ইহারা প্রধানতঃ সম্রাটের দেহরক্ষীর কাজ করিত।

'দাখিলী' ও 'অহ্‌দী'

আকবরের আমলে মোগল সেনাবাহিনী পদাতিক, অশ্বারোহী, গোলন্দাজ ও নৌবাহিনী—এই চারি ভাগে বিভক্ত ছিল। মোগল সেনাবাহিনীতে বিভিন্ন দেশের ও জাতির লোকও গ্রহণ করা হইত। কিন্তু উহা সম্পূর্ণভাবে জাতীয় বাহিনী ছিল একথা বলা চলে না। মোগলবাহিনী যুদ্ধের সময়েও অতিশয় মন্থর গতিতে একস্থান হইতে অন্যস্থানে অগ্রসর হইত। অসংখ্য দাস-দাসী, স্ত্রীলোক, হাতী, উট প্রভৃতি সমভিব্যাহারে মোগল সম্রাট সেনাবাহিনীর অধিনায়কত্ব করিতে অগ্রসর হইতেন। ফলে, সেনাবাহিনীর গতিশীলতা ব্যাহত হইত।

মোগলবাহিনী—পদাতিক, অশ্বারোহী, গোলন্দাজ ও নৌবাহিনী

আকবরের শাসনব্যবস্থার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গুণ ছিল উহার ধর্ম ও ব্যক্তি নিরপেক্ষতা। আকবর ছিলেন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন শাসক। তিনি তাঁহার রাজনীতিকে ধর্ম হইতে মুক্ত রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার আমলে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে প্রজামাত্রেই সম-মর্যাদা ও সমান অধিকার লাভ করিত। বিচারকার্যেও প্রজায় প্রজায় কোন প্রভেদ করা হইত না। তাহার শাসনব্যবস্থায় বহু সংখ্যক হিন্দু কর্মচারী গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। মানসিংহ, টোডরমল

আকবরের শাসন-ব্যবস্থার প্রকৃতি

প্রভৃতির নাম এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য। আকবর ভারতবাসী হিন্দু ও মুসলমানের অখণ্ড আনুগত্যের ভিত্তিতে এক জাতীয় শাসনব্যবস্থা স্থাপন করিয়া তাঁহার অপূর্ব রাজনৈতিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছিলেন।

আকবরের ধর্মনীতি (Religious policy of Akbar) : ভারতের মুসলমান যুগের ইতিহাসে ধর্মনিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থা স্থাপনের দূরদর্শিতা শের শাহ্ ও আকবর ভিন্ন অপর কোন সুলতান বা সম্রাটের ছিল না।

ধর্মবিষয়ে আকবরের দূরদর্শিতা

আকবর বুঝিয়াছিলেন যে, সমগ্র হিন্দুস্তানের সম্রাটকে কেবলমাত্র সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব করিলেই চলিবে না। হিন্দুস্তানের সম্রাটকে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল ভারতবাসীর স্বাভাবিক আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল জাতীয় সম্রাটের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হইতে হইবে। আকবরের শাসনব্যবস্থা, ব্যক্তিগত আচার-আচরণ, ধর্মনীতি সবকিছুই এই মূল নীতির উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। ধর্মের ব্যাপারে আকবর সর্বপ্রকার সংকীর্ণতা হইতে মুক্ত ছিলেন। তাঁহার ধর্মনীতি বিভিন্ন প্রভাবাধীনে গড়িয়া উঠিয়াছিল। বাল্যকালেই তিনি সুফি ধর্মমতের প্রভাবে আসেন এবং ধর্মবিষয়ে উদারতা ও সহিষ্ণুতা অবলম্বনের প্রয়োজন উপলব্ধি করেন। পূর্বপুরুষদের ধর্মমতের দিক দিয়া বিচার করিলেও একথা উল্লেখ করিতে হয় যে, আকবর তৈমুর বংশের সন্তানসুলভ উদারতা সহজাত স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হিসাবেই লাভ করিয়াছিলেন।

আকবরের চরিত্রে বিভিন্ন প্রভাব

তৈমুর বংশের সকলেই ছিলেন দুর্ধর্ষ সমরবিজয়ী নেতা, তাঁহাদের শিল্প ও সাহিত্যানুরাগ ছিল অপরিসীম, কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে তাঁহারা উৎকট সাম্প্রদায়িকতার পক্ষপাতী ছিলেন না। তৈমুর বংশোদ্ভূত আকবর স্বভাবতই তাঁহার জ্ঞান-বুদ্ধির বিচারে ধর্মান্ধতা বর্জনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি ধর্মবিষয়ে সর্বপ্রকার সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে নিজেকে এবং তাঁহার শাসনব্যবস্থাকে স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। জনৈক পারসিক মনীষীর কন্যা হামিদা বানুর মানসিক উৎকর্ষ, উদারতা ও পরধর্মসহিষ্ণুতা প্রভৃতি যাবতীয় গুণ পুত্র আকবরের চরিত্রকে স্বভাবতই প্রভাবিত করিয়াছিল। আকবরের হিন্দু পত্নীদের প্রভাবও এবিষয়ে নেহাৎ কম ছিল না।

বাল্যকাল হইতেই আকবর সিয়া-সুন্নী ও মেহ্‌দি-সুফি ধর্ম-সম্প্রদায়গুলির ধর্মদ্বন্দ্বের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠেন। বদাউনীর বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায় যে, আকবর স্বয়ং গভীর ধর্মপ্রবণ ব্যক্তি ছিলেন। সুতরাং বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের পরস্পর বিদ্বেষে তিনি মর্মাহত হইতেন। উলেমাদের ধর্মান্ধতা তাঁহার অন্তরকে পীড়া দিত। এইভাবে বিভিন্ন ধর্মের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া আকবর ক্রমেই সর্বধর্ম-সারগ্রাহী হইয়া উঠিলেন। বিভিন্ন ধর্ম একই স্থানে পৌঁছিবার বিভিন্ন পথমাত্র—এই ধারণা তাঁহার জন্মিয়াছিল। ফলে, তাঁহার অন্তরে পরধর্মসহিষ্ণুতা ও ধর্মব্যাপারে চরম উদারতার ভাব সৃষ্টি হইল। তিনি হিন্দু, জৈন, ইরাণী ও খ্রীষ্টধর্মের সার সম্পর্কে কৌতূহলী হইয়া উঠিলেন। খ্রীষ্টধর্মের মূলকথা কি সেবিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা লাভের জন্য তিনি গোয়ার পোর্তুগীজ ধর্মযাজকদের নিকট একজন যাজককে তাঁহার রাজ-সভায় প্রেরণ করিতে অনুরোধ জানান। দুইজন জেসুইট্ ধর্মযাজক (Jesuit missionaries)—ফাদার রিডোল্‌ফো একোয়াভাইভা (Father Ridlofo Aquaviva) ও ফাদার এ্যান্টোনিও মন্‌সেরেট্ (Father Antonio Monserrate)-কে গোয়ার জেসুইট্ যাজকসংঘ হইতে আকবরের রাজসভায় এই উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হইয়াছিল। মন্‌সেরেট্ আকবরের রাজত্বকাল সম্পর্কে একখানি অতি মূল্যবান ঐতিহাসিক গ্রন্থ ল্যাটিন ভাষায় রচনা করিয়াছিলেন। আকবর বিভিন্ন ধর্মের ধর্মজ্ঞানীদের আলাপ-আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক শুনিতে ভালবাসিতেন এবং বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে ইবাদৎখানায় সর্বদাই আলোচনা হইত। তাঁহার ইবাদৎখানায় পুরুষোত্তম, দেবী, হরিবিজয় সুরী, বিজয়সেন সুরী, ভানুচন্দ্র উপাধ্যায় প্রভৃতি হিন্দু ও জৈন দার্শনিকগণ স্থান পাইয়াছিলেন।

আকবরের ধর্মমতের মূলনীতি—সর্বধর্মের সার গ্রহণ

জেসুইট্ যাজকদের আগমন

আকবর ও তাঁহার অভিন্নহৃদয় সুহৃদ আবুল ফজ্‌ল ধর্মসম্পর্কে একই নীতি ও ধারণা পোষণ করিতেন। তাঁহার ধর্মনীতির মূল কথা-ই ছিল সহিষ্ণুতা বা 'সুলহ্-ই-কুল' (toleration)। পরধর্মসহিষ্ণুতা আকবরের নিকট কেবলমাত্র মুখের কথা ছিল না, প্রকৃতক্ষেত্রেও তিনি এই নীতি কার্যকরী করিয়াছিলেন।

পরধর্মসহিষ্ণুতা—'সুলহ্-ই-কুল'

উলেমাদের মধ্যে ধর্ম-সংক্রান্ত বিবাদ-বিসম্বাদ বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে আকবর তাঁহার 'অভ্রান্ত ও সর্বময় কর্তৃত্বের ঘোষণা' (Infallible Decree) দ্বারা নিজেকে রাষ্ট্র ও ধর্মব্যবস্থার সর্বোচ্চে স্থাপন করিয়াছিলেন (১৫৭৯)। এবিষয়ে ইংল্যাণ্ডের রাজা অষ্টম হেন্‌রীর এ্যাক্ট্ অব্ সুপ্রিম্যাসি (Act of Supremacy)-এর সহিত আকবরের ঘোষণার সাদৃশ্য দেখা যায়। এই ঘোষণার দ্বারা ইস্‌লাম ধর্মসম্পর্কে যে-কোন সমস্যার চরম সমাধানের ক্ষমতা আকবর নিজহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

'অভ্রান্ত ও সর্বময় কর্তৃত্বের ঘোষণা' (Infallible Decree)

পরস্পর ধর্ম-বিদ্বেষ ও পর-ধর্মের প্রতি অসহিষ্ণুতা দূর করিবার উদ্দেশ্যে আকবর 'দীন-ইলাহী' (Din Ilahi) নামে এক নূতন একেশ্বরবাদী ধর্মমত প্রবর্তন করেন (১৫৮২)। সকল ধর্মের সার লইয়া 'দীন-ইলাহী' ধর্মমত গঠিত হইয়াছিল। আকবরের উদ্দেশ্য ছিল এই সর্ব-ধর্ম-সার 'দীন-ইলাহী'কে জাতীয় ধর্মে পরিণত করা। এই ধর্মমতে কোন বিশেষ ধর্মের প্রাধান্য বা কোন বিশেষ ধর্মের সংকীর্ণতা আকবর স্বীকার করেন নাই। হিন্দু-মুসলমান সকলেই যাহাতে এই ধর্ম গ্রহণ করিতে পারে সেইজন্যই তিনি 'দীন-ইলাহী' ধর্মমত প্রবর্তন করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু গভীর দার্শনিক তত্ত্বে পরিপূর্ণ 'দীন-ইলাহী' ধর্মমত জনসাধারণের মনে কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।

'দীন-ইলাহী'

আকবরের পরধর্মসহিষ্ণুতা এবং সর্ব-ধর্ম-সারে বিশ্বাস কেবলমাত্র তাঁহার 'দীন-ইলাহী' ধর্মমতের প্রচার হইতেই বুঝা যায় না, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী প্রজাবর্গের প্রতি তাঁহার উদার ও সহিষ্ণু মনোভাব হইতেও এই পরিচয় পাওয়া যায়। আকবরের আমলেই হিন্দুগণ সর্বপ্রথম নাগরিকের পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ঘৃণ্য জিজিয়া কর উঠাইয়া দিয়া এবং হিন্দুদের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়া আকবর এই দুই শক্তিশালী সম্প্রদায়ের মধ্যে পূর্ণ মিলন সাধন করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং রাজপুতকন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন এবং নিজপুত্র সেলিমের সহিত এক রাজপুতকন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। আকবর নিজ পরিবারস্থ হিন্দুনারীদের তাঁহাদের নিজধর্ম অনুসরণ করিয়া চলিবার স্বাধীনতা দিয়াছিলেন, একথা সমসাময়িক চিত্রাদি হইতে

হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে সমব্যবহার—হিন্দুরমণী বিবাহ

প্রমাণিত হয়। রাজ্যজয়ের সময় তাঁহার সেনবাহিনী কোন ধর্মস্থান যাহাতে কলুষিত না করে সেজন্য আকবর প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

আকবরের রাজপুত নীতি (Akbar's Rajput policy) : রাজপুত জাতিকে দমন করিয়া আকবর সমগ্র উত্তর-ভারতের একচ্ছত্র অধিপতি হইয়াছিলেন, কিন্তু রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ও বিচক্ষণতা-সম্পন্ন সম্রাট আকবর রাজপুত জাতির সৌহার্দ্য লাভের মূল্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। বস্তুত, রাজপুত জাতির সহযোগিতার ফলেই আকবর বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার শাসনব্যবস্থায়ও রাজপুত নেতৃবৃন্দ গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আকবরের পূর্ববর্তী মুসলমান বিজেতাগণ বিজিত শত্রুর প্রতি অনুকম্পা ও উদারতা প্রদর্শনের প্রয়োজন উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। বিজিত শত্রুকে নির্মম শাস্তিদান, বিজিত শত্রুর উপর প্রতিহিংসা গ্রহণ, তাহার মর্যাদা নাশ করা, প্রভৃতিই ছিল তাঁহাদের নীতি। কিন্তু সমরকুশলী সম্রাট আকবর প্রকৃত সংগঠক ছিলেন। বিজিত শত্রুর উপযুক্ত মর্যাদা দান, বিজিত শত্রুর গুণ গ্রহণের ক্ষমতা তাঁহার ছিল। রাজপুত জাতির সহযোগিতা ভারতবর্ষে স্থায়ী সাম্রাজ্য গঠনে অপরিহার্য একথা আকবর ভালভাবেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ১৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দে রণথম্ভোর জয়ের পর তিনি রাজপুতদের প্রতি যে উদারতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা রাজপুত জাতির সৌহার্দ্য অর্জনে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। তিনি রাজপুত জাতিকে নানাপ্রকার বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ও মর্যাদাদানে কার্পণ্য করেন নাই। রাজপুতজাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আকবর ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু রাজপুতদের প্রতি তাঁহার উদারতারও অন্ত ছিল না। পরাজিত শত্রুকে মিত্রতাপূর্ণ ব্যবহার ও উপযুক্ত মর্যাদা দান করিয়া আকবর তাঁহার সামরিক জয়কে অন্তর বিজয়ে পরিণত করিতেন। ফলে, বিজিত শত্রু চির-মিত্রে পরিণত হইত। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলের স্বাভাবিক আনুগত্যের উপর নির্ভর করিয়া তিনি তাঁহার সাম্রাজ্য গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন। রাজপুতদের প্রতি বা হিন্দুদের প্রতি ব্যবহারে আকবর এই

আকবরের দূরদৃষ্টির মূল্য—রাজপুতজাতির সৌহার্দ্য লাভ

রণথম্ভোর জয়ের পর পরাজিত শত্রুর প্রতি উদারতা

নীতির ব্যতিক্রম করেন নাই। হিন্দুমন্দির অপবিত্রীকরণ, ধর্মান্ধতাবশতঃ পর-ধর্মাবলম্বীদের প্রতি কোনপ্রকার অত্যাচার বা অবিচার প্রভৃতি দ্বারা আকবর তাঁহার বিজয়-গৌরবকে ম্লান করেন নাই। তাঁহার এই উদার, প্রকৃত সম্রাট-সুলভ নীতির সুফল আমরা দেখিতে পাই তাঁহার প্রতি সমগ্র রাজপুতজাতি তথা ভারতবাসীর অকপট আনুগত্যে। আকবরের দূরদর্শিতার ফলে তাঁহার সর্বাধিক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শত্রু রাজপুতজাতি তাঁহার অনুগত মিত্রতে পরিণত হইয়াছিল।

রাজপুত জাতির আনুগত্য

আকবর ও তাঁহার পুত্র সেলিম রাজপুত কন্যা বিবাহ করিয়া রাজপুত-জাতিকে সম্রাটের সম-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। বহু রাজপুত নেতা তাঁহার অধীনে উচ্চ কর্মচারিপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। রাজা বিহারীমল, তাঁহার পুত্র ও পৌত্র ভগবানদাস ও মানসিংহের নাম এবিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাজপুতজাতি ছিল সম-সাময়িক ভারতের শ্রেষ্ঠ সামরিক জাতি। আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার দিক দিয়াও আকবরের রাজপুত কর্মচারিগণ মুসলমান রাজকর্মচারীদের অপেক্ষা বহু ঊর্ধ্বে ছিলেন। আকবর এই রাজপুত বীরগণের অক্লান্ত, আন্তরিক সহায়তায় মোগল সাম্রাজ্যকে দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়া-ছিলেন। আকবরের স্বজাতীয় অনুচরবৃন্দ ছিল স্বার্থান্বেষী ও সুবিধাবাদী, কিন্তু রাজপুত কর্মচারীদের নিকট হইতে আকবর অখণ্ড আনুগত্য ও সহযোগিতা পাইয়াছিলেন। আকবর রাজপুত জাতির উপর যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন রাজপুতজাতি সেই বিশ্বাসের মর্যাদা সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিয়াছিল।

রাজপুত রমণী বিবাহ

রাজপুতজাতির উপর আকবরের বিশ্বাস স্থাপন

আকবর-অনুসৃত রাজপুত নীতির সুফল জাহাঙ্গীর ও শাহ্‌জাহানের আমলেও সম্পূর্ণভাবে বিনাশ প্রাপ্ত হয় নাই। কিন্তু ঔরংজেবের আমলে এই দূরদর্শী নীতি পরিত্যক্ত হইয়া এক সংকীর্ণ, ধর্মান্ধ অত্যাচারী নীতি অনুসৃত হইয়াছিল। ঔরংজেবের হিন্দু তথা রাজপুত বিদ্বেষ সমগ্র রাজপুত জাতিকে তাঁহার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শত্রুতে পরিণত করিয়াছিল। সাম্রাজ্যবাদী আকবর রাজপুতজাতির স্বাধীনতা হরণ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাহাদের প্রতি

জাহাঙ্গীর ও শাহ্-জাহানের আমলে আকবর-অনুসৃত রাজপুত নীতির সুফল

মিত্রতাপূর্ণ ব্যবহার, তাহাদিগকে উপযুক্ত মর্যাদাদান ও তাহাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তিনি তাহাদের মনের গ্লানি দূর করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু ঔরংজেবের উৎকট ধর্মান্ধতা ও অ-মুসলমান-নির্যাতন নীতির ফলে নীতির সুফল সমূলে বিনষ্ট হইয়াছিল।

ঔরংজেবের ধর্মান্ধতা—রাজপুত শক্তির শত্রুতা

হিন্দুদের প্রতি আকবরের নীতি (Akbar's policy towards the Hindus) : উদার মনোবৃত্তির সহিত দূরদর্শিতার সমন্বয় ঘটিলে যে সুফল পাওয়া যায় তাহা আকবরের সংস্কারকার্যাদি হইতে প্রমাণিত হয়। আকবরের সংস্কারগুলি যেমন ছিল তাঁহার মৌলিক প্রতিভার পরিচায়ক তেমনি ছিল প্রজাবর্গের মঙ্গলার্থক। তাঁহার সংস্কারগুলি হইতেই হিন্দুদের প্রতি তাঁহার ব্যবহারের নীতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। আকবর প্রায় দুই কোটি মুদ্রার ক্ষতি স্বীকার করিয়াও হিন্দুদের উপর হইতে তীর্থকর উঠাইয়া দিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন তিনি ঘৃণ্য জিজিয়া কর উঠাইয়া দিয়া (১৫৬৪) মুসলমান ও অ-মুসলমান প্রজার মধ্যে কৃত্রিম প্রভেদ দূর করেন। আকবরের যুদ্ধগুলি প্রধানতঃ হিন্দু রাজগণের বিরুদ্ধেই সংঘটিত হইয়াছিল। পূর্বে যুদ্ধ জয়লাভের পর পরাজিত সৈন্যগণকে ক্রীতদাসে পরিণত করা হইত, কিন্তু আকবর এই প্রথা রহিত করিয়া দিয়াছিলেন। ইহার ফলে বহু হিন্দু সৈনিক ক্রীতদাসে পরিণত হওয়ার দুর্ভাগ্য হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। এই সকল সংস্কারকার্য সম্পাদনে আকবর অপর কাহারো পরামর্শ গ্রহণ করেন নাই। ইহা হইতেই তাঁহার উন্নত মনোবৃত্তির পরিচয় লাভ করা যায়। সকল ধর্মের প্রতি পরম সহিষ্ণুতা প্রদর্শন ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় নীতি হিসাবে গ্রহণ করিয়া আকবর তাঁহার শাসনব্যবস্থাকে ধর্মের প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। হিন্দুস্তানের সম্রাটের পক্ষে এইরূপ উদার নীতি অনুসরণ রাজনৈতিক দূরদর্শিতারও পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

তাঁহার সংস্কার নীতির উদারতা

তীর্থকর, জিজিয়া প্রভৃতি বৈষম্যমূলক করের অবসান

সর্বধর্ম-সহিষ্ণুতা

আকবরের পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দু সাহিত্যের অর্থাৎ সংস্কৃত সাহিত্যের যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। আবুল ফজ্‌ল বর্ণিত একুশ জন রাজপণ্ডিতদের

মধ্যে নয়জনই ছিলেন হিন্দু। হিন্দুমন্দির স্থাপন, হিন্দুদের উৎসব উপলক্ষে মেলা বসান প্রভৃতির পূর্ণ স্বাধীনতা তিনি দিয়াছিলেন। এই-ভাবে আকবর প্রজাবর্গের মধ্যে ধর্মের ভিত্তিতে ভেদাভেদ নীতির অবসান ঘটাইয়াছিলেন। তাঁহারই অধীনে সর্বপ্রথম হিন্দু তথা অ-মুসলমান প্রজাবর্গ নাগরিক মর্যাদা লাভ করিয়াছিল। আকবর ও তাঁহার পুত্র যুবরাজ সেলিম রাজপুত তথা হিন্দু রমণী বিবাহ করিয়াছিলেন। এই-ভাবে তিনি হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পূর্ণ সংমিশ্রণের পথ উন্মুক্ত করিয়াছিলেন। সুতরাং আকবরের এই নীতি সাফল্য লাভ করিলে ভারতের পরবর্তী ইতিহাস ভিন্নরূপ ধারণ করিত। আকবরের শাসনব্যবস্থায় বহু হিন্দু উচ্চ রাজকর্মচারিপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার শাসনব্যবস্থা হিন্দু-মুসলমান মিলিত চেষ্টার চরম সাফল্যের পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

হিন্দুসাহিত্যের পৃষ্ঠ-পোষকতা, মন্দির নির্মাণ প্রভৃতির স্বাধীনতা

আকবরের হিন্দু রমণী বিবাহ

আকবর কেবলমাত্র ধর্ম-সংক্রান্ত সংস্কার সাধন করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না। হিন্দু সমাজের কুপ্রথা দূরীকরণের চেষ্টাও তিনি করিয়াছিলেন। সতীদাহ প্রথা সেকালে এক অতি নিষ্ঠুর প্রথায় পরিণত হইয়াছিল। হিন্দু বিধবাদিগকে অনেক ক্ষেত্রে তাঁহাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলপূর্বক স্বামীর সহমৃতা হইতে বাধ্য করা হইত। আকবর এই বলপূর্বক সতীদাহ নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।

বলপূর্বক সতীদাহ নিষিদ্ধ

আকবরের অপরাপর সংস্কার (Other Reforms of Akbar) :

উপরোক্ত সংস্কার ভিন্ন আকবর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। বিবাহের উপযুক্ত বয়সের পূর্বে বিবাহ করাও নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল। অধিক বয়স্কা স্ত্রীলোক ও অল্প বয়স্ক পুরুষের মধ্যে যাহাতে বিবাহ ঘটিতে না পারে সেজন্য আকবর এক শ্রেণীর কর্মচারীর উপর এবিষয়ে দৃষ্টি রাখিবার ভার দিয়াছিলেন। তিনি বহু-বিবাহ প্রথারও সমর্থন করিতেন না।

ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধকরণ

বাল্যবিবাহ ও বহু-বিবাহ নিষিদ্ধকরণ

আকবরের চরিত্র ও কৃতিত্ব (Character and Estimate of Akbar) : যে রাজগণ তাঁহাদের চরিত্রের মাধুর্য এবং জনহিতৈষণার দ্বারা

ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অমর হইয়া আছেন, মোগল-শ্রেষ্ঠ সম্রাট আকবর তাঁহাদের অন্যতম। আকবর ছিলেন একাধারে সাহসী বীর, অনন্যসাধারণ সামরিক প্রতিভা-সম্পন্ন সেনাপতি, প্রজারঞ্জক, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন শাসক। বিজেতা হিসাবে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ, শাসক হিসাবে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠতর। তিনি নিজ চরিত্রের মাধুর্য এবং কার্য নিপুণতায়, সর্বোপরি তাঁহার প্রজাবাৎসল্যের দ্বারা প্রজাবর্গের অন্তর জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ছিলেন। ন্যায় এবং সততার প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল। পরচরিত্র বুঝিবার মত অন্তর্দৃষ্টি এবং পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মতো মানসিক উৎকর্ষ ও উদারতা আকবরের ছিল। পর-গুণ গ্রাহিতা, অপরকে নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করিবার মতো মনোবলও তাঁহার ছিল। বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা শ্রবণে তিনি আনন্দ পাইতেন। রাজকর্তব্যের এক অতি উচ্চ আদর্শও তিনি অনুসরণ করিতেন।

চরিত্র

আকবর নিরক্ষর ছিলেন, কিন্তু তাঁহার জ্ঞানপিপাসা ছিল অপরিসীম। তাহার স্মরণশক্তি ছিল অসাধারণ। অপরের মুখে ইতিহাস, দর্শন, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ের গ্রন্থাদি শ্রবণ করিয়া তিনি স্মরণ রাখিতে পারিতেন। তিনি সকল ধর্মের সার গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার রাজসভা ফৈজী, আবুল ফজ্‌ল, দেবী, পুরুষোত্তম, ভানুচন্দ্র, হরিবিজয়, বিজয়সেন, একোয়াভাইবা, মন্‌সেরেট্ প্রভৃতি হিন্দু, পারসিক, জৈন, খ্রীষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মনীষীদের দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল।

শাসক হিসাবে আকবর ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাসে এক যুগান্তর আনিয়াছিলেন। সামরিক প্রতিভাবলে যে বিশাল সাম্রাজ্য তিনি গঠন করিয়াছিলেন, সংগঠনী প্রতিভা দ্বারা উহাকে তিনি দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করিতেও সক্ষম হইয়াছিলেন। শাসনকার্যের ক্ষুদ্রতম বিষয়ও আকবরের দৃষ্টি এড়াইত না। তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টার ফলে বিশাল মোগল সাম্রাজ্যের উপযোগী শাসনব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছিল। আকবর বুঝিয়াছিলেন ভারতবর্ষে স্থায়ী শাসনব্যবস্থা স্থাপনের একমাত্র শর্ত ছিল হিন্দু-মুসলমানের অখণ্ড ও অকপট আনুগত্য লাভ। তিনি পূর্ববর্তী সুলতানদের ন্যায় সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন নাই। হিন্দুদের প্রতি উদার নীতি অনুসরণ

সাম্রাজ্য সংগঠন

করিয়া সমগ্র মধ্যযুগে তিনিই সর্বপ্রথম ভারতের জাতীয় সম্রাটের মর্যাদালাভে সমর্থ হইয়াছিলেন।

আকবরের শাসননীতি ছিল যেমন ব্যক্তি-নিরপেক্ষ তেমনি ধর্ম-নিরপেক্ষ। তাঁহার শাসনাধীনে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলেই সম-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। দুর্ধর্ষ রাজপুতজাতি আকবরের বিশ্বস্ত মিত্র জাতিতে পরিণত হইয়াছিল। শাসনব্যবস্থায় হিন্দুগণ উচ্চ রাজকর্মচারিপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পূর্ববর্তী মুসলমান সুলতানগণের ধর্মান্ধ সংকীর্ণ নীতি ত্যাগ করিয়া আকবর সকলের প্রতি সমব্যবহার দ্বারা প্রজাবর্গের অন্তর জয় করিয়াছিলেন। প্রজাবর্গের মধ্যে জাতি-ধর্মের ভিত্তিতে কৃত্রিম বিভেদ দূর করিয়া আকবর জাতীয় ঐক্যের যে মহান আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা পরবর্তী কালে অনুসৃত হইলে ভারতের ইতিহাস অন্যরূপ হইত। আকবরের শাসন হিন্দু-মুসলমান তথা সমগ্র ভারতবাসীর অকপট, স্বাভাবিক আনুগত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁহার শাসনব্যবস্থায় ভারতীয় এবং পারসিক-আরবীয় (Perso-Arabic) শাসন-নীতির এক অভূতপূর্ব সংমিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়। আকবর শের শাহের আমলের রাজস্ব-নীতি, হিন্দুগণের প্রতি প্রীতি ও বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার, শাসন-ব্যবস্থায় হিন্দু কর্মচারী নিয়োগ, প্রজার মঙ্গল সাধন প্রভৃতির অনুকরণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে করা হয়। যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ, যাহা কিছু দেশ ও জনসমাজের হিতসাধনে গ্রহণযোগ্য তাহা আকবর গ্রহণ করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই।

শাসনদক্ষতা

জাতীয় শাসনব্যবস্থা স্থাপন

আকবর অ-মুসলমানদের উপর হইতে জিজিয়া কর এবং হিন্দুদের উপর হইতে তীর্থকর উঠাইয়া দিয়া সকল প্রজাকেই ধর্মপালনের চরম স্বাধীনতা দান করিয়াছিলেন। তাঁহার সামাজিক সংস্কারগুলিও উল্লেখযোগ্য। বলপূর্বক সতীদাহের নিষ্ঠুরপ্রথা বন্ধ করিবার জন্য কাহারও ইচ্ছার বিরুদ্ধে সহমরণে বাধ্য করা নিষিদ্ধ বলিয়া তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন। পরাজিত শত্রুর সৈনিকদের ক্রীতদাসে পরিণত করিবার রীতি তিনি উঠাইয়া দিয়াছিলেন। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ প্রথা প্রভৃতি দূর করিবার চেষ্টাও তিনি করিয়াছিলেন।

বিভিন্ন সংস্কার

শিল্প ও সাহিত্যের প্রতিও আকবরের গভীর অনুরাগ ছিল। হুমায়ুনের সমাধি, ফতেপুর সিক্রির প্রাসাদাদি প্রভৃতি আকবরের স্থাপত্য-শিল্পানুরাগের নিদর্শনস্বরূপ। আকবরের পৃষ্ঠ-পোষকতায় হিন্দু চিত্রশিল্পিগণ পারসিক চিত্রশিল্পে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন।*

স্থাপত্য-শিল্প ও চিত্র-শিল্প

আবুল ফজ্‌লের মতে আকবর স্বয়ং নূতন নূতন প্রাসাদের পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতেন। তাঁহার আমলে নির্মিত বহু কেল্লা, প্রমোদভবন, মিনার, সরাইখানা, বিদ্যালয় তাঁহার নির্মাণ-শিল্পপ্রীতি ও জন-কল্যাণের ইচ্ছার পরিচায়ক। বুলন্দ-দর্‌ওয়াজা, পাঁচ-মহল প্রভৃতি আকবরের স্থাপত্য শিল্পানু-রাগের সাক্ষ্য আজিও বহন করিতেছে।

আকবরের পৃষ্ঠপোষকতায় সংস্কৃত সাহিত্যেরও বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়া-ছিল। আবুল ফজ্‌ল প্রদত্ত একুশ জন প্রথম পর্যায়ের মনীষীদের মধ্যে নয়জনই ছিলেন হিন্দু। তানসেন ও বাজবাহাদুর ছিলেন আকবরের রাজসভার সঙ্গীতশিল্পী। আর আবুল ফজ্‌ল ছিলেন বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন জ্ঞানী ব্যক্তি। ডক্টর স্মিথ তাঁহাকে ফ্রান্সিস্ বেকন (Francis Bacon)-এর সহিত তুলনা করিয়াছেন। আবুল ফজ্‌ল 'আকবর-নামা' ও 'আইন-ই-আকবরী' নামে দুইখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই দুইখানি গ্রন্থে আকবরের রাজত্বকাল সম্পর্কে বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। আবুল ফজ্‌লের ভ্রাতা ফৈজী ছিলেন ঐ সময়ের শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি নল-দময়ন্তী উপাখ্যান ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। নিজাম-উদ্দিন ও বদাউনী আকবরের রাজত্বকাল সম্পর্কে দুইখানি মুল্যবান গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। আকবরের আদেশে কথাসরিৎসাগর, রামায়ণ-মহাভারত, অথর্ববেদ, হরিবংশ প্রভৃতি বহু সংস্কৃত গ্রন্থ ফার্সী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। বীরবল ছিলেন আকবরের অন্যতম সভা কবি। তুলসীদাস,

সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা

* "The ancient art of Indian painting which had always continued to exist received a new direction from Akbar who induced the Hindu artists to learn Persian technique and imitate Persian style." Vide Smith's *Oxford History of India*, p. 373.

সুরদাস প্রভৃতি হিন্দি কবিগণ তাঁহাদের রচনা দ্বারা হিন্দি সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন।

আকবরের রাজত্বকাল ভারত-ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল যুগ। আকবর তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভা, রাজকীয় মর্যাদা, সামরিক ও শাসনতান্ত্রিক কৃতিত্বের জন্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজগণের অন্যতম হিসাবে পরিগণিত হইয়াছেন।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজগণের অন্যতম

আকবরের শেষ জীবন (Last days of Akbar): আকবরের জীবনের শেষ কয়েক বৎসর সুখের ছিল না। তাঁহার প্রিয় সুহৃদ আবুল ফজ্‌লের মৃত্যু (১৫৯৫), পুত্র সেলিমের বিদ্রোহ, পোর্তুগীজদের ষড়যন্ত্র প্রভৃতি নানাকারণে আকবরের মানসিক শান্তি বিনষ্ট হইয়াছিল। ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে দেহ এবং মন যখন ভারাক্রান্ত এমন সময়ে অজীর্ণ রোগে আক্রান্ত হইয়া আকবর মৃত্যুমুখে পতিত হন (১৭ই অক্টোবর)।

মৃত্যু (১৬০৫)

নবম অধ্যায়

জাহাঙ্গীর ও শাহ্‌জাহান

(Jahangir & Shah Jahan)

জাহাঙ্গীরের সিংহাসন লাভ (Accession of Jahangir): আকবরের মৃত্যুকালে তাঁহার একমাত্র পুত্র সেলিম জীবিত ছিলেন। সেলিম আকবরের জীবদ্দশায় সিংহাসন লাভের জন্য বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন, অবশ্য বিনা যুদ্ধেই আকবর পুত্রকে স্ববশে আনিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেলিম আকবরের অন্তরঙ্গ সুহৃদ আবুল ফজ্‌লকে হত্যা করাইয়াছিলেন। এই সকল কারণে আকবর সেলিমের প্রতি তেমন সন্তুষ্ট ছিলেন না। সেলিমের পুত্র খুস্‌রভ্‌ ছিলেন আকবরের প্রিয়পাত্র। মানসিংহ ও অপরাপর অভিজাতগণ বিদ্রোহী সেলিমের পরিবর্তে খুস্‌রভ্‌কে সিংহাসনে স্থাপন

সেলিমের বিদ্রোহ: উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত হইবার আশঙ্কা

করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। আকবরের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে সাধারণ্যে এই ধারণাই জন্মিয়াছিল যে, আকবর হয়ত খুস্‌রভ্‌কেই সিংহাসনাধিকার দান করিয়া যাইবেন। কিন্তু আকবর শেষ পর্যন্ত পুত্র সেলিমের দাবিই স্বীকার করিয়া নিজ পোশাক ও তরবারী উত্তরাধিকারের চিহ্নস্বরূপ সেলিমকেই দিয়া গিয়াছিলেন।

আকবর কর্তৃক সেলিম উত্তরাধিকারী মনোনীত

১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে (অক্টোবর ২৪) সেলিম 'নূর-উদ্দিন মোহম্মদ জাহাঙ্গীর বাদশাহ্‌ গাজী' উপাধি ধারণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইতিহাসে তিনি সম্রাট জাহাঙ্গীর নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। জাহাঙ্গীর বুদ্ধি-বিবেচনা বা শিক্ষার দিক দিয়া সম্রাটপদের যোগ্য ছিলেন। সিংহাসনারোহণের অব্যবহিত পরেই জাহাঙ্গীর ষাটটি ঘণ্টা যুক্ত ত্রিশ গজ লম্বা একটি সোনার শিকল আগ্রার দুর্গ হইতে যমুনা নদীর তীর পর্যন্ত ঝুলাইয়া রাখিলেন। বিচারপ্রার্থী যে-কোন ব্যক্তি এই শিকল টানিলেই তাঁহার প্রার্থনা সম্রাটের নিকট পৌঁছাইবার জন্যই এই ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন বারোটি আইনও জারী করা হইয়াছিল। এই সকল আইন বা 'দস্তুর-উল্‌-আমল' তাঁহার সাম্রাজ্যের সর্বত্র যাহাতে মানিয়া চলা হয় সেবিষয়েও তিনি সকলকে সতর্ক করিয়া দিলেন। জাহাঙ্গীর হিন্দু ও মুসলমান প্রজাবর্গকে মুক্তহস্তে দান করিরা সকলের প্রীতিভাজন হইবারও চেষ্টা করিলেন। যে সকল অভিজাত ব্যক্তি তাঁহার সিংহাসন আরোহণের বিরোধিতা করিয়াছিলেন জাহাঙ্গীর তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিলেন। সম্রাট আকবরের আমলের রাজকর্মচারীদের প্রতি উপযুক্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেও তিনি ত্রুটি করিলেন না।

সিংহাসনারোহণ: ন্যায়-বিচারের জন্য শিকলের ব্যবস্থা

বারোটি আইন জারী

কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই জাহাঙ্গীরের পুত্র খুসরু বা খুসরভ্‌ বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। মথুরার হুসেন বেগ, লাহোরের আব্দুর্ রহিম, শিখ গুরু অর্জুন তাঁহাকে সাহায্যদান করেন। জাহাঙ্গীর স্বয়ং সসৈন্যে নিজপুত্রের বিদ্রোহ দমনে অগ্রসর হইলেন। খুস্‌রভ্‌ জাহাঙ্গীরের সেনা-বাহিনীর সহিত যুদ্ধে স্বভাবতই আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না, তিনি পরাজিত হইয়া তাঁহার প্রধান অনুচরবর্গসহ ধৃত হইলেন। খুস্‌রভ্‌কে বন্দী করিয়া রাখা হইল এবং বন্দিদশায়ই তাঁহার মৃত্যু

খুসরু বা খুস্‌রভের বিদ্রোহ দমন

হইল। শিখদের পঞ্চম গুরু অর্জুন খুস্‌রভ্‌কে অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া জাহাঙ্গীর তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। এই অদূরদর্শিতার ফলে শিখজাতি জাহাঙ্গীরের চিরশত্রুতে পরিণত হইল।

মেহেরুন্নিসার সহিত বিবাহ—মেহেরুন্নিসার 'নুর-জাহান' নামকরণ

১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে জাহাঙ্গীর মেহেরুন্নিসা নামে এক অসামান্যা রূপবতী মহিলাকে বিবাহ করেন। মেহেরুন্নিসা ছিলেন মির্জা গিয়াস বেগ নামে জনৈক ইরাণীর কন্যা। প্রথমে আলী-কুল বেগ নামক এক ব্যক্তির সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। জাহাঙ্গীর আলী-কুল বেগকে 'শের আফগান' উপাধিতে ভূষিত করিয়া বাংলাদেশের বর্ধমান জেলায় জায়গীর দান করেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই শের আফগান উদ্ধত ও বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে জাহাঙ্গীর তাঁহার বিরুদ্ধে এক সামরিক অভিযান প্রেরণ করেন। শের আফগান যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন এবং মেহেরুন্নিসাকে দিল্লীতে লইয়া যাওয়া হয়। মেহেরুন্নিসার অসামান্য রূপে মুগ্ধ হইয়া জাহাঙ্গীর তাঁহাকে বিবাহ করেন। ঐ সময় হইতে তাঁহার নাম হয় 'নুর-জাহান' (Light of the World)। কেহ কেহ মনে করেন যে, জাহাঙ্গীর পূর্ব হইতেই মেহেরুন্নিসার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন।

নুর-জাহানের চরিত্র ও শাসনব্যবস্থায় প্রভাব

নুর-জাহান অসামান্যা রূপবতী মহিলাই ছিলেন না, ফার্সী সাহিত্য, কবিতা, প্রভৃতিতেও তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁহার চরিত্রের অপরাপর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। জাহাঙ্গীরের সহিত বিবাহের পর হইতেই নূরজাহান শাসনব্যবস্থায় এক অসাধারণ প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তার করেন। তাঁহার ভ্রাতা আসফ্‌ খাঁ এবং তাঁহার পিতা উভয়েই রাজসভায় উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তদুপরি নুর-জাহান তাঁহার প্রথম বিবাহের কন্যার সহিত জাহাঙ্গীরের কনিষ্ঠ পুত্র শাহ্‌রিয়ার-এর বিবাহ দিয়াছিলেন।

জাহাঙ্গীরের রাজ্যবিস্তার (Jahangir's Conquest)ঃ জাহাঙ্গীর পিতা আকবরের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া মোগল সাম্রাজ্যের সীমা বিস্তারে মনোযোগী হন। ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে আকবর বাংলাদেশ মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশের আফগান দলপতিগণ

মোগল সম্রাটের বশ্যতা সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করেন নাই। তদুপরি পুনঃপুনঃ শাসনকর্তা পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশে মোগল প্রভুত্ব দৃঢ়ভাবে স্থাপনের ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ইস্‌লাম খাঁ ছিলেন বাংলার শাসনকর্তা। এই সময়ে বাংলার আফগান জমিদারগণ কেন্দ্রীয় শাসনের প্রকাশ্য বিরোধিতা শুরু করিলেন। মোগল শক্তির সহিত পুনরায় যুঝিয়া তাঁহারা বাংলাদেশে আফগান প্রভুত্ব স্থাপনের প্রয়াসী হইলেন। আফগান নেতা ঈশা খাঁর পুত্র উস্‌মান খাঁর নেতৃত্বে বাংলার আফগান অভিজাতগণ মোগল শাসনের বিরোধিতা শুরু করিলেন এবং 'ভদ্রক' নামক স্থানে প্রথমে মোগলবাহিনীকে পরাজিত করিতেও সক্ষম হইলেন। কিন্তু ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে উস্‌মান পরাজিত ও নিহত হইলেন। উস্‌মানের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে আফগান শক্তি সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হইল, এবং বাংলাদেশ মোগল সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করিয়া লইল।

বাংলাদেশের আফগান বিদ্রোহ দমন

আকবর চিতোর জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু মেবার বীর-কেশরী রাণা প্রতাপ মোগল প্রভুত্ব অস্বীকার করিয়াই চলিয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে প্রতাপ মোগল অধিকার হইতে কয়েকটি দুর্গ পুনরধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে মেবারের রাণা ছিলেন রাণা প্রতাপের পুত্র অমর সিংহ। জাহাঙ্গীর সিংহাসন লাভ করিয়াই মেবারের বিরুদ্ধে আকবর-অনুসৃত যুদ্ধ-নীতি গ্রহণ করিলেন। তিনি যুবরাজ পর্‌বেজকে অমর সিংহের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন, কিন্তু এই অভিযান ব্যর্থ হইল। অতঃপর জাহাঙ্গীর মহাবৎ খাঁর নেতৃত্বে দ্বিতীয় অভিযান প্রেরণ করিলেন। মহাবৎ খাঁ অমর সিংহকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইলেন বটে, কিন্তু ইহার পর বারবার সেনাপতি-পরিবর্তনের ফলে মেবারকে পদানত করা সম্ভব হইল না। অবশেষে সম্রাটের তৃতীয় পুত্র খুর্‌রমের নেতৃত্বে এক অভিযান প্রেরিত হইলে অমর সিংহ পরাজিত হইলেন। অমর সিংহ ও তাঁহার পুত্র করণ সিংহ দিল্লী সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। জাহাঙ্গীর বিজিত শত্রুর প্রতি উপযুক্ত মর্যাদা প্রদর্শনে কার্পণ্য করিলেন না। অমর সিংহকে চিতোর ফিরাইয়া দেওয়া হইল এবং অতি উদার শর্তে উভয় পক্ষের মধ্যে এক শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হইল।

মেবার বিজয় (১৬১৫)

যুবরাজ করণ সিং পাঁচ হাজার সৈন্যের মন্‌সবদার নিযুক্ত হইলেন। জাহাঙ্গীরের এই রাজপুত নীতি তাঁহার রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচায়ক। পূর্বশত্রুতা ভুলিয়া গিয়া তিনি অমর সিংহ ও তাঁহার পুত্র যুবরাজ করণ সিংহের প্রতি যে-উদার ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা সত্যই প্রশংসনীয়। এমন কি, মেবারের রাণার আনুগত্যলাভে সমর্থ হইয়া জাহাঙ্গীর এত প্রীত হইয়াছিলেন যে, তিনি অমর সিংহ ও তাঁহার পুত্র করণ সিংহের মর্মর মূর্তি নির্মাণ করিয়া আগ্রার মোগল উদ্যানে স্থাপনের আদেশ দিয়াছিলেন।

কাংড়া বিজয় (১৬২০)

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে অপর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল কাংড়া বা নগরকোট দুর্গ জয়। উত্তর-পাঞ্জাবের শতদ্রু ও রাভী নদীর মধ্যবর্তী পার্বত্য অঞ্চলে দুর্ভেদ্য কাংড়া দুর্গ টি ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মোগল আক্রমণ প্রতিহত করিয়া চলিতে সমর্থ হইয়াছিল। জাহাঙ্গীর পাঞ্জাবের শাসনকর্তা মুর্তজা খাঁকে কাংড়া জয় করিবার জন্য সসৈন্যে প্রেরণ করেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইল। অবশেষে খুর্‌রমের নেতৃত্বে মোগলবাহিনী দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর অবরোধের পর এই দুর্গটি জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

মালিক অম্বর

অসীরগড় দুর্গ জয় করিবার পর আকবর সমগ্র দাক্ষিণাত্যে মোগল প্রাধান্য স্থাপনের সুযোগ গ্রহণের পূর্বেই যুবরাজ সেলিমের বিদ্রোহ দমনের জন্য উত্তর-ভারতে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। জাহাঙ্গীর সম্রাট হইয়া পিতার আরব্ধ কার্য সম্পূর্ণ করিতে অগ্রসর হইলেন। ঐ সময়ে আহ্‌ম্মদনগরের মন্ত্রী মালিক অম্বর ছিলেন দাক্ষিণাত্যের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি। দীর্ঘ বিশ বৎসরের দাক্ষিণাত্যের ইতিহাস তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়াই রচিত হইয়াছিল। মালিক অম্বর মূলতঃ হাব্‌সী জাতির লোক ছিলেন। তিনি দাক্ষিণাত্যেই স্থায়িভাবে বসবাস করিয়া সম্পূর্ণরূপে দক্ষিণ-ভারতীয় হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি অনন্যসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন রাজনীতিক ছিলেন। শাসনকার্য, যুদ্ধ-পরিচালনা, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, সর্বদিক দিয়াই মালিক অম্বর নিজ প্রতিভার পরিচয় দান করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যে তিনি টোডরমলের রাজস্বনীতির প্রবর্তন করিয়াছিলেন। মোগলশক্তিকে প্রতিহত করিতে

হইলে রাজ্যের প্রত্যেক ব্যক্তির সাহায্য ও সহানুভূতি একান্ত প্রয়োজন এই কথা তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই কারণে তিনি নানাবিধ সংস্কার সাধন করেন। কেবলমাত্র ভাড়াটিয়া মুসলমান সৈন্যের দ্বারা মোগলশক্তি প্রতিহত করা সম্ভব হইবে না বিবেচনা করিয়া তিনি দুর্ধর্ষ মারাঠা সৈনিকদের আহ্মদনগরের সেনাবাহিনীতে গ্রহণ করেন। তাঁহার নিকট হইতেই মারাঠাগণ সর্বপ্রথম 'গরিলা যুদ্ধকৌশল' (guerilla method of warfare) শিক্ষা করিয়াছিল। দাক্ষিণাত্যের মোগল প্রাধান্য বিস্তার মালিক অম্বর কর্তৃকই প্রতিহত হইয়াছিল।

জাহাঙ্গীর আহ্মদনগরের সহিত এক দীর্ঘকালব্যাপী দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইলেন। আকবর আহ্মদনগরের একাংশ জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু অপরাংশে নিজামশাহী বংশের দ্বিতীয় মূর্তজা তখনও স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন; আহ্মদনগরের মন্ত্রী মালিক অম্বর আহ্মদনগরের হৃতরাজ্যাংশ পুনরধিকার করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। দাক্ষিণাত্যের মোগল কর্মচারিগণের অযোগ্যতার সুযোগে তিনি মোগলগণ কর্তৃক আহ্মদনগরের হৃত অংশ পুনরধিকার করিতে সমর্থ হন। তিনি বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সহিত মিত্রতাবদ্ধ হইয়া মোগলশক্তির বিরুদ্ধে যুঝিবার শক্তি সঞ্চয় করেন এবং ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে মোগল আক্রমণ প্রতিহত করিতে সমর্থ হন। জাহাঙ্গীর যুবরাজ খুর্‌রমকে মালিক অম্বরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। ১৬১৭ খ্রীষ্টাব্দে খুর্‌রম মালিক অম্বরকে পরাজিত করিয়া আহ্মদনগর দুর্গ এবং বালাঘাট অঞ্চল অধিকার করিতে সমর্থ হইলেন। কিন্তু এই যুদ্ধের ফলে মোগল সাম্রাজ্য পূর্ব-দাক্ষিণাত্যে যতদূর বিস্তৃত ছিল উহা অপেক্ষা এক মাইলেরও অধিক বিস্তার লাভ করিল না। জাহাঙ্গীর মালিক অম্বরের পরাজয়ে সন্তুষ্ট হইয়া খুর্‌রমকে 'শাহ্ জাহান' *(Lord of the World)* উপাধিতে ভূষিত করিলেন।

জাহাঙ্গীরের দাক্ষিণাত্য বিজয়ের চেষ্টা

সাময়িক সাফল্য

১৬১৭ খ্রীষ্টাব্দের পরাজয়ের পরও মালিক অম্বর দমিলেন না। তিনি বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সহিত মিত্রতাচুক্তি স্থাপন করিয়া পুনরায় মোগল-অধিকৃত স্থান দখল করিতে সমর্থ হইলেন। তিনি বুরহানপুর অবরোধ করিলে শাহ্ জাহানকে পুনরায় তাঁহার বিরুদ্ধে সসৈন্যে প্রেরণ করা

হইল। মালিক অম্বর পরাজিত হইলেন, আহ্মদনগরের নূতন রাজধানী খর্কী মোগলবাহিনী কর্তৃক বিধ্বস্ত হইল। মালিক অম্বর বুরহানপুরের অবরোধ উঠাইয়া লইতে এবং মোগল সাম্রাজ্যের বিজিত স্থানসমূহ প্রত্যর্পণ করিয়া মোগল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হইলেন। কিন্তু ১৬২৩ খ্রীষ্টাব্দে গোলকুণ্ডার সাহায্য লইয়া মালিক অম্বর আবার বিজাপুর আক্রমণ করিলেন। ইতিমধ্যে শাহ্জাহান পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া মালিক অম্বরের সহিত যোগদান করিলেন। মালিক অম্বর ও শাহ্জাহানের যুগ্মবাহিনী বুরহানপুর আক্রমণ করিল। জাহাঙ্গীর যুবরাজ পর্বেজ ও মহাবৎ খাঁকে দাক্ষিণাত্যের দিকে এক বিশাল বাহিনীসহ প্রেরণ করিলে শাহ্জাহান বশ্যতা স্বীকার করিলেন। তখন বাধ্য হইয়া মালিক অম্বর যুদ্ধ ত্যাগ করিলেন। ইহার কিছুকাল পর মহবৎ খাঁকে দিল্লী প্রত্যাবর্তনের আদেশ দেওয়া হইল। ইহার পর দাক্ষিণাত্যে মোগল প্রাধান্য বিস্তারের আর কোন চেষ্টা করা হয় নাই।

আহ্মদনগরের সহিত দ্বন্দ্বের পুনরাবৃত্তি

মোগল সাম্রাজ্যের উত্তর সীমায় অবস্থিত কান্দাহারের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষ ও পারস্যের বাণিজ্যপথ ছিল। ইহা ভিন্ন কান্দাহারের রাজনৈতিক গুরুত্বও নেহাৎ কম ছিল না। এই কারণে এই স্থানের অধিকার লইয়া মোগল ও পারসিক সাম্রাজ্যের মধ্যে প্রায়ই গোলযোগের সৃষ্টি হইত। আকবরের মৃত্যু পর্যন্ত কান্দাহার মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে খুসরভ্ বা খুস্রু বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে সেই সুযোগে পারস্যরাজ শাহ্ আব্বাস্ কান্দাহার আক্রমণ করিয়া অকৃতকার্য হন। সুচতুর শাহ্ আব্বাস্ জাহাঙ্গীরের রাজসভায় দূত প্রেরণ করিয়া মোগল সম্রাটের প্রতি প্রীতি ও সৌহার্দ্য জ্ঞাপন করিলেন। উভয় সম্রাটের মধ্যেই দৌত্য বিনিময় হইল। একাদিক্রমে চারিবার পারস্য-সম্রাটের নিকট হইতে জাঙ্গাহীরের নিকট দূত প্রেরিত হইল। এইভাবে জাহাঙ্গীর যখন পারস্য-সম্রাট কর্তৃক কান্দাহার আক্রমণের কথা একপ্রকার ভুলিয়া গিয়াছেন ঠিক সেই সময়ে (১৬২২) আকস্মিকভাবে শাহ্ আব্বাস্ কান্দাহার আক্রমণ করিয়া উহা জয় করিতে সমর্থ হন। জাহাঙ্গীর শাহ্জাহানকে কান্দাহার পুনরুদ্ধারের জন্য প্রেরণ করিতে চাহিলেন। ইতিমধ্যে নূরজাহান নিজ জামাতা এবং [illegible]

পারস্য-সম্রাট কর্তৃক কান্দাহার জয়

কনিষ্ঠ পুত্র শাহ্‌রিয়ারকে জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর সিংহাসনে স্থাপন করিবার জন্য ষড়যন্ত্র শুরু করিয়াছেন। শাহ্‌জাহান এমতাবস্থায় কান্দাহারের ন্যায় দূরদেশে যুদ্ধ করিতে যাইতে রাজী হইলেন না। তিনি বিমাতা নুরজাহানের ক্রীড়নক পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা-ই স্থির করিলেন। শাহ্‌জাহান বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে জাহাঙ্গীর অত্যন্ত মর্মাহত হইলেন এবং পরবেজকেই উত্তরাধিকারী মনোনীত করিবেন স্থির করিলেন। যাহা হউক, শাহ্‌রিয়ারকে কান্দাহার পুনরুদ্ধারের জন্য প্রেরণ করা স্থির হইল। কিন্তু বিদ্রোহী শাহ্‌জাহান আহ্‌মদনগরের মন্ত্রী মালিক অম্বরের সহিত যোগদান করিয়া বুরহানপুর আক্রমণ করিলে জাহাঙ্গীর দাক্ষিণাত্যের দিকে অধিক মনোযোগ দিলেন। কাজেই কান্দাহার পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা আর কার্যকরী করা সম্ভব হইল না।

কান্দাহার পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা পরিত্যক্ত

এদিকে শাহ্‌জাহান মোগল রাজকর্মচারী খান-ই-খানান আব্দুল রহিমের সাহায্যলাভ করিয়া প্রথমেই আগ্রা দখল করিতে মনস্থ করিলেন, কিন্তু যুবরাজ পরবেজ ও মহাবৎ খাঁর হস্তে দিল্লীর নিকটবর্তী বালোচপুর নামক স্থানে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইলেন (১৬২৩)। মোগলবাহিনী কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া শাহ্‌জাহান দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হইলেন। সেখান হইতে তিনি বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং রাজমহল ও পাটনা অধিকার করিতে সমর্থ হইলেন। ইহার পর তিনি এলাহাবাদ অবরোধ করিলে মহাবৎ খাঁর হস্তে তাঁহাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। এলাহাবাদ অধিকার করিতে ব্যর্থকাম হইয়া শাহ্‌জাহান পুনরায় দাক্ষিণাত্যে চলিয়া যান। সেখানে মালিক অম্বরের সহিত যোগদান করিয়া তিনি বুরহানপুর অবরোধ করেন। পরবেজ ও মহাবৎ খাঁ দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হইলে শাহ্‌জাহান আত্মসমর্পণ করেন এবং মোগল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। উদারহৃদয় জাহাঙ্গীর অপরাধী পুত্রকে ক্ষমা করেন।

শাহ্‌জাহানের বিদ্রোহ

শাহ্‌জাহানের বিদ্রোহ-দমনে মহাবৎ খাঁর কৃতিত্বে নুরজাহান সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিলেন। পরবেজ ও মহাবৎ খাঁ অত্যন্ত শক্তি ও প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠিতেছেন দেখিয়া নুরজাহান মহাবৎ খাঁকে বাংলাদেশে প্রেরণের ব্যবস্থা করিলেন। এইভাবে ক্রমেই মহাবৎ খাঁ নুরজাহানের ব্যবহারে অতিষ্ঠ হইয়া

শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। সাময়িকভাবে তিনি জাহাঙ্গীর ও নূরজাহানকে বন্দী করিতে সক্ষম হইলেন, কিন্তু নূরজাহানের কৌশলে উভয়েই বন্দিদশা হইতে মুক্ত হইয়া পলায়ন করিতে সমর্থ হইলেন। রোটাস নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া জাহাঙ্গীর তাঁহার অনুচরদের সাহায্যে একদল সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। পরিস্থিতির এইরূপ পরিবর্তন ঘটিলে মহাবৎ খাঁ পলাইয়া গেলেন এবং শাহ্‌জাহানের নিকট আশ্রয়প্রার্থী হইলেন। কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরেই জাহাঙ্গীরের মৃত্যু ঘটিলে (১৬২৭) এক নূতন জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হইল। জাহাঙ্গীরের পুত্রদের মধ্যে পর্‌বেজ ও খুস্‌রু ইতিপূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। ফলে, শাহ্‌জাহান ও জাহাঙ্গীরের কনিষ্ঠ পুত্র শাহ্‌রিয়ার উভয়েই সিংহাসন লাভের উদ্দেশ্যে এক আত্মঘাতী অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত হইলেন।

মহাবৎ খাঁর বিদ্রোহ

জাহাঙ্গীরের মৃত্যু (১৬২৭)

হকিন্স্ ও টমাস্ রো-এর দৌত্য (Embassies of Capt. William Hawkins & Thomas Roe): ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন হকিন্স্ ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেম্‌সের নিকট হইতে এক অনুরোধ-পত্র লইয়া জাহাঙ্গীরের রাজসভায় উপস্থিত হন। এই পত্রে ইংলণ্ডরাজ প্রথম জেম্‌স্ জাহাঙ্গীরের নিকট ইংরেজ বণিকদের জন্য বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা চাহিয়া অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। জাহাঙ্গীর ক্যাপ্টেন হকিন্স্‌কে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনে ত্রুটি করিলেন না। হকিন্সের ব্যবহারে প্রীত হইয়া ইংরেজদের প্রার্থিত সকল সুযোগ-সুবিধা জাহাঙ্গীর মঞ্জুর করিলেন। হকিন্স্ মোগল দরবারের রীতি-নীতি, আইন-অনুষ্ঠান প্রতি সম্পর্কে একটি বিশদ বিবরণ রচনা করিয়াছিলেন। হকিন্সের দৌত্য আপাতদৃষ্টিতে কার্যকরী হইলেও পোর্তুগীজদের বিরোধিতায় ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

হকিন্সের প্রাথমিক সাফল্য

পোর্তুগীজ বিরোধিতায় হকিন্সের দৌত্য বিফল

১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডরাজ প্রথম জেম্‌স্ পুনরায় সার্ টমাস্ রো নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে জাহাঙ্গীরের রাজসভায় দূত হিসাবে প্রেরণ করিলেন। ইংরাজ বণিকদের জন্য বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা লাভ করা-ই ছিল এই

দৌত্যের উদ্দেশ্য। পোর্তুগীজ বণিকগণ ইংরাজ বণিকদের কোনপ্রকার সুযোগ-সুবিধা লাভের পক্ষপাতী ছিল না। তাহাদের বিরোধিতায় টমাস্ রো-এর কাজ বহু পরিমাণে জটিল হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু বহু চেষ্টায় টমাস্ রো ইংরাজ বণিকদের জন্য বিনা শুল্কে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য-চালনার অধিকার লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। টমাস্ রো এবং তাঁহার সহকারী এডোয়ার্ড টেরি উভয়েই জাহাঙ্গীরের আমলের নানা তথ্যপূর্ণ ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

টমাস্ রো কর্তৃক নানা প্রকার বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা লাভ

জাহাঙ্গীরের চরিত্র (Character of Jahangir): জাহাঙ্গীরের চরিত্র সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতদ্বৈধ আছে। কোন কোন ঐতিহাসিক তাঁহাকে অলস, ব্যভিচারী, আরামপ্রিয় ও অত্যাচারী শাসক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি নিজ পিতা আকবরের ন্যায় বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন না সত্য এবং তাঁহার চরিত্রের অপকর্ষতারও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, তথাপি রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, শিল্প ও সাহিত্যানুরাগ, সৌন্দর্য ও মমত্ববোধ তাঁহার চরিত্রের ত্রুটি অনেক পরিমাণে স্খালন করিয়াছিল, একথাও স্বীকার করিতে হইবে। শাসন-সংক্রান্ত জটিলতম সমস্যা উপলব্ধি করিবার মতো মানসিক ক্ষমতা তাঁহার ছিল। অত্যধিক মাদকদ্রব্যাদি সেবনের ফলে জীবনের শেষভাগে অবশ্য তাঁহার বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা কতক পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তথাপি জীবনের অধিকাংশ সময়েই তিনি সম্রাটসুলভ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

জাহাঙ্গীরের চরিত্রের বিভিন্ন দিক

শাসনকার্য পরিচালনায় তিনি অপর কোন ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণ করিতেন না এবং কেহ তাঁহার মতের বিরোধিতা করিলে তিনি তাহাও সহ্য করিতেন না। কিন্তু রাজত্বকালের শেষ ভাগে তাঁহার এই উদ্ধত প্রকৃতির কতকটা পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। সামরিক অভিযানের যাবতীয় পরিকল্পনা জাহাঙ্গীর স্বয়ং প্রস্তুত করিতেন। সেনাপতি হিসাবেও তিনি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। বিচার-ব্যাপারে তিনি ব্যক্তি ও ব্যক্তির মধ্যে কোন প্রভেদ করিতেন না। ধনী, দরিদ্র সকলেই যাহাতে তাঁহার নিকট সরাসরি বিচারপ্রার্থী হইতে পারে সেজন্য তিনি ষাটটি ঘণ্টাযুক্ত

তাঁহার সর্বময় কর্তৃত্ব ও ঔদ্ধত্য

বিচার বিষয়ে ন্যায় ও সততা

একটি সোনার শিকল প্রস্তুত করিয়া উহা আগ্রার প্রাসাদ হইতে যমুনা নদীর তীর পর্যন্ত ঝুলাইয়া দিয়াছিলেন। এই শিকল টানিলেই বিচারপ্রার্থীর আবেদন সম্রাটের নিকট পৌঁছিবার ব্যবস্থা করা হইত। জাহাঙ্গীরই মোগলযুগের সর্বপ্রথম লিখিত বারোটি আইন প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

অন্তর ছিল শিশু অপেক্ষাও কোমল। আত্মীয়-স্বজন এমনকি পশুপক্ষীর জন্যও তাঁহার দয়া ও মমত্ববোধের সীমা ছিল না, কিন্তু ক্রোধের বশবর্তী হইলে তিনি নৃশংসতার চূড়ান্ত করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। শিল্প ও সাহিত্যের প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল। তিনি তুর্কী ভাষায় কথা বলিতে পারিতেন এবং পারসিক ভাষায়ও তাঁহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। তিনি নিজ জীবনস্মৃতি রচনা করিয়াছিলেন এবং ইহাতে তাঁহার জীবনের ঘটনাগুলি অকপটে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। ইতিহাস, ভূগোল, জীবনচরিত প্রভৃতি পাঠে তিনি আনন্দ লাভ করিতেন।

বিভিন্ন গুণাপগুণ

চিত্রশিল্পের প্রতিও তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তাঁহার রাজসভায় হিন্দি কবি এবং বিভিন্ন ধর্মের ধর্মজ্ঞানী ও সাধুসন্ত যথেষ্ট সম্মান লাভ করিতেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপলব্ধি করিবার মতো মানসিক উৎকর্ষ তাঁহার ছিল। আগ্রার প্রাসাদের দেওয়াল-চিত্রগুলির কতকাংশ জাহাঙ্গীর স্বয়ং অঙ্কন করিয়াছিলেন। স্থাপত্য-শিল্পেও তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। তাঁহার সঙ্গীতপ্রীতি ছিল অসাধারণ। ধর্মব্যাপারে তিনি ছিলেন এক রহস্যস্বরূপ। প্রকৃতপক্ষে তিনি কোন্ ধর্ম পালন করিতেন সেবিষয়ে বিভিন্ন মত রহিয়াছে। তিনি পরধর্মসহিষ্ণুতা ও ধর্মোন্মত্ততার এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ ছিলেন। কোন সময়ে পরধর্মের প্রতি চরম উদারতা প্রদর্শন কখনও বা অসহিষ্ণুতাবশতঃ চরম নির্যাতন ছিল তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

এইভাবে নানাবিধ সদ্‌গুণের সহিত জাহাঙ্গীরের চরিত্রের অপকর্ষতাও মিশিয়া ছিল। এই কারণে টেরি প্রভৃতি সমসাময়িক লেখকদের বর্ণনায় তাঁহাকে পরস্পর-বিরুদ্ধ গুণাবলীর এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ বলা হইয়াছে।*

বিরুদ্ধ গুণের সংমিশ্রণ

* "Now for the disposition of that king, it ever seemed unto me to be composed of extremes ; for sometimes he was barbarously cruel and at other times he would seem to be exceedingly fair and gentle."

Edward Terry, Vide *Oxford History of India* : Smith, p. 387.

শাহ্‌জাহান, ১৬২৮ (Shah Jahan) : কাশ্মীর হইতে ফিরিবার পথে জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হইলে (অক্টোবর, ১৬২৭) শাহ্‌জাহান ও শাহ্‌রিয়ার-এর মধ্যে এক উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব অনিবার্য হইয়া উঠিল। পিতার মৃত্যুকালে শাহ্‌জাহান দাক্ষিণাত্যে অবস্থান করিতেছিলেন। এই সুযোগে নূরজাহানের সাহায্যে যুবরাজ শাহ্‌রিয়ার লাহোর হইতে নিজেকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন। শাহ্‌রিয়ার ছিলেন নূরজাহানের জামাতা। অপর পক্ষে শাহ্‌জাহান নূরজাহানের ভ্রাতা আসফ্‌ খাঁর কন্যা মমতাজকে বিবাহ করিয়াছিলেন। আসফ্‌ খাঁ স্বভাবতই শাহ্‌-জাহানের সিংহাসনলাভের পক্ষপাতী ছিলেন। এইরূপ আত্মীয়তার সূত্র ধরিয়া উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব জটিলতর হইয়া উঠিল। এদিকে আসফ্‌ খাঁ শাহ্‌জাহান আগ্রা পৌঁছিবার পূর্ব পর্যন্ত সিংহাসন যাহাতে শূন্য না থাকে সেইজন্য খুসরু'র পুত্র দাওর বক্স্‌কে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। যুবরাজ শাহ্‌রিয়ার নূরজাহানের সাহায্যেও আসফ্‌ খাঁর সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না। আসফ্‌ খাঁর হস্তে তিনি পরাজিত ও ধৃত হইলে তাঁহার চক্ষু উৎপাটন করিয়া সিংহাসন লাভের অযোগ্য করিয়া রাখা হইল। শাহ্‌জাহান দাক্ষিণাত্য হইতে আগ্রা পৌঁছিবার মধ্যপথ হইতেই আদেশ দিলেন যে, দিল্লীর সিংহাসন দাবি করিতে পারে এইরূপ যাবতীয় পুরুষকে যেন অবিলম্বে হত্যা করা হয়। আসফ্‌ খাঁর তৎপরতায় এই আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হইল। একমাত্র দাওর বক্স্‌ পারস্য দেশে পলাইয়া গিয়া প্রাণে বাঁচিলেন। এইভাবে রক্তস্নানের পর শাহ্‌জাহান ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব

শাহ্‌জাহানের সিংহাসন লাভ (১৬২৮)

তাঁহার বিপত্তি (His difficulties) : সিংহাসন দাবি করিতে পারে এইরূপ কোন উত্তরাধিকারীকে জীবিত অবস্থায় না রাখিয়া শাহ্‌জাহান যখন সিংহাসনে আরোহণ করিলেন তখন আপাতদৃষ্টিতে সব কিছুই সহজ ও শান্ত বলিয়া মনে হইল। পরম আনন্দ, উৎসাহ ও উদ্দীপনা লইয়া শাহ্‌জাহান শাসনকার্য শুরু করিলেন। প্রথমেই তিনি আসফ্‌ খাঁ ও মহাবৎ খাঁকে উপযুক্ত সম্মানে পুরস্কৃত করিলেন। আসফ্‌ খাঁ সম্রাটের 'ওয়াজীর' বা মন্ত্রিপদে উন্নীত হইলেন আর মহাবৎ খাঁ আজমীরের শাসনকর্তার পদ লাভ করিলেন। কিন্তু অল্পকালের

বুন্দেলা নেতা জুঝর সিংহের বিদ্রোহ

মধ্যেই বুন্দেলখণ্ডের রাজপুত জাতির বুন্দেলা নেতা জুঝর সিংহ বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। এই বিদ্রোহ অবশ্য সহজেই দমন করা হইল, কিন্তু জুঝর সিংহকে সম্পূর্ণভাবে দমন করা সম্ভব হইল না। কয়েক বৎসর পরে তিনি পুনরায় বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে যুদ্ধে তাঁহার মৃত্যু হইল। তাঁহার মৃত্যুর পর অবশ্য বুন্দেলাগণ আর কোন বিদ্রোহে লিপ্ত হয় নাই।

খান জাহানের বিদ্রোহ

শাহ্‌জাহানের রাজত্বের দ্বিতীয় বৎসরে আফগান নেতা খান জাহান লোদী আহ্‌ম্মদনগরের নিজামশাহী সুলতান নিজাম-উল্‌-মুল্‌কের সহিত যোগদান করিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। শাহ্‌জাহান এই বিদ্রোহ দমনের জন্য সুদক্ষ ও সাহসী সৈন্যদল প্রেরণ করিলেন। দীর্ঘ চারি বৎসর ধরিয়া আফগান নেতা খান জাহান একপ্রকার সমভাবেই মোগল শক্তির সহিত যুদ্ধ করিয়া চলিলেন। অবশেষে কালিঞ্জরের নিকটে তাল সেহওন্দ (Tal Sehonda)-এর যুদ্ধে তিনি পরাজিত এবং নৃশংসভাবে নিহত হইলেন।

দাক্ষিণাত্য ও গুজরাটের চরম দুর্দশা

দুর্ভিক্ষ (Famine) ঃ শাহ্‌জাহানের সিংহাসন লাভের দুই বৎসর পর (১৬২৮-৩০) দাক্ষিণাত্য ও গুজরাটে এক ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। রাজসভার ঐতিহাসিক আব্দুল হামিদ লাহোরী দাক্ষিণাত্য ও গুজরাটের দুর্ভিক্ষের যে বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন তাহা হইতে এই দুই স্থানের জনসাধারণের অবর্ণনীয় দুর্দশার কথা জানিতে পারা যায়। "সামান্য রুটির জন্য মানুষ বিক্রয় করিতেও লোকে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু এই মূল্যেও কোন ক্রেতা পাওয়া যাইত না। ক্ষুধার জ্বালায় মানুষ মানুষের মাংস অবধি খাইতে বাধ্য হইয়াছিল। নিজ সন্তানের মাংস ভক্ষণে মানুষের কোন দ্বিধা ছিল না। মৃতদেহের স্তূপে রাস্তাঘাটে চলাচল অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। এইভাবে এক অতি উর্বর শস্য-শ্যামল দেশ শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল।"* ইংরাজ পর্যটক পিটার মাণ্ডি

* "The inhabitants of these two countries (the Deccan and Gujarat) were reduced to the direst extremity. Life was offered for a loaf but none would buy ; rank was to be sold for a cake but none cared for it...Destitution at last reached such a pitch that men began to devour each other, and the flesh of a son was preferred to his love. The number of the dying caused obstructions on the roads..." Abdul Hamid Lahori, Vide Smith's *Oxford History of India*, p. 393. *An Advanced History of India*, p. 472.

(Peter Mundy) স্বচক্ষে এই বীভৎস দৃশ্য দেখিয়াছিলেন। তাঁহার রচনায়ও অনুরূপ বিবরণ পাওয়া যায়। হতভাগ্যদের মৃতদেহ এমনভাবে সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়া রহিয়াছিল যে, পিটার মাণ্ডি ক্ষুদ্র একটি তাঁবু খাটাইবার মতো স্থানও পান নাই।

পিটার মাণ্ডির বর্ণনায় শাহ্‌জাহান দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত প্রজাবর্গের সাহায্যার্থে কোন কিছু করেন নাই বলা হইয়াছে। বস্তুতপক্ষে শাহ্‌জাহান সরকারী ব্যয়ে খাদ্য বিতরণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং মোট সত্তর লক্ষ টাকা রাজস্ব মকুব করিয়া দিয়াছিলেন। জায়গীরদারগণকেও অনুরূপ উদারতা প্রদর্শনের জন্য সম্রাটের অনুরোধ জানান হইয়াছিল। এই সকল তথ্য 'বাদশাহ্-নামা' নামক সমসাময়িক গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায়। সার্ রিচার্ড টেম্প্‌ল্ (Sir Richard Temple) পিটার মাণ্ডির বর্ণনাকেই গ্রহণযোগ্য মনে করিয়াছেন এবং সার্ রিচার্ড টেম্প্‌ল্-র মন্তব্যের উপর নির্ভর করিয়া ডক্টর স্মিথ্ মোগল যুগ অপেক্ষা ব্রিটিশ শাসনাধীনে ভারতবাসী অধিক সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছিল এই কথাই বলিতে চাহিয়াছেন। রিচার্ড টেম্প্‌ল্ ও ডক্টর স্মিথের মন্তব্য পক্ষপাত দোষে দুষ্ট, বলা বাহুল্য।

শাহ্‌জাহান কর্তৃক দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িতদের সাহায্যদান

পোর্তুগীজ দমন (Suppression of the Portuguese): ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাটের অনুমতি লইয়া পোর্তুগীজ বণিকগণ বাংলাদেশের সাতগাঁ বা সাতগাঁও নামক স্থানে নদীর তীরে তাহাদের বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করে। ক্রমে তাহারা হুগলী নামক স্থানে তাহাদের বাণিজ্যকেন্দ্র স্থানান্তরিত করে। পোর্তুগীজ বণিকগণ স্বভাবতই ছিল দুর্নীতি-পরায়ণ। শুল্ক ফাঁকি দিয়া বাণিজ্য পরিচালনা, নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র কৃষকদের উপর অত্যাচার, বলপূর্বক ভারতীয়দের খ্রীষ্টধর্মে ধর্মান্তরিতকরণ এবং সুযোগ পাইলে যাহাকে তাহাকে ধরিয়া আনিয়া ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রয় প্রভৃতি যাবতীয় অপকর্মে তাহারা সিদ্ধহস্ত ছিল।

পোর্তুগীজ বণিকদের আচরণ

সিংহাসনে আরোহণের পূর্বেই শাহ্‌জাহান পোর্তুগীজদের অন্যায় অত্যাচারের বিষয় অবগত ছিলেন। শাহ্‌জাহান যখন পিতার বিরুদ্ধে

বিদ্রোহে লিপ্ত তখন মমতাজমহলের দুইজন ক্রীতদাসী বালিকাকে হুগলীর পোর্তুগীজগণ বলপূর্বক লইয়া গিয়াছিল। সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর পোর্তুগীজদের দমন করিবার তাঁহার সুযোগ হইল। শাহ্‌জাহান বাংলার শাসনকর্তা কাশিম খাঁকে পোর্তুগীজদের উচিত শিক্ষা দিবার আদেশ করিলেন।

পোর্তুগীজদের শাস্তি-বিধান

কাশিম খাঁর পুত্র এনায়েৎ-উল্লাহ্‌ পোর্তুগীজদের বাণিজ্যকেন্দ্র হুগলী আক্রমণ করিলেন এবং তিনমাসেরও অধিককাল যুদ্ধ করিয়া পোর্তুগীজদের সমুচিত শিক্ষা দিলেন। দশ হাজার পোর্তুগীজদের মৃত্যু হইল, ৪,৪০০ মোগলবাহিনী কর্তৃক ধৃত হইল এবং ইহাদিগকে বন্দী অবস্থায় আগ্রায় প্রেরণ করা হইল। সেখানে অনেকে ইস্‌লামধর্ম গ্রহণে বাধ্য হইল আর অনেকে অশেষ নির্যাতন ভোগ করিয়া প্রাণ হারাইল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য যাহারা বাঁচিয়া রহিল তাহাদিগকে পুনরায় হুগলীতে ফিরিয়া যাইবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল।

শাহ্‌জাহানের ধর্মনীতি (Religious policy of Shah Jahan) : সম্রাট আকবর কর্তৃক প্রবর্তিত সর্ব-ধর্মসহিষ্ণুতার নীতি মোটামুটিভাবে জাহাঙ্গীরের আমলেও অনুসৃত হইয়াছিল। যদিও জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের

পরধর্মসহিষ্ণুতার নীতি পরিত্যক্ত

শেষভাগে হিন্দুমন্দিরাদি নির্মাণ করা নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল তথাপি তাঁহার আমলে হিন্দু তথা অপর কোন ধর্ম-সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার করা শাসন-নীতি হিসাবে গৃহীত হয় নাই। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল ধর্মবিষয়ে উদারতার জন্যই বরঞ্চ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালে পূর্বে অনুসৃত পরধর্মসহিষ্ণুতার নীতি যেমন পরিত্যক্ত হইয়াছিল, তেমনি ভবিষ্যতে ধর্মান্ধ-নীতি ও পর-ধর্মাবলম্বীদের উপর অত্যাচারের ইঙ্গিত দিয়াছিল। ঔরংজেবের আমলের সংকীর্ণ ধর্মান্ধতার পূর্ব-ছায়াপাত শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালেই পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

সাম্রাজ্য বিস্তার-নীতি (Policy of Imperial Expansion) :

(১) দাক্ষিণাত্য-নীতি (Deccan Policy) : শাহ্‌জাহান চিরাচরিত মোগলনীতির অনুসরণ করিয়া দাক্ষিণাত্যের সুলতানি রাজ্যগুলি জয়ে মনোনিবেশ করেন। আকবর ও জাহাঙ্গীরের দাক্ষিণাত্য-নীতি রাজনৈতিক

উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ছিল। কিন্তু শাহ্‌জাহানের দাক্ষিণাত্য-নীতির পশ্চাতে কেবলমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল এমন নহে। তিনি ছিলেন গোঁড়া সুন্নী মুসলমান। দাক্ষিণাত্যের বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার 'সিয়া' সম্প্রদায়ের মুসলমানদের তিনি বিধর্মী বলিয়া মনে করিতেন। 'সিয়া' সম্প্রদায়ের ধ্বংসসাধন ছিল তাঁহার দাক্ষিণাত্য-নীতির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। সুতরাং রাজনৈতিক ও ধর্মনৈতিক উদ্দেশ্য লইয়াই শাহ্‌জাহান দাক্ষিণাত্য-বিজয়ে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

শাহ্‌জাহানের দাক্ষিণাত্য-নীতির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য—রাজনৈতিক ও ধর্ম নৈতিক

মোগলসম্রাট আকবর দাক্ষিণাত্যের সুলতানি সাম্রাজ্য জয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু এবিষয়ে তিনি আংশিক সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন মাত্র। ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি খান্দেশ এবং ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে আহ্‌ম্মদনগর মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। অসীরগড় জয় করিবার কালে যুবরাজ সেলিম বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে অসীরগড় জয় সমাপ্ত করিয়াই দাক্ষিণাত্য-বিজয় তাঁহাকে স্থগিত রাখিতে হইয়াছিল। জাহাঙ্গীরের আমলে আহ্‌ম্মদনগর জয়ের চেষ্টা মালিক অম্বর কর্তৃক প্রতিহত হইয়াছিল। দীর্ঘকাল যুঝিয়াও আকবরের রাজত্বকালে মোগল সাম্রাজ্য দাক্ষিণাত্যে যতদূর বিস্তৃত ছিল তদপেক্ষা অতি সামান্যও জাহাঙ্গীর বিস্তৃত করিতে সমর্থ হন নাই।

আকবর ও জাহাঙ্গীরের দাক্ষিণাত্য-বিজয়

কিন্তু শাহ্‌জাহানের রাজত্বকাল হইতে মোগল সম্রাটগণের দাক্ষিণাত্য-নীতির এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হয়। ইতিমধ্যে আহ্‌ম্মদনগরের সুযোগ্য মন্ত্রী মালিক অম্বরের মৃত্যু হইয়াছে এবং তাহার ফলে তাঁহার পুত্র ফতে খাঁ মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন। ফতে খাঁ ছিলেন মালিক অম্বরের অযোগ্য পুত্র। তাঁহার বিশ্বাসঘাতকতার ফলেই আহ্‌ম্মদনগর মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। ১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে মোগলবাহিনী আহ্‌ম্মদনগরের পরীন্দা নামক দুর্গটি জয় করিতে চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হয়। বস্তুতপক্ষে মালিক অম্বরের ন্যায় স্বাধীনতাকামী কোন মন্ত্রীর অধীনে আহ্‌ম্মদনগর মোগল আক্রমণ প্রতিহত করিয়া চলিতে হয়ত সক্ষম হইত। কিন্তু ফতে খাঁ নিজ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে সুলতান নিজাম-উল্-মুল্‌ককে বন্দী করিয়া রাখিলেন এবং মোগল

শাহ্‌জাহানের আমলে মোগল সম্রাটগণের দাক্ষিণাত্য-নীতির পরিবর্তন

সম্রাট শাহ্জাহানের সহিত গোপনে পত্রালাপ করিতে লাগিলেন। শাহ্জাহানের ইঙ্গিতে তিনি শেষ পর্যন্ত নিজাম-উল্-মুল্ককে হত্যা করাইয়া তাঁহার দশ বৎসরের নাবালক পুত্র হুসেন শাহ্কে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া নিজ ক্ষমতা নিরঙ্কুশ করিয়া তুলিলেন। কিন্তু ফতে খাঁ কেবল মুখেই মোগল সম্রাটের প্রতি সৌহার্দ্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার বিশ্বাসঘাতকতা প্রকট হইয়া উঠিলে ১৬৩১ খ্রীষ্টাব্দে মোগলবাহিনী দৌলতাবাদ দুর্গটি অবরোধ করিল। প্রথমে তিনি মোগলবাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন, কিন্তু পরে দশলক্ষ পঞ্চাশ হাজার মুদ্রা উৎকোচ গ্রহণ করিয়া দুর্গটি মোগল সেনাবাহিনীর হস্তে সমর্পণ করিলেন।

ফতে খাঁর বিশ্বাস-ঘাতকতা

উৎকোচ গ্রহণপূর্বক ফতে খাঁ কর্তৃক দৌলতাবাদ দুর্গ সমর্পণ

মালিক অম্বরের অপদার্থ পুত্র ফতে খাঁ কর্তৃক দৌলতাবাদ দুর্গ সমর্পণ আহ্মদনগর সুলতানির অবসান ঘটাইল। ১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দে আহ্মদনগর মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হইল এবং নিজামশাহী বংশের শেষ সুলতান নাবালক হুসেন শাহ্ গোয়ালিওর দুর্গে জীবনের অবশিষ্ট কাল বন্দিদশায় কাটাইলেন।

আহ্মদনগরের মোগল সাম্রাজ্যভুক্তি

আহ্মদনগর মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া শাহ্জাহান গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর জয়ে প্রবৃত্ত হইলেন। সিয়া-সম্প্রদায়ভুক্ত বিজাপুরের ঐশ্বর্যশালী আদিলশাহী বংশের স্বাধীনতা শাহ্জাহানের নিকট অসহ্য ছিল। এই সময়ে মারাঠা নেতা শাহজী (শিবাজীর পিতা) নিজামশাহী বংশের এক বালককে আহ্মদনগরের সুলতান বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ইতিমধ্যে শাহ্জাহান জানিতে পারিলেন যে, বিজাপুরের সুলতান আহ্মদনগরের স্বাধীনতাকামী বিদ্রোহীদিগকে সাহায্যদান করিতেছেন। শাহ্জাহান বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সুলতানগণকে শাহজীর পক্ষ অবলম্বন না করিতে আদেশ দিলেন এবং মোগল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিয়া নিয়মিত করদানে চুক্তিবদ্ধ হইতে বলিলেন।

শাহজী কর্তৃক আহ্মদনগরের পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা

শাহ্জাহান ১৬৩৬ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্চাশ হাজার সৈন্যসহ বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। গোলকুণ্ডার সুলতান মোগল সেনাবাহিনীর

সহিত যুদ্ধে পরাজয় নিশ্চিত মনে করিয়া শাহ্‌জাহানের বশ্যতা স্বীকার করিয়া লইলেন। বিজাপুরের সুলতান কাপুরুষতা অপেক্ষা যুদ্ধে প্রাণদান শ্রেয়ঃ মনে করিয়া মোগল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিলেন না। তখন মোগল সেনাবাহিনী তিন দিক হইতে বিজাপুর আক্রমণ করিল।

গোলকুণ্ডা কর্তৃক বিনা যুদ্ধে মোগল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার

বিজাপুর রাজ্যের যে সকল স্থানে মোগলবাহিনী প্রবেশ করিল সেই সকল স্থান শ্মশানে পরিণত হইল। অসংখ্য নর-নারীকে হত্যা ও ততোধিক নর-নারীকে ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী হিসাবে বিক্রয় করিয়া মোগলবাহিনী বিজাপুর সুলতানের স্বাধীনতা-স্পৃহার উপযুক্ত শাস্তি দান করিল। ১৬৩৬ খ্রীষ্টাব্দে বিজাপুরের সুলতান আদিল শাহ্‌ শাহ্‌জাহানের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। আহ্‌ম্মদনগর রাজ্যটি বিজাপুর সুলতান ও মোগল সম্রাটের মধ্যে ভাগ করিয়া লওয়া হইল। পঞ্চাশটি পরগণা বিজাপুর সুলতানের রাজ্যভুক্ত হইল। ক্ষতিপূরণ এবং কর হিসাবে কুড়ি লক্ষ মুদ্রা বিজাপুর সুলতানের নিকট হইতে আদায় করা হইল। বিজাপুর সুলতানকে বাৎসরিক কোন নির্দিষ্ট করদানের প্রতিশ্রুতি দিতে হইল না বটে, কিন্তু মোগল সম্রাটকে প্রতি বৎসর উপঢৌকন প্রেরণের শর্ত তাঁহাকে মানিয়া লইতে হইল।

বিজাপুরের বিরুদ্ধে শাহ্‌জাহানের অভিযান

বিজাপুরের বশ্যতা-স্বীকার

দাক্ষিণাত্যে মোগল সাম্রাজ্যের চারিটি প্রদেশ—খান্দেশ, বেরার, তেলিঙ্গানা ও দৌলতাবাদ যুবরাজ ঔরংজেবের অধীনে স্থাপন করা হইল। ১৬৩৬ খ্রীঃ হইতে ১৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ঔরংজেব দাক্ষিণাত্যের শাসন-কর্তৃপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ঐ সময়ে তিনি নাসিকের নিকটে বাগ্‌লানা (Baglana) নামক স্থানটি দখল করেন। ১৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ভগ্নী জাহানারা আগুনে পুড়িয়া মরণাপন্ন হইলে ঔরংজেব তাঁহাকে দেখিবার জন্য আগ্রায় উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে তাঁহাকে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তার পদত্যাগ করিতে বাধ্য করা হইল। কি কারণে তাঁহাকে পদচ্যুত করা হইয়াছিল সেবিষয়ে কোন তথ্য জানা যায় নাই বটে, কিন্তু ইহা যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ছিল সেবিষয়ে সন্দেহ নাই।

ঔরংজেবের দাক্ষিণাত্য শাসন (১৬৩৬—৪৪)

ঔরংজেবের পদচ্যুতি (১৬৪৪)

কয়েক বৎসর পর শাহ্‌জাহান পুনরায় ঔরংজেবকে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। এইবার ঔরংজেব বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা সম্পূর্ণভাবে মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করিবার জন্য কৃতসংকল্প হন। কারণ এই দুই রাজ্যের প্রায় স্বাধীন মর্যাদাভোগ ঔরংজেবের মনঃপূত ছিল না। সিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর সুলতানগণকে সম্পূর্ণভাবে দমন করাই ছিল সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত পরধর্ম-অসহিষ্ণু ঔরংজেবের আন্তরিক ইচ্ছা। তদুপরি এই দুই রাজ্যের অপর্যাপ্ত ধনরত্নের প্রতিও তাঁহার লোভ ছিল।

দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তৃপদে ঔরংজেবের পুনর্নিয়োগ

১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিশ্রুত কর অনাদায়ের অজুহাতে ঔরংজেব গোলকুণ্ডা আক্রমণ করিলেন। এই আক্রমণের পশ্চাতে সম্রাট শাহ্‌জাহানের পূর্ণ সমর্থন ছিল। মোগলবাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত দুর্বলচেতা গোলকুণ্ডা সুলতান কুতব শাহ্‌ শান্তির প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু ঔরংজেব সমগ্র গোলকুণ্ডা মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করিতে ইচ্ছুক ছিলেন বলিয়া তিনি শান্তির প্রস্তাব এড়াইয়া গেলেন। এদিকে দারা ও জাহানারার পরামর্শে শাহ্‌জাহান ঔরংজেবকে গোলকুণ্ডা রাজ্যের সহিত যুদ্ধ মিটাইয়া ফেলিবার আদেশ দিলে ঔরংজেব বাধ্য হইয়া ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রভূত পরিমাণ অর্থ এবং গোলকুণ্ডা রাজ্যের একটি জেলা কুতব শাহের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইলেন। সুচতুর ঔরংজেব নিজ পুত্র মোহম্মদের সহিত কুতব শাহের একমাত্র কন্যার বিবাহ দিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর মোহম্মদ গোলকুণ্ডার সিংহাসন লাভ করিবেন এই স্বীকৃতিও আদায় করিয়া লইলেন।

গোলকুণ্ডা রাজ্য আক্রমণ (১৬৫৬)

বিজাপুর রাজ্যের সুলতান একপ্রকার স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করিতেছিলেন। ১৬৩৬ খ্রীষ্টাব্দের চুক্তির ফলে তাঁহার স্বাধীন মর্যাদা তেমন ক্ষুণ্ণ হয় নাই। তিনি ১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দে জিঞ্জী দুর্গটি দখল করেন এবং পোর্তুগীজদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধে জয়লাভ করেন। কিন্তু সুলতান আদিল শাহের মৃত্যুর পর (১৬৫৬) তাঁহার অষ্টাদশ বর্ষীয় পুত্র সুলতান হইলে বিজাপুর রাজ্যে গোলযোগের সৃষ্টি হয়। সেই সুযোগে ঔরংজেব মীর জুম্‌লার সাহায্য লইয়া বিজাপুর রাজ্য আক্রমণ করিলেন (১৬৫৭)। বিজাপুর মোগলবাহিনী কর্তৃক বিধ্বস্ত

বিজাপুর রাজ্য আক্রমণ (১৬৫৭)

হইল। সমগ্র বিজাপুর রাজ্যজয় যখন ঔরংজেবের প্রায় সমাপ্ত তখন শাহ্‌জাহানের আদেশে ঔরংজেবকে বাধ্য হইয়া বিজাপুর সুলতানের সহিত শান্তি স্থাপন করিতে হইল। বিজাপুর সুলতান বিদর, কল্যাণী, পরীন্দা ও আরও কয়েকটি স্থান মোগলদের সমর্পণ করিতে এবং প্রভূত পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে দিতে বাধ্য হইলেন।

মোগল সাম্রাজ্যের প্রয়োজনের দিক হইতে বিচার করিলে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা জয়ের কোন প্রয়োজন ছিল না বা দাক্ষিণাত্যের দিকে সাম্রাজ্য-বিস্তৃতি শাসনকার্যের সুবিধার দিক দিয়াও বাঞ্ছনীয় ছিল না। তদুপরি ঔরংজেব যখন দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা-পদে নিযুক্ত ছিলেন তখন এতদঞ্চলের আভ্যন্তরীণ অব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক দুর্বলতাও নেহাৎ কম ছিল না। এমতাবস্থায় সাম্রাজ্য-বিস্তৃতির প্রয়োজন বা যৌক্তিকতা যে ছিল না, একথা বলা বাহুল্য। পররাজ্য-অপহরণ, পরধর্ম-অসহিষ্ণুতা এবং ধনরত্নের লোভই ছিল গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর আক্রমণের প্রকৃত যুক্তি। যৌক্তিকতা বা নৈতিকতার দিক দিয়া যেমন এই দুই দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সমর্থন করা যায় না, তেমনি বিজয়ের মুহূর্তে ঔরংজেবকে নিরস্ত করিয়া ভবিষ্যতে পুনরায় এই দ্বন্দ্ব-সৃষ্টির পথ উন্মুক্ত রাখাও যুক্তিযুক্ত বলা যায় না। শাহ্‌জাহানের আমলে যে দাক্ষিণাত্য-নীতি অনুসৃত হইয়াছিল উত্তরকালে তাহাই ঔরংজেব অধিকতর দৃঢ় সংকল্প লইয়া কার্যকরী করিয়াছিলেন।

শাহ্‌জাহানের দাক্ষিণাত্য-নীতির সমালোচনা

(২) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-নীতি (North-Western Frontier Policy): জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে (১৬২২) পারস্য-সম্রাট শাহ্‌ আব্বাস মোগল সাম্রাজ্য হইতে কান্দাহার জয় করিয়া লইয়াছিলেন (২৯২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। সম্রাট শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালে কান্দাহার পুনরুদ্ধারের চেষ্টা পুনরায় শুরু হয়। কূটকৌশলে শাহ্‌জাহান কান্দাহারের পারসিক শাসনকর্তা আলী মর্দানকে প্রভূত পরিমাণ অর্থ দ্বারা বশ করিয়া কান্দাহার দখল করিতে সমর্থ হন। পরবর্তী দশ বৎসর কান্দাহার মোগল সম্রাটের অধীনে ছিল, কিন্তু ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে শাহ্‌ আব্বাস কান্দাহার অবরোধ করিলেন। শীতকালে তুষারপাত-হেতু শাহ্‌জাহান সময়মত সামরিক সাহায্য প্রেরণ করিতে সক্ষম হইলেন না,

কূটকৌশলে কান্দাহার অধিকার

ফলে কান্দাহার রক্ষা করা সম্ভব হইল না। মোগল শাসনকর্তা দৌলত খাঁ শত্রুহস্তে কান্দাহার ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন (ফেব্রুয়ারি, ১৬৪৯)। অতঃপর প্রধান মন্ত্রী সাদুল্লা খাঁ ও ঔরংজেবকে কান্দাহার পুনরুদ্ধারের জন্য প্রেরণ করা হইল (১৬৪৯), কিন্তু সেই চেষ্টাও সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হইল। এইভাবে ১৬৫২ এবং ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে আরও দুইবার কান্দাহার পুনরুদ্ধারের চেষ্টা বিফল হইল। দ্বিতীয় অভিযানের নেতৃত্বও সাদুল্লা খাঁ ও ঔরংজেবের উপর দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু তৃতীয় অভিযানে শাহ্‌জাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা শিকোহ্‌ সেনাপতিত্ব করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই কান্দাহার জয় করিতে সক্ষম হন নাই। ইহার পর আর কোন মোগল সম্রাট কান্দাহার জয় করিতে চেষ্টা করেন নাই। কান্দাহার পুনরুদ্ধারের অভিযানের পুনঃপুনঃ ব্যর্থতা মোগল সাম্রাজ্যের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়াছিল বলা বাহুল্য।

শাহ্‌ আব্বাস কর্তৃক কান্দাহার পুনরধিকার

কান্দাহার উদ্ধারের ব্যর্থ চেষ্টা—১৬৪৯, ১৬৫২, ১৬৫৩

(৩) মধ্য-এশিয়া জয়ের চেষ্টা (Attempts at Conquest of Central Asia): কাফ্রিস্তানের উত্তরে অবস্থিত বদাখ্‌শান্‌ এবং বখ্‌ নামক মধ্য-এশিয়াস্থ স্থানগুলি জয় করিবার ইচ্ছা শাহ্‌জাহানের পিতা ও পিতামহের ছিল। মধ্য-এশিয়ার সমরকন্দ ছিল তৈমুরের রাজধানী। তৈমুরবংশসম্ভূত মোগল সম্রাটগণ স্বভাবতই বদাখ্‌শান্‌ ও বখ্‌ জয় করিয়া ক্রমে সমরকন্দ জয় করিবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতেন। শাহ্‌জাহান পিতা-পিতামহের আকাঙ্ক্ষা কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে ১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দে যুবরাজ মুরাদ ও আলী মর্দান খাঁকে বদাখ্‌শান্‌ ও বখ্‌ জয় করিবার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিলেন। এই অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হইল এবং মুরাদ ও আলী মর্দান বখ্‌ ও বদাখ্‌শান্‌ অধিকার করিলেন। অল্পকাল পরে মুরাদ বখ্‌-এর আবহাওয়া সহ্য করিতে না পারিয়া পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আগ্রায় ফিরিয়া আসিলেন। শাহ্‌জাহান ওয়াজীর বা প্রধানমন্ত্রী সাদুল্লা খাঁকে বখ্‌-এ প্রেরণ করিলেন। পর বৎসর (১৬৪৭) নব-বিজিত স্থানগুলির নিরাপত্তা বিধানের উদ্দেশ্যে ঔরংজেবকে এক সেনাবাহিনীসহ সেখানে প্রেরণ করা হইল। কিন্তু দুর্ধর্ষ উজবেগদের পদানত

বদাখ্‌শান্‌ ও বখ্‌ জয়

বদাখ্‌শান্‌ ও বখ্‌ অধিকারে রাখিবার ব্যর্থ চেষ্টা

রাখা সম্ভব হইল না। ঔরংজেবের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইলে, তিনি বখ্‌ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। এই ব্যাপারে মোগল রাজকোষ হইতে সাড়ে চারি কোটি মুদ্রা ব্যয় এবং পাঁচ হাজার সৈন্যের প্রাণনাশ হইয়াছিল।

শাহ্‌জাহানের শেষ জীবন (The Last days of Shah Jahan) : সম্রাট শাহ্‌জাহানের শেষ জীবন চরম দুঃখ-দুর্দশার মধ্য দিয়া অতিবাহিত হইয়াছিল। ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে শাহ্‌জাহান অসুস্থ হইয়া পড়িলে তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা না করিয়াই তাঁহার চারি পুত্রের মধ্যে উত্তরাধিকার-যুদ্ধ শুরু হয়। তাঁহার চারি পুত্রের মধ্যে দারা ছিলেন সর্বজ্যেষ্ঠ; দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন সুজা, ঔরংজেব ছিলেন তৃতীয় এবং মুরাদ ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। আর জাহানারা ও রৌশনারা নামে তাঁহার দুই কন্যা ছিলেন।

শাহ্‌জাহানের পুত্র-কন্যাগণ

জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা শিকোহ্‌ ছিলেন শাহ্‌জাহানের সর্বাধিক প্রিয়। শাহ্‌জাহানের মৃত্যুর পর দারা-ই সিংহাসন লাভ করিবেন ইহাই ছিল সকলের ধারণা। শাহ্‌জাহানও মনে মনে দারাকেই তাঁহার উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়াছিলেন। পাণ্ডিত্য, চরিত্রের গুণ, অমায়িকতা সর্ব দিক দিয়াই দারা ছিলেন শ্রেষ্ঠ। বেদান্ত, বাইবেল, সুফী ধর্মজ্ঞানীদের রচনা, ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ ট্যালমাদ্‌ প্রভৃতি সব কিছুই তিনি পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্মমত ছিল আকবরের ধর্মমতেরই অনুরূপ। তিনিও সর্বধর্মের সার গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। এই কারণে তিনি অসহিষ্ণু গোঁড়া মুসলমানদের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। তিনি অথর্ব বেদ, উপনিষদ প্রভৃতি ফার্‌সী ভাষায় অনুবাদ করাইয়াছিলেন। কিন্তু সর্বদা পিতৃস্নেহাধীনে থাকায় দারা রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, যুদ্ধবিগ্রহে পারদর্শিতা কোন কিছুই ভালভাবে অর্জন করিবার সুযোগ পান নাই।

দারা

দ্বিতীয় পুত্র সুজা সুদক্ষ যোদ্ধা, তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন রাজনীতিক ছিলেন। কিন্তু তাঁহার অত্যধিক আরামপ্রিয়তা ও আলস্য তাঁহাকে অকর্মণ্য করিয়া তুলিয়াছিল। ঔরংজেব ছিলেন সর্বাধিক ক্ষমতাসম্পন্ন। কূটকৌশল, সামরিক দক্ষতা, স্বার্থপরতা, পরধর্ম-অসহিষ্ণুতা প্রভৃতি বিভিন্ন দোষগুণের এক অত্যাশ্চর্য সংমিশ্রণ তাঁহার চরিত্রে পরিলক্ষিত হয়। শাসনকার্যে তাঁহার দক্ষতার পরিচয় দাক্ষিণাত্যের

সুজা, ঔরংজেব ও মুরাদ

শাসনকর্তা হিসাবে তাঁহার নানাবিধ উন্নয়নমূলক কার্যের মধ্যে পরিস্ফুট হইয়াছিল। কনিষ্ঠ পুত্র মুরাদ সরল হৃদয়, উদার, সাহসী ও বীর যোদ্ধা ছিলেন। কিন্তু মাদকদ্রব্যে অত্যধিক আসক্ত হইয়া উঠায় তিনি একেবারে অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন।

শাহ্‌জাহানের অসুস্থতার কালে সুজা বাংলাদেশে, মুরাদ গুজরাটে এবং ঔরংজেব দাক্ষিণাত্যে ছিলেন। একমাত্র জ্যেষ্ঠ পুত্র দারাই ছিলেন আগ্রায়।

সুজার পরাজয়

স্বভাবতই অপর তিন ভ্রাতার মনে সন্দেহ জাগিয়াছিল যে, হয়ত পিতার মৃত্যু ঘটিয়াছে এবং দারা নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য সেই সংবাদ গোপান রাখিয়াছেন। সুজা নিজেকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিয়া সসৈন্যে আগ্রা অভিমুখে অগ্রসর হইলে পথিমধ্যে দারার পুত্র সুলেমান শিকোহ্‌ তাঁহাকে পরাজিত করেন। ফলে, সুজা বাংলাদেশে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। এদিকে মুরাদ আহ্‌ম্মদাবাদে নিজেকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। ঔরংজেব তাঁহাকে কূটকৌশলে নিজ দলভুক্ত করিলেন এবং উভয়ের মধ্যে মোগল সাম্রাজ্য ভাগ করিয়া লইবার এক চুক্তিও স্বাক্ষরিত হইল। ঔরংজেব ও মুরাদের যুগ্মবাহিনী ক্রমে উজ্জয়িনীর নিকটবর্তী ধর্মাট

ধর্মাট-এর যুদ্ধ
(১৫ই এপ্রিল, ১৬৫৮)

নামক স্থানে উপস্থিত হইলে সম্রাট শাহ্‌জাহানের আদেশে যশোবন্ত সিংহ ও কাশিম খাঁ তাঁহাদিগকে বাধাদান করিলেন। কিন্তু ঔরংজেবের যুদ্ধকৌশলের বিরুদ্ধে যশোবন্ত সিংহের সমর-বাহিনী আঁটিয়া উঠিতে পারিল না আর কাশিম খাঁ যুদ্ধে কোন অংশই গ্রহণ করিলেন না। ফলে ঔরংজেবেরই জয় হইল। ধর্মাট-এর যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ঔরংজেবের মর্যাদা এবং স্পর্ধা উভয়ই বৃদ্ধি পাইল। অতঃপর আগ্রার অনতিদূরে সামুগড়ের প্রান্তরে দারা শিকোহ্‌ এবং ঔরংজেবের মধ্যে এক ভীষণ যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে রাজপুত নেতা রামসিংহ দারার পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করিলেন। উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ চলিল। বিশ্বাসঘাতক মোগল সেনাপতি খলিল উল্লাহ্‌ খাঁর পরামর্শে শত্রুপক্ষের দৃষ্টি এড়াইবার জন্য দারা হস্তিপৃষ্ঠ হইতে নামিয়া অশ্বপৃষ্ঠে যুদ্ধ করিতে শুরু

সামুগড়ের যুদ্ধ

করিলেন। তাঁহার হস্তিপৃষ্ঠে হাওদা শূন্য দেখিয়া মোগল-বাহিনী যুদ্ধে দারার মৃত্যু ঘটিয়াছে মনে করিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। রণকৌশলী ঔরংজেবের হস্তে দারা শেষ পর্যন্ত হয়ত পরাজিত হইতেন,

কিন্তু খলিল উল্লাহ্ খাঁর কুপরামর্শের ফলে দারা অতি সহজেই পরাজিত হইলেন। এই যুদ্ধে-ই উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত দ্বন্দ্বের শেষ মীমাংসা হইয়া গেল। ইহার পর দারা, সুজা বা মুরাদের পক্ষে ঔরংজেবকে পরাজিত করিবার আর কোন সামর্থ্যই রহিল না। সামুগড়ের যুদ্ধে জয়লাভের অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবেই ঔরংজেব হিন্দুস্তানের সিংহাসন দখল করিতে সমর্থ হইলেন। তিনি সরাসরি আগ্রায় উপস্থিত হইয়া আগ্রার দুর্গ অধিকার করিলেন। বৃদ্ধ পিতা শাহ্‌জাহান ও ভগিনী জাহানারার শত অনুরোধ ও কাতর প্রার্থনা সত্ত্বেও ঔরংজেব কোন আপোস-মীমাংসায় রাজী হইলেন না। বৃদ্ধ সম্রাট শাহ্‌জাহানকে সাধারণ বন্দীর ন্যায় আবদ্ধ রাখিয়া ঔরংজেব স্বয়ং সিংহাসন দখল করিলেন।

শাহ্‌জাহান সিংহাসন-চ্যুত ও কারারুদ্ধ

আগ্রা অধিকার করিয়া ঔরংজেব কূটকৌশলে মুরাদকে বন্দী করিতে সমর্থ হইলেন। হতভাগ্য মুরাদ গোয়ালিওর দুর্গে দুই বৎসর বন্দী অবস্থায় থাকিবার পর ঔরংজেবের আদেশে নিহত হইলেন। সুজাও ঔরংজেবের নিষ্ঠুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইলেন না। খাজওয়ার যুদ্ধে (জানুয়ারি ৫, ১৬৫৯) তিনি ঔরংজেবের হস্তে পরাজিত হইয়া বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু মীরজুমলা কর্তৃক পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া তিনি আরাকানে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। আরাকানে খুব সম্ভবত তিনি সপরিবারে নিহত হইয়াছিলেন। এদিকে দারার পক্ষে ঔরংজেবকে পরাজিত করা সম্ভব হইবে না বিবেচনা করিয়া তাঁহার সেনাবাহিনী, সেনাপতি প্রভৃতি সকলেই তাঁহার পক্ষ ত্যাগ করিলেন। দারা ও তাঁহার পুত্র সুলেমান দিল্লী হইতে লাহোর এবং তথা হইতে গুজরাটে পলায়ন করিলেন। গুজরাটের শাসনকর্তা দারাকে প্রভূত পরিমাণ অর্থ সাহায্য করিলে তিনি দাক্ষিণাত্যের বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সুলতানদের সহিত যোগদান করিয়া ঔরংজেবের সহিত যুদ্ধ করিতে মনস্থ করিলেন। সেই সময়ে রাজপুতকুলকলঙ্ক যশোবন্ত সিংহ দারাকে সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দিয়া তাঁহার দাক্ষিণাত্যে যাওয়ার পরিকল্পনা ত্যাগ করাইলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দারাকে কোন সাহায্যই দিলেন না। এদিকে ঔরংজেব দারার বিরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। এমতাবস্থায় দারাকে ঔরংজেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ

মুরাদের হত্যা

সুজার পলায়ন ও মৃত্যু

দারার সহিত দেওরাই-এর যুদ্ধ (১৬৫৯)

হইতে হইল। ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে দেওরাই-এর যুদ্ধে দারা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইয়া আত্মরক্ষার্থ পলায়ন করিলেন। ভারতবর্ষের কোন স্থানে আশ্রয় না পাইয়া দারা সপরিবারে দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত অতিক্রম করিবার পথে বোলান গিরিপথের অনতিদূরে দদর নামক স্থানে জীহন খাঁ নামে জনৈক আফগান দলপতির গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই জীহন খাঁকে পূর্বে একবার দারা মৃত্যুদণ্ডাদেশ হইতে রক্ষা করিলেও সেই জীহন খাঁ-ই এখন তাঁহাকে মোগল হস্তে সমর্পণ করিলেন। দিল্লীতে বন্দী অবস্থায় আনীত হইলে দারাকে প্রকাশ্য রাজপথে অপমানিত করা হইল। ভ্রাতৃ-হস্তে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতভাগ্য যুবরাজ দারার জন্য সেই দিন দিল্লীবাসী নীরবে অশ্রুবিসর্জন করিয়াছিল। কিছুকাল কারারুদ্ধ থাকিবার পর ঔরংজেবের আদেশে তাঁহাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হইল (আগস্ট ৩০, ১৬৫৯)।

দারার হত্যা

এদিকে বৃদ্ধ সম্রাট শাহ্‌জাহান ঔরংজেব কর্তৃক কারারুদ্ধ অবস্থায় অশেষ দুঃখ-দুর্দশা ও মানসিক যাতনা ভোগ করিয়া দীর্ঘ আট বৎসর পরে ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে মরিয়া বাঁচিলেন।

শাহ্‌জাহানের মৃত্যু (১৬৬৬)

শাহ্‌জাহানের চরিত্র ও কৃতিত্ব (Shah Jahan's Character & Estimate): শাহ্‌জাহানের চরিত্র ও কৃতিত্ব বর্ণনা করিতে গিয়া একাধিক ইওরোপীয় পর্যটক ও ঐতিহাসিক তাঁহাকে নিষ্ঠুর, অত্যাচারী, বিলাসপ্রিয় ও ব্যভিচারী বলিয়াছেন। টমাস রো, টেরী, বার্ণিয়ে, ডি লিয়েৎ প্রভৃতি ইওরোপীয় পর্যটক ও যাজকদের বর্ণনার উপর ভিত্তি করিয়া ডক্টর স্মিথ্ও শাহ্‌জাহান সম্পর্কে অনুরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল লেখকদের মন্তব্য যে পক্ষপাত-দোষে দুষ্ট তাহা নিরপেক্ষ বিচারে অবশ্যই প্রমাণিত হইবে।

ইওরোপীয় ঐতিহাসিকদের মন্তব্য

শাহ্‌জাহান কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ত নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং ধর্মবিষয়েও তিনি সম্পূর্ণ সহিষ্ণুতার নীতি অনুসরণ করেন নাই। খ্রীষ্টানদের প্রতি অত্যাচার, পোর্তুগীজদের প্রতি নির্মম ব্যবহার, হিন্দু মন্দিরাদি নির্মাণে বাধাদান প্রভৃতি তাঁহার চরিত্রের অপকর্ষতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই। ব্যক্তিগত চরিত্রের দিক দিয়াও

তাঁহার চরিত্রের ত্রুটি

শাহ্জাহানের চরিত্র ত্রুটিহীন ছিল না। সর্বোপরি সিংহাসন লাভ ও উহার নিরাপত্তার জন্য তিনি নৃশংস হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

নিরপেক্ষ বিচার

কিন্তু এই সকল ত্রুটি যেন আমাদের বিচার-বিবেচনাকে বিভ্রান্ত না করে। বিংশ শতাব্দীর মানদণ্ডে বিচার করিলে সিংহাসন নিরাপদ করিতে গিয়া শাহ্জাহান যে নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন উহা নিন্দনীয় বলিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু সমসাময়িক ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীর অপরাপর দেশে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের দৃষ্টান্ত যে একেবারে নাই, এমন বলা যায় না। বিশেষত, ভারতবর্ষের মুসলমান যুগের ইতিহাসে এইরূপ হত্যাকাণ্ড নূতন ছিল না। ধর্মব্যাপারে অসহিষ্ণুতার জন্য পোর্তুগীজরাই যে দায়ী ছিল এবিষয়ে সন্দেহ নাই। সর্বোপরি নূরজাহানের চক্রান্ত হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই তাঁহাকে এই সকল পন্থা অনুসরণ করিতে হইয়াছিল। পোর্তুগীজ বণিকদের ধর্মের নামে অধর্মের অনুষ্ঠান, ভারতীয়দের বলপূর্বক খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করা এবং সুযোগ পাইলে জলদস্যুতা করা ও ধৃত ব্যক্তিদিগকে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রয় করা প্রভৃতি অপকর্মের ফলেই ইওরোপীয়দের প্রতি শাহ্জাহানের মনে সন্দেহ ও ঘৃণার সৃষ্টি হইয়াছিল। এই কারণে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের প্রতি তিনি তেমন উদারতা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। তথাপি তাঁহার রাজসভায় জেসুইট্ ধর্মযাজকগণ তখনও যথেষ্ট সমাদর লাভ করিতেন। অবশ্য ধর্মব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণভাবে সংকীর্ণতামুক্ত ছিলেন না। হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর তিনি পুনঃস্থাপন করিয়াছিলেন এবং হিন্দুমন্দির নির্মাণে বাধাদান এবং নব-নির্মিত মন্দিরগুলির ধ্বংসসাধনও তিনি করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্রের ত্রুটি মমতাজমহলের প্রতি তাঁহার প্রেমের গভীরতার দ্বারা বহুলাংশে স্খালিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই।

পরধর্ম-অসহিষ্ণুতা

মোগল সাম্রাজ্য গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে উন্নীত

বস্তুতপক্ষে শাহ্জাহান যেমন ছিলেন সর্বাধিক জাঁকজমকপ্রিয় সম্রাট, তেমনি তাঁহার শাসনকালে মোগল সাম্রাজ্যও গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছিয়াছিল। ঐতিহাসিক আব্দুল হামিদ লাহোরীর বর্ণনা হইতে জানিতে পারা যায় যে, শাহ্-জাহানের সাম্রাজ্য সিন্ধু হইতে আসামের সিলেট বা শ্রীহট্ট জেলা এবং আফগান অঞ্চলের বিস্তৃত দুর্গ হইতে দাক্ষিণাত্যের অউসা

অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। শাসনব্যবস্থার কাঠামো ছিল সম্রাট আকবরের শাসনব্যবস্থারই অনুরূপ। শাহ্‌জাহানের শাসনব্যবস্থার দক্ষতা এবং তাঁহার বিচার-ব্যবস্থার ব্যক্তি-নিরপেক্ষতা ও সততা সম্পর্কে দেশীয় ও বিদেশীয় লেখকগণ ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার রাজত্ব-কালে কোন বহিঃশত্রুর আক্রমণ বা ঔরংজেবের বিদ্রোহের পূর্বে কোন আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ঘটে নাই। ইতালীয় পর্যটক মানুচি (Manucci) বলিয়াছেন যে, ব্যভিচারী ও বিলাসপ্রিয় হইলেও শাহ্‌জাহান সম্পূর্ণ দক্ষতার সহিত সাম্রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন। ডক্টর স্মিথ্ মানুচির উক্তি অস্বীকার করিয়া শাহ্‌জাহানের বিচার-ব্যবস্থাকে এশিয়ার স্বৈরাচারী শাসকসুলভ নিষ্ঠুর বর্বরতার যন্ত্রস্বরূপ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু এল্‌ফিন্‌স্টোন, আলেকজাণ্ডার ডাও (Alexander Dow) প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ ভিন্ন মত পোষণ করেন। যাহা হউক, ডক্টর স্মিথের সমালোচনা যে অযথা রূঢ় হইয়াছে, সেবিষয়ে মতদ্বৈধ নাই।

শাহ্‌জাহানের শাসন ও বিচার-ব্যবস্থার প্রশংসা

শাহ্‌জাহান ' ভাবত নিষ্ঠুর ছিলেন, একথা সত্য নহে। তাঁহার সন্তান-বাৎসল্য ও পত্নীপ্রেম তাঁহার অন্তরের কোমলতার পরি-চায়ক, সন্দেহ নাই। দীর্ঘ উনিশ বৎসরের ক্রমবর্ধমান পত্নী-প্রেমের শেষ স্মৃতি* হিসাবে সম্রাট শাহ্‌জাহান মমতাজের দেহাবশেষের উপর বিখ্যাত মর্মর সৌধ 'তাজমহল' নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তাজমহল পৃথিবীর সপ্ত-আশ্চর্যের অন্যতম হিসাবে আজিও দর্শকের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে।

শাহ্‌জাহানের সন্তান-বাৎসল্য ও পত্নীপ্রেম

---

* "হীরামুক্তা মাণিক্যের ঘটা
যেন শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা
যায় যদি লুপ্ত হয়ে যাক,
শুধু থাক
একবিন্দু নয়নের জল
কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল
এ তাজমহল॥"

শা-জাহান—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শাহ্‌জাহান বাল্যকালে মোল্লা কাসিমবেগ তবরেজী, সেখ্‌ সুফী প্রভৃতি তদানীন্তন বিখ্যাত মনীষীদের অধীনে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। ফারসী ও হিন্দী ভাষায় তাঁহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। সাহিত্যের প্রতিও তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তাঁহারই পৃষ্ঠপোষকতায় আব্দুল হামিদ লাহোরী তাঁহার বিখ্যাত ইতিহাস-সাহিত্য 'বাদশাহ্‌নামা' রচনা করিয়াছিলেন। সেই সময়েই কাফী খাঁ তাঁহার 'মুন্তাখাব-উল-লুবাব' গ্রন্থখানি রচনা করেন। এই গ্রন্থে ঔরংজেবের আমলেরও বহু ঐতিহাসিক তথ্য সন্নিবিষ্ট আছে। শাহ্‌জাহানের আমলে বহু হিন্দী কবির উদ্ভব ঘটিয়াছিল। ইঁহাদের মধ্যে তুলসীদাস ও বিহারীলাল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তাঁহার শিক্ষা

শাহ্‌জাহান ছিলেন আড়ম্বরপ্রিয় সম্রাট। টেভার্নিয়ে, বার্নিয়ে, মানুচি প্রভৃতি বিদেশী পর্যটক শাহ্‌জাহানের দরবারের আড়ম্বরপ্রিয়তার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আমলে মোগল শিল্প ও স্থাপত্যের চরম উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। জগদ্বিখ্যাত তাজমহল, মোতি মসজিদ, দেওয়ান-ই-খাস, জামি মসজিদ প্রভৃতিতে শাহ্‌জাহানের আমলের স্থাপত্যশিল্প উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। পিতামহ আকবর কর্তৃক নির্মিত প্রাসাদ-দুর্গগুলির বিভিন্ন অংশ শাহ্‌জাহানের আমলে পুনঃনির্মিত হইয়াছিল। আগ্রা দুর্গের অভ্যন্তরে নির্মিত 'মুসম্মান বুরজ', 'খাসমহল', 'শিশমহল' প্রভৃতিও শাহ্‌জাহানের স্থাপত্যানুরাগের সাক্ষ্য বহন করিতেছে। শাহ্‌জাহানের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থাপত্য-কীর্তি হইল 'তাজমহল'। কুড়ি হাজার শিল্পী ও শ্রমিকের দীর্ঘ বাইশ বৎসরের অক্লান্ত শ্রমে এই সমাধিসৌধটি নির্মিত হইয়াছিল। দেশীয় এবং বিদেশীয় শিল্পিগণও তাজমহল নির্মাণে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে ওস্তাদ ঈশা ও বাঙ্গালী কারুশিল্পী বলদেব দাস গুলতরাসের নাম উল্লেখযোগ্য। শাহ্‌জাহানের ময়ূরসিংহাসনটি তাঁহার শিল্পানুরাগে এক অপূর্ব নিদর্শনস্বরূপ ছিল। শিল্পী বেবাদল খাঁর দীর্ঘ আট বৎসরের পরিশ্রমে মোট আট কোটি মুদ্রা ব্যয়ে এই মণিমুক্তাখচিত সিংহাসনটি নির্মিত হইয়াছিল। এই সিংহাসনের চারিটি পায়া ছিল স্বর্ণনির্মিত। পারস্য-সম্রাট নাদির শাহ্‌ ভারত আক্রমণকালে এই

স্থাপত্য-শিল্পের উৎকর্ষ

তাজমহল

ময়ূরসিংহাসন

বহুমূল্য অপূর্ব শিল্পনিদর্শনটি পারস্যে লইয়া গিয়াছিলেন। শাহ্‌জাহান নিজ নামানুকরণে 'শাহ্‌জাহানাবাদ' নামে একটি নূতন নগর স্থাপন করিয়াছিলেন, ইহাই বর্তমানে নূতন দিল্লী নামে পরিচিত।

চিত্র-শিল্প

শাহ্‌জাহানের আমলে চিত্রশিল্পেরও যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। আকবরের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতীয় চিত্র-শিল্পিগণ পারসিক চিত্র-শিল্পের অনুকরণে চিত্র অঙ্কন করিতে শুরু করিয়াছিলেন। কিন্তু এবিষয়ে বিশেষ কোন উৎকর্ষ সাধিত না হওয়ায় শিল্পিগণ হিন্দু চিত্র-শিল্প-রীতি ও ইওরোপীয় চিত্র-শিল্প-রীতির সংমিশ্রণে এক নূতন রূপ ও দৃষ্টিভঙ্গির রচনা করিয়াছিলেন।

বাহ্যিক সমৃদ্ধির অন্তরালে জনসাধারণের দুর্দশা

শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালে মোগল সাম্রাজ্য গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল একথা ঐতিহাসিক মাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। ধন-সম্পদ, আড়ম্বর-ঐশ্বর্যের জন্য শাহ্‌জাহানের রাজত্বকাল ছিল বিখ্যাত। মণিমুক্তা-মরকত-খচিত ময়ূরসিংহাসন এবং তাজমহল প্রভৃতি মর্মরসৌধ ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধির পরিচায়ক সন্দেহ নাই। সম্রাট শাহ্‌জাহানের মুকুটে বিশ্ববিশ্রুত কোহিনূর মণি শোভা পাইত। কিন্তু সম্রাটের এই ঐশ্বর্য জনসাধারণের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পরিচায়ক বলিয়া মনে করা ভুল হইবে।

প্রাদেশিক শাসন-কর্তাদের অত্যাচার

প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের স্বার্থলোলুপতা ও অত্যাচার জনসাধারণ বিশেষভাবে কৃষক ও শিল্প শ্রমিকদের চরম দুর্দশার সৃষ্টি করিয়াছিল। যে জনসমাজ মোগল সম্রাটের ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধির কারণ ছিল এবং যাহাদের উৎপাদিত সম্পদ মোগল সম্রাটের আড়ম্বর ও বিলাস-প্রিয়তার অর্থ যোগাইত, তাহারা দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী হইতেও বঞ্চিত ছিল।

মোগল সাম্রাজ্য পতনের বীজ অঙ্কুরিত

এদিক দিয়া বিচার করিলে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, শাহ্‌জাহানের আমলের সমৃদ্ধির পশ্চাতে মোগল সাম্রাজ্যের পতনের বীজ অঙ্কুরিত হইতেছিল।

দশম অধ্যায়

ঔরংজেব আলমগীর

(Aurangzeb Alamgir)

ঔরংজেব-এর সিংহাসনারোহণ (Aurangzeb's Accession to the throne): বৃদ্ধ পিতা সম্রাট শাহ্‌জাহানকে সিংহাসনচ্যুত ও কারারুদ্ধ করিয়া ঔরংজেব ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসন দখল করিয়াছিলেন, এই আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে। কিন্তু ঐ বৎসর আনুষ্ঠানিকভাবে অভিষেক-ক্রিয়া সম্পাদনের অবকাশ ছিল না, কারণ তখনও তাঁহার সিংহাসন সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ হয় নাই। ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে খাজওয়া ও দেওরাই-এর যুদ্ধে জয়লাভের পর দিল্লী ফিরিয়া আসিলে ঔরংজেবের অভিষেক-ক্রিয়া উপযুক্ত আড়ম্বরের সহিত সম্পন্ন হয়। ঔরংজেব 'আলমগীর পাদশাহ্‌ গাজী' উপাধি ধারণ করিয়া হিন্দুস্তানের সম্রাট-পদে অধিষ্ঠিত হইলেন (১৬৫৯)।

আনুষ্ঠানিকভাবে অভিষেক (১৬৫৯)

সিংহাসনারোহণের সঙ্গে সঙ্গে প্রজাবর্গের আনুগত্য ও সহানুভূতি লাভের উদ্দেশ্যে ঔরংজেব তাহাদের মোট দেয় করের পরিমাণ হ্রাস করিলেন এবং মোট আশী প্রকারের কর মকুব করিয়া দিলেন। কিন্তু সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণের রচনা হইতে জানা যায় যে, স্থানীয় রাজকর্মচারীদের দুই-একজন ভিন্ন কেহই সম্রাটের কর মকুবের আদেশ পালন করেন নাই।

কর মকুব

ঔরংজেব ছিলেন গোঁড়া, পরধর্ম-অসহিষ্ণু সুন্নী মুসলমান। ভ্রাতৃবিরোধে তাঁহার জয়ী হওয়ার অন্যতম কারণ ছিল সুন্নী মুসলমান সম্প্রদায়ের তাঁহার প্রতি অত্যধিক সহানুভূতি। স্বভাবতই, সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তিনি গোঁড়া সুন্নী সম্প্রদায়ের মনস্তুষ্টির জন্য কতিপয় গোঁড়াপন্থী সংস্কার সাধন করিলেন। মদ্য-পান, আকবর-প্রবর্তিত 'নওরোজ' অনুষ্ঠান প্রভৃতি তিনি নিষিদ্ধ ঘোষণা

সুন্নী সম্প্রদায়ের সন্তুষ্টি-বিধানের চেষ্টা

করিলেন। পুরাতন মসজিদগুলির সংস্কার, নূতন মসজিদ স্থাপন, দরগা, মসজিদ প্রভৃতির ইমাম ও মোয়াজ্জেমগণকে নিয়মিতভাবে বেতন দান প্রভৃতি নানাপ্রকার ব্যবস্থা তিনি করিলেন। অপরদিকে সুফি মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তিনি কঠোর দমন-নীতি প্রয়োগ করিলেন।

ঔরংজেব ও উত্তর-পূর্ব ভারত (Aurangzeb & North-Eastern India) ঃ মোগল সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তনের সময় হইতে ক্রমশ রাজ্যসীমা বিস্তারের চেষ্টা অব্যাহতভাবে চলিয়াছিল। সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ঔরংজেবও সাম্রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করিলেন। ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে বিহার প্রদেশের শাসনকর্তা দাউদ খাঁ পালামৌ জয় করিলেন। ঐ বৎসর ঔরংজেব মীরজুমলাকে বাংলাদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। কুচ্‌বিহার ও আসামের অহোম রাজা মোগল সাম্রাজ্য হইতে একাংশ দখল করিয়া লইয়াছিলেন। সুতরাং অহোম রাজাকে দমন করা ছিল মীরজুমলার প্রধান দায়িত্ব। ঐ বৎসরই মীরজুমলা কুচ্‌বিহার ও আসামের রাজাকে পরাজিত করিলেন, কিন্তু বর্ষা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মীরজুমলার সেনাবাহিনী আসামের অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় অসুস্থ হইয়া পড়িল। কিন্তু মীরজুমলা এইরূপ অবস্থায়ও অহোমদের সহিত যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। অহোমরাজ মোগল সেনার সহিত দীর্ঘকাল যুদ্ধ করা সম্ভব হইবে না দেখিয়া মীরজুমলার সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন। অহোমরাজ জয়ধ্বজ সিংহ যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রভূত পরিমাণ অর্থ এবং বাৎসরিক কর দানে স্বীকৃত হইলেন। ইহাভিন্ন দরং জেলার অধিকাংশ মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হইল। আসামে অবস্থানকালে মীরজুমলা অসুস্থ হইয়া পড়িলেন এবং ইহার ফলেই শেষ পর্যন্ত তাঁহার মৃত্যু ঘটিল। কিন্তু মোগল সেনাবাহিনীর বহুসংখ্যক সৈন্যের এবং মীরজুমলার ন্যায় অনন্যসাধারণ সেনাপতির প্রাণের বিনিময়ে আসামের যে অংশ জয় করা সম্ভব হইয়াছিল, কয়েক বৎসরের মধ্যেই অহোমরাজ তাহা পুনরধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

পালামৌ অধিকার (১৬৬১)

কুচ্‌বিহার ও আসামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

সাময়িক সাফল্য : মীরজুমলার মৃত্যু

মীরজুমলার মৃত্যুর পর ঔরংজেব তাঁহার মাতুল শায়েস্তা খাঁকে

বাংলার শাসনকর্তা-পদে নিযুক্ত করিলেন। শায়েস্তা খাঁ দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি বাংলাদেশে পোর্তুগীজদের দমন করিয়া তাহাদের কর্মকেন্দ্র সন্দীপ অধিকার করেন। ইহা ভিন্ন আরাকানী রাজার নিকট হইতে তিনি চট্টগ্রামও দখল করিয়াছিলেন (১৬৬৬)।

শায়েস্তা খাঁ বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত: সন্দীপ ও চট্টগ্রাম অধিকার

ঔরংজেবের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-নীতি (North-West Frontier Policy of Aurangzeb): ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবর্তী দুর্ধর্ষ আফগান উপজাতীয় দলগুলি চিরকাল-ই ভারতীয় সুলতান ও সম্রাটদের বিপত্তির কারণ ছিল। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে আফগান উপজাতিগুলি মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্বর্তী স্থানগুলিতেও প্রবেশ করিযা হত্যা-লুণ্ঠনাদি করিতে দ্বিধাবোধ করিত না। ১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দে আফগান উপজাতির ইউসুফ্‌জাই শাখার দলপতি কয়েকটি উপজাতীয় দলকে ঐক্যবদ্ধ করিযা মোহম্মদ শাহ্‌ নামে জনৈক ব্যক্তিকে তাহাদের রাজা বলিযা ঘোষণা করিলেন। এই উপজাতীয় দলগুলি সিন্ধু নদ অতিক্রম করিযা হাজারা জেলা দখল করিতে সমর্থ হইল এবং কৃষকদের নিকট হইতে বলপূর্বক কর আদায় করিতে লাগিল। ইহা ভিন্ন মোগল ঘাঁটিগুলি আক্রমণ করিতেও তাহারা পশ্চাদ্‌পদ হইল না। ঔরংজেব আফগান উপজাতিগুলিকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে তিনজন সেনানায়ককে প্রেরণ করিলেন। মোগল সেনাবাহিনী আফগান দলপতি-দিগকে উপযুক্ত শাস্তিদানে ত্রুটি করিল না। তাহাদের অনেকেই মোগল সৈন্যের হস্তে প্রাণ হারাইল, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তদেশও কতকটা শান্ত হইল। অতঃপর রাজা যশোবন্ত সিংহকে জামরুদের সামরিক ঘাঁটির অধিনায়কপদে নিযুক্ত করিয়া ঐ অঞ্চলের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হইল।

ইউসুফ জাই নামক আফগান উপজাতি শাখার বিদ্রোহ

১৬৭২ খ্রীষ্টাব্দে আফ্রিদি জাতি তাহাদের নেতা আকৃমল খাঁর অধীনে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল এবং মোগলদের উপর আক্রমণ শুরু করিল। রাজা যশোবন্ত সিংহ এই বিদ্রোহ দমন করিতে গিয়া শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইয়া পেশোয়ারে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হইলেন। দশ হাজার মোগলসৈন্য আফ্রিদিগণ কর্তৃক ধৃত হইল এবং মধ্য-এশিয়ার বিভিন্নবাজারে ক্রীতদাস হিসাবে ইহাদের বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করা হইল।

আফ্রিদি জাতির বিদ্রোহ

পেশোয়ার, বান্নু ও কোহাট জেলার দুর্ধর্ষ 'খতক' জাতি (Khataks) তাহাদের নেতা খুশ্-হল্ খাঁর নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। মোগল কর্তৃপক্ষ খুশ্-হল্ খাঁকে এক দরবারে আহ্বান করিয়া কৌশলে বন্দী করেন। কিছুকাল বন্দী অবস্থায় থাকিয়া তিনি অবশ্য মোগল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করেন এবং তিনি ও তাঁহার পুত্র মোগল সেনাবাহিনীতে চাকরি গ্রহণ করেন। 'খতক' জাতি ছিল ইয়ুসুফ্‌জাই উপজাতিদের চিরকালের শত্রু। ঔরংজেব এই কারণে খুশ্-হল্ খাঁ ও তাঁহার পুত্রকে ইয়ুসুফ্‌জাই উপজাতি দলকে দমনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তথায় পৌঁছিয়া খুশ্-হল্ খাঁ ও তাঁহার পুত্র আফ্রিদি নেতা আকমল খাঁর সহিত মিলিত হইয়া মোগলসৈন্যের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। তখন ঔরংজেব পর পর কয়েকজন সেনাপতিকে আফগান উপজাতিকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিলেন।

'খতক' উপজাতির বিদ্রোহ

কিন্তু তাহাতেও কোন ফল না হওয়ায় তিনি স্বয়ং হাসান আব্দাল নামক স্থানে এক বিশাল সৈন্যবাহিনীসহ উপস্থিত হইলেন (১৬৭৪)। আফগান উপজাতীয় নেতৃগণের অনেকেই ভাতা, জায়গীর প্রভৃতি প্রলোভনের দ্বারা তিনি অবশ্য ভুলাইতে সক্ষম হইলেন। কিন্তু তাহাতে যুদ্ধের সম্পূর্ণ অবসান না হইলেও কতক পরিমাণে শান্তি ফিরিয়া আসিল। কাবুলের নব-নিযুক্ত শাসনকর্তা আমীর খাঁর প্রীতি ও সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহারে আফগান উপজাতিগুলি সম্পূর্ণভাবে শান্ত হইল।

আফগান উপজাতি দমনে ঔরংজেবের অভিযান

আফগান উপজাতি-গুলির দমন

ঔরংজেবের শাসনব্যবস্থা ও সাম্রাজ্যবাদী নীতির উপর আফগান উপজাতি-গুলির বিদ্রোহের প্রতিকূল প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এই যুদ্ধের ব্যয়-সঙ্কুলানের জন্য ঔরংজেবের রাজকোষ প্রায় শূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। ইহা ভিন্ন উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে যুদ্ধের জন্য দাক্ষিণাত্য হইতে সমরকুশল সেনাপতিদের মধ্যে অনেককে তথায় প্রেরণ করা প্রয়োজন হইয়াছিল। সেই সুযোগে শিবাজী নিজ শক্তি অপ্রতিহত করিয়া তুলিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। আফগান জাতিকে রাজপুত-শক্তি দমনে ব্যবহার করিবার সুযোগ ঔরংজেব সেই সময় হইতে চিরতরে হারাইয়াছিলেন। শেষ পর্যন্ত আফগান উপজাতিগুলিকে দমন করিতে

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নীতিব ফলাফল

সমর্থ হইলেও স্বাধীনতাকামী আফগান জাতির সৌহার্দ্য তিনি চিরতরে হারাইয়াছিলেন।

ঔরংজেবের ধর্ম-নীতি (Religious Policy of Aurangzeb): সম্রাট আকবরের রাজত্বকাল ছিল উদারতা ও ধর্ম-বিষয়ে চরম সহিষ্ণুতার যুগ। জাহাঙ্গীরের আমলেও পরধর্মসহিষ্ণুতার নীতি বজায় ছিল। কিন্তু শাহ্‌জাহানের রাজত্বকাল হইতেই ধর্ম-বিষয়ে সংকীর্ণ, অসহিষ্ণু নীতির অনুসরণ শুরু হয়। এই প্রতিক্রিয়া ঔরংজেবের রাজত্বকালে উৎকট সাম্প্রদায়িকতা ও পরধর্ম-অসহিষ্ণুতায় পরিণত হয়। ঔরংজেব ছিলেন সংকীর্ণমনা সুন্নী মুসলমান। তিনি কোরাণের নীতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে গিয়া অ-মুসলমান ও সিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তিনি স্বয়ং গোঁড়া সুন্নী মুসলমানসুলভ আচার-আচরণ মানিয়া চলিতে লাগিলেন। মোগল দরবারের পূর্বেকার বহু অনুষ্ঠান ও রীতি-নীতির তিনি পবিবর্তন সাধন করিলেন। দরবারে সঙ্গীতানুষ্ঠান তাঁহার আদেশে নিষিদ্ধ হইয়াছিল। 'নওরোজ' নামক অনুষ্ঠানটিও বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। প্রচলিত মুদ্রায় 'কলিমা'র যে দুই-একটি কথা ছাপ দেওয়া হইত তাহাও তিনি উঠাইয়া দিলেন, কারণ অ-মুসলমানদের স্পর্শে 'কলিমা'র পবিত্রতা নষ্ট হইবে। জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যোতিষশাস্ত্রের আলোচনাও তিনি ইসলাম ধর্ম-বিরোধী বলিয়া নিষেধ করিলেন। মদ, ভাঙ্‌ প্রভৃতির ব্যবহার নিষিদ্ধ করিয়া তিনি আদেশ জারী করিলেন। বলপূর্বক সতীদাহ প্রথাও তিনি নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন বটে কিন্তু তাঁহার এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকরী হয় নাই। ধর্মান্ধ সংকীর্ণ নীতির প্রয়োগে ঔরংজেব উপরোক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না। ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অ-মুসলমানদের উপর 'জিজিয়া' কর পুনঃস্থাপন করিলেন।

ধর্ম-বিষয়ে ঔরংজেবের সংকীর্ণ অসহিষ্ণু নীতি

'জিজিয়া' কর পুনঃ-স্থাপিত

ঔরংজেব স্বয়ং যে অত্যন্ত গোঁড়া এবং নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন সেবিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন স্বীয় ধর্মের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে প্রভাবিত ছিল। কিন্তু হিন্দুস্তানের সম্রাটের পক্ষে ধর্মের গোঁড়ামি শাসন-নীতিতে প্রয়োগ করা যে অদূরদর্শিতার কাজ হইয়াছিল সেবিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ

নাই। স্পেনরাজ দ্বিতীয় ফিলিপ, ফরাসীরাজ চতুর্দশ লুই ধর্মান্ধতা বশতই নিজ নিজ সাম্রাজ্যের সর্বনাশ সাধন করিয়াছিলেন। ঔরংজেবের ধর্ম-নীতি তাঁহার ধর্মানুরাগের পরিচয় হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে বিভিন্ন জাতি-ধর্মের নর-নারী অধ্যুষিত হিন্দুস্তানের সম্রাট-পদের দায়িত্বের কোন পরিচয়ই যে ছিল না, সেবিষয়ে সন্দেহ নাই। ঔরংজেব ধর্মের দ্বারা তাঁহার রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিকে আচ্ছন্ন হইতে দিয়াছিলেন। ইহার ফলে মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি শিথিল ও বিপর্যস্ত হইয়াছিল। তাঁহার ধর্মান্ধ-নীতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া স্বরূপ-ই মারাঠা, রাজপুত, জাঠ, শিখ প্রভৃতি বিভিন্ন হিন্দু সম্প্রদায় মোগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল।

ধর্মান্ধ নীতির কুফল

ঔরংজেবের পরধর্ম-অসহিষ্ণুতার নীতি কেবলমাত্র হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছিল এমন নহে ; সিয়া, খোজা ও বোহ্‌রা সম্প্রদায়ের মুসলমানদের প্রতিও সেই একই নীতি অনুসৃত হইয়াছিল।

সিয়া, খোজা, বোহ্‌রা সম্প্রদায়ের প্রতি অসহিষ্ণুতা

ঔরংজেবের ধর্মনীতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া (Reaction against Aurangzeb's Religious policy) : ঔরংজেবের ধর্মান্ধ-নীতির বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে এক দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। প্রথমে মথুরার জাঠগণ তিলপৎ-এর জমিদার গোকুলার নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করে (১৬৬৯) এবং তাহারা মথুরার ফৌজদারকে হত্যা করে। গোকুলাকে দমন করিতে অবশ্য মোগলশক্তিকে বেশী বেগ পাইতে হইল না, কিন্তু তাহাতে বিদ্রোহের আগুন নির্বাপিত হইল না। কয়েক বৎসর পরে জাঠগণ পুনরায় (১৬৮৬) বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের নেতা রাজারামও মোগল বাহিনীর হাতে নিহত হন। কিন্তু তাহাতে জাঠগণকে দমন করা সম্ভব হইল না। ঔরংজেবের মৃত্যুর পর জাঠগণ তাহাদের নেতা চুড়ামন-এর অধীনে পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল।

জাঠ বিদ্রোহ

বুন্দেলখণ্ডের বুন্দেলা রাজপুতগণ তাহাদের নেতা ছত্রশালের অধীনে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ছত্রশাল কিছুকাল ঔরংজেবের রাজকর্মচারী হিসাবে দাক্ষিণাত্যে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। শিবাজীর স্বাধীনতা-স্পৃহা, হিন্দুধর্ম রক্ষার

বুন্দেলা বিদ্রোহ : ছত্রশাল

দৃঢ় সংকল্প ও দুঃসাহসিকতা ছত্রশালের মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। ১৬৭১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ঔরংজেবের হিন্দু-নির্যাতন ও হিন্দু মন্দির অপবিত্রীকরণ নীতির প্রতিবাদ-কল্পে বুন্দেলখণ্ডে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। দীর্ঘকাল মোগল শক্তির সহিত সংগ্রাম করিয়া ছত্রশাল মালবদেশের পূর্বাংশ লইয়া একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

'সৎনামী' বিদ্রোহ

পাঞ্জাবের বর্তমান পাতিয়ালা ও মেওয়াট অঞ্চলে 'সৎনামী' হিন্দু সম্প্রদায়ের বসবাস ছিল। ঔরংজেবের অ-মুসলমান নির্যাতন নীতির ফলে যখন ব্যাপক প্রতিক্রিয়া শুরু হইয়াছিল ঐ সময়ে জনৈক মোগলসৈন্য একজন 'সৎনামী' ভক্তকে হত্যা করিলে তাহারা বিদ্রোহী হইয়া উঠে। প্রথমে সৎনামী সম্প্রদায় বিদ্রোহে সাফল্যলাভ করিলেও শেষ পর্যন্ত মোগলবাহিনীর হস্তে তাহাদের প্রায় সকলকেই প্রাণ হারাইতে হইয়াছিল।

শিখদের প্রতি অদূরদর্শী নীতির অনুসরণ

ঔরংজেবের অদূরদর্শী ধর্ম-নীতি শিখ জাতির মধ্যেও বিদ্রোহের আগুন ছড়াইয়া দিল। গুরু অর্জুন জাহাঙ্গীরের বিদ্রোহী পুত্র খুস্রুকে সাহায্য দান করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে জাহাঙ্গীরের আদেশে হত্যা করা হইয়াছিল একথার উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে। ঐ সময় হইতেই শিখ জাতি মোগল সাম্রাজ্যের প্রতি বিদ্রোহভাব পোষণ করিতেছিল। গুরু হরগোবিন্দ তাঁহার পিতা গুরু অর্জুনের উপর ধার্য অর্থদণ্ড দিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়া মোগল সম্রাট কর্তৃক দীর্ঘ বারো বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। মুক্তিলাভের পর গুরু হরগোবিন্দ শাহ্‌জাহানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন, কিন্তু মোগলবাহিনী কর্তৃক পরাজিত হন। এইভাবে শিখ গুরুদের মধ্যে মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহভাব বৃদ্ধি পাইতে থাকে। নবম শিখগুরু তেগ্‌বাহাদুর ঔরংজেবের হিন্দুবিরোধী নীতির প্রতিবাদ করেন এবং কাশ্মীরের ব্রাহ্মণদের ঔরংজেব-প্রবর্তিত হিন্দু-বিরোধী নীতি অমান্য করিতে উপদেশ দেন। এজন্য ঔরংজেব তেগ্‌বাহাদুরকে বন্দী হিসাবে দিল্লী আনিতে আদেশ দিলে তাঁহাকে ঔরংজেবের সম্মুখে উপস্থিত করা হইল। তাঁহাকে মৃত্যুভয় দেখাইয়া ইস্‌লাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিতে

বলা হইলে তিনি ধর্মত্যাগ অপেক্ষা মৃত্যুবরণই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিলেন। ঔরংজেবের আদেশে তাঁহাকে হত্যা করা হইল। তিনি 'শির' দিয়াছিলেন কিন্তু 'সর্' দেন নাই—মস্তক দিয়াছিলেন, ধর্ম দেন নাই (শির দিয়া সর্ ন দিয়া)। তেগ্ বাহাদুরই ছিলেন শিখদের 'খাল্সার' সংগঠক। তিনি শিখজাতির মনে দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার এক নবচেতনা জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন।

গুরু তেগ্ বাহাদুরের হত্যা—'শির দিয়া সর্ ন দিয়া'

তেগ্ বাহাদুরের এই নির্মম হত্যা শিখদের মনে মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে এক দারুণ প্রতিশোধ-স্পৃহার উদ্রেক করিল। ফলে, তেগ্ বাহাদুরের পুত্র গুরুগোবিন্দের নেতৃত্বে শিখজাতি মোগল শক্তির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সংঘর্ষে অবতীর্ণ হইল।

গুরুগোবিন্দের অধীনে মোগল-শিখ সংঘর্ষ

ঔরংজেবের রাজপুত-নীতি (Rajput policy of Aurangzeb) : সম্রাট আকবর কর্তৃক অনুসৃত রাজপুত-নীতির দূরদর্শিতা উপলব্ধি করিবার মতো রাজনৈতিক জ্ঞান ঔরংজেবের ছিল না। যে দুর্ধর্ষ রাজপুত জাতিকে বন্ধুত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া সম্রাট আকবর মোগল সাম্রাজ্য বিস্তার এবং মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়াছিলেন ঔরংজেবের অদূরদর্শী ধর্মান্ধ-নীতি সেই রাজপুত জাতিকেই মোগল সাম্রাজ্যের প্রধান শত্রুতে পরিণত করিল।

ঔরংজেবের রাজপুত-নীতির অদূরদর্শিতা

১৬৭৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজা যশোবন্ত সিংহ জামরুদে মোগল সামরিক ঘাঁটির অধিকর্তাপদে নিযুক্ত থাকা কালীন মৃত্যুমুখে পতিত হইলে ঔরংজেব সেই সুযোগে তাঁহার রাজ্য দখল করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করিলেন। মাড়বার রাজ্যে প্রবেশ করিয়া মোগল রাজকর্মচারিগণ ও সেনাবাহিনী তথাকার দেবমন্দিরগুলি ধ্বংস করিল। মাড়বারের অধিবাসীদের উপর জিজিয়া কর স্থাপিত হইল। ছত্রিশ লক্ষ মুদ্রা উৎকোচ গ্রহণ করিয়া যশোবন্ত সিংহেরই এক আত্মীয়কে যোধপুরের সিংহাসনে স্থাপন করা হইল। যশোবন্ত সিংহের মৃত্যুকালে তাঁহার দুই রাণীই ছিলেন সন্তানসম্ভবা। কিছুকালের মধ্যেই দুই রাণীর দুইটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিল। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই এই

যশোবন্ত সিংহের মৃত্যু : ঔরংজেব কর্তৃক মাড়বার দখল

দুইটি শিশুর মধ্যে একটির মৃত্যু হইল। পুত্র অজিৎ সিংহকে লইয়া যশোবন্ত সিংহের দুই রাণী ও এক অতি বিশ্বস্ত অনুচর দুর্গাদাস দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন। যশোবন্তের সিংহাসন তাঁহার পুত্র অজিৎ সিংহকে দেওয়া হউক তাঁহারা এই দাবি জানাইলে, অজিৎ সিংহ দিল্লীর প্রাসাদে মোগল হারেমে প্রতিপালিত হইবেন এই শর্তে ঔরংজেব যশোবন্তের সিংহাসনে অজিত সিংহের দাবি মানিয়া লইতে রাজী হইলেন। দুর্গাদাস ও অপরাপর রাজপুত নেতৃবর্গ ঔরংজেবের এই প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করিয়া দিল্লী ত্যাগ করিতে উদ্যোগ করিলে ঔরংজেব অজিৎ সিংহ এবং যশোবন্ত সিংহের দুই রাণীকে বন্দী করিবার আদেশ দিলেন। রাজপুত বীর দুর্গাদাসের বীরত্ব ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের ফলে শিশুপুত্রসহ রাণীদ্বয় দিল্লী হইতে পলায়ন করিতে সমর্থ হইলেন। ঔরংজেব জনৈক দুগ্ধ-বিক্রেতার শিশুপুত্রকে অজিৎ সিংহ বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে কাহাকেও ভুলান সম্ভব হইল না। মাড়বারে ফিরিয়া গিয়া দুর্গাদাস ঔরংজেবের সহিত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

অজিত সিংহ

রাজপুত বীর দুর্গাদাস

ঔরংজেব মাড়বার আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে স্বয়ং আজমীরে উপস্থিত হইলেন। মোগল সেনাবাহিনীর অধিনায়কত্ব তিনি নিজপুত্র আকবরের উপর ন্যস্ত করিয়া স্বয়ং আজমীর হইতে যুদ্ধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে লাগিলেন। রাজপুতবাহিনী মোগলসেনার হস্তে পরাজিত হইল। ঔরংজেব মাড়বার রাজ্যকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক অংশে একজন করিয়া মুসলমান ফৌজদার নিযুক্ত করিলেন। ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ঔরংজেব মেবারের মহারাণা রাজসিংহকে মেবার রাজ্যে জিজিয়া কর স্থাপনের আদেশ দিলেন। রাজসিংহ এই আদেশে অপমানিত বোধ করিয়া ঔরংজেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে মনস্থ করিলেন। অজিত সিংহের মাতা ছিলেন মেবারের রাজকন্যা। তিনি মোগল আক্রমণের বিরুদ্ধে রাজসিংহের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন।

রাজপুত-মোগল সংঘর্ষ : ঔরংজের কর্তৃক মাড়বার দখল

এমতাবস্থায় রাজসিংহ নিজ রাজ্যের নিরাপত্তার কথা ভাবিয়া মাড়বার রাজ্য রক্ষার জন্য সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন। কারণ মাড়বার

সম্পূর্ণভাবে মোগল অধিকারভুক্ত হইলে মেবারের স্বাধীনতা বিপন্ন হইবে, ইহা তিনি ভালভাবেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। দুর্গাদাস ও রাজসিংহ যুগ্মভাবে মোগল শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। এদিকে ঔরংজেবও এক বিশাল বাহিনীসহ মেবারের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। এই সেনাবাহিনীর সাহায্যে ঔরংজেবের পক্ষে মেবার রাজ্যে প্রবেশ করা কঠিন হইল না। রাজসিংহ আত্মরক্ষার্থ নিজ প্রজাবর্গসহ রাজধানী ত্যাগ করিয়া পর্বতারণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। উদয়পুর ও চিতোর মোগলবাহিনী কর্তৃক অধিকৃত হইল। মোট দুই শতেরও অধিক দেবমন্দির মোগলবাহিনীর হস্তে বিধ্বস্ত হইল।

মেবার আক্রমণ : উদয়পুর ও চিতোর অধিকার

এই ঘোর দুর্দিনেও রাজপুতগণ তাহাদের সাহস ও সংকল্প হারাইল না। তাহারা মোগলবাহিনীর বিরুদ্ধে অবিরাম যুদ্ধ করিয়া চলিল। যুবরাজ আকবরকে তাহারা একাধিকবার অতর্কিত আক্রমণে পরাজিত করিতে সমর্থ হইলে ঔরংজেব আকবরকে মেবার হইতে মাড়বারে স্থানান্তরিত করিলেন এবং সেই স্থলে যুবরাজ আজমকে নিযুক্ত করিলেন। যুবরাজ আকবর ইহাতে অপমানিত বোধ করিয়া রাজপুত বিদ্রোহীদের সহিত যোগ দিলেন। রাজপুতদিগের সাহায্যে তিনি ঔরংজেবকে সিংহাসনচ্যুত বলিয়া ঘোষণা করিয়া স্বয়ং 'হিন্দুস্তানের সম্রাট' উপাধি ধারণ করিলেন। এই সময়ে ঔরংজেব আজমীরে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি কূটকৌশলে যুবরাজ আকবরের সহিত রাজপুতগণের মিত্রতা বিনষ্ট করিতে সমর্থ হইলেন। আকবরের প্রশংসা করিয়া তিনি এই মর্মে একখানি জাল চিঠি লিখিলেন যে, আকবর রাজপুত নেতৃবৃন্দকে ঔরংজেবের সেনাবাহিনীর হস্তে সমর্পণ করিবার যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা খুবই প্রশংসনীয়। এই চিঠিখানি যাহাতে রাজপুতদের হস্তগত হয় ঔরংজেব সেই ব্যবস্থাও করিলেন। এই চিঠির মর্ম অবগত হওয়া-মাত্রই রাজপুতগণ আকবরকে মিথ্যা সন্দেহ করিয়া তাঁহার পক্ষ ত্যাগ করিল এবং এইভাবে আকবরের সহিত রাজ-পুতগণের মিত্রতা বিনষ্ট হইল। বীর দুর্গাদাস অবশ্য শেষ পর্যন্ত ঔরংজেবের কূটকৌশল বুঝিতে পারিয়া আকবরকে নিরাপদে শিবাজীর পুত্র শম্ভুজীর

যুবরাজ আকবরের বিদ্রোহ

ঔরংজেবের কূটকৌশল

রাজসভা পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিলেন। এইভাবে মোগলবাহিনী যখন আকবরের বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত তখন জয়সিংহ মালব ও গুজরাট আক্রমণ করিয়া মোগলশক্তির বিরুদ্ধে প্রতিশোধগ্রহণে প্রবৃত্ত হইলেন। এমন সময়ে ঔরংজেবকে দাক্ষিণাত্যের দিকে যুদ্ধযাত্রা করিতে হইল। তিনি জয়সিংহের সহিত বিবাদ মিটাইয়া ফেলিলেন এবং জয়সিংহ জিজিয়া করের পরিবর্তে ঔরংজেবকে তিনটি জেলা দান করিয়া সমগ্র মেবার রাজ্য ফিরিয়া পাইলেন।

মেবার ও মাড়বারের বিরুদ্ধে ঔরংজেবের নীতির বিফলতা

মাড়বারের বীরযোদ্ধা দুর্গাদাস আরও কিছুকাল মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইলেন। অবশেষে ঔরংজেবের মৃত্যুর পর পরবর্তী মোগল সম্রাট অজিত সিংহের দাবি স্বীকার করিয়া লইলেন (১৭০৯)। ঔরংজেবের রাজপুত জাতির মিত্রতার মূল্য উপলব্ধি করিবার মতো ক্ষমতা ছিল না। তাঁহার রাজপুত-নীতি মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পথ প্রশস্ত করিয়াছিল। নিজ জীবনেই তিনি মেবারের সহিত যুদ্ধ মিটাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং পরবর্তী কালে তাঁহার পুত্র অজিত সিংহের দাবি মানিয়া লইয়াছিলেন। সুতরাং ঔরংজেবের রাজপুত-নীতি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল একথা বলা চলে না। উপরন্তু তিনি সমগ্র রাজপুত জাতিকে মোগল সাম্রাজ্য ও সম্রাটের এক ঘোর শত্রুজাতিতে পরিণত করিয়া গিয়াছিলেন।

ঔরংজেবের দাক্ষিণাত্য-নীতি (Deccan policy of Aurangzeb):

পূর্ববর্তী মোগল সম্রাটদের নীতির অনুসরণ

ঔরংজেবের দাক্ষিণাত্য-নীতি পূর্ববর্তী মোগল সম্রাটদের দাক্ষিণাত্যে সাম্রাজ্য বিস্তার-নীতির অনুসরণ বলা যাইতে পারে। সম্রাট আকবরের আমল হইতেই দাক্ষিণাত্যে মোগল সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা আমরা দেখিতে পাই।

দাক্ষিণাত্যের শাসন-কর্তা হিসাবে ঔরংজেবের দাক্ষিণাত্য-নীতি

ঔরংজেব যখন দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা ছিলেন তখন হইতেই তিনি গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর রাজ্য দখল করিবার চেষ্টা শুরু করেন। গোলকুণ্ডার সুলতান কুতব্ শাহের মন্ত্রী মীরজুমলার সহিত গোপনে ষড়যন্ত্র করিয়া তিনি গোলকুণ্ডা আক্রমণ করিয়াছিলেন। ঔরংজেবের উদ্দেশ্য ছিল গোলকুণ্ডা রাজ্যকে সম্পূর্ণভাবে মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করা।

তিনি গোলকুণ্ডা আক্রমণ করিয়া যখন তথাকার সুলতানকে কঠোর শর্তাধীনে আবদ্ধ করিতে উদ্যত তখন কুতব্ শাহ্ গোপনে দিল্লীতে দূত প্রেরণ করিয়া শাহ্‌জাহানের নিকট ঔরংজেবের দারুণ উৎপীড়নের কথা জানাইয়া শান্তি স্থাপনের অনুরোধ করেন। জাহানারা ও দারার অনুরোধে শাহ্‌জাহান ঔরংজেবকে গোলকুণ্ডার সহিত শান্তি স্থাপনের আদেশ দিলে তিনি বাধ্য হইয়াই যুদ্ধ মিটাইয়া লন। কিন্তু কুতব্ শাহের নিকট হইতে তিনি দশলক্ষ মুদ্রা ক্ষতিপূরণ আদায় করিলেন এবং তাঁহাকে বাৎসরিক করদানে স্বীকৃত হইতে বাধ্য করিলেন। ইহা ভিন্ন রঙ্গীর নামক স্থানটিও তিনি দখল করিলেন। নিজপুত্র মোহম্মদের সহিত কুতব্ শাহের একমাত্র কন্যার বিবাহ দিয়া কুতব্ শাহের মৃত্যুর পর গোলকুণ্ডা মোহম্মদের অধিকারভুক্ত হইবে এইরূপ প্রতিশ্রুতিও ঔরংজেব কুতব্ শাহের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইয়াছিলেন।

গোলকুণ্ডা জয়ের চেষ্টা

বিজাপুর রাজ্য তখন আদিল শাহ্ নামক জনৈক দৃঢ়চেতা সুলতানের অধীন ছিল। তাঁহার আমলে ঔরংজেব বিজাপুর রাজ্যের কোন ক্ষতি করিতে পারেন নাই। আদিল শাহ্ মোগল শক্তিকে উপেক্ষা করিয়া অপ্রতিহতভাবে রাজ্যশাসন করিয়া চলিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ঔরংজেব শাহ্‌জাহানের অনুমতি লইয়া বিজাপুর রাজ্য আক্রমণ করিলেন (১৬৫৭)। মী—চুমলা এই যুদ্ধে তাঁহাকে সাহায্য দান করেন। বিজাপুর রাজ্য যখন প্রায় সম্পূর্ণভাবে করতলগত এই সময়ে শাহ্‌জাহানের আদেশে ঔরংজেবকে শান্তি স্থাপন করিতে হইল। বিদর, কল্যাণী, পরীন্দা প্রভৃতি স্থান এবং প্রভূত পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে দিয়া বিজাপুর সুলতান তখনকার মত রক্ষা পাইলেন।

বিজাপুর আক্রমণ

দাক্ষিণাত্যে ঔরংজেবের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতে দেওয়ার বিপদ যুবরাজ দারা ও জাহানারা বুঝিয়াছিলেন। এই কারণেই ঔরংজেব গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর যাহাতে সম্পূর্ণভাবে দখল না করিতে পারেন সেই চেষ্টা করা হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন ঔরংজেবের উৎপীড়নও দারা ও জাহানারার অন্তরে বিতৃষ্ণার সৃষ্টি করিয়াছিল। দারা ও জাহানারার অনুরোধেই শাহ্‌জাহান

শাহ্‌জাহানের আদেশে ঔরংজেবের দাক্ষিণাত্য-নীতি ব্যাহত

ঔরংজেবকে গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরের সহিত সন্ধি স্থাপনের জন্য আদেশ দিয়াছিলেন।

বৃদ্ধ পিতা শাহ্‌জাহানকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া ঔরংজেব সম্রাট-পদ লাভ করিলে তাঁহার দাক্ষিণাত্য-নীতির পূর্ণ অনুসরণের সুযোগ আসিল। কিন্তু সেই সময়ে তাঁহাকে দুর্ধর্ষ মারাঠা বীর শিবাজীর সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হইল। শত চেষ্টাসত্ত্বেও ঔরংজেব শিবাজীকে দমন করিতে সক্ষম হইলেন না।

মারাঠা-বীর শিবাজীর সহিত ঔরংজেবের সংঘর্ষ

দাক্ষিণাত্যে শাসনকর্তা হিসাবে নিযুক্ত থাকাকালীনই ঔরংজেব শিবাজীর বিরুদ্ধে এক সামরিক অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু মারাঠা বীর শিবাজী সেই বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সম্রাটপদলাভের পরও ঔরংজেবের মারাঠা শক্তি দমনের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। নিজ মাতুল শায়েস্তা খাঁকে তিনি শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু শায়েস্তা খাঁ শিবাজীর হস্তে নিজেই সায়েস্তা হইয়া ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেনাপতি আফজল খাঁও শিবাজীর হস্তে প্রাণ হারাইয়াছিলেন। অতঃপর ঔরংজেবের সেনাপতি জয়সিংহ ও দিলীর খাঁ অবশ্য সাময়িকভাবে শিবাজীর বিরুদ্ধে সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু মারাঠা বীরকে সম্পূর্ণভাবে দমন করা ঔরংজেবের সেনাপতিদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। মৃত্যুর পূর্বে শিবাজী মোগল-অধিকৃত মারাঠা রাজ্যের প্রায় সকল স্থানই পুনরধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শিবাজীর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র শম্ভুজীর সহিত ঔরংজেবের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। ১৬৮১ খ্রীষ্টাব্দে ঔরংজেব শম্ভুজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধেও তিনি সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই।

শিবাজীর পুত্র শম্ভুজীর সহিত ঔরংজেবের সংঘর্ষ

মারাঠা শক্তি ভিন্ন দাক্ষিণাত্যের সুলতানি রাজ্যগুলির বিরুদ্ধেও ঔরংজেব অভিযান শুরু করেন। তিনি বিজাপুর আক্রমণ করিয়া বিজাপুর সুলতানকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করেন। অতঃপর গোলকুণ্ডা আক্রমণ করিতে গিয়া ঔরংজেব আবদুল্লা পানি নামে গোলকুণ্ডার জনৈক রাজকর্মচারির বিশ্বাসঘাতকতার ফলে গোলকুণ্ডা অধিকার করিতে সক্ষম হন। গোলকুণ্ডা জয়ের পর ঔরংজেব সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া পুনরায় মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত

হইলেন। এইবার তিনি মারাঠা রাজধানী রায়গড় দখল করিতে সমর্থ হইলেন। শম্ভুজীর পুত্র শাহু মোগলহস্তে বন্দী হইলেন। বিজাপুর, গোলকুণ্ডা ও মারাঠা রাজ্যের কতকাংশ দখল করিয়া ঔরংজেব ত্রিচিনপল্লী এবং তাঞ্জোরের হিন্দু-রাজ্যগুলি আক্রমণ করিলেন। ঐ দুইটি স্থানেরই হিন্দু-রাজগণ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মোগল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। দাক্ষিণাত্যের এই সকল রাজ্যজয়ের ফলে ঔরংজেব এক অতি বিশাল সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট হইলেন। ইহার পূর্বে অপর কোন মোগল সম্রাট এইরূপ বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করেন নাই।*

ঔরংজেব কর্তৃক বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, মারাঠা রাজ্যের একাংশ, ত্রিচিনপল্লী ও তাঞ্জোর অধিকার

সমালোচনা (Criticism): ঔরংজেবের দাক্ষিণাত্য-নীতির যৌক্তিকতা সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ একমত নহেন। ডক্টর স্মিথ্, এল্‌ফিন্‌স্টোন প্রমুখ ঐতিহাসিকগণের মতে দাক্ষিণাত্যের সুলতানি রাজ্যগুলি জয় করিয়া ঔরংজেব অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরের স্বাধীনতা হরণ করিয়া ঔরংজেব মারাঠা শক্তির উত্থানের পথ প্রশস্ত করিয়াছিলেন। এই দুইটি সুলতানি রাজ্য স্বাধীন থাকিলে নিজ নিরাপত্তার জন্যই এগুলি মারাঠা শক্তিকে দমন করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিত। কিন্তু এই দুইটি রাজ্যের স্বাধীনতা-বিলুপ্তির ফলে মারাঠা শক্তিকে প্রতিহত করিবার মতো কোন স্থানীয় শক্তি আর রহিল না। কিন্তু সার্ যদুনাথ, ডক্টর রায়চৌধুরী, ডক্টর মজুমদার, ডক্টর দত্ত প্রভৃতি আধুনিক ঐতিহাসিকগণ এবিষয়ে ডক্টর স্মিথ্, এল্‌ফিন্‌স্টোন প্রভৃতি ঐতিহাসিকদের বিরুদ্ধ-মত পোষণ করেন। তাঁহাদের মতে গোলকুণ্ডা, বিজাপুর প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের সুলতানি রাজ্যের স্বাধীনতা বজায় থাকিলেও মারাঠা শক্তির

ডক্টর স্মিথ্ ও এল্‌ফিন্‌স্টোনের অভিমত

সার্ যদুনাথ, ডক্টর রায়চৌধুরী, ডক্টর মজুমদার প্রভৃতির অভিমত

* ঔরংজেবের আমলে মোগল সাম্রাজ্য চরম বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। এই বিশাল সাম্রাজ্য একুশটি সুবায় বিভক্ত ছিল। যথা: (১) আগ্রা, (২) এলাহাবাদ, (৩) আজমীর, (৪) বাংলা, (৫) বিহার, (৬) দিল্লী, (৭) কাশ্মীর, (৮) লাহোর, (৯) গুজরাট, (১০) মালব, (১১) মুলতান, (১২) সিন্ধু, (১৩) উড়িষ্যা (১৪) বেরার, (১৫) খান্দেশ, (১৬) ঔরঙ্গাবাদ, (১৭) বিদর, (১৮) হায়দ্রাবাদ (গোলকুণ্ডা), (১৯) বিজাপুর, (২০) অযোধ্যা ও (২১) কাবুল।

উত্থান রোধ করা সম্ভব হইত না, কারণ দাক্ষিণাত্যের সুলতানি রাজ্যগুলির মধ্যে কোনপ্রকার ঐক্য ছিল না। দুর্ধর্ষ মারাঠা শক্তিকে প্রতিহত করিতে হইলে যে পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন ছিল, পরস্পর বিবাদ-বিসম্বাদে লিপ্ত দাক্ষিণাত্যের সুলতানিগুলির পক্ষে সেই শক্তি সঞ্চয় করা কখনও সম্ভব হইত না। ইহা ভিন্ন মারাঠা জাতি ধর্ম ও গভীর জাতীয়তাবোধে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া এক স্বাধীন শক্তিশালী সামরিক সাম্রাজ্য গঠনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। এইরূপ প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে বিজাপুর বা গোলকুণ্ডার সুলতান কোনপ্রকার সাফল্য লাভ করিতে পারিতেন এইরূপ মনে করিবার কোনও কারণ নাই। সুতরাং এই দুইটি রাজ্য দখল করিয়া ঔরংজেব যে-কোন রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন এইরূপ মনে করিবার কোন যুক্তি নাই।

কিন্তু ঔরংজেবের দাক্ষিণাত্য-নীতি মোগল সাম্রাজ্যের পক্ষে সর্বনাশাত্মক হইয়াছিল, একথা অনস্বীকার্য। ঔরংজেবের দাক্ষিণাত্যে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইবার ফলে উত্তর-ভারতে অব্যবস্থা দেখা দিয়াছিল। সম্রাটের দীর্ঘকাল রাজধানী হইতে অনুপস্থিতির অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে মোগল শাসনব্যবস্থাও শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। ইহা ভিন্ন দীর্ঘকাল ধরিয়া ক্রমাগত যুদ্ধের ফলে মোগল সেনাবাহিনীর দক্ষতাও হ্রাস পাইয়াছিল। নানাপ্রকার অসুবিধা ভোগ এবং যুদ্ধজনিত ক্লান্তির ফলে মোগলবাহিনীর সামরিক ক্ষমতাই যে কেবল হ্রাস পাইয়াছিল এমন নহে, সৈনিকদের সাহস এবং আত্মপ্রত্যয়ও লোপ পাইয়াছিল। দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর দাক্ষিণাত্যে ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া এবং প্রভূত পরিমাণ অর্থ ও সৈন্য ক্ষয় করিয়াও ঔরংজেব সেই অনুপাতে লাভবান হন নাই। সাম্রাজ্যের দুর্বলতা ও পতনের দিক দিয়া এই কারণগুলি যে যথেষ্ট দায়ী ছিল, সেবিষয়ে সন্দেহ নাই। মোগল সাম্রাজ্যের বিশালতাও উহার পতনের অন্যতম কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ন যেমন 'স্পেনীয় ক্ষত' (Spanish ulcer) তাঁহার সর্বনাশের কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন তেমনি 'দাক্ষিণাত্যের ক্ষত' (Deccan ulcer) ঔরংজেবের সর্বনাশের কারণ হইয়াছিল, একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

উপসংহার

ঔরংজেবের শেষজীবন (The Last days of Aurangzeb) : বৃদ্ধ পিতাকে সিংহাসনচ্যুত, অপমানিত ও লাঞ্ছিত করিয়া ঔরংজেব যে সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন এবং দীর্ঘকাল অক্লান্তশ্রমে যে বিশাল সাম্রাজ্য গঠন

করিয়াছিলেন উহার কোন কিছুই তাঁহাকে শেষজীবনে শান্তি দান করিতে পারিল না। তাঁহার পুত্রগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। দাক্ষিণাত্যে মারাঠা শক্তি পুনরায় দুর্বার হইয়া উঠিল। ফলে, বিশাল মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি ক্রমেই শিথিল হইতে শিথিলতর হইতে লাগিল। নিজের জীবনের ব্যর্থতা ও সাম্রাজ্যের আসন্ন বিপদ তাঁহার অন্তরকে পীড়িত করিয়া তুলিল। ভগ্নহৃদয় ও ভগ্ন স্বাস্থ্যে জীবনের শেষ দিনগুলি যাপন করিয়া স্পর্ধিত মোগল সম্রাট ঔরংজেব আলমগীর বাদশা গাজী আহম্মদনগরে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন (৩, মার্চ, ১৭০৭)।

মৃত্যু (মার্চ, ৩, ১৭০৭)

ঔরংজেবের চরিত্র ও কৃতিত্ব-বিচার (Critical Estimate of Aurangzeb's character and achievements): ঔরংজেব মোগল-বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন ইহা অনস্বীকার্য। তাঁহার চরিত্রের জটিলতা বহু ঐতিহাসিককে বিভ্রান্ত করিয়াছে। তাঁহার দোষগুণের সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ বিচার অনেক ক্ষেত্রেই করা হয় নাই। বৃদ্ধ পিতার প্রতি তাঁহার আচরণ তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য-সম্পর্কিত বিচারকে প্রভাবিত করিয়াছে। কিন্তু তৈমুর বংশের ইহা-ই ছিল চিরাচরিত রীতি। সুতরাং ভ্রাতৃহত্যা বা পিতার প্রতি নির্মম ব্যবহার ঔরংজেবের চরিত্র-বিচারে যেন আমাদিগকে বিভ্রান্ত না করে।

বিভ্রান্তকারী চরিত্রের জটিলতা

ঔরংজেব সুদক্ষ সমরনায়ক, ক্ষমতাবান শাসক এবং সূক্ষ্ম কূটবুদ্ধিসম্পন্ন রাজনীতিক ছিলেন। বিপদে সাহস ও ধৈর্য সহকারে নিজ অভীষ্ট সিদ্ধির চেষ্টার ক্রুটি তিনি কোন দিনই করেন নাই। দাক্ষিণাত্যের শাসক হিসাবে তিনি দাক্ষিণাত্যের আভ্যন্তরীণ অবস্থার উন্নতি বিধানের চেষ্টা করিয়াছিলেন। মুর্শিদ কুলি খাঁর সাহায্যে তিনি দাক্ষিণাত্যের রাজস্ব-ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করিয়াছিলেন। সম্রাট-পদলাভের পরও তিনি কোন সময়েই শাসনকার্যে অবহেলা প্রদর্শন করেন নাই। ফরাসীরাজ চতুর্দশ লুই-এর তিনি ছিলেন সমসাময়িক। লুই-এর ন্যায় তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমী এবং নিজ ক্ষমতায় বিশ্বাসী ছিলেন। লুই-এর মতোই তিনি নিজেই ছিলেন নিজের প্রধানমন্ত্রী। শাসনকার্যের খুঁটিনাটিও তাঁহার দৃষ্টি এড়াইত না এবং প্রত্যেক বিষয়েই তিনি স্বয়ং আদেশ দিতেন। আইন-কানুন যাহাতে কেহ অমান্য না

চরিত্রের গুণাবলী

করিতে পারে সেবিষয়ে তাঁহার প্রখর দৃষ্টি ছিল। রাজ্যশাসন ব্যাপারে ঔরংজেব কাহারো প্রভাবে অন্যায়ভাবে প্রভাবিত হইতেন না। মধ্যযুগীয় রাজগণের ন্যায় তাঁহার সাম্রাজ্য-লিপ্সার অন্ত ছিল না। শাসন-ব্যাপারেও তিনি নিজের সর্বাত্মক প্রাধান্যের পক্ষপাতী ছিলেন।

আইন-কানুন প্রয়োগে কঠোরতা

ঔরংজেবের সাহস ছিল অপরিসীম, তাঁহার কর্মনিষ্ঠা ছিল অতুলনীয়। গেমেলি ক্যারেরী (Gemelli-Careri) নামে জনৈক ইতালীয় চিকিৎসক ঔরংজেবের রাজত্বকালের শেষ দিকে ভারত-ভ্রমণে আসিয়াছিলেন। তিনি বৃদ্ধ ঔরংজেবকে শাসনকার্যের যাবতীয় কাগজ-পত্র নিজে পাঠ করিয়া সেগুলির উপর নিজ আদেশ লিখিয়া দিতে দেখিয়াছিলেন। গেমেলি ঔরংজেবের কর্মক্ষমতা ও দায়িত্বজ্ঞানের প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

কর্মনিষ্ঠা

ইস্‌লাম ধর্মনীতি সম্পর্কে ঔরংজেবের গভীর জ্ঞান ছিল। ফার্সী সাহিত্য, আরবীয় আইন-কানুন, নীতিশাস্ত্র প্রভৃতি সম্পর্কে তাঁহার অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল। মুসলমান আমলের সর্ব বৃহৎ আইন সংকলন 'ফতোয়া আলমগীরী' ঔরংজেবের পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত হইয়াছিল। মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরাণ তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। ধর্ম বিষয়ে তিনি ছিলেন অত্যন্ত গোঁড়া। নিজ হস্তে কোরাণের অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া তিনি মক্কায় প্রেরণ করিতেন। ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি ছিলেন অনাড়ম্বর। মিতাহার, স্বল্পনিদ্রা, মাদক দ্রব্যাদিতে অনাসক্তি প্রভৃতি ছিল তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

শিক্ষা

ধর্মসম্পর্কে গোঁড়ামি

কিন্তু উপরোক্ত গুণাবলীর অধিকারী হইলেও ঔরংজেব যে শাসক হিসাবে সাফল্যলাভে সমর্থ হন নাই, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। বিভিন্ন জাতি ও ধর্ম-সম্প্রদায়-অধ্যুষিত ভারত সম্রাটের দায়িত্ব উপলব্ধি করিবার মতো রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি তাঁহার ছিল না। সংকীর্ণ ধর্মান্ধ-নীতি অনুসরণ করিয়া তিনি অ-মুসলমানদের আনুগত্য হারাইয়াছিলেন। জনকল্যাণ সাধনের প্রয়োজনীয়তা এবং জনকল্যাণের মধ্যেই যে রাষ্ট্রকল্যাণ নিহিত, উহা উপলব্ধি

শাসক হিসাবে ব্যর্থতা

দূরদৃষ্টির অভাব

করিবার মতো অন্তর্দৃষ্টিও তাঁহার ছিল না। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রজাবর্গের স্বাভাবিক আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল রাষ্ট্র-ই যে প্রকৃত শক্তির অধিকারী, একথা তিনি বুঝিতে পারেন নাই।

সংকীর্ণ অসহিষ্ণু নীতি

শুধু পরধর্ম-অসহিষ্ণুতা-ই যে তাঁহার ছিল এমন নহে, অপরের প্রতি তিনি সন্দিহানও ছিলেন। এই সন্দিগ্ধভাবের ফলেই তিনি অপর কাহারও উপর কখনও কোন আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। রাষ্ট্রের যাবতীয় ক্ষমতা নিজহস্তে কেন্দ্রীভূত করিয়া তিনি রাজকর্মচারিগণের স্বাভাবিক উদ্যোগ-উদ্যমের পথ রুদ্ধ করিয়াছিলেন। সম্রাটের উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতার ফলেই স্বাধীনভাবে কোন কিছু করিবার ক্ষমতাই তাঁহারা হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন।

রাষ্ট্রক্ষমতা নিজহস্তে কেন্দ্রীকরণ

দীর্ঘকাল সেনাবাহিনীকে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত রাখিয়া তিনি তাহাদের সামরিক দক্ষতাও ক্ষুণ্ণ করিয়াছিলেন তাঁহার রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদৃষ্টির অভাবহেতুই মোগল সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি বৃদ্ধি পাইলেও উহার ভিত্তি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। সম্রাট আকবরের দূরদর্শিতায় গঠিত মোগল সাম্রাজ্য ঔরংজেবের অদূরদর্শিতায় আশু পতনের পথে ধাবিত হইয়াছিল।

মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পথ প্রস্তুত

একাদশ অধ্যায়

ছত্রপতি শিবাজী

(Chhatrapati Shivaji)

মারাঠা শক্তির উত্থান (Rise of the Maratha Power) ঃ সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ভাগে মারাঠা শক্তির উত্থান ভারত-ইতিহাসের এক যুগান্তকারী ঘটনা। প্রাচীন কালে মহারাষ্ট্র অঞ্চল সাতবাহন ও চালুক্য রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মধ্যযুগের প্রথমার্ধে এই দেশে যাদববংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেছিলেন। যাদববংশীয় রাজা রামচন্দ্রদেবকে পরাজিত করিয়া আলা-উদ্দিন এই অঞ্চল নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই মারাঠাগণ পুনরায় দাক্ষিণাত্যের রাজনীতিক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিতে শুরু করে। প্রথমে বহ্‌মনীরাজ্য এবং উহার পতনের পর আহ্‌মদনগর ও বিজাপুরের সুলতানি রাজ্যগুলিতে মারাঠা দলপতিগণ সামরিক কার্য করিতেন। সেই সময়ে বহু মারাঠা দলপতি দাক্ষিণাত্যের সুলতানগণের নিকট হইতে জায়গীর, উচ্চ সম্মান এবং সামরিক শক্তি লাভ করেন। শিবাজীর পিতা শাহজীর নাম এবিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মহারাষ্ট্রের পূর্ব-ইতিহাস

দীর্ঘকাল নানাপ্রকার সামরিক দায়িত্ব-পালন ও যুদ্ধবিগ্রহের অভিজ্ঞতার ফলে মারাঠা জাতি এক দুর্ধর্ষ সামরিক শক্তি হিসাবে গড়িয়া উঠিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল। কিন্তু তাহারা তখনও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ হইতে পারে নাই। নাসিক, পুণা, সাতারা, সোলাপুর এবং আহ্‌মদনগরের একাংশ লইয়া তখন মহারাষ্ট্রদেশ গঠিত ছিল। কোঙ্কনেও মারাঠাদের বসতি ছিল।* কিন্তু এই সকল ভিন্ন ভিন্ন স্থানে মারাঠা দলপতিগণ স্থানীয় শক্তি-সামর্থ্যের অধিকারী হইলেও তাঁহারা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে

রাজনৈতিক অনৈক্য

সপ্তদশ শতাব্দীতে মারাঠা জাতি শিবাজীর অধীনে ঐক্যবদ্ধ

*Vide *Shivaji and His Times* : Sir J. N. Sarkar.

পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত ছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ভাগে মারাঠা-বীর শিবাজী মারাঠা জাতিকে এক গভীর জাতীয়তা ও ধর্মবোধে উদ্‌বুদ্ধ করিয়া এক ঐক্যবদ্ধ মহারাষ্ট্র দেশ গঠনে সমর্থ হন।

কিন্তু শিবাজীর সংগঠনী-শক্তি ও নেতৃত্ব ভিন্ন অপর কয়েকটি প্রভাব পূর্ব হইতেই মারাঠা জাতিকে ঐক্যের পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছিল।

অপরাপর প্রভাব: ভৌগোলিক পরিবেশ, ধর্ম ও সামরিক শিক্ষা

সুতরাং শিবাজীর উত্থান মারাঠা জাতির ইতিহাসের কোন আকস্মিক বা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নহে, উহা ছিল বিভিন্ন প্রভাবের এক অতি স্বাভাবিক পরিণতি।* যে-সকল প্রভাব ও ঘটনা মারাঠা জাতির মধ্যে এক গভীর জাতীয় চেতনা জাগাইয়া তুলিয়াছিল সেগুলির মধ্যে ভৌগোলিক পরিবেশ, ধর্ম ও দাক্ষিণাত্যের সুলতানগণের অধীনে মারাঠা জাতির সামরিক শিক্ষালাভ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মহারাষ্ট্র পর্বতসঙ্কুল দেশ। সহায়দ্রি, বিন্ধ্য ও সাতপুরা পর্বতশ্রেণী, তাপ্তী ও নর্মদা নদী মহারাষ্ট্র দেশকে এক প্রাকৃতিক দুর্গস্বরূপ করিয়া

প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ও উহার প্রভাব

তুলিয়াছে। সহায়দ্রি-বিন্ধ্য-সাতপুরা পর্বতের উত্তুঙ্গ প্রাচীর, তাপ্তী ও নর্মদা নদীর গভীর পরিখা মহারাষ্ট্র-দেশকে বহিরাক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার সুযোগ বৃদ্ধি করিয়াছিল। পর্বতসঙ্কুল দেশে প্রকৃতির কৃপণতা মারাঠা জাতিকে স্বভাবতই কঠোর পরিশ্রমী, সাহসী ও ধৈর্যশীল করিয়া তুলিয়াছিল। ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য তাহাদের মধ্যে তেমন ছিল না, ফলে সেদেশে সামাজিক ঐক্যবোধ স্বাভাবিক-ভাবেই বৃদ্ধি পাইবার সুযোগ ছিল।† সাম্য, ভ্রাতৃত্ববোধ, আত্মপ্রত্যয় ও সরলতা ছিল তাহাদের চরিত্রের সহজাত ও স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। তাহাদের জীবন-

* "Sivaji's rise to power cannot be treated as an isolated phenomenon in Maratha history." Ishwari Prasad, *A History of the Muslim Rule in India*. p. 649.

† "Though poor the peasant's hut, his feast tho' small
He sees his little lot the lot of all."
—Goldsmith. (on the Swiss),
The Traveller.

যাত্রা ছিল অনাড়ম্বর ও তাহাদের দেহ ছিল সবল ও সুস্থ। প্রকৃতি কর্তৃক মহারাষ্ট্র দেশ সুরক্ষিত থাকিবার ফলে মারাঠা জাতির মধ্যে প্রাচীন গ্রীকদের ন্যায়ই গভীর স্বাধীনতা-স্পৃহা জন্মিয়াছিল। তাহারা ছিল 'ভারতীয়-স্পার্টান' (Indian Spartans)। যোদ্ধা হিসাবে স্পার্টানদের ন্যায় তাহারাও ছিল দুর্ধর্ষ। অতর্কিত আক্রমণ এবং পর্বতসঙ্কুল দেশের বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করিয়া যুদ্ধের ব্যাপারে তাহারা ছিল আফগান উপদলগুলির মতোই দুঃসাহসী।

মারাঠা জাতির বৈশিষ্ট্য —'ভারতীয় স্পার্টান'

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে মহারাষ্ট্র দেশে ধর্মের এক প্রবল বন্যা দেখা দিয়াছিল। তুকারাম, রামদাস, বামন পণ্ডিত ও একনাথ প্রভৃতি ধর্মগুরু হিন্দুধর্মের যাবতীয় সংকীর্ণতা ও কুসংস্কার দূর করিয়া 'ভক্তিবাদ' নামক সাম্যবাদী ধর্মের প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রচারিত ধর্মমতে, বিশেষতঃ রামদাস প্রচারিত ধর্মে এক গভীর জাতীয়তাবাদী আবেদনও ছিল। সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্ম—সর্বক্ষেত্রে এক সর্বাঙ্গীণ পুনরুজ্জীবনই ছিল এই ধর্মের মূল উদ্দেশ্য। এই ধর্মের প্রভাবে প্রভাবিত হইবার এবং তাঁহার উদ্দেশ্য সফল করিয়া তুলিবার মতো উপযুক্ত ব্যক্তিরও অভাব হইল না। মারাঠা বীর শিবাজীর মনে এই সকল প্রভাব ও আদর্শ এক গভীর রেখাপাত করিল। তিনি 'খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত' মারাঠা জাতিকে 'এক রাজ্যপাশে' আবদ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন।

ধর্মের প্রভাব : তুকারাম, রামদাস, বামন পণ্ডিত ও একনাথ

ধর্মের প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে মারাঠা ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাবও মারাঠা জাতির মধ্যে এক গভীর ঐক্যবোধ জাগাইয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছিল। তুকারাম রচিত 'ভজন' মারাঠা জাতির সকল সম্প্রদায় কর্তৃকই গীত হইত। এইভাবে দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে এক গভীর একতাবোধ জাগরিত হইয়াছিল।

ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব

কিন্তু দাক্ষিণাত্যের সুলতানগণের অধীনে সামরিক বৃত্তি গ্রহণ করিয়া মারাঠা জাতি নিজেদের স্বাভাবিক দুর্ধর্ষতার সহিত মুসলমান যুদ্ধ নীতির সংমিশ্রণে এক অসাধারণ শক্তিশালী সামরিক জাতি হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার বেসামরিক শাসনকার্যে বহুসংখ্যক মারাঠা কর্মচারী নিযুক্ত

সামরিক শিক্ষা

ছিলেন। এই শাসন-সংক্রান্ত কার্যের অভিজ্ঞতাও পরবর্তী কালে মারাঠাদের বহু উপকারে আসিয়াছিল।

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, দাক্ষিণাত্যের সুলতানদের অধীনে বহু মারাঠা দলপতি জায়গীর ও উচ্চ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্যের শাসক হিসাবে ঔরংজেব যখন বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা আক্রমণ করেন তখন মারাঠা জায়গীরদারগণ তাঁহাদের সামরিক সাহায্যের বিনিময়ে গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরের সুলতানদের নিকট হইতে নানাপ্রকারের সুযোগ-সুবিধা আদায় করিয়া লইয়া ছিলেন। এই মারাঠা জায়গীরদারগণের অন্যতম শাহজী ভোঁসলা প্রথমে আহ্‌মদনগরের এবং ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বিজাপুরের সুলতানের অধীনে কার্য গ্রহণ করেন। পুণা ও কর্ণাটে তাঁহার বিস্তীর্ণ জায়গীর ছিল। এই মারাঠা জায়গীরদার শাহজীর পুত্র-ই বিখ্যাত শিবাজী।

দাক্ষিণাত্যের সুলতানদের অধীনে মারাঠা দলপতিদের জায়গীর লাভ

শাহজী ভোঁসলা

শিবাজীর জন্ম ও বাল্যজীবন (Birth & Early life of Shivaji) : শিবাজী ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে* (৬, এপ্রিল) জুনারের নিকটবর্তী শিবনের দুর্গে জন্মগ্রহণ করেন। শিবাজীর মাতা জীজাবাঈ ছিলেন শাহজীর উপেক্ষিতা ও অবহেলিতা পত্নী। শাহজী তাঁহার অধিকতর সুন্দরী এবং অল্পবয়স্কা স্ত্রী তুকাবাঈ ও তুকাবাঈ-এর পুত্র ব্যাঙ্কোজী সহ নিজ কর্মস্থল বিজাপুরে বাস করিতেন। আর শিবাজীসহ জীজাবাঈ দাদাজী বা দাদোজী কোণ্ডদেব নামে জনৈক ব্রাহ্মণের তত্ত্বাবধানে পুণায় বাস করিতেন। জীজাবাঈ ছিলেন স্বভাবতই ধর্মপরায়ণা। স্বামীর অবহেলাজনিত মর্মবেদনা তাঁহাকে ধর্মানুরাগিণী তপশ্চারিণীতে পরিণত করিয়াছিল। মাতার এই ধর্মানুরাগ ও তপশ্চারণ শিবাজীর মনে গভীর রেখাপাত করিল। দাদাজী কোণ্ডদেবের স্নেহ ও শিক্ষায় শিবাজীর মনে এক বিরাট আদর্শ গড়িয়া উঠিল। জীজাবাঈ ছিলেন প্রাচীন যাদববংশসম্ভূতা। দাদাজী ছিলেন রাজপুত বংশজাত। যাদব বংশ, রাজপুত জাতি এবং রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী

শিবাজীর জন্ম (১৬২৭)

মাতা জীজাবাঈ ও দাদাজী কোণ্ডদেবের প্রভাব

* কাহারও কাহারও মতে ১৬৩০ খ্রীঃ ১৯শে ফেব্রুয়ারি।

শ্রবণ করিয়া শিবাজীর মনে সাহস ও দেশপ্রেম উভয়ই সঞ্চারিত হইয়াছিল। দাদাজী কোণ্ডদেবের ধর্মপরায়ণতা ও তাঁহার মুখে দেশপ্রেম ও বীরত্বের কাহিনী শুনিয়া শিবাজী দেশপ্রেম ও বীরত্বের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। এযাবৎ প্রাপ্ত ঐতিহাসিক তথ্যাদি হইতে শিবাজী নিরক্ষর ছিলেন বলিয়াই জানা যায় তবে সন্ত রামদাসের নিকট লিখিত একটি পত্রের নিম্নে কয়েকটি কথা শিবাজীর হস্তাক্ষর বলিয়া 'রামদাসী পত্র ব্যবহার' গ্রন্থে দাবি করা হইয়াছে। সার্ যদুনাথের মতে, অপর কোন ঐতিহাসিক সমর্থনাভাবে এই পত্রে লিখিত কয়েকটি কথা শিবাজীর হস্তাক্ষর বলিয়া গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত হইবে না। যাহা হউক, সম্রাট আকবর, হায়দর আলি, রঞ্জিৎ সিংহের ন্যায় শিবাজীও নিরক্ষর ছিলেন এই কথা-ই সাধারণ্যে প্রচলিত। নিরক্ষর হইলেও শিবাজীর মানসিক ক্ষমতার যে পূর্ণবিকাশ সাধিত হইয়াছিল তাহা শিবাজীর জীবনের কার্যাবলী এবং শাসনদক্ষতা হইতেই অনুমান করা যাইতে পারে। দৈহিক ক্ষমতার দিক দিয়াও শিবাজী নানাপ্রকার শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। যুদ্ধবিদ্যা, অশ্বচালনা এবং অনুরূপ কার্যে তিনি ছিলেন অসাধারণ দক্ষতার অধিকারী।

বাল্যশিক্ষা

দাদাজী কোণ্ডদেবের মাধ্যমে বাল্যকাল হইতেই পুণার মাওল* বা মাওয়ালী জাতির সহিত শিবাজীর ঘনিষ্ঠ পরিচয় জন্মে। পরবর্তী কালে এই মাওয়ালী জাতির অনুচর লইয়াই শিবাজী তাঁহার দুর্ধর্ষ এবং বিশ্বস্ত সেনাবাহিনী গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।

মাওল বা মাওয়ালী জাতির সহিত ঘনিষ্ঠতা

উচ্চ আদর্শের সহিত দুঃসাহসিকতা ও দৈহিক শক্তির সমন্বয় সাধিত হইলে যে অদম্য উদ্যম ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, শিবাজীর ক্ষেত্রেও তাহা-ই ঘটিয়াছিল। কিন্তু দাদাজী কোণ্ডদেবের জীবদ্দশায় শিবাজী দুঃসাহসিকতার পথে সম্পূর্ণভাবে পদার্পণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু ১৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দে দাদাজীর মৃত্যু হইলে শিবাজী নিজ পরিকল্পিত পথে অগ্রসর হইবার পূর্ণ সুযোগ পাইলেন।

দাদাজীর মৃত্যু: শিবাজীর অবাধ স্বাধীনতা

উত্তর-ভারতে মোগল সম্রাটের কর্মব্যস্ততা এবং বিজাপুর সুলতানের

* সার্ যাদুনাথ মাওল 'Maval' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। Vide *Shivaji & His Times*, p.32.

অসুস্থতার সুযোগে বিজাপুর রাজ্যে অব্যবস্থা দেখা দিলে শিবাজী পুণার দক্ষিণ-পশ্চিমে তোরণা নামক দুর্গটি দখল করিলেন। ইহা ভিন্ন তোরণা দুর্গের নিকটবর্তী রায়গড় দুর্গটিও তিনি আক্রমণ করিলেন। ১৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দে দাদাজীর মৃত্যুর পর শিবাজী চকন দুর্গ এবং বড়মতি ও ইন্দুপুরের সামরিক ঘাঁটিগুলিও দখল করিয়া লইলেন। ইহার অব্যবহিত পরে তিনি সিংহগড়, কোন্দন ও পুরন্দর দুর্গগুলি দখল করিয়া নিজ কর্মকেন্দ্র পুণার নিরাপত্তা বিধান করিলেন। বিজাপুরের সুলতান প্রথমে শিবাজীর এইরূপ কার্যাবলীতে তেমন বিচলিত না হইলেও শিবাজী যখন কল্যাণ দুর্গটি দখল করিয়া বসিলেন এবং কোঙ্কণ আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করিলেন তখন বিজাপুর সুলতানের টনক নড়িল। সেই সময়ে শিবাজীর পিতা শাহজী বিজাপুর সুলতানের সেনাপতি মুস্তাফা কর্তৃক কারারুদ্ধ হইলেন। জিঞ্জি দুর্গ অবরোধ* করিতে গিয়া উদ্ধত ব্যবহারের জন্যই তাঁহাকে কারারুদ্ধ করা হইয়াছিল, কিন্তু শিবাজীর কার্যকলাপ যে ইহার মূল কারণ ছিল সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। অতঃপর শাহজীর জায়গীরও কাড়িয়া লওয়া হইল। পিতা কর্তৃক অবহেলিত পুত্র হইলেও শিবাজী শাহজীর কারারুদ্ধ হওয়ার সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত মর্মাহত হইলেন। সুতরাং কিছুকালের জন্য বাধ্য হইয়াই তিনি বিজাপুর রাজ্যের বিরুদ্ধে আক্রমণ বন্ধ করিলেন এবং পিতার মুক্তির জন্য কূটকৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তিনি দাক্ষিণাত্যের মোগল শাসনকর্তা সম্রাট শাহ্‌জাহানের পুত্র মুরাদের সহিত মোগলপক্ষে যোগদান করিবার আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। তখন বিজাপুরের সুলতান এই সংবাদে অত্যন্ত ভীত হইয়া শিবাজীর সন্তুষ্টিবিধানের জন্য শাহজীকে মুক্তি দিলেন। স্যর্‌ যদুনাথের মতে বিজাপুরের কতিপয় উচ্চপদস্থ রাজ-কর্মচারীর অনুরোধে শাহ্‌জীকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল। অবশ্য শিবাজী ভবিষ্যতে বিজাপুরের বিরুদ্ধে কোন আক্রমণাত্মক কার্য করিবেন না এই শর্ত

শিবাজী কর্তৃক তোরণা দুর্গ জয়, রায়গড় আক্রমণ, চকন দুর্গ জয়, বড়মতি ও ইন্দুপুরের ঘাঁটি অধিকার

কল্যাণ দুর্গ অধিকার : শাহজী কারারুদ্ধ

আক্রমণাত্মক কার্য হইতে শিবাজীর সাময়িক বিরতি

---

* Vide Ishwari Prasad: *A short History of Muslim Rule*, p. 657.

শাহজীকে মানিয়া লইতে হইল। সুতরাং শিবাজী কিছুকাল শান্তভাবেই কাটাইলেন এবং নিজ শক্তি ও সামর্থ্য বৃদ্ধিতে মনোযোগী হইলেন।

১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ঔরংজেব বিজাপুর রাজ্য আক্রমণ করিলেন। সেই সুযোগে শিবাজী জাওলী নামক মারাঠা রাজ্যটি দখল করিয়া নিজ রাজ্যসীমা ও শক্তি বৃদ্ধি করিলেন। পর বৎসর (১৬৫৭) তিনি আহ্মদনগরে মোগল অধিকৃত স্থানগুলির মধ্যে জুনার ও অপর কয়েকটি স্থান অধিকার করিয়া লইলেন। তখন ঔরংজেব শিবাজীর বিরুদ্ধে এক মোগলবাহিনী প্রেরণ করিলেন। শিবাজী ও মোগল সেনার মধ্যে এই সর্বপ্রথম সংঘর্ষ ঘটিল। শিবাজী এই যুদ্ধে পরাজিত হইলেন বটে, কিন্তু সেই সময়ে বৃষ্টিপাত শুরু হইলে ঔরংজেবের সেনাবাহিনীর শিবাজীর তেমন ক্ষতিসাধন করিতে পারিল না। ইহার অল্পকালের মধ্যেই শাহ্জাহানের অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া ঔরংজেব দাক্ষিণাত্য ত্যাগ করিয়া আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করিলে শিবাজীর সুযোগ বৃদ্ধি পাইল। পরবর্তী দুই বৎসরের মধ্যে (১৬৫৭—'৫৯) তিনি উত্তর-কোঙ্কণ এবং অপরাপর কয়েকটি স্থান দখল করিলেন। বিজাপুর সুলতান মোগল আক্রমণ হইতে মুক্ত হইয়া শিবাজীকে দমন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। সেনাপতি আফ্জল খাঁকে এক বিশাল বাহিনীসহ শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হইল। শিবাজীকে জীবিত অথবা মৃত যেভাবেই হউক ধরিয়া আনিবার আদেশ সেনাপতি আফ্জলকে দেওয়া হইল।

জাওলী, জুনার ও অপরাপর স্থান অধিকার

মোগল হস্তে শিবাজীর পরাজয়

উত্তর-কোঙ্কণ ও অপরাপর স্থান অধিকার

আফ্জল খাঁ কৌশলে শিবাজীকে হত্যা করিয়া তাঁহার মৃতদেহ বিজাপুরে লইয়া আসিবেন মনস্থ করিয়া তাঁহাকে নিজ শিবিরে শান্তিস্থাপনের উদ্দেশ্যে আলাপ-আলোচনার জন্য আহ্বান করিলেন। মারাঠা ব্রাহ্মণ কৃষ্ণজী ভাস্কর দূত হিসাবে গমন করিলেন, কিন্তু তিনি আফ্জল খাঁর দুরভিসন্ধি সম্পর্কে শিবাজীকে ইঙ্গিত দিয়া আসিলেন। শিবাজী প্রস্তুত হইয়াই আফ্জলের শিবিরে উপস্থিত হইলেন। আফ্জল খাঁ শিবাজীকে আলিঙ্গন করিবার ভান করিয়া তাঁহার গলা টিপিয়া ধরিয়া তাহাকে ছুরিকাঘাত করিতে চেষ্টা করিলে শিবাজী তাঁহার লৌহ-

সেনাপতি আফ্জলের হত্যা

নির্মিত 'বাঘনখ' নামক অস্ত্র দ্বারা আফ্‌জলের বক্ষ ছিন্নভিন্ন করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিলেন। শিবাজীকে মৃত অবস্থায় বিজাপুরে লইয়া যাইতে আসিয়া আফ্‌জল নিজ মৃতদেহই রাখিয়া গেলেন। সেনাপতি আফ্‌জল খাঁর মৃত্যুতে বিজাপুরের বিশাল সেনাবাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। শিবাজী অনায়াসেই তাহাদিগকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিয়া বিজাপুর রাজ্য হইতে কোলাপুর ও দক্ষিণ-কোঙ্কণ দখল করিয়া লইলেন।

কোলাপুর ও দক্ষিণ-কোঙ্কণ জয়

আফ্‌জলের হত্যার জন্য কাফি খাঁ শিবাজীকে সম্পূর্ণভাবে দায়ী করিয়াছেন। গ্র্যাণ্ট ডাফ্ ও অপরাপর ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ কাফি খাঁর মন্তব্যের উপর নির্ভর করিয়াই শিবাজীকেই বিশ্বাসঘাতক, চক্রান্তকারী বলিয়া অভিহিত করিযাছেন। কিন্তু সমসাময়িক ইংরেজ বাণিজ্যকুঠিতে (Factory) রক্ষিত কাগজপত্র হইতে ইহা প্রমাণিত হয় যে, বন্ধুত্বের ভান করিয়া শিবাজীকে বন্দী করিবার সুস্পষ্ট নির্দেশ আফ্‌জল খাঁকে দেওয়া হইয়াছিল এবং শিবাজী আফ্‌জলের আক্রমণ হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই তাঁহাকে হত্যা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।*

আফ্‌জল খাঁর হত্যা সম্পর্কে কাফি খাঁর মন্তব্য

ইতিমধ্যে ঔরংজেব বৃদ্ধ পিতা সম্রাট শাহ্‌জাহানকে সিংহাসন হইতে অপসারিত করিয়া স্বয়ং সম্রাট হইয়াছেন। তিনি শিবাজীকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে নিজ মাতুল শায়েস্তা খাঁকে দাক্ষিণাত্যের শাসন-কর্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। শায়েস্তা খাঁ পুণা ও চকন এবং উত্তর-কোঙ্কণ ও কল্যাণ অধিকার করিতে সমর্থ হইলেন। এই পরিস্থিতিতে শিবাজী বিজাপুর রাজ্যের সহিত যুদ্ধ মিটাইয়া ফেলিতে বাধ্য হইলেন। অতঃপর তিনি তাঁহার সমগ্র শক্তিসহ মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। চকন দুর্গটি জয় করিয়া শায়েস্তা খাঁ যখন পুণার শিবিরে অবস্থান করিতেছিলেন ঐ সময়ে শিবাজী একদিন রাত্রির অন্ধকারে আকস্মিক-ভাবে শায়েস্তা খাঁর শিবিরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার পুত্রকে হত্যা করিলেন এবং

শায়েস্তা খাঁ

* Vide Sir J. N. Sarkar's *Shivaji & His Times*, p. 69, also foot note of the same page.

প্রায় চল্লিশ জন দেহরক্ষীকে হত্যা করিয়া শায়েস্তা খাঁকে আক্রমণ করিলেন। অতর্কিত আক্রমণ হইতে প্রাণ বাঁচাইতে গিয়া শায়েস্তা খাঁ পলায়ন করিলেন। কিন্তু পলায়নের কালে শিবাজীর তরবারির আঘাতে তাঁহার হাতের একটি অঙ্গুলী হারাইয়া তিনি দাক্ষিণাত্য ত্যাগ করিলেন। শায়েস্তা খাঁর এইরূপ শোচনীয় পরাজয়ে ঔরংজেব অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন। তিনি শায়েস্তা খাঁকে বাংলার শাসনকর্তা-পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন।

শায়েস্তা খাঁর দাক্ষিণাত্য হইতে পলায়ন ও বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত (১৬৬৩)

এদিকে শিবাজী সুরাট বন্দর লুণ্ঠন করিয়া প্রায় এক কোটি মুদ্রা সংগ্রহ কিন্তু ঔরংজেব শিবাজীকে দমন করিবার সংকল্প ত্যাগ করিলেন না। তিনি জয়সিংহ ও দিলীর খাঁকে শিবাজীকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করিলেন। জয়সিংহের কূটকৌশলে শিবাজী বিজাপুরের বিরুদ্ধে মোগলবাহিনীকে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন। ইহাছাড়া, অল্পকালের মধ্যেই জয়সিংহ কূট-কৌশলে শিবাজীর অনুচরবর্গের কয়েকজনকে স্বপক্ষে আনিতে সক্ষম হইলেন। তারপর তিনি শিবাজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এইবার শিবাজী মোগলবাহিনীর নিকট পরাজিত হইয়া তাঁহার মোট ৩৬টি দুর্গের মধ্যে ২৩টি মোগলদের নিকট ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। অবশিষ্ট ১৩টি দুর্গের জন্যও পুরন্দরের সন্ধির দ্বারা তিনি মোগলদের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। ইহার অব্যবহিত পরে জয়সিংহ বিজাপুর আক্রমণ করিলে শিবাজী নিজ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জয়সিংহকে সাহায্য করিলেন। সেই সময়ে কুচক্রী জয়সিংহ সরলপ্রাণ শিবাজীকে নানাপ্রকার মিথ্যা প্ররোচনায় প্ররোচিত করিয়া আগ্রায় ঔরংজেবের সহিত সাক্ষাতের জন্য লইয়া গেলেন।

শিবাজী কর্তৃক সুরাট বন্দর লুণ্ঠন (১৬৬৪)

জয়সিংহ ও দিলীর খাঁ: শিবাজীর পরাজয়

পুরন্দরের সন্ধি (১৬৬৫)

শিবাজী আগ্রায় ঔরংজেবের দরবারে উপস্থিত হইলে (১২ই মে, ১৬৬৬) তাঁহাকে উপযুক্ত মর্যাদা দান করা হইল না। এমনকি পাঁচ হাজার সৈনিকের মনসবদারগণের সহিত তাঁহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল। শিবাজী ঔরংজেবকে ধূর্তামি ও কপটতার জন্য প্রকাশ্যভাবে অভিযুক্ত করিলেন। ফলে, তাঁহাকে

পুত্র শম্ভুজীসহ নজরবন্দী করিয়া রাখা হইল। কিন্তু শিবাজী কৌশলে মোগল প্রহরীর সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়া নিজ পুত্রসহ দিল্লী হইতে পলায়ন করিতে সক্ষম হইলেন। স্বদেশে ফিরিয়া তিনি নিজরাজ্য সংগঠনে মনোনিবেশ করিলেন। তিন বৎসরের মধ্যেই তিনি পুনরায় মোগলদের সহিত দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইলেন এবং ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া একে একে মোগল অধিকার হইতে নিজরাজ্যের মোগল অধিকৃত অংশগুলির প্রায় সবই পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইলেন। সেই সময়ে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে আফগান দলপতিগণের বিদ্রোহের ফলে দাক্ষিণাত্য হইতে দিলীর খাঁ ও অপরাপর মোগল সেনাপতিকেও তথায় প্রেরণ করিতে হইল। ফলে, দাক্ষিণাত্যে মারাঠা প্রাধান্য অপ্রতিহত রহিয়া গেল।

শিবাজী-ঔরংজেব সাক্ষাৎকার

১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে রায়গড় দুর্গে শিবাজীর নিজ অভিষেকক্রিয়া মহা-সমারোহে নিষ্পন্ন হইল। তিনি 'ছত্রপতি-গোব্রাহ্মণ-প্রজাপালক' উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। মোগল সেনাবাহিনীর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কর্মব্যস্ততার সুযোগে শিবাজী জিঞ্জি, ভেলোর এবং উহার পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহ জয় করিলেন। মহীশূরের অধিকাংশও তিনি নিজরাজ্যভুক্ত করিতে সমর্থ হইলেন। এইভাবে যখন শিবাজী নিজ রাজ্যের সীমা বিস্তার করিতেছিলেন তখন আকস্মিকভাবে তাঁহার মৃত্যু ঘটে (১৬৮০)। তাঁহার মৃত্যুকালে মারাঠা রাজ্য উত্তরে রামনগর হইতে দক্ষিণে কারওয়ার, পূর্বে বাগনালা হইতে দক্ষিণে কোলাপুর এবং পশ্চিমে আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অবশ্য এই অঞ্চলের মধ্যে পোর্তুগীজ, ইংরেজ ও আফ্রিকার বণিকগণের বাণিজ্য-কেন্দ্র দমন, সল্‌সেট, চৌল, বোম্বাই, বেসিন প্রভৃতি তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

শিবাজীর অভিষেক (১৬৭৪): 'ছত্রপতি-গোব্রাহ্মণ-প্রজাপালক' উপাধি ধারণ

মৃত্যু (১৬৮০)

শিবাজীর শাসনব্যবস্থা (Shivaji's Administrative System): শিবাজী কেবলমাত্র দুঃসাহসী বীর এবং সমরকুশল সেনাপতি হিসাবেই ইতিহাসে পরিচিত নহেন, অনন্য-সাধারণ সংগঠক এবং সুদক্ষ শাসক হিসাবেও তিনি সমধিক পরিচিত। তাঁহার

শাসক হিসাবে শিবাজী

শাসনব্যবস্থার মূল নীতিই ছিল জনকল্যাণসাধন এবং মুসলমান আক্রমণ হইতে নিজ দেশ ও প্রজাবর্গকে রক্ষা করা।
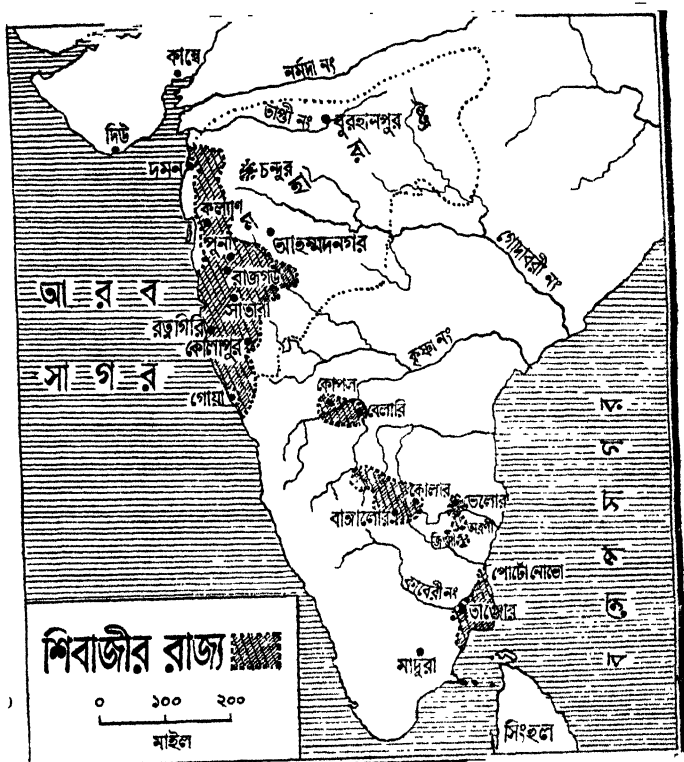
শিবাজীর শাসনব্যবস্থা ছিল স্বৈরতান্ত্রিক কিন্তু স্বৈরতন্ত্র হইলেও উহা স্বেচ্ছাতন্ত্রে পরিণত হয় নাই। শাসনব্যবস্থার সর্বোচ্চে ছিলেন রাজা স্বয়ং। কিন্তু রাজা 'অষ্টপ্রধান' নামক আটজন মন্ত্রীর এক সভার সাহায্যে শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন। এই আটজন মন্ত্রীর মধ্যে পেশওয়া-ই ছিলেন প্রধানমন্ত্রীস্বরূপ। অষ্টপ্রধানদের প্রত্যেকেই এক একটি বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। রাজস্ব বিভাগ, পররাষ্ট্র বিভাগ, সামরিক বিভাগ, পরিবহন বিভাগ, বিচার বিভাগ, ধর্ম বিভাগ, ডাক বিভাগ ও

রাজা ও 'অষ্টপ্রধান'

জনকল্যাণ বিভাগ—এই আটটি ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের জন্য এক একজন মন্ত্রী বা 'প্রধান' দায়ী থাকিতেন। দেশের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ-সাধনের ভার ছিল পেশওয়া বা প্রধানমন্ত্রীর উপর। ন্যায়াধীশ ছিলেন বিচার বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত। পণ্ডিত রাও ছিলেন ধর্ম-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদির ভারপ্রাপ্ত। মোগল শাসনব্যবস্থার সদ্‌র-ই-সুদুর-এর যে সকল কর্তব্য ছিল পণ্ডিত রাওকেও অনুরূপ কার্যাদি সম্পাদন করিতে হইত। উপরোক্ত আটটি প্রধান বিভাগ ভিন্ন আরও দশটি অর্থাৎ মোট আঠারটি বিভাগে শাসনকার্যাদি বিভক্ত ছিল। 'অষ্টপ্রধানগণ' রাজার আদেশাধীনে এই সকল বিভিন্ন বিভাগের কার্যাদি পরিচালনা করিতেন। রাজকর্মচারিপদ পূর্বে বংশানুক্রমিক ছিল, কিন্তু শিবাজী এই প্রথা উঠাইয়া দিয়াছিলেন। এই প্রথার উচ্ছেদসাধনের সঙ্গে সঙ্গে পূর্বেকার জায়গীর প্রথারও অবসান ঘটিয়াছিল।

শাসন বিভাগ

শাসনকার্যের সুবিধার জন্য শিবাজীর সমগ্র রাজ্য তিনটি প্রদেশে বা প্রান্তে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেকটি প্রান্তে একজন করিয়া রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত ছিলেন। ইঁহারা রাজার ইচ্ছামত মনোনীত ও পদচ্যুত হইতেন। রাজপ্রতিনিধিকে সাহায্য করিবার জন্য প্রত্যেক প্রদেশ বা প্রান্তে আটজন রাজকর্মচারীর এক একটি করিয়া সভা ছিল। প্রদেশ বা প্রান্তগুলি ছিল পরগণা বা তরফে বিভক্ত এবং এগুলি ছিল আবার গ্রামে বিভক্ত। গ্রামের শাসনভার গ্রাম-পঞ্চায়েতের উপর-ই ন্যস্ত থাকিত। কয়েকটি গ্রামের শাসনকার্যাদি পরিদর্শনের জন্য এক একজন দেশপাণ্ডে নিযুক্ত থাকিতেন। রাজকর্মচারিগণ বেতন ভোগ করিতেন। প্রধানমন্ত্রী পেশওয়া, পণ্ডিত রাও এবং ন্যায়াধীশ ভিন্ন অপরাপর সকল রাজকর্মচারীকেই সামরিক ও বে-সামরিক উভয় প্রকার কার্যাদি করিতে হইত।

প্রদেশ বা প্রান্ত—পরগণা বা তরফ—গ্রাম

রাজকর্মচারিগণের সামরিক ও বে-সামরিক দায়িত্ব

শিবাজী নিজ রাজ্যের সকল জমি জরিপ করাইয়া জমির উৎপাদিকা শক্তির অনুপাতে রাজস্ব ধার্য করিতেন। উৎপন্ন ফসলের এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব হিসাবে গ্রহণ করা হইত। জমির রাজস্ব ভিন্ন প্রতিবেশী অঞ্চলগুলির অধিবাসীদের নিকট হইতে চৌথ ও সর্‌দেশমুখী আদায় করা হইত। মোগল অধিকৃত

রাজস্ব—ফসলের এক-তৃতীয়াংশ নির্ধারিত

স্থান ও বিজাপুর রাজ্যের কতকাংশ হইতেও চৌথ ও সর্দেশমুখী আদায় করা হইত। মারাঠা আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য শিবাজীর রাজ্যের প্রতিবেশী অঞ্চলের অধিবাসিগণ ফসলের 'চৌথ' অর্থাৎ এক-চতুর্থাংশ দিতে বাধ্য ছিল। সর্দেশমুখী বা ফসলের দশমাংশ শিবাজী মারাঠা রাজ্যের সর্দেশমুখ বা প্রধান হিসাবে মারাঠাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিতেন। কিন্তু কালক্রমে সর্দেশমুখী প্রতিবেশী রাজ্যগুলির অধিবাসীদের নিকট হইতেই আদায় করা হইত। চৌথ ও সর্দেশমুখীর মূল প্রকৃতি সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতদ্বৈধ রহিয়াছে।*

চৌথ ও সর্দেশমুখী

শিবাজী সর্বপ্রথম পার্বত্য মাওয়ালী জাতির লোক লইয়া তাঁহার সেনাবাহিনী গঠন করিয়াছিলেন। পার্বত্যাঞ্চলে যুদ্ধের জন্য মাওয়ালী জাতি ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। যাহা হউক, শিবাজীর রাজ্যের সীমা বিস্তৃত হইলে তিনি একটি সুসংগঠিত স্থায়ী সেনাবাহিনী গঠন করিলেন। তাঁহার সেনাবাহিনীর সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল আজ্ঞানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা।

সেনাবাহিনী

শিবাজীর সেনাবাহিনী প্রধানত লঘু অস্ত্রধারী পদাতিক ও অশ্বারোহী এই দুইভাগে বিভক্ত ছিল। লঘু অস্ত্রধারী পদাতিক সৈন্য পার্বত্য অঞ্চলে যুদ্ধ করিবার পক্ষে খুব উপযোগী ছিল। অশ্বারোহী সৈন্য শিলাদার ও বর্গীর এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। শিলাদারগণ সরকার হইতে অর্থ পাইত বটে, কিন্তু তাহাদের নিজ নিজ অশ্ব এবং সামরিক অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করিতে হইত। বর্গীরা সরকার হইতে নিয়মিত বেতন, সামরিক অস্ত্রশস্ত্র, অশ্ব প্রভৃতি পাইত। অশ্বারোহী সৈন্যদের পঁচিশজন করিয়া এক একজন হাওয়ালদার বা হাবিলদারের অধীনে ছিল। এইরূপ পাঁচজন হাবিলদার একজন জুম্‌লাদারের অধীনে থাকিত। প্রতি দশজন জুম্‌লাদার আবার এক একজন হাজারীর অধীনে, প্রতি পাঁচজন হাজারী এক একজন পাঁচ হাজারীর অধীনে এবং সকল পাঁচ হাজারী

লঘু অস্ত্রধারী পদাতিক ও অশ্বারোহী

শিলাদার ও বর্গীর

সামরিক সংগঠন

* Vide : Sir J. N. Sarkar : *Shivaji & His Times*, p. 457.
Ranade : *Maratha History* vol. I. pp. 231 ff. :
An Advanced History of India, p. 519.

সায়্নোবৎ-এর অধীনে থাকিত। পদাতিক সৈন্যের প্রতি পাঁচজন একজন 'নায়েক' এবং পাঁচজন নায়েক একজন হাবিলদারের অধীনে থাকিত। দুই বা তিনজন হাবিলদারের উপর একজন জুম্‌লাদার, দশজন জুম্‌লাদারের উপর একজন হাজারী বা সাতজন হাজারীর উপর একজন সায়্নোবৎ থাকিতেন।

হস্তীবাহিনী, উষ্ট্রবাহিনী ও নৌবহর

শিবাজীর মৃত্যুকালে তাঁহার সেনাবাহিনীতে ত্রিশ হইতে চল্লিশ হাজার অশ্বারোহী এবং একলক্ষ পদাতিক ছিল। সভাসদ্ বখর-এর বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, শিবাজীর হস্তী-বাহিনীতে ১,২৬০টি যুদ্ধহস্তী এবং উষ্ট্রবাহিনীতে ১৫০০ হইতে ৩০০৯টি উট ছিল। ইহা ভিন্ন তাঁহার মোট দুই শত যুদ্ধ জাহাজও ছিল। সুরাটের ফরাসী বণিকদের নিকট হইতে শিবাজী ৮০টি কামান এবং তাঁহার গাদাবন্দুকের জন্য প্রচুর পরিমাণ সীসা ক্রয় করিয়াছিলেন, এই প্রমাণ পাওয়া যায়।* শিবাজীর সামরিক সংগঠনে দুর্গগুলি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিত। তোরণা, জিঞ্জি, কল্যাণ, রায়গড়, পান্‌হালা প্রভৃতি দুর্গগুলি এবিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দুর্গ

সামরিক শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা

সামরিক শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা কঠোরভাবে পালন করা হইত। সামরিক শৃঙ্খলা ভঙ্গ বা আদেশ অমান্য করিবার শাস্তি ছিল অত্যন্ত কঠোর। সৈন্যশিবিরে স্ত্রীলোকের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। যুদ্ধের সময় শিশু, স্ত্রীলোক, ধর্মগ্রন্থ, ধর্মস্থান প্রভৃতির কোনপ্রকার ক্ষতি বা কোনপ্রকার অমর্যাদা করা নিষিদ্ধ ছিল।

শিবাজীর চরিত্র ও কৃতিত্ব (Character and Estimate of Shivaji) :

কাফি খাঁ ও ইওরোপীয় ঐতিহাসিকগণের মন্তব্য

কাফি খাঁ ও তাঁহার অনুকরণে ইওরোপীয় ঐতিহাসিকগণ শিবাজীর চরিত্র ও কৃতিত্ব বিচার করিতে গিয়া তাঁহার প্রতি অবিচার করিয়াছিলেন আধুনিক ঐতিহাসিক গবেষণার ফলে তাহা কতক পরিমাণে অপসৃত হইয়াছে। আধুনিক গবেষণায়

* Vide Ishwari Prasad : *A short History of Muslim Rule in India.* p. 677.

কাফি খাঁর এবং ইওরোপীয় ঐতিহাসিকদের অভিমত ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।*

শিবাজী ছিলেন বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন। তাঁহার ব্যক্তিত্ব ছিল অনন্য-সাধারণ। এক অসাধারণ সম্মোহনী শক্তি তাঁহার মধ্যে অন্তর্নিহিত ছিল। তাঁহার সংস্পর্শে যাহারাই আসিয়াছিল তাহারাই মুগ্ধ, অনুগত হইয়া পড়িয়াছিল। সামান্য জায়গীরদারের পুত্র হইয়া শিবাজী নিজ শ্রম ও অধ্যবসায়, সামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা বলে ভারত-ইতিহাসে অমরত্ব লাভের যোগ্যতা অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হায়দর আলি ও রঞ্জিৎ সিংহের ন্যায় তাঁহার অসাধারণ উদ্ভাবনী শক্তি ছিল। আদর্শের সহিত বাস্তবতার, গভীর ধর্মপরায়ণতার সহিত চরম পরধর্ম-সহিষ্ণুতা, গভীর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার সহিত কূটকৌশলের এক অতি অদ্ভুত সমন্বয় তাঁহার চরিত্রে পরিলক্ষিত হয়। শিবাজীর বিরুদ্ধে সমালোচক কাফি খাঁও শিবাজীর পরধর্ম-সহিষ্ণুতা ও শাসনদক্ষতার প্রশংসা করিয়াছেন। যুদ্ধের কালে কোন মস্‌জিদ বা মন্দির ধ্বংস করা, কোন ধর্মগ্রন্থের অবমাননা বা অশ্রদ্ধা করা তিনি নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন। শিবাজীর অনন্যসাধারণ সংগঠনী শক্তির পরিচয় তাঁহার সামরিক সংগঠনে প্রকাশ পাইয়াছিল। কাফি খাঁ এবং ইংরেজ ঐতিহাসিকদের কেহ কেহ শিবাজীকে তৈমুর ও আলা-উদ্দিনের হিন্দুসংস্করণ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, কিন্তু উচ্চ আদর্শবাদিতা পরধর্ম-

চরিত্রের গুণাবলী

* "বিদেশীর ইতিবৃত্ত দস্যু বলি করে পরিহাস
অট্টহাস্যরবে—
তব পুণ্য চেষ্টা যত তস্করের নিষ্ফল প্রয়াস,
এই জানে সবে॥
অয়ি ইতিবৃত্তকথা, ক্ষান্ত কর মুখর ভাষণ
ওগো মিথ্যাময়ী,
তোমার লিখন'পরে বিধাতার অব্যর্থ লিখন
আজি হবে জয়ী।
যাহা মরিবার নয় তাহারে কেমনে চাপা দিবে
তব ব্যঙ্গ বাণী? —শিবাজি-উৎসব, রবীন্দ্রনাথ

সহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণের দিক দিয়া বিচার করিলে এইরূপ তুলনা যে ব্যক্তিগত বিদ্বেষপ্রসূত সেবিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

শিবাজী সমসাময়িক কলুষতার ঊর্ধ্বে ছিলেন। হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল অপরিসীম কিন্তু তিনি কোন মুসলমান, শিশু, হিন্দু বা মুসলমান স্ত্রীলোক বা মুসলমান ধর্মগ্রন্থ কোরাণের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন নাই। কাফি খাঁর বর্ণনা হইতে জানিতে পারা যায় যে, যুদ্ধজয়ের কালে বা কোন দুর্গ বা শহর লুণ্ঠনের সময় যদি কোরাণ তাঁহার হাতে পড়িত তাহা হইলে তিনি উহা তাঁহার কোন মুসলমান অনুচরকে দান করিতেন।* ঐতিহাসিক রওলিন্‌সন্ (Rawlinson)-এর মতে শিবাজী অযথা হত্যা বা অত্যাচার দ্বারা নিজের বিজয়গৌরবকে ক্ষুণ্ণ হইতে দিতেন না। স্ত্রীজাতিকে ও মুসলমান ধর্মস্থান রক্ষা করা তাঁহার অন্যতম প্রধান কর্তব্য বলিয়া তিনি মনে করিতেন। হিন্দু আদর্শ ও বীরত্বের এক চরম বিকাশ আমরা শিবাজীর চরিত্রে দেখিতে পাই।

তাঁহার মানবতা

পরধর্ম-সহিষ্ণুতা

শিবাজী নিঃসম্বল অবস্থা হইতে একমাত্র নিজ অক্লান্ত কর্মপ্রচেষ্টা দ্বারা এক বিস্তীর্ণ রাজ্য গড়িয়া তুলিয়া বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত মারাঠা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিজাপুর ও মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে ক্রমাগত যুঝিয়া শিবাজী শেষ পর্যন্ত নিজ অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন ; ইহা কম গৌরবের কথা নহে। সামরিক বাহিনীর সংগঠন ব্যাপারেও শিবাজী মৌলিক প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার শাসনব্যবস্থা, বিচারপদ্ধতি প্রভৃতি আধুনিক ঐতিহাসিক মাত্রেরই প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। শিবাজী হয়ত নিরক্ষর ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মানসিক বিকাশ সম্পূর্ণভাবেই ঘটিয়াছিল।

রাজ্যস্থাপন

তাঁহার অমরত্ব

* "But he made it a rule that whenever his followers went plundering, they should do no harm to mosques, the Book of God, or woman of any one. Whenever a copy of sacred Koran came into his hands he treated it with respect and gave it to some of his Musalman followers." Khafi Khan, Vide Ishwari Prasad, p. 683.

ন্যায়পরায়ণতা, উদারতা প্রভৃতি গুণের ভিত্তিতে তিনি শাসন পরিচালনা করিয়া নিজ প্রজাবর্গের পরম শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। বীরত্ব ও মনুষ্যত্বের দাবিতে শিবাজী ভারত-ইতিহাসে অমর হইয়া আছেন।

শিবাজীর উত্তরাধিকারিগণ (Successors of Shivaji) : শিবাজীর মৃত্যুর (১৬৮০) পর তাঁহার পুত্র শম্ভুজী রাজা হইলেন। শম্ভুজী সাহসী ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি ছিলেন যেমন অলস তেমনি বিলাসপ্রিয়। কবি কুলশ নামে জনৈক উত্তর-ভারতীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন তাঁহার মন্ত্রী। শম্ভুজীও নিজ পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া দিল্লী সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। তিনি ঔরংজেবের বিদ্রোহী পুত্র আকবরকে আশ্রয় দান করিয়া কিছুকাল মোগলদের সহিত বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি পোর্তুগীজ ও জাঞ্জিবারের সিদ্দিগণের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া নিজ শক্তির অপচয় করিতে লাগিলেন। ঔরংজেব যখন তাঁহার সমগ্র শক্তিসহ বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা জয়ে প্রবৃত্ত তখন শম্ভুজী বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সহিত একযোগে ঔরংজেবের বিরোধিতা করিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিলেন না। উপরন্তু তিনি বিলাস-ব্যসনে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। ফলে, তাঁহার শাসনব্যবস্থাও শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। এমতাবস্থায় ঔরংজেব বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা জয় সমাপ্ত করিয়া আকস্মিকভাবে শম্ভুজীর রাজ্য আক্রমণ করিলে শম্ভুজীর পক্ষে আত্মরক্ষা করা সম্ভব হইল না। শম্ভুজী, কবি কুলশ ও অপরাপর বহু প্রধান রাজকর্মচারী বন্দী হইলেন। কয়েক সপ্তাহ অকথ্য অত্যাচারের পর তাঁহাদিগকে হত্যা করা হইল। ঔরংজেবের সেনাবাহিনী শম্ভুজীর রাজধানী রায়গড় ও আরও বহু দুর্গ অধিকার করিল। শম্ভুজীর শিশুপুত্রসহ তাঁহার সমগ্র পরিবার ঔরংজেব কর্তৃক বন্দী হইল। এইভাবে মারাঠা শক্তি পর্যুদস্ত হইলেও উহার পতন ঘটিল না। অল্পকালের মধ্যেই মারাঠা শক্তি পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিল এবং পুনরায় মোগলদের সহিত দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইল। এই দ্বন্দ্বে মোগল শক্তি চিরতরে হীনবল হইয়া গেল। মারাঠা শক্তির এই পুনরুজ্জীবনের মূলে রামচন্দ্র পন্থ, শঙ্কর মল্‌হার, পরশুরাম ত্রিম্বক প্রভৃতি নেতার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শম্ভুজীর হত্যা

মারাঠা শক্তির পুনরুজ্জীবন

রাজারামের আমলে মারাঠা-মোগল দ্বন্দ্ব

শম্ভুজীর মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা রাজারাম মারাঠা সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনি মারাঠা জাতির চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী মোগল শক্তির বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইলেন। মারাঠা সৈন্য মোগলবাহিনীকে অতর্কিত আক্রমণ দ্বারা ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল এবং ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে মোগল সেনাপতি রুস্তম খাঁকে বন্দী করিল। মোগল সেনা পান্‌হালা দুর্গটি অবরোধ করিতে গিয়া শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইল। এইভাবে মোগলবাহিনী সর্বত্র মারাঠাদের হস্তে পরাজিত ও পর্যুদস্ত হইতে লাগিল। মারাঠা সেনাপতি শান্তাজী ও ধনাজী ক্রমাগত মোগলবাহিনীকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। শান্তাজীর নামে মোগলদের মনে এক বিভীষিকার সৃষ্টি হইল। এই সময়ে মারাঠাদের মধ্যে আত্মকলহ দেখা দিলে তাহারা কতক পরিমাণে দুর্বল হইয়া পড়িল। এই সময়ে শান্তাজীরও মৃত্যু ঘটিল। মোগলবাহিনী সুযোগ বুঝিয়া জিঞ্জি দুর্গটি অধিকার করিয়া লইল (১৬৯৮)। দীর্ঘ আট বৎসর ধরিয়া জিঞ্জি দুর্গটি মোগল-বাহিনীর অবরোধ প্রতিহত করিয়া চলিয়াছিল, কিন্তু মারাঠাদের মধ্যে আভ্যন্তরীণ গোলযোগ দেখা দিলে মোগল সেনাপতি জুল্‌ফিকার খাঁ জিঞ্জি দুর্গটি দখল করিতে সক্ষম হইলেন। রাজারাম জিঞ্জি হইতে সাতারা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং সেখানে তিনি মারাঠাশক্তির পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করিলেন। এদিকে মোগলবাহিনী একে একে মারাঠা দুর্গগুলি জয় করিতে লাগিল। দীর্ঘ পাঁচ বৎসর অক্লান্ত যুদ্ধ করিয়া ঔরংজেবের সেনাবাহিনী মাত্র আটটি মারাঠা দুর্গ দখল করিতে সমর্থ হইল। এই সময়ে ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে রাজারামের মৃত্যু হইলে তাঁহার শিশুপুত্র তৃতীয় শিবাজী মারাঠা সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। রাণীমাতা তারাবাঈ তৃতীয় শিবাজীর নাবালকত্বে শাসনকার্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করিলেন এবং মারাঠা জাতির চিরাচরিত প্রথা অনুসরণ করিয়া মোগলদের সহিত যুদ্ধ করিয়া চলিলেন।

মোগলবাহিনীর সামরিক সাফল্য

তৃতীয় শিবাজী: তারাবাঈ

মারাঠা শক্তির পুনরুত্থান

মারাঠাগণ মোগল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে হানা দিতে লাগিল। কেবল দক্ষিণ-ভারতেই নহে, উত্তর-ভারতে মালব ও গুজরাট অঞ্চলেও মারাঠাগণ হানা দিতে

লাগিল। ঔরংজেবের মারাঠা শক্তি দমনের চেষ্টা ব্যর্থ হইল, উপরন্তু মারাঠা আক্রমণ মোগল সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ হইয়া দাঁড়াইল। সমগ্র ভারতে মারাঠাগণ এক প্রবল শক্তিরূপে দেখা দিল।

দ্বাদশ অধ্যায়

আফগান ও মোগল শাসনাধীন বাংলা

(Bengal under the Afghans & the Moghuls)

[শের শাহ্ কর্তৃক বাংলাদেশ জয় ও তাঁহার আমলে বাংলা সম্পর্কে আলোচনা ২৩৯-'৪১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

শূরবংশীয় আফগান সুলতানগণের অধীনে বাংলাদেশ (Bengal under the Sur Afghans) : শের শাহের সুলতানির পাঁচবৎসর ও তাঁহার পুত্র ইস্‌লাম শাহ্ শূর-এর অধীনে আট বৎসর বাংলাদেশ দিল্লীর আনুগত্য স্বীকার করিয়া চলিয়াছিল। কিন্তু ইস্‌লাম শাহের মৃত্যুর (১৫৫৩) সঙ্গে সঙ্গে শের শাহ্ প্রতিষ্ঠিত আফগান সুলতানির পতন শুরু হইলে বাংলাদেশই সর্বপ্রথম স্বাধীন হইয়া যায়। বাংলার শাসনকর্তা মহম্মদ খাঁ শামস্-উদ্দিন মহম্মদ শাহ গাজি উপাধি ধারণ করিয়া স্বাধীনভাবে শাসন শুরু করেন। ইহার পর তিনি আরাকান আক্রমণ করেন। ইহা ভিন্ন জৌনপুর দখল করিয়া ক্রমে তিনি আগ্রার দিকে অগ্রসর হন। কিন্তু আদিল শাহ্-এর সেনাপতি হিমুর হস্তে তিনি ছাপরঘাটের যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন।

শামস্-উদ্দিন মহম্মদ শাহ্ গাজি (১৫৫৩-'৫৬)

আদিল শাহ্ শাহ্‌বাজ খাঁকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। কিন্তু শামস্-উদ্দিনের পুত্র খিজির খাঁ এলাহাবাদে অবস্থানকালে পিতার মৃত্যু সংবাদ পাইবামাত্র 'গিয়াস-উদ্দিন বাহাদুর শাহ্' উপাধি ধারণ করিয়া নিজেকে বাংলার স্বাধীন সুলতান বলিয়া ঘোষণা করেন (১৫৫৬) এবং অল্পকালের মধ্যেই শাহ্‌বাজ খাঁকে

গিয়াস্-উদ্দিন বাহাদুর শাহ্ (১৫৫৬-'৬০)

পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া বাংলাদেশ নিজ অধিকারে আনিতে সক্ষম হন।*

ঐ বৎসর (১৫৫৬) হুমায়ুন আফগান সুলতান সিকন্দর শূর-এর নিকট হইতে পাঞ্জাব ও দিল্লী পুনরুদ্ধার করেন। কিন্তু ইহার কয়েকমাসের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় (১৫৫৬) বাংলাদেশ বা অপরাপর অঞ্চলে মোগল অধিকার বিস্তার করিবার সুযোগ তিনি আর পান নাই। তাঁহার পুত্র আকবর দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া শূরবংশীয় আফগান নেতৃবর্গকে একে একে দমন করিতে অগ্রসর হন। পানিপথের যুদ্ধে হিমু পরাজিত ও নিহত হইলে আদিল শাহ্ শূরের দুর্বলতা আরও বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। সেই সুযোগে বাংলার সুলতান গিয়াস-উদ্দিন বাহাদুর শাহ্ তাঁহাকে সুরজগড়ের অনতিদূরে ফত্‌পুর নামক স্থানে পরাজিত ও নিহত করেন। ইহার পর গিয়াস-উদ্দিন জৌনপুরের দিকে অগ্রসর হইলে মোগল সেনাপতি খান্-ই-জামান-এর হস্তে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হন। কূটকৌশলী গিয়াস-উদ্দিন খান্-ই-জামানের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া মোগল আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হন। ইহার পরবর্তী কয়েক বৎসর তিনি মোগলদের সহিত মিত্রতা রক্ষা করিয়া শান্তিপূর্ণভাবে রাজত্ব করিযা ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। অতঃপর তাঁহার ভ্রাতা জালাল-উদ্দিন শূর দ্বিতীয় গিয়াস-উদ্দিন উপাধি ধারণ করিয়া বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনিও মোগলদের প্রতি মিত্রতা-নীতি অনুসরণ করিয়া বাংলাদেশকে মোগল আক্রমণ হইতে নিরাপদ রাখিতে সচেষ্ট ছিলেন। কর্‌রাণী বংশীয় আফগান দলপতিদের বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপ দমনে তাঁহাকে ব্যস্ত থাকিতে হইত, এজন্য মোগলদের সহিত মিত্রতা রক্ষা করিয়া চলিবার প্রয়োজন ছিল আরও বেশি। এইভাবে ১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিবার পর মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র সিংহাসনে আরোহণ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে

আদিল শাহ্ শূর-এর পরাজয় ও মৃত্যু (১৫৫৭)

খান্-ই-জামানের হস্তে গিয়াস-উদ্দিনের পরাজয় —মোগলদের সহিত মিত্রতা-নীতি

দ্বিতীয় গিয়াস-উদ্দিন (১৫৬০-'৬৩)

* Vide *History of Bengal*, (D.U.) Vol. II, pp. 179-'80,

হত্যা করিয়া জনৈক আফগান দলপতি তৃতীয় গিয়াসউদ্দিন উপাধি ধারণ করিয়া বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। মাত্র এক বৎসর রাজত্ব করিবার পর ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে কর্‌রাণী বংশের জনৈক আফগান দলপতি তাজ খাঁ কর্‌রাণী তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত ও নিহত করিয়া বাংলার সিংহাসন অধিকার করিয়া লন। এইভাবে দ্বিতীয় গিয়াসউদ্দিনের মৃত্যুর পরবর্তী এক বৎসর অন্তর্দ্বন্দ্ব ও অরাজকতার পর বাংলার সুলতানি কর্‌রাণী আফগানদের হস্তগত হয়।

অরাজকতা ও অন্তর্দ্বন্দ্ব : কর্‌রাণী বংশের সিংহাসন লাভ

কর্‌রাণী বংশীয় আফগানদের অধীনে বাংলা (Bengal under the Karrani Afghans) : তাজ খাঁ কর্‌রাণী বা কর্‌লানী প্রথম জীবনে শের শাহের অন্যতম প্রধান কর্মচারী ছিলেন। শের শাহের মৃত্যুর পর তিনি ও তাঁহার ভ্রাতাগণ—ইমাদ, সুলেমান ও ইলিয়াস—মিলিতভাবে গঙ্গানদীর তীরে খোওয়াসপুর অঞ্চলে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিবার উদ্দেশ্যে নিকটবর্তী অঞ্চল হইতে রাজস্ব আদায় করিতে আরম্ভ করেন। ইহা ভিন্ন ঐ অঞ্চলে দিল্লী সুলতানের যে হস্তীবাহিনী মোতায়েন ছিল উহাও দখল করিয়া লইলেন। বহু সংখ্যক আফগান ভাগ্যান্বেষী দলপতি ও সৈন্য তাঁহাদের সহিত যোগ দিলে আদিল শাহের সেনাপতি হিমু তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়া এই বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপের অবসান ঘটাইলেন। তাজ খাঁ ও সুলেমান বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পরবর্তী দশবৎসর ধরিয়া নানাপ্রকার অসদুপায়ে এবং বল প্রয়োগ দ্বারা পশ্চিমবঙ্গ অর্থাৎ গৌড়ের অধিকাংশ ও বিহারের দক্ষিণ-পূর্বাংশ অধিকার করিতে তাঁহারা সমর্থ হন।* তৃতীয় গিয়াস-উদ্দিনকে সিংহাসনচ্যুত ও হত্যা করিয়া তাজ খাঁ বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু

কর্‌রাণী বংশের ক্ষমতালাভ

তাজ খাঁ কর্‌রাণী (১৫৬৪-'৬৫)

---

* "Taj and Sulaiman fled to Bengal, when in the course of ten years, by combined force and fraud they gained possession of much of western Bengal (Gaur) in addition to the south-eastern districts of Bihar, which had fallen into a state of anarchy." *History of Bengal*, (D.U.) Vol. II, p. 181.

দীর্ঘকাল রাজ্যভোগ তাঁহার ভাগ্যে ছিল না। পরবৎসরই (১৫৬৫) তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তাঁহার পর সুলেমান কর্‌রাণী সিংহাসনে আরোহণ করেন।

সুলেমান কর্‌রাণী আট বৎসর (১৫৬৫-'৭২) বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই আট বৎসরের মধ্যে তিনি বাংলাদেশকে উত্তর-পূর্ব ভারতের শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করিয়া গিয়াছিলেন। বাংলাদেশ তখন এক অত্যন্ত শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছিল। সুলেমান কর্‌রাণীর অধীনে বাংলার আভ্যন্তরীণ শাসনে যেমন শান্তি বিরাজিত ছিল, বাংলার রাজ্যসীমার নিরাপত্তাও তেমনি অক্ষুণ্ণ ছিল। ইহা ভিন্ন সুলেমান কর্‌রাণীর রাজ্যবিস্তার নীতি, কূটকৌশল প্রভৃতির ফলে বাংলার রাজ্যসীমা যথেষ্ট বিস্তৃত হইয়াছিল। দিল্লী, অযোধ্যা, গোয়ালিওর, এলাহাবাদ প্রভৃতি অঞ্চল মোগল সম্রাটের অধীন হইবার পর সেই সকল অঞ্চলের আফগান নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিবার ফলে সুলেমান কর্‌রাণী এক দুর্ধর্ষ সামরিক বাহিনী গঠন করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। শের শাহের আমলের সামরিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি-বর্গের অনেকে সুলেমানের সেনাবাহিনীতে যোগদান করিয়াছিলেন। সুলেমান কর্‌রাণী বাংলার যে সকল অঞ্চল তখনও স্বাধীন ছিল সেই সকল অঞ্চলে নিজ অধিকার স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন কোচবিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি অঞ্চল আক্রমণ করিয়া তিনি প্রভূত পরিমাণ ধনদৌলত হস্তগত করিয়াছিলেন। ফলে, তাঁহার রাজকোষ ধনরত্নে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। তিনি কালাপাহাড়ের নেতৃত্বে এক দুর্ধর্ষ আফগানবাহিনী প্রেরণ করিয়া পুরীর জগন্নাথমন্দির লুণ্ঠন করাইয়াছিলেন। সেখান হইতে মোট পাঁচ মণ সোনা তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল।*

সুলেমান কররাণী
(১৫৬৫-'৭২)

বাংলাদেশ উত্তর-পূর্ব ভারতের শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত

সুলেমান কর্‌রাণী তদানীন্তন ভারতের শ্রেষ্ঠ হস্তীবাহিনী গঠন করিয়া বাংলার সামরিক শক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। এই দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনী, শ্রেষ্ঠ হস্তীবাহিনী এবং পরিপূর্ণ রাজকোষ যাঁহার অধিকারে ছিল তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতে স্বীকৃত হইবে, ইহাতে আশ্চর্যের কিছু নাই। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সুলেমান

সামরিক শক্তি

* Vide *History of Bengal*, (D.U.) Vol. II, pp. 183-'84.

কর্‌রাণীর শাসন ছিল প্রজাহিতৈষী ও পক্ষপাতশূন্য। বিচার-ব্যবস্থায় ন্যায় এবং সততা অনুসৃত হইত। মুসলমান বিদ্বজ্জন তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন।

মোগলদের প্রতি মৈত্রী নীতি—আকবরের আনুগত্য স্বীকার

সুলেমান ছিলেন দূরদর্শী শাসক। নিজ রাজ্যের নিরাপত্তা ও শান্তি বজায় রাখিতে হইলে মোগলদের সহিত কূটনৈতিক মিত্রতা-নীতি অনুসরণ করা একান্ত প্রয়োজন একথা তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এজন্য তিনি আকবরের সাম্রাজ্যের পশ্চিমাংশের (অযোধ্যা অঞ্চলের) শাসনকর্তা খান্-ই-জামান, খান-ই-খানান প্রভৃতিকে মিত্রতামূলক পত্রালাপ ও উপহার প্রেরণ করিয়া প্রীত করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন তিনি আকবরকে সম্রাট বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন।*

মিঞা লোদী

সুলেমান কর্‌রাণীর শাসনকালের কৃতকার্যতা প্রধানতঃ তাঁহার উজীর মিঞা লোদীর দূরদর্শিতা ও কর্মকুশলতার ফলেই সম্ভব হইয়াছিল। ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে সুলেমান কর্‌রাণীর মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র বাযাজিদ্ সিংহাসনে আরোহণ করেন।

বায়াজিদ্ (১৫৭২-'৭৩)

বায়াজিদ্ তাঁহার ঔদ্ধত্য ও অত্যাচারের দ্বারা অতি অল্পকালের মধ্যেই আফগান অভিজাতবর্গকে শত্রুতে পরিণত করিলেন। ফলে, সুলেমান কর্‌রাণীর ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা হানুসু,বায়াজিদের বিরুদ্ধে এক গোপন ষড়যন্ত্র শুরু করিল। শেষ পর্যন্ত বায়াজিদ্ এই সকল ষড়যন্ত্রকারীর হাতে প্রাণ হারাইলেন। সুলেমান কর্‌রাণীর বিশ্বস্ত উজীর মিঞা লোদী হানুসুকে হত্যা করিয়া বায়াজিদের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন।

দাউদ কর্‌রাণী (১৫৭৩-'৭৬)

পরবর্তী সুলতান হইলেন সুলেমান কর্‌রাণীর দ্বিতীয় পুত্র দাউদ কর্‌রাণী। দাউদ কর্‌রাণী ছিলেন সুলতান পদের অযোগ্য। ব্যভিচার, মদ্যাসক্তি প্রভৃতি দোষে তাঁহার চরিত্র দুষ্ট ছিল। স্বভাবতই তিনি স্বার্থান্বেষী আফগান অভিজাত কুৎলু লোহানী ও গুজর কর্‌রাণী প্রভৃতির কুপরামর্শে পিতৃবন্ধু বিশ্বস্ত উজীর মিঞা লোদীর বিরোধিতা শুরু করিলেন এবং তাঁহার জামাতা ইয়ুসুফ্‌কে হত্যা করাইলেন।

* *Ibid*, p. 182.

মিঞা লোদীর সহিত স্বভাবতই দাউদের আর কোন সম্পর্ক রহিল না। তাঁহার ন্যায় বিশ্বস্ত কর্মকুশল, দূরদর্শী উজীরের অপসরণের সঙ্গে সঙ্গে কর্‌রাণী বংশের পতন শুরু হইল।

এদিকে মোগল সম্রাট আকবর মুনিম খাঁকে বিহার জয়ের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। প্রথমে মিথ্যা আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দান করিয়া মুনিম খাঁকে নিরস্ত করা সম্ভব হইলেও শেষ পর্যন্ত তাহা আর কার্যকরী হইল না। এই সময়ে দাউদ কুৎলু ও গুজর খাঁর পরামর্শে মিঞা লোদীকে কর্‌রাণী বংশের প্রতি তাঁহার আনুগত্যের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। মিঞা লোদী দাউদের এই বিপদে তাঁহাকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার শিবিরে উপস্থিত হইলে অপরিণামদর্শী দাউদ তাঁহাকে বিশ্বাসঘাতকের ন্যায় হত্যা করাইলেন। ইহার ফলভোগ করিতেও বেশি বিলম্ব হইল না। মোগলসৈন্য বিহার আক্রমণ করিয়া কর্‌রাণী শাসনের অবসান ঘটাইয়া উহা অধিকার করিয়া লইল। ইহার পর মুনিম খাঁ বাংলাদেশের দিকে অগ্রসর হইলেন। বিহার অঞ্চল হইতে বিতাড়িত আফগানদের মোগলবাহিনীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার সাহস বা সামর্থ্য কিছুই ছিল না। মুনিম খাঁ বিনা বাধায় বাংলাদেশ অধিকার করিয়া লইলেন। দাউদ উড়িষ্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। এই সময় রাজা টোডরমল বাংলাদেশে আসিয়া দাউদ খাঁকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিবার পরামর্শ দান করিলে তুকারয়-এর যুদ্ধে দাউদ সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইলেন।

মোগলবাহিনী কর্তৃক বিহার ও বাংলাদেশ অধিকার

১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে শের শাহ্ কর্তৃক বাংলাদেশ অধিকৃত হইবার পর ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে এইভাবে সর্বশেষ আফগান সুলতানের হাত হইতে বাংলাদেশ মোগল শাসনাধীনে চলিয়া গেল। কিন্তু তখনও বাংলাদেশের সর্বত্র নিরঙ্কুশ মোগল শাসন স্থাপিত হয় নাই। বাংলার বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় হিন্দু রাজগণ ও আফগান নেতৃবর্গ তখনও স্বাধীনভাবেই শাসন চালাইতেছিলেন।

বাংলায় মোগল অধিকার স্থাপিত (১৫৭৬)

মুনিম খাঁ ছিলেন বাংলার সর্বপ্রথম মোগল প্রতিনিধি। তুকারয়-এর যুদ্ধের অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হইলে খান্-ই-জাহান বাংলাদেশের

শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন। রাজা টোডরমল ছিলেন তাঁহার সহকারী। খান্-ই-জাহান ছিলেন পারস্যদেশীয় শিয়া মুসলমান। অথচ বাংলাদেশে তদানীন্তন সরকারী কর্মচারী মাত্রেই ছিলেন সুন্নী সম্প্রদায়-ভুক্ত তুর্কী। স্বভাবতই খান্-ই-জাহানের প্রভুত্ব তাঁহারা মানিয়া চলিতে রাজী হইলেন না। যাহা হউক, রাজা টোডরমলের কূটকৌশল ও খান্-ই-জাহানের ব্যক্তিত্ব শেষ পর্যন্ত জয়ী হইল। বাংলার সুন্নী তুর্কী কর্মচারিগণ খান্-ই-জাহানের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে স্বীকৃত হইলেন। মুনিম খাঁর মৃত্যুর পর খান্-ই-জাহান বাংলার শাসন-কর্তার পদ গ্রহণ করিবার পূর্বেই দাউদ কর্‌রাণী উড়িষ্যায় পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করিয়া পুনরায় বাংলাদেশে আধিপত্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এদিকে পূর্ববঙ্গ হইতে ঈশা খাঁ মোগল নৌবাহিনীকে বিতাড়িত করিয়াছেন। বিহারে জুনিয়াদ কর্‌রাণী ও গজপতি শাহ্ স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠিয়াছেন। এইরূপ পরিস্থিতিতে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় পুনরায় মোগল অধিকার স্থাপনের সমস্যা দেখা দিল। খান্-ই-জাহান ও টোডরমলের চেষ্টায় রাজমহলের নিকট এক যুদ্ধে দাউদ কর্‌রাণী পরাজিত ও ধৃত হইলে তাঁহার শিরশ্ছেদ করা হইল। জুনিয়াদ কামানের গোলার আঘাতে প্রাণ হারাইলেন। কালাপাহাড় যুদ্ধে আহত-হইয়া পলাইয়া গেলেন। বিদ্রোহী আফগানদের মধ্যে একমাত্র কুৎলু লোহানী তখনও টিকিয়া রহিলেন। বাংলাদেশে পুনরায় মোগল শাসন স্থাপিত হইল। দক্ষিণ-বিহারে মোগল সেনাপতি শাহ্‌বাজ খাঁ গজপতি শাহ্‌কে সম্পূর্ণভাবে দমন করিতে সমর্থ হইলেন। বাংলাদেশে খান-ই-জাহান সাতগাঁও অর্থাৎ হুগলী অঞ্চলে আফগান অভিজাতবর্গকে দমন করিলেন। ইহার পর তিনি ভাওয়াল অর্থাৎ ঢাকার উত্তরাংশ জয় করিবার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইলেন। সেই অঞ্চলে মোগল নৌসেনাপতি শাহ্ বর্‌দি মোগল সম্রাটের আনুগত্য অস্বীকার করিয়া ইব্রাহিম ও করিম নামে দুইজন আফগান নেতার সহিত যুগ্মভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন। খান্-ই-জাহান এই তিনজনকেই পরাজিত করিয়া মোগল সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করিতে

বাংলার মোগল শাসনকর্তা মুনিম খাঁ

দাউদ কর্তৃক বাংলা পুনরধিকার

মোগল শাসনকর্তা খান্-ই-জাহান ও তাহার সহকারী টোড়রমল কর্তৃক বাংলা পুনরুদ্ধার

খান্-ই-জাহানের মৃত্যু (১৫৭৮)

বাধ্য করিলেন। ঈশা খাঁও তাঁহার হস্তে পরাজিত হইয়া পলাইয়া গেলেন।* ইহার অল্পকাল পরেই খান্-ই-জাহানের মৃত্যু হইল (১৫৭৮)।

পরবর্তী শাসনকর্তা ছিলেন মুজফ্ফর খাঁ। তিনি মোগল সম্রাট আকবরের সভাসদ্ ছিলেন। বিহার অঞ্চলে তিনি এককালে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বাংলাদেশের শাসনকর্তার পদে নিযুক্তির কালে তাঁহার দৈহিক এবং মানসিক ক্ষমতা অনেক পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল। ফলে, মাত্র এক বৎসরের মধ্যেই তাঁহার অধীন সেনাবাহিনী বিদ্রোহী হইয়া তাঁহাকে হত্যা করে। মুজফ্ফর খাঁ যখন বাংলার শাসনকর্তা হইয়া আসেন সেই সময়ে সম্রাট আকবর সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থাকে সুষ্ঠু ও সুদক্ষ করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক সুবায় একজন সিপাহ্শালার বা সুবাদারের সঙ্গে এক একজন দেওয়ান, বক্শী, মির-আদল, সদ্র, কটোয়াল, মিরবাহার, ওয়াকিনবীশ প্রভৃতি নিয়োগ করেন। মজফ্ফর খাঁর সহিতও এই সকল রাজকর্মচারী দিল্লী হইতে আসিয়াছিলেন। এই সকল বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারিবৃন্দ এবং মোগল সেনাবাহিনীর বহু সংখ্যক পদস্থ কর্মচারী বাংলা ও বিহারের বিভিন্নাংশ হইতে নানা অজুহাতে এবং জোর জবরদস্তি করিয়া অর্থ আদায় করিতে আরম্ভ করেন। কর্‌রাণী সুলতানদের আমলে বিশেষত সুলেমানের রাজত্বকালে বাংলাদেশে মোটামুটিভাবে শান্তি বিরাজিত ছিল। শান্তির সঙ্গে সঙ্গে সমৃদ্ধিও দেখা দিয়াছিল। কিন্তু মোগল কর্মচারীদের বিশেষভাবে সামরিক কর্মচারীদের স্বার্থপরতা ও অর্থশোষণ বাংলা ও বিহারে এক ব্যাপক হতাশা ও বিদ্বেষের সৃষ্টি করিয়াছিল। আকবর কর্তৃক প্রেরিত বেসামরিক কর্মচারিগণ সামরিক কর্মচারীদের অর্থশোষণ বন্ধ করিবার চেষ্টা গিয়া অনেকে উদ্ধত ব্যবহার শুরু করিলেন। কেহ কেহ আবার সামরিক কর্মচারীদের অন্যায় অর্থশোষণ বন্ধ করিতে গিয়া নিজেই অর্থ আত্মসাৎ করিতে লাগিলেন। এমতাবস্থায় বিহার ও বাংলাদেশের সামরিক কর্মচারিগণ বিদ্রোহ

মুজফ্ফর খাঁর শাসনকালের দুর্বলতা

আকবর কর্তৃক নূতন শাসন-পদ্ধতির প্রচলন

সামরিক কর্মচারীদের অত্যাচার ও শোষণ

বিদ্রোহ

---

* *History of Bengal*, (D.U.) Vol. II, pp, 194-95.

ঘোষণা করিলেন। মুজফ্‌ফর খাঁর অব্যবস্থিতচিত্ততার ফলে বিদ্রোহীদের দমন করা আরও কঠিন হইয়া পড়িল। বিদ্রোহিগণ তাঁহাকে হত্যা করিয়া বিহার ও বাংলা কবলিত করিল। কিন্তু বিদ্রোহিগণ তাহাদের সাফল্যের ফল ভোগ করিবার পূর্বেই মোগল সেনাবাহিনী বিহার পুনরধিকার করিয়া লইল। তর্‌সুন খাঁ ও টোডরমল ছিলেন মোগলবাহিনীর সেনাপতি। এদিকে সম্রাট আকবর খান্‌-ই-আজ্‌মকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন (১৫৮২)। বিহার ও অযোধ্যার শাসন-কর্তাদিগকে খান্‌-ই-আজমকে সাহায্যদানের আদেশও তিনি দিলেন। খান্‌-ই-আজ্‌ম এলাহাবাদ, অযোধ্যা ও বিহারের মোগল সেনাবাহিনীসহ বাংলা-দেশের বিদ্রোহীদের দমন করিতে অগ্রসর হইলেন। বিদ্রোহীদের মধ্যে অন্তর্বিরোধ এবং যুদ্ধে কালাপাহাড়ের পরাজয় বাংলার বিদ্রোহী আফগান নেতৃবর্গের পতন ঘটাইল। খান্‌-ই-আজ্‌ম বাংলা পুনরুদ্ধার করিলেন (১৫৮৩)। কিন্তু খান্‌-ই-আজ্‌মের বাংলাদেশের জলবায়ু পছন্দ হইল না। তিনি সম্রাট আকবরের অনুমতি লইয়া বিহার প্রদেশে তাঁহার নিজ জায়গীরে চলিয়া গেলেন। পরবর্তী শাসনকর্তা শাহ্‌বাজ খাঁর বাংলায় আসিয়া পৌঁছিতে কয়েকমাস বিলম্ব ঘটিল। সেই সময়ে ওয়াজীর খাঁ ছিলেন বাংলাদেশের অস্থায়ী শাসনকর্তা। সুযোগ পাইয়া বাংলাদেশের বিদ্রোহিগণ পুনরায় গোলযোগের সৃষ্টি করিল। ১৫৮৪ হইতে ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পুনঃপুনঃ সামরিক অভিযান করিয়া শাহ্‌বাজ খাঁ বাংলাদেশে মোগল শাসন সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা করিলেন।

মোগল শাসনকর্তা খান্‌-ই-আজ্‌ম কর্তৃক বাংলা পুনরুদ্ধার

শাহ্‌বাজ খাঁ

বাংলাদেশের পরবর্তী শাসনকর্তা ছিলেন রাজা মানসিংহ। তিনি বাংলাদেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়া (১৫৯৪) রাজমহলে বাংলার এক নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্ববঙ্গের ভাটি অঞ্চলের স্বাধীন জমিদার ঈশা খাঁ দীর্ঘকাল যাবৎ মোগলদের বিরোধিতা করিতেছিলেন। মোগল শাসনের বিরুদ্ধে আফগান বিদ্রোহিগণের অনেককে তিনি আশ্রয়ও দিয়াছিলেন। শাহ্‌বাজ খাঁর ন্যায় সুদক্ষ শাসনকর্তাও ঈশা খাঁকে দমন করিতে পারেন নাই। মানসিংহ সসৈন্যে ঈশা খাঁকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। উত্তর-বঙ্গের

মানসিংহ : ঈশা খাঁ

ঘোড়াঘাটে পৌঁছিবার পর মানসিংহ অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িলে সেই অভিযান ব্যর্থ হইল। এদিকে কোচবিহারের রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুদেব ঈশা খাঁর সামরিক সাহায্য গ্রহণ করিয়া কোচবিহার আক্রমণ করিলে লক্ষ্মীনারায়ণ মোগল সম্রাটের সাহায্য প্রার্থনা করেন। মানসিংহ রঘুদেব-এর বিরুদ্ধে এক সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন এবং নিজপুত্র দুর্জন সিংহের অধিনায়কত্বে এক স্থল ও নৌবাহিনী প্রেরণ করেন। রঘুদেব যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। কিন্তু দুর্ধর্ষ ঈশা খাঁ বিক্রমপুরের অনতিদূরে মোগলবাহিনীকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিয়া মোগলবাহিনীর অনেককে বন্দী করিতে সমর্থ হন। দুর্জন সিংহ ও আরও অনেকে এই যুদ্ধে প্রাণ হারান।

ঈশা খাঁ কর্তৃক সম্রাট আকবরের আনুগত্য স্বীকার

এই যুদ্ধে জয়লাভ করিলেও ঈশা খাঁ মোগলদের সহিত আর যুঝিয়া চলা সমীচীন হইবে না বিবেচনা করিয়া সম্রাট আকবরের আনুগত্য স্বীকার করেন (১৫৯৭)। ইহার দুই বৎসর পর ঈশা খাঁর মৃত্যু হয়।

তাঁহার মৃত্যু (১৫৯৯)

১৬০২ খ্রীষ্টাব্দে মানসিংহ দক্ষিণ-ঢাকার শেরপুর নামক স্থানের স্বাধীন জমিদার কেদার রায়ের বিরুদ্ধে অভিযানে অগ্রসর হন। কিন্তু ইতিমধ্যে মালদহ অঞ্চলে বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপ শুরু হইলে মানসিংহ তাঁহার পুত্র মহাসিংহকে তথায় প্রেরণ করিলেন। এদিকে কুৎলু খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ওস্‌মান ময়মনসিংহের মোগল থানাদারকে বিতাড়িত করিয়া সেই অঞ্চল অধিকার করেন। মানসিংহ দ্রুত ওস্‌মানের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন এবং তাহাকে পরাজিত করিয়া পুনরায় কেদার রায়ের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ইতিমধ্যে ঈশা খাঁর পুত্র মুশা খাঁ কেদার রায়ের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। সেই সময় ব্রহ্মদেশীয় জলদস্যুগণ (মগ) ঢাকা আক্রমণ করিয়া পরাজিত হইলে কেদার রায় তাহাদিগকে নিজপক্ষে টানিয়া লইলেন। মানসিংহ কেদার রায়কে দমন করিবার জন্য এক বিশাল বাহিনী প্রেরণ করিলে বিক্রমপুরের নিকট দুই পক্ষের মধ্যে এক দারুণ যুদ্ধ বাধিল। যুদ্ধে কেদার রায় আঘাতপ্রাপ্ত অবস্থায় মোগল সেনার হস্তে বন্দী হইলেন। কিন্তু ঢাকায় মানসিংহের নিকট তাঁহাকে উপস্থিত করিবার পূর্বেই পথিমধ্যে তাঁহার মৃত্যু হইল

কেদার রায়

(১৬০৪)। কেদার রায় ছিলেন দুর্ধর্ষ বীর ও সুদক্ষ সামরিক সংগঠক। বহু পোর্তুগীজ জলদস্যুকে তিনি তাহার নৌবাহিনীতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পরবৎসর মোগল সম্রাট আকবর মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইলে মানসিংহ আগ্রায় ফিরিয়া যান। পরবর্তী সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলেও সাময়িকভাবে তিনি পুনরায় বাংলার শাসনকর্তা পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

বাংলার বারভূঁইয়া (Bara Bhuiyas of Bengal)ঃ বাংলাদেশে 'বারভূঁইয়ার' কাহিনী দেশাত্মবোধের উদাহরণ-স্বরূপ স্বীকৃতি পাইয়াছে বটে, কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিকগণ 'বারভূঁইয়া' মোগল আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশ ও দশের রক্ষক হিসাবে আবির্ভূত হইয়াছিলেন একথা স্বীকার করেন না।* সার যদুনাথের মতে ইঁহারা ছিলেন সকলেই ভূঁইফোড় স্থানীয় জমিদার। কররাণী বংশের পতনোন্মুখতার সুযোগ লইয়া ইঁহারা বাংলাদেশের বিভিন্নাংশে কতক স্থান দখল করিয়া লইয়াছিলেন। যশোরের জমিদার প্রতাপাদিত্যকে রাণাপ্রতাপের সম্মান দান করিবার যে প্রবণতা কোন কোন লেখক প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা কেবল ইতিহাসসম্মত নহে, সার যদুনাথের মতে ইহা হাস্যকরও বটে।

বারভূঁইয়ার প্রকৃত পরিচয়

যশোরের প্রতাপাদিত্যের ন্যায় ভাটির ঈশা খাঁ ও তাঁহার পুত্র মুশা খাঁ, বিক্রমপুরের কেদার রায় ও তাঁহার পুত্র চাঁদ রায়† প্রভৃতি সকলেই ছিলেন স্থানীয় জমিদার। মির্জা নাথন রচিত বহারিস্তান গ্রন্থে পুনঃপুনঃ বাংলার বারভূঁইয়ার উল্লেখ রহিয়াছে, কিন্তু এই বারভূঁইয়া কাহারা সে বিষয় কোন সুস্পষ্ট উল্লেখ নাই। মাত্র একটি স্থানে কয়েকজন জমিদারের নাম দেওয়া হইয়াছে, যথাঃ বাহাদুর গাজি, সোনা গাজি, আনোয়ার গাজি, শেখ পির, মির্জা মোমিন, মধু রায়, বিনোদ রায়,

বারভূঁইয়াব কয়েকজন

---

* "A false provincial patriotism has led modern Bengali writers to glorify the *Barabhuiyas* of Bengal as the champions of national independence against foreign invaders. They were nothing of the sort." *History of Bengal*, (D. U.) Vol. II, *Edtd.* by J. N. Sarkar, p. 225.

† Vide *History of Bengal* (D.U.) Vol. II, p. 226.

পালোয়ান এবং হাজি শামস্‌-উদ্দিন বাগ্‌দাদী।* যাহা হউক সাধারণ্যে, ঈশা খাঁ, মুশা খাঁ, কেদার রায়, চাঁদ রায়, প্রতাপাদিত্য, কন্দর্পনারায়ণ ও তাঁহার পুত্র রামচন্দ্র, আনোয়ার গাজি, প্রভৃতি বারভুঁইয়াদের মধ্যে প্রধান বলিয়া স্বীকৃত।

যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য (Raja Pratapaditya of Jessore): যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য বাংলার স্বাধীন জমিদার-গণের অন্যতম প্রধান ছিলেন। বহারিস্তান, আব্দুল লতিফ-এর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ও জেস্যুইট্‌ মিশনারীদের বিবরণে প্রতাপাদিত্যের ব্যক্তিগত চরিত্রের ভূয়সী প্রশংসা রহিয়াছে। তাঁহার রাজনৈতিক প্রতিপত্তি ও মর্যাদা, ব্যক্তিগত কর্মকুশলতা, সামরিক সংগঠন শক্তি প্রভৃতির বিশেষ উল্লেখ উপরি-উক্ত গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়। রাজা প্রতাপাদিত্যের সমরবাহিনী ও নৌবহর, সর্বোপরি তাঁহার ঐশ্বর্য ও ব্যক্তিত্ব তাঁহাকে সমসাময়িক স্বাধীন জমিদারগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসনের অধিকারী করিয়াছিল।

প্রতাপাদিত্যের চরিত্র

তাঁহার রাজধানী যশোর, খুলনা ও বাখরগঞ্জ জেলা লইয়া গঠিত ছিল। যমুনা ও ইছামতীর সঙ্গমস্থলে ধূমঘাট নামক স্থানে তাঁহার রাজধানী ছিল। রাজা প্রতাপাদিত্য সম্পর্কে সাধারণ্যে যে উচ্চ ধারণা আছে, তাহা ইতিহাসসম্মত নহে। মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে তিনি নিজ রাজ্যরক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু একটি যুদ্ধেও তিনি মোগল-বাহিনীকে পরাজিত করিতে পারেন নাই। ইহা ভিন্ন তিনি বিনা শর্তে মোগল প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। এই সকল কারণে সার যদুনাথ বলেন যে, হল্‌দিঘাটের যুদ্ধের বীর রাণা প্রতাপের সহিত রাজা প্রতাপাদিত্যের তুলনা করা যেমন অযৌক্তিক তেমনি হাস্যকর।†

তাঁহার রাজ্যসীমা

পরাজয় ও মোগল প্রাধান্য স্বীকার

রাজা কন্দর্পনারায়ণ ও তাঁহার পুত্র রামচন্দ্র (Raja Kandarpa-narayan & His son Ramchandra): রাজা প্রতাপাদিত্যের

* *Ibid*, p. 239.

† *Ibid.* pp. 225-26.

রাজ্যের পূর্বসীমায় রাজা কন্দর্পনারায়ণের রাজ্য ছিল। বর্তমান বাখরগঞ্জ জেলার একাংশ লইয়া তাঁহার রাজ্য গঠিত ছিল। কন্দর্পনারায়ণের পুত্র রাজা রামচন্দ্র ছিলেন প্রতাপাদিত্যের জামাতা। নাবালক অবস্থায়ই রামচন্দ্র নিজ রাজ্যভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধি ও রাজনৈতিক ক্ষমতা জেসুইট্ মিশনারীদের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল। তিনি একবার ভুলুয়ার রাজা লক্ষ্মণ মাণিক্যকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন।

কন্দর্পনারায়ণ ও তাঁহার পুত্র রামচন্দ্র

ঈশা খাঁর পুত্র মুশা খাঁ (Musa Khan, son of Isa Khan) : ভাটির দুর্ধর্ষ স্বাধীন ভূঁইয়া (জমিদার) ঈশা খাঁর পুত্র মুশা খাঁ জাহাঙ্গীরের আমলে বাংলাদেশের ভূইয়াদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ছিলেন। তিনিও পিতার অনুসৃত মোগলদের সহিত শত্রুতার নীতি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলেন। ঈশা খাঁ প্রযোজনবোধে অন্ততঃ মৌখিকভাবে মোগল আনুগত্য স্বীকার করিয়া চলিতেন। কিন্তু মুশা খাঁ মোগল প্রাধান্য সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করিয়া মোগলদের সহিত আজীবন যুঝিয়া চলিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্য বর্তমান ঢাকা জেলা, ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহের অধিকাংশ লইয়া গঠিত ছিল। তাঁহার রাজধানী ছিল সোনারগাঁও। খিজিরপুর, কদম রসুল ও নারায়ণগঞ্জের নিকট যাত্রাপুর নামে তাঁহার তিনটি সুরক্ষিত দুর্গ ছিল। কাত্রাভু ছিল তাঁহার পরিবার-পরিজনের বসবাসের স্থান। কেদাররায়ের মৃত্যুর পর মুশা খাঁ তাহার রাজ্যের কতকাংশ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। মোগলদের সহিত দ্বন্দ্বে মুশা খাঁ বাংলার বারভূঁইয়ার সাহায্য পাইযাছিলেন।

মুশা খাঁর মোগল-বিরোধিতা

বাহাদুর গাজি (Bhadur Ghazi) : ভাওয়ালের জমিদার বাহাদুর গাজি সমসাময়িক ভূঁইয়াদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার এক বিশাল নৌবাহিনী ছিল। তিনি মোগলদের বিরুদ্ধে মুশা খাঁকে যথেষ্ট সাহায্যদান করিয়াছিলেন। মোগল হস্তে মুশা খাঁর চূড়ান্ত পরাজয় ঘটিলে বাহাদুর গাজি মোগলদের পক্ষে যোগদান করেন এবং যশোর ও

বাহাদুর গাজির মোগল আধিপত্য স্বীকার

কামরূপ অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন। বাংলার অন্যতম ভুঁইয়া আনোয়ার গাজি তাঁহারই ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন বলিয়া অনেকে মনে করেন।

সোনা গাজি (Sona Ghazi): ত্রিপুরার উত্তর সীমায় সরাইল নামক স্থানের জমিদার ছিলেন সোনা গাজি। তাঁহারও বহুসংখ্যক যুদ্ধ-নৌকা ছিল। তিনি মুশা খাঁকে মোগলদের বিরুদ্ধে সাহায্যদান করিয়াছিলেন এরূপ কোন উল্লেখ নাই। সম্ভবত তিনি পূর্বাহ্নেই মোগল প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন।

সোনা গাজির মোগল প্রভুত্ব স্বীকার

[**ঈশা খাঁ, কেদার রায়** প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা ৩৫৯-'৬১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

রাজা মানসিংহ যখন বাংলার শাসনকর্তা তখন বাংলার স্বাধীন জমিদারগণের নিকট হইতে কেবলমাত্র মৌখিক আনুগত্যের স্বীকৃতিই লাভ করা সম্ভব হইয়াছিল। তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণভাবে দমন করিবার চেষ্টাও সেই সময়ে করা হয় নাই। জাহাঙ্গীর দিল্লীর সম্রাট হইলে পর বাংলার স্বাধীন জমিদারগণকে সম্পূর্ণভাবে পদানত করিবার ধারাবাহিক চেষ্টা শুরু হয়। জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া মানসিংহকে পুনরায় বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন, কিন্তু পর বৎসরই (১৬০৬) তাঁহাকে বিহারের শাসনকর্তা রোটাসের গিরিদুর্গে প্রেরণ করিলেন। কুতব-উদ্দিন খাঁ কোকা বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন। কুতব-উদ্দিন খাঁ কোকা ও তাঁহার পরবর্তী শাসনকর্তা জাহাঙ্গীর কুলি খাঁ উভয়েরই শাসনকালের তেমন কোন গুরুত্ব ছিল না। কুতব-উদ্দিন কোকা বর্ধমানে ফৌজদার শের আফগানের সহিত যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। বাংলাদেশের আবহাওয়া জাহাঙ্গীর কুলি খাঁর সহ্য হয় নাই। শাসনকর্তা-পদ গ্রহণ করিবার এক বৎসরের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। পরবর্তী শাসনকর্তা ইস্‌লাম খাঁ ছিলেন যেমন সুদক্ষ শাসক, দুর্ধর্ষ সেনাপতি তেমনি বিচক্ষণ রাজনীতিক। তিনি বাংলার বারভুঁইয়াদিগকে দমন করিয়া তাঁহাদিগকে মোগল সম্রাটের প্রভুত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়া-

মানসিংহের তৃতীয়বার বাংলার শাসনভার গ্রহণ (১৬০৫-৬)

কুতব-উদ্দিন কোকা (১৬০৬-৭)

জাহাঙ্গীর কুলি খাঁ (১৬০৭-৮)

ছিলেন মুশা খাঁ, রাজা প্রতাপাদিত্য, ওস্মান আফগান প্রভৃতিকে সম্পূর্ণভাবে দমন করিতে তিনি সমর্থ হইয়াছিলেন। ইস্লাম খাঁ সিলেট্ বা শ্রীহট্ট, কাছাড়, ধুব্ড়ী প্রভৃতি অঞ্চল মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। এইভাবে ১৬০৮ হইতে ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পাঁচ বৎসরের মধ্যে ইস্লাম খাঁ বাংলাদেশে মোগল অধিকার নিরঙ্কুশ করিয়া তুলিয়াছিলেন। মোগল সাম্রাজ্য গঠনে তাঁহার অবদান অপরিসীম। বাংলার ইতিহাসে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ মোগল শাসনকর্তা।

ইস্লাম খাঁ। (১৬০৮-১৩) : তাঁহার কৃতিত্ব

ইস্লাম খাঁর পরবর্তী শাসনকর্তা কাসিম খাঁ ছিলেন অকর্মণ্য শাসক। তাঁহার শাসনকালে বাংলাদেশের কোন কোন অংশ মগ ও ফিরিঙ্গীগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। ইস্লাম খাঁর আমলে যে শান্তি, প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি মোগলগণ স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল তাহা বিনষ্ট হইয়া অব্যবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল। দেওয়ান মির্জা হুসেন বেগ-এর সহিত বিবাদ-বিসম্বাদের ফলে এই অব্যবস্থা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। আসাম, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে কাসিম খাঁর সামরিক অভিযানগুলিও বিফল হইয়াছিল। কিন্তু কাসিম খাঁর পর ইব্রাহিম খাঁ বাংলার শাসনকর্তা হইয়া আসিলে বাংলাদেশে পুনরায় শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়। ইব্রাহিম খাঁ ছিলেন নূরজাহানের ভ্রাতা। তাঁহার চরিত্রের মাধুর্য, বিবেচনা বুদ্ধি, তাঁহার কর্মদক্ষতা প্রভৃতি তাঁহাকে ইস্লাম খাঁ অপেক্ষাও অধিক সম্মানের অধিকারী করিয়া তুলিয়াছিল। ত্রিপুরা ও আরাকানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে তিনি কৃতকার্য হইয়াছিলেন। আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যাপারে তিনি ছিলেন উদার নীতির পক্ষপাতী। উন্নয়নমূলক কার্যাদি, সুশাসন, শান্তি ও শৃঙ্খলার মাধ্যমে তিনি বাংলাদেশকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন।

কাসিম খাঁ (১৬১৩-১৭)

ইব্রাহিম খাঁ (১৬১৭)

১৬২২ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে জাহাঙ্গীরের পুত্রদের মধ্যে সর্বাধিক ক্ষমতাশালী শাহ্‌জাহান নূরজাহানের বিরোধিতায় দিল্লী সিংহাসন হইতে বঞ্চিত হইবার আশঙ্কা করিয়া দাক্ষিণাত্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন।

মোগল সেনাপতি ও পরভেজ্ তাঁহাকে দাক্ষিণাত্য হইতে বিতাড়িত করিলে শাহ্জাহান বাংলাদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি ইব্রাহিম খাঁকে নিজ পক্ষে টানিবার চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হইলে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ হইল। ইব্রাহিম খাঁ মোগল সম্রাটের প্রাধান্য রক্ষা করিতে গিয়া প্রাণ হারাইলেন। শাহ্জাহান সাময়িকভাবে বাংলাদেশ অধিকার করিয়া লইলেন। উড়িষ্যাও তাঁহার অধিকারে আসিল। তারপর তিনি বিহার জয় করিতে অগ্রসর হইলেন। বিহার প্রদেশটিও সহজেই তাঁহার অধিকার-ভুক্ত হইল। এইভাবে ক্রমে জৌনপুর, বানারস, চুণার, এলাহাবাদ, আগ্রা প্রভৃতি অধিকার করিতে মনস্থ করিয়া তিনি যখন অভিযানে ব্যস্ত সেই সময়ে সম্রাটের সেনাবাহিনীর হস্তে পরাজিত হইয়া তাঁহাকে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া দাক্ষিণাত্যে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। ফলে, ১৬২৫ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় বাংলাদেশ জাহাঙ্গীরের অধিকারে আসিল।

বিদ্রোহী শাহ্জাহান কর্তৃক বাংলাদেশ অধিকৃত (১৬২৪)

শাহ্জাহানের পরাজয়, জাহাঙ্গীরের অধিকার পুনঃস্থাপিত

বাংলাদেশের ইতিহাসে জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তাঁহার দীর্ঘ বাইশ বৎসরের রাজত্বকালের মধ্যে ইস্‌লাম খাঁ ও ইব্রাহিম খাঁর চেষ্টায় বাংলার সর্বত্র মোগল অধিকার নিরঙ্কুশভাবে স্থাপিত হইয়াছিল। বাংলাদেশ ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক দিক্ দিয়া ঐক্যবদ্ধ হইয়া অহোম ও আরাকান রাজ্যের সীমা পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল। ফলে, আরাকান ও অহোম রাজ্যের সহিতও মোগল সম্রাটের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল।

বাংলাদেশের ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপিত

শাহ্জাহান ও ঔরংজেবের দীর্ঘ আশী বৎসর রাজত্বকালে বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা মোটামুটি অব্যাহত-ই ছিল। ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর শাহ্জাহান সিংহাসন আরোহণ করিয়াই জাহাঙ্গীরের আমলের বাংলার সর্বশেষ শাসনকর্তা ফিদাই খাঁকে পদচ্যুত করিয়া কাসিম খাঁ যুইনিকে সেই পদে নিযুক্ত করিলেন। ১৬২৮ হইতে ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ছিলেন বাংলাদেশের শাসনকর্তা। তাঁহার শাসনকালের সর্বপ্রধান উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল হুগলীর পোর্তুগীজদের দমন।

ফিদাই খাঁর পদচ্যুতি —কাসিম খাঁ যুইনির নিয়োগ

পোর্তুগীজ বণিকগণ-ই সর্বপ্রথম বাংলাদেশে ব্যবসায় করিবার উদ্দেশ্যে আসিয়াছিল। প্রথমে তাহারা ব্যবসায়ের জন্য প্রতি বৎসর আসিত এবং ব্যবসায়ের কাল উত্তীর্ণ হইয়া গেলে আবার দেশে ফিরিয়া যাইত। কিন্তু ব্যবসায়ে অত্যধিক লাভ হওয়াতে তাহারা ক্রমে সাতগাঁও অঞ্চলে স্থায়িভাবে বাস করিতে শুরু করে। স্থানীয় জমিদারগণ ও বাংলার শাসকবর্গও পোর্তুগীজদের সহিত ব্যবসায় উভয় পক্ষেই লাভজনক দেখিয়া তাহাদের প্রতি সদয় ব্যবহার শুরু করিলেন। ক্রমে সাতগাঁও অঞ্চলে পোর্তুগীজগণ ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে শুল্ক আদায় করিতে লাগিল। সাতগাঁও অঞ্চল ব্যবসায়ের পক্ষে অসুবিধাজনক হইয়া উঠিলে তাহারা হুগলীতে সরিয়া গেল। এইভাবে পোর্তুগীজগণ বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশের মাধ্যমে সমগ্র উত্তর-ভারতে এক অতি ব্যাপক ব্যবসায় শুরু করিল। ১৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দে পোর্তুগীজদের নেতা পেড্রো ট্যাভারে (Pedro Tavares) সম্রাট আকবরের আদেশে দিল্লী উপস্থিত হইলেন। তাঁহার ব্যবহারে সম্রাট আকবর এত প্রীত হইলেন যে, তিনি পেড্রো ট্যাভারেকে বাংলাদেশে পোর্তুগীজগণকে একটি শহর স্থাপনের অনুমতি দান করিলেন। ইহা ভিন্ন তাহাদিগকে ধর্মাচরণের, খ্রীষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করিবার এবং গির্জা স্থাপনের স্বাধীনতাও দান করিলেন। এই অনুমতি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে পোর্তুগীজগণ হুগলীতে এক পোর্তুগীজ উপনিবেশ গড়িয়া তুলিল। অবশ্য পোর্তুগীজগণকে সম্রাটের আইন-কানুন ও আদেশ মানিয়া চলিতে ও করদান করিতে হইত। এদিক্ দিয়া দেখিতে গেলে হুগলী পোর্তুগীজদের রাজার অধীন উপনিবেশে পরিণত হয় নাই। সপ্তদশ শতাব্দীতে হুগলীর অধিবাসীর সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল উহার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিও ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। মোগল সম্রাট পোর্তুগীজগণকে হুগলীর আভ্যন্তরীণ শাসনকার্য পরিচালনা ও উহার নিরাপত্তার দায়িত্ব দানে অস্বীকৃত ছিলেন না। অবশ্য সর্বোপরি মোগল সম্রাটের আধিপত্য তাহারা মানিয়া চলিবে, এই ছিল তখনকার ব্যবস্থা। হুগলীর

পোর্তুগীজ বণিকদের আগমন

সাতগাঁও অঞ্চলে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন

হুগলীতে স্থায়িভাবে বসবাস

পেড্রো ট্যাভারের সম্রাট আকবরের সভায় গমন : বাংলাদেশে শহর স্থাপনের অনুমতিলাভ

আত্মপ্রকাশ করিতে সাহসী হয় নাই। বহিরাগত আক্রমণও তাঁহার সময়ে ঘটে নাই বলিলেই চলে। সুজার নামই তখন সমগ্র জমিদার সম্প্রদায়ের মধ্যে এক ভীতির সঞ্চার করিত। উড়িষ্যার শাসনভারও সুজার উপর ন্যস্ত করা হইয়াছিল। ১৬৫৮-৬০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সুজা দুইবার দিল্লী সিংহাসন অধিকার করিবার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সেই চেষ্টা যেমন ব্যর্থ হইয়াছিল, তাঁহার অনুপস্থিতিতে বাংলার শাসন-ব্যবস্থায়ও তেমনই শৈথিল্য দেখা দিয়াছিল। খাজওয়ার যুদ্ধে (১৬৫৯) পরাজিত হইলে সুজার সকল আশা ব্যর্থ হইয়াছিল। ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে মিরজুমলা বাংলার শাসনভার গ্রহণ করিলে বাংলাদেশে যে অরাজকতা দেখা দিয়াছিল তাহার অবসান ঘটে। আপাতদৃষ্টিতে অরাজকতা দূর হইলেও সমরকুশলী শাসনকর্তা মিরজুমলা বাংলাদেশের শাসন-ব্যবস্থার কতকগুলি বিশেষ সমস্যার সমাধান করিতে পারেন নাই। মগ জলদস্যুদের আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার জন্য সেই সময়ে শক্তিশালী নৌবহরের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু মিরজুমলার আসাম অভিযানে যাত্রার ফলে এবিষয়ে বিশেষ কিছু করা সম্ভব হয় নাই। ফলে, জলদস্যুর উপদ্রব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া-ই চলিয়াছিল। পরবর্তী শাসনকর্তা শায়েস্তা খাঁকে এজন্য একটি নূতন নৌবহর গঠন করিতে হইয়াছিল। মিরজুমলা দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্য যাবতীয় জিনিসের একচেটিয়া আড়তদারী সরকারের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছিলেন। ইংরাজ বণিকদের জাহাজে করিয়া তিনি পারস্যদেশে নানাপ্রকার সামগ্রী রপ্তানির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ওলন্দাজগণকে তিনি যুবরাজ সুজার বিরুদ্ধে সাহায্যদানে বাধ্য করিয়াছিলেন। মিরজুমলার শাসনকালে বাংলাদেশে এক দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। সেই দুর্ভিক্ষ দীর্ঘ দুই বৎসরকাল ধরিয়া অপ্রতিহতভাবে চলিয়াছিল। মিরজুমলা সেই সময়ে আসাম অভিযানে ব্যস্ত ছিলেন। মিরজুমলার শাসনকাল কুচবিহার জয় ও আসাম জয়ের জন্য প্রসিদ্ধ। আসাম জয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং সেই অসুস্থতার ফলে ঢাকার অনতিদূরে খিজিরপুর নামক দুর্গে তাঁহার মৃত্যু হয় (১৬৬৩)।

খাজওয়ার যুদ্ধ—সুজার পরাজয়: মিরজুমলার শাসন-কর্তৃপদ লাভ

মিরজুমলার শাসন-ব্যবস্থা

কুচবিহারও আসাম জয়—মৃত্যু (১৬৬৩)

মোগলযুগে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি (Society & Culture of Bengal under the Mughals) : মোগল শাসনকালে বাংলার রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের এক আমূল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল। বাংলা ও বাঙালীর জাতীয় জীবন এক নূতনরূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। মোগলযুগেই বহির্জগতের বিশেষভাবে পাশ্চাত্ত্যদেশের সহিত বাংলাদেশের যে যোগাযোগ স্থাপিত হয় তাহার মাধ্যমে বাংলার অর্থ নৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে এক নূতন ধারা প্রবাহিত হইয়া আধুনিক বর্তমান বাংলা ও বাঙালী জাতির উদ্ভব ঘটিয়াছে। বিশাল সামুদ্রিক বাণিজ্য, বৈষ্ণবধর্মের বিস্তৃতি, হিন্দু, মুসলমান শিল্পী, সাহিত্যিক ও ধর্মজ্ঞানীদের উদ্ভব, হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সৌহার্দ্যবৃদ্ধি প্রভৃতি মোগল আমলের দান বলা যাইতে পারে। পঞ্চদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

বাংলার নূতনরূপ পরিগ্রহণ

ত্রয়োদশ অধ্যায়

পরবর্তী মোগল সম্রাটগণ

(The Later Moghuls)

ঔরংজেবের উত্তরাধিকারিগণ (Successors of Aurangzeb) : স্পর্ধিত মোগল সাম্রাজ্যের ততোধিক স্পর্ধিত সম্রাট ঔরংজেব আলমগীরের জীবদ্দশায়ই মোগল সাম্রাজ্যের পতনের বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল। মৃত্যুর পূর্বেই মোগল সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশ হইয়া ঔরংজেব তাঁহার পুত্রদের নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা-প্রসূত বহু সদুপদেশ দান করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্বেই মোগল সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ বণ্টনের নির্দেশ দিয়া তিনি উইল করিয়া গিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার তিন পুত্র মোয়াজ্জেম, আজম ও কামবক্সের মধ্যে সাম্রাজ্য বণ্টন করিয়া লইবার জন্য শেষ নির্দেশ রাখিয়া গিয়াছিলেন।

মোগল সাম্রাজ্যের পতনের বীজ অঙ্কুরিত

কিন্তু ঔরংজেবের মৃত্যুর (১৭০৭) অব্যবহিত পরেই এক উত্তরাধিকার-দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হইল। আজম ও কামবক্স উভয়কেই এক বৎসরের মধ্যে পরাজিত ও নিহত করিয়া মোয়াজ্জেম বাহাদুর শাহ্ বা প্রথম শাহ্ আলম উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন (১৭০৮)। চারি বৎসর পরে (১৭১২) তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার চারিপুত্র জাহান্দার শাহ্, আজিম-উস্-শান, জাহান শাহ্ ও রফি-উস্-সানের মধ্যে এক ভীষণ ভ্রাতৃবিরোধ শুরু হইল। জুল্‌ফিকার খাঁর সাহায্যে জাহান্দার শাহ্ তিন ভ্রাতাকে হত্যা করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। কিন্তু জাহান্দার শাহ্ অধিককাল রাজত্বভোগ করিবার সুযোগ পাইলেন না। আজিম-উস্-শানের পুত্র ফারুক্‌শিয়ার তাঁহার পিতৃহন্তা পিতৃব্য ও প্রধান মন্ত্রী জুল্‌ফিকার খাঁকে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করিলেন।

ভ্রাতৃবিরোধ : শাহ্ আলম বা প্রথম বাহাদুর শাহ্ (১৭০৭-১২)

জাহান্দার শাহ্ (১৭১২-১৩)

ফারুক্‌শিয়ার (১৭১৩-১৯)

পাটনার সহকারী শাসনকর্তা হুসেন আলি এবং এলাহাবাদের শাসনকর্তা আবুদুল্লা নামে দুই ভ্রাতার সাহায্যে ফারুক্‌শিয়ার সিংহাসনলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই দুই ভ্রাতা সৈয়দবংশসম্ভূত ছিলেন বলিয়া ইতিহাসে 'সৈয়দ-ভ্রাতৃদ্বয়' নামে পরিচিত। ফারুক্‌শিয়ার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিলেও প্রকৃত শাসনক্ষমতা ছিল সৈয়দ-ভ্রাতৃদ্বয়ের হস্তে। অল্পকালের মধ্যেই সৈয়দ-ভ্রাতৃদ্বয় ও ফারুক্‌শিয়ারের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হইল। ফারুক্‌শিয়ার সৈয়দ-ভ্রাতৃদ্বয় কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইলেন। অবশেষে ফারুক্‌শিয়ারের চক্ষু উৎপাটন করিয়া তাঁহাকে হত্যা করা হইল। তারপর সৈয়দ-ভ্রাতৃদ্বয় রফি-উস্-শানের দুই পুত্র রফি-উদ্-দরাজাত ও রফি-উদ্-দৌলাকে পর পর সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। কিন্তু জাহান্ শাহের তরুণ পুত্র রোহ্‌শান-আখ্‌তার সৈয়দ-ভ্রাতৃদ্বয়কে স্বপক্ষে আনিয়া নিজে মোহম্মদ শাহ্ নাম ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

রফি-উদ্-দরাজাত ও রফি-উদ্-দৌলা

মোহম্মদ শাহ্ সৈয়দ-ভ্রাতৃদ্বয়ের সাহায্যে সিংহাসন লাভ করিলেও তাঁহাদের প্রভাবাধীনে থাকিতে স্বীকৃত হইলেন না। ইতিমধ্যে সৈয়দ-ভ্রাতৃদ্বয়ের ঔদ্ধত্যে বহু লোকই তাঁহাদের শত্রুতে পরিণত হইয়াছিল।

মোহম্মদ শাহ্ সেই সুযোগে সৈয়দ-ভ্রাতৃদ্বয় হুসেন ও আবদুল্লাকে হত্যা করিলেন। এই ব্যাপারে তিনি দাক্ষিণাত্যের নিজাম-উল্-মুল্কের সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন। নিজাম-উল্-মুল্ক প্রথমে কিছুকাল মোহম্মদ শাহের প্রধান মন্ত্রী হিসাবে কার্য করেন। কিন্তু প্রধান মন্ত্রীর কাজ তাঁহার মনঃপূত হইল না। তিনি দাক্ষিণাত্যে ফিরিয়া গিয়া মৌখিকভাবে মোগল সাম্রাজ্যের প্রাধান্য মানিয়া লইয়া এক স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।

মোহম্মদ শাহ
(১৭১৯-৪৮)

মোহম্মদ শাহ্ সিংহাসনলাভের প্রথম কয়েক বৎসর দক্ষতার সহিত শাসনকার্য পরিচালনা করিলেন বটে, কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই তিনি বিলাস-ব্যসনে গা ঢালিয়া দিলেন। শাসন-ব্যবস্থা তাহাতে স্বভাবতই শিথিল হইয়া পড়িল। ফলে, দাক্ষিণাত্য, অযোধ্যা ও বাংলাদেশ মোগল সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। মারাঠাগণ মোগল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে অপ্রতিহতভাবে হানা দিতে শুরু করিল। আগ্রার সন্নিকটে জাঠগণ, পাঞ্জাবে শিখগণ ও রুহেলখণ্ডে আফগান রুহেলাগণ স্বাধীন হইয়া উঠিল। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে যখন এইরূপ ব্যাপক বিদ্রোহ ও অব্যবস্থা দেখা দিয়াছে, ঠিক সেই সময়ে নাদির শাহের আক্রমণ মোগল সাম্রাজ্যের উপর চরম আঘাত হানিলে ঔরংজেবের বিশাল সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল।

ব্যাপক বিদ্রোহ : মোগল সাম্রাজ্যে ভাঙন

মোহম্মদ শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র আহ্ম্মদ শাহ্ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। বিধ্বস্ত মোগল সাম্রাজ্যকে পুনর্গঠিত বা পুনঃসঞ্জীবিত করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। ক্রমেই মোগল সাম্রাজ্য সংকুচিত ও সংকীর্ণ হইতে লাগিল। আহ্ম্মদ শাহ্কে সিংহাসনচ্যুত করিয়া জাহান্দার শাহের পুত্র আজ-উদ্দিন 'দ্বিতীয় আলমগীর' উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। নিজাম-উল্-মুল্কের পৌত্র ইমাদ্-উল্-মুল্কের সহায়তায় দ্বিতীয় আলমগীর সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই ওয়াজীর বা প্রধান মন্ত্রী ইমাদ্-উল্-মুল্কের প্রাধান্য দ্বিতীয়

আহ্ম্মদ শাহ
(১৭৪৮-৫৪)

দ্বিতীয় আলমগীর
(১৭৫৪-৫৯)

আলমগীরের নিকট অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি নিজেকে স্বাধীন করিবার চেষ্টা শুরু করিলেন ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওয়াজীর ইমাদ্-উল্-মুল্কের হস্তে নিজেই প্রাণ হারাইলেন। অতঃপর তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় শাহ্ আলম সম্রাট-পদে অধিষ্ঠিত হইলেন।

দ্বিতীয় শাহ্ আলম (১৭৫৯-১৮০৬)

ওয়াজীর ইমাদ্-উল্-মুল্কের ঔদ্ধত্যে অতিষ্ঠ হইয়া তিনি শেষ পর্যন্ত ইংরেজগণের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত তিনি ইংরেজদের বৃত্তিভোগী হিসাবেই জীবন ধারণ করেন। দ্বিতীয় শাহ্ আলমের পুত্র দ্বিতীয় আকবর দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। অবশেষে তৈমুর বংশের সর্বশেষ সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্ ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহে যোগদান করিয়া ইংরেজগণ কর্তৃক দেশ হইতে নির্বাসিত হইলেন। কয়েক বৎসর ব্রহ্মদেশের রেঙ্গুনে নির্বাসিত অবস্থায় অতিবাহিত করিয়া ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

দ্বিতীয় আকবর (১৮০৬-৩৭)

দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্ (১৮৩৭-৫৮)

বৈদেশিক আক্রমণ (Foreign Invasions)

নাদির শাহ্, ১৭৩৮-'৩৯ (Nadir Shah) : পারস্যের সাফাবী বংশের পতনের (১৭২২) পর পারস্যে আফগান প্রাধান্য স্থাপিত হয়। সাফাবী সাম্রাজ্যের পতন বহু পূর্বেই শুরু হইয়াছিল, কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় শতকে যখন আফগানগণ কর্তৃক সাফাবী সাম্রাজ্য আক্রান্ত হয় তখন মোহম্মদ শাহ্ ছিলেন মোগল সম্রাট। তাঁহার ওয়াজীর নিজাম-উল্-মুল্ক মোহম্মদ শাহ্‌কে সাফাবী সম্রাটের সাহায্যে অগ্রসর হইতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। মোহম্মদ শাহ্ অবশ্য এই পরামর্শ গ্রহণ করেন নাই। এই সময়ে নাদির ইমাম কুলি খাঁ পারস্য হইতে আফগানদের বিতাড়িত করিয়া সাফাবী বংশের শেষ সম্রাট তহ্‌মাস্প্‌কে সিংহাসনচ্যুত করেন এবং নিজে পারস্যের সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি প্রথমে (১৭৩২) রাজপ্রতিনিধি হিসাবে শাসনকার্য শুরু করেন এবং ১৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বয়ং 'নাদির শাহ্' উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। নাদির ইমাম কুলি খাঁ প্রথম জীবনে অত্যন্ত

সাফাবী বংশের পতন

নাদির ইমাম কুলি খাঁর 'নাদির শাহ্' নাম ধারণ

দরিদ্র ছিলেন এবং কিছুকাল দস্যুদলের সর্দারও ছিলেন। পর বৎসর (১৭৩৭) নাদির শাহ্ কান্দাহার আক্রমণ করিলে পলায়মান আফগানদের অনেকেই ভারতবর্ষে আশ্রয় গ্রহণ করে। নাদির শাহ্ এবিষয়ে প্রতিবাদ জানাইয়া দিল্লীতে দূত প্রেরণ করেন। দীর্ঘ এক বৎসরের মধ্যেও এবিষয়ে কোন উত্তর না পাইয়া উপরন্তু পারস্যের দূতকে মোগল দরবারে আটক করিয়া রাখিলে নাদির শাহ্ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি ভারত আক্রমণ করিয়া ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। প্রথমে তিনি আফগানিস্তান দখল করিলেন। আফগানিস্তান ও পাঞ্জাব রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা ঔরংজেবের পরবর্তী মোগল সম্রাটগণ করেন নাই। ফলে, আফগানিস্তান ও পাঞ্জাব সহজেই নাদির শাহ্ কর্তৃক অধিকৃত হইল। ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে নাদির শাহ্ পানিপথের অদূরবর্তী কার্ণাল নামক স্থানে সসৈন্যে উপস্থিত হইলেন। মোগল সম্রাট মোহম্মদ শাহ্ নাদির শাহ্‌কে বাধা দিবার জন্য অগ্রসর হইয়া শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইলেন। পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রা ক্ষতিপূরণ দিবার শর্তে তিনি সন্ধি স্থাপন করিতে বাধ্য হইলেন। এই অর্থ আদায় করিবার উদ্দেশ্যে নাদির শাহ্ স্বয়ং সম্রাট মোহম্মদ শাহের সহিত দিল্লীতে প্রবেশ করিলেন এবং শাহ্-জাহানের প্রাসাদভবন দেওয়ান-ই-খাসে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার দিল্লী অবস্থানকালে অকস্মাৎ গুজব রটিয়া গেল যে, নাদির শাহের মৃত্যু হইয়াছে। এই মিথ্যা রটনার উপর নির্ভর করিয়া দিল্লী-বাসীরা নাদির শাহের সেনাবাহিনীকে আক্রমণ করিল এবং মোট নয় শত সৈন্যের প্রাণনাশ করিল। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া নাদির শাহ্ ইহার প্রতিশোধ লইবার উদ্দেশ্যে নির্বিচারে দিল্লীবাসীদের হত্যা করিতে নিজ সৈন্যদলকে আদেশ দিলেন। দীর্ঘ সাত ঘণ্টা ধরিয়া ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠন চলিল। অসংখ্য নরনারীর রক্তে দিল্লীর ধূলি রঞ্জিত হইল। মোহম্মদ শাহের কাতর অনুনয়ের ফলে নাদির শাহ্ হত্যাকাণ্ড হইতে নিরস্ত হইলেন বটে, কিন্তু নাদির শাহ্ দিল্লী সম্রাটের যাবতীয় ঐশ্বর্য এবং প্রভূত পরিমাণ লুণ্ঠিত ধনরত্ন লইয়া স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন।

ভারত আক্রমণের কারণ

আফগানিস্তান ও পাঞ্জাবের নিরাপত্তা অবহেলিত

কার্ণালে মোগল সম্রাটের পরাজয় (১৭৩৯)

নাদির শাহ্ কর্তৃক দিল্লীতে হত্যাকাণ্ড

শাহ্জাহানের বিখ্যাত ময়ূরসিংহাসন ও কোহিনূর মণি ভিন্ন মোট পনর কোটি মুদ্রা, বহু মণি-মাণিক্য, আসবাবপত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ লইয়া নাদির শাহ্ ভারতবর্ষ ত্যাগ করিলেন। ইহা ভিন্ন দশ হাজার ঘোড়া, তিন শত হাতী ও বহুসংখ্যক উটও তিনি সঙ্গে লইয়া গেলেন। সিন্ধু, কাবুল ও পশ্চিম-পাঞ্জাবও নাদির শাহ্কে ছাড়িয়া দিতে হইল।

ময়ূরসিংহাসন, কোহিনূর মণি, পনর কোটি মুদ্রা ও প্রভূত পরিমাণ ধনরত্ন অপহরণ

এই বিপুল পরিমাণ ঐশ্বর্য অপহৃত হওয়ায় মোগল সাম্রাজ্যের পতন আসন্ন হইয়া উঠিল। নাদির শাহের আক্রমণ পতনোন্মুখ মোগল সাম্রাজ্যকে যে চরম আঘাত হানিল তাহা হইতে ইহার পুনরুজ্জীবনের আর কোন আশাই রহিল না। স্পর্ধিত মোগল সাম্রাজ্যের মর্যাদা ধুলায় লুণ্ঠিত হইল।

মোগল সাম্রাজ্যের উপর চরম আঘাত

আহ্মদ শাহ্ আব্দালী (Ahmad Shah Abdali): নাদির শাহের ভারত-আক্রমণকালে আহ্মদ শাহ্ আব্দালী নামে জনৈক আফগান উপজাতীয় দলপতি ভারতবর্ষে তাঁহার অনুচর হিসাবে সঙ্গে আসিয়াছিলেন। ১৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দে আততায়ীর হস্তে নাদির শাহের মৃত্যু হইলে আহ্মদ শাহ্ আব্দালী আফগানিস্তানকে স্বাধীন করিতে সমর্থ হন। তারপর তিনি স্বয়ং 'দুর্-ই-দুর্রান্' উপাধি ধারণ করিয়া পারস্যের সম্রাটপদ গ্রহণ করেন। নাদির শাহের অনুচর হিসাবে ভারতবর্ষে আসিয়া তিনি ভারতের অভাবনীয় ঐশ্বর্যের পরিচয় পাইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন ভারতবর্ষের সামরিক দুর্বলতাও তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। পারস্যের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াই তিনি ভারতবর্ষ আক্রমণে প্রবৃত্ত হন। ১৭৪৮ হইতে ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি মোট নয়বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া লাহোর অধিকার করেন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি ভাবী মোগল সম্রাট আহ্মদ শাহ্ এবং ওয়াজীর পুত্র মীর মন্নুর যুগ্ম চেষ্টায় মানপুরের যুদ্ধে পরাজিত হন। ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পুনরায় ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, কিন্তু দিল্লীতে তখন ইরাণী ও তুরানীদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব চলিতেছিল বলিয়া পাঞ্জাবের শাসনকর্তা মীর

পরিচয়

প্রথম আক্রমণ (১৭৪৮)

দ্বিতীয় আক্রমণ (১৭৫০)

মন্নু সে-বার দিল্লী হইতে কোন সাহায্য পাইলেন না। এককভাবে আহ্‌ম্মদ শাহ্‌ আব্‌দালীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া মীর মন্নু পরাজিত হন। তিনি সিন্ধু-নদীর পূর্ব-তীরস্থ চারিটি জেলার মোট রাজস্ব হইতে যাহা উদ্‌বৃত্ত হইত তাহা আব্‌দালীকে প্রেরণ করিতে প্রতিশ্রুত হন। পরবৎসর (১৭৫২) আহ্‌ম্মদ শাহ্‌ আব্‌দালী পুনরায় ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। এইবারও তিনি মীর মন্নুকে পরাজিত করিয়া শির্‌হিন্দ পর্যন্ত মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত যাবতীয় স্থান দখল করিয়া লন এবং মীর মন্নুকেই পাঞ্জাবের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া যান। কয়েক বৎসর পরই মীর মন্নুর মৃত্যু হইলে পাঞ্জাবে অব্যবস্থা দেখা দেয়। মন্নুর স্ত্রী মঘ্‌লানী বেগম এইরূপ পরিস্থিতিতে দিল্লী সম্রাটের সাহায্য চাহিলে ওয়াজীর ইমাদ্‌-উল্‌-মুল্‌ক এই সুযোগে পাঞ্জাব অধিকার করেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া আব্‌দালী তাঁহার চতুর্থ অভিযানে অবতীর্ণ হন (১৭৫৬)। তিনি এইবার দিল্লী প্রবেশ করিয়া অবাধে লুণ্ঠন করিলেন। বৃন্দাবন এবং মথুরাও আব্‌দালী কর্তৃক লুণ্ঠিত হইল। তারপর দিল্লীর সম্রাটকে কাশ্মীর, পাঞ্জাব, শিরহিন্দ, সিন্ধু প্রভৃতি স্থান ছাড়িয়া দিতে বাধ্য করিয়া তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন। এইবার তিনি নিজপুত্র তৈমুরকে পাঞ্জাবের শাসনকর্তাপদে নিযুক্ত করিয়া গেলেন। তৈমুরের শাসনকার্যে অক্ষমতার ফলে পাঞ্জাবে বিদ্রোহ দেখা দিলে জলন্ধরের শাসনকর্তা, মারাঠা নেতা রঘুনাথ রাও প্রভৃতির সাহায্যে পাঞ্জাব হইতে আফগান শাসনের অবসান ঘটে। অতঃপর আব্‌দালী পঞ্চমবার (১৭৫৯) ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন এবং পাঞ্জাব পুনরধিকার করিতে সমর্থ হন। তারপর তিনি মারাঠাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে আব্‌দালী মারাঠাগণকে পরাজিত করিয়া তাহাদের শক্তি বিধ্বস্ত করেন। ইহার ফলে মারাঠাগণের সাম্রাজ্য বিস্তারের আশা চিরতরে নির্বাপিত হয়। এই আঘাতের পর মারাঠা শক্তি পুনঃসঞ্জীবিত হইতে পারে নাই। এই দিক দিয়া বিচার করিলে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ ভারত-ইতিহাসের এক যুগান্তকারী ঘটনা বলা যাইতে পারে। মারাঠা শক্তির দুর্বলতার সুযোগে শিখ

তৃতীয় আক্রমণ (১৭৫২)

চতুর্থ আক্রমণ (১৭৫৬)

পঞ্চম আক্রমণ (১৭৫৯)

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ (১৭৬১)

জাতির উত্থানের পথ সহজ হয় এবং ইংরেজদের শক্তিবৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হইয়া উঠে।

ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ও নবম আক্রমণ (১৭৬২, ১৭৬৪, ১৭৬৫, ১৭৬৭)

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের পরও আহ্‌ম্মদ শাহ্‌ আব্‌দালী আরও চারিবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু পাঞ্জাবের শিখ জাতিকে দমন করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

আহ্‌ম্মদ শাহ্‌ আব্‌দালীর আক্রমণের ফলাফল

আহ্‌ম্মদ শাহ্‌ আব্‌দালীর পুনঃপুনঃ আক্রমণের ফলে পতনোন্মুখ মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি বিধ্বস্ত হইয়া গেল। মারাঠা শক্তির পরাজয়ে শিখ ও ইংরেজ শক্তির উত্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাইল।

মোগল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ (Causes of the downfall of the Moghul Empire): উত্থান ও পতনের চক্রবৎ আবর্তন—ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। মোগল সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রেও এই প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিল না। একদা বিশাল, শক্তিশালী মোগল সাম্রাজ্য কালের অতলতলে তলাইয়া গিয়া ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থানলাভ করিল।

মোগল সাম্রাজ্যের পতন—প্রাকৃতিক নিয়ম

কোন সাম্রাজ্যের পতনই কেবলমাত্র আভ্যন্তরীণ বা বহিরাগত কারণে ঘটে নাই, এই উভয় প্রকার কারণের একত্র সন্নিবেশের ফলেই পূর্বেও বহু সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়াছিল। মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পশ্চাতেও আভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত কারণ পরিলক্ষিত হয়।

দুই প্রকারের কারণ—আভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত

আভ্যন্তরীণ কারণ:

প্রথমত, মোগল সাম্রাজ্যের শক্তি মোগল সম্রাটগণের ব্যক্তিগত ক্ষমতা, উদ্যম ও সমরনিপুণতার উপর নির্ভরশীল ছিল, প্রজাবর্গের স্বাভাবিক আনুগত্যের উপর নহে। একমাত্র সম্রাট আকবর তাঁহার স্বাভাবিক উদারতা, দূরদর্শিতা ও গভীর রাজনীতি জ্ঞানের সাহায্যে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতি প্রজাবর্গের স্বাভাবিক ও অকপট আনুগত্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার পরবর্তী সম্রাটগণ এই সকল নীতি অনুসরণ করিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন নাই। ব্যক্তিগত

(১) একমাত্র আকবর ভিন্ন অপরাপর সম্রাটের প্রজাবর্গের স্বাভাবিক আনুগত্য লাভে অক্ষমতা

ক্ষমতা ও আকবর-গঠিত সাম্রাজ্যের দৃঢ়তা এই দুই কারণেই ঔরংজেবের আমল পর্যন্ত মোগল সাম্রাজ্য টিকিয়াছিল, কিন্তু এই বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের মূল ভিত্তি লোকচক্ষুর অন্তরালে ক্রমেই দুর্বল হইতে দুর্বলতর হইতেছিল। ঔরংজেবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মোগল সাম্রাজ্যের পতন শুরু হইল।

দ্বিতীয়ত, মোগল সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা ছিল এক-কেন্দ্রিক স্বৈরতন্ত্র। সম্রাট আকবরের আমলে এই এক-কেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় জনকল্যাণের ও প্রজাবর্গের প্রতি সম-ব্যবহারের নীতি অনুসৃত হইল, ফলে শাসন-ব্যবস্থায় জনসাধারণের অংশ না থাকিলেও সুশাসন দাবি করিবার অধিকার স্বীকৃত ছিল। কিন্তু আকবরের পরবর্তী সম্রাটগণের মধ্যে একমাত্র জাহাঙ্গীর ভিন্ন অপরাপর সম্রাটগণের ধর্মান্ধ, সংকীর্ণ নীতির ফলে প্রজাবর্গের এই দাবি উপেক্ষিত হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন এক-কেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার সহজাত ত্রুটিই ছিল এই যে, যখনই কেন্দ্রীয় সরকার দুর্বল হইয়া পড়িত তখনই দূরবর্তী অঞ্চলগুলি স্বাধীন হইয়া যাইত। ঔরংজেবের পরবর্তী মোগল সম্রাটদের দুর্বলতা স্বভাবতই সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে স্বাধীনতার স্পৃহা জাগাইয়া তুলিয়াছিল।

(২) জনকল্যাণের নীতি পরিত্যক্ত

তৃতীয়ত, মোগল সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল ঔরংজেবের দাক্ষিণাত্য-নীতি। দাক্ষিণাত্যের স্বাধীন সুলতানিগুলির অবসান ঘটাইয়া ঔরংজেব মোগল সাম্রাজ্যের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও দুর্ধর্ষ শত্রু মারাঠাগণের উত্থানের পথ সহজ করিয়া দিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যের স্বাধীন সুলতানি রাজ্যগুলি নিজ নিজ নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যেই মারাঠা শক্তির বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইত। কিন্তু এগুলির স্বাধীনতা হরণ করিয়া ঔরংজেব সেই পথ বন্ধ করিয়াছিলেন। সুতরাং ঔরংজেবের দাক্ষিণাত্য-বিজয় মোগল সাম্রাজ্যের শক্তি বৃদ্ধি না করিয়া বরঞ্চ দুর্বলতা বৃদ্ধি করিয়াছিল। সার্ যদুনাথ, ডক্টর রায়চৌধুরী-মজুমদার-দত্ত প্রমুখ আধুনিক ঐতিহাসিকদের মতে দাক্ষিণাত্যের সুলতানি রাজ্যগুলি ঔরংজেব কর্তৃক অধিকৃত না হইলেও মারাঠাজাতির অভ্যুত্থান বন্ধ করা সম্ভব হইত না। সুযোগ্য নেতা শিবাজীর অধীনে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ মারাঠা জাতিকে দমন করা ও বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সুলতানদের পক্ষে সম্ভব হইত এইরূপ মনে করা যুক্তিযুক্ত হইবে না। তথাপি ইহা অনস্বীকার্য যে,

(৩) ঔরংজেবের দাক্ষিণাত্য-নীতি

দাক্ষিণাত্য বিজয়ের জন্য ঔরংজেবের দীর্ঘকাল রাজধানী হইতে অনুপস্থিতি তাঁহার শাসনব্যবস্থাকে বহুল পরিমাণে শিথিল করিয়া দিয়াছিল, এবং উত্তর-ভারতে অব্যবস্থার সুযোগ বৃদ্ধি করিয়াছিল। সুতরাং ঔরংজেবের দাক্ষিণাত্য-নীতি মোগল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে দায়ী ছিল একথা অস্বীকার করা যায় না।

(৪) অনুদার ও পরধর্ম-অসহিষ্ণুতার নীতি

চতুর্থত, সম্রাট আকবর কর্তৃক অনুসৃত উদার, পরধর্মসহিষ্ণু এবং প্রজাবর্গের প্রতি সম-ব্যবহারের নীতি শাহ্‌জাহানের আমলেই পরিত্যক্ত হইয়াছিল। ঔরংজেবের আমলে উদারতার পরিবর্তে সংকীর্ণতা, পরধর্ম-সহিষ্ণুতার স্থলে পরধর্মবিদ্বেষ ও ধর্মান্ধতা, প্রজাবর্গের প্রতি সম-ব্যবহারের স্থলে অ-মুসলমানদের উপর নির্যাতন-নীতি রাজপুত, জাঠ, প্রভৃতি সকল হিন্দু সম্প্রদায়কেই মোগল সাম্রাজ্যের ঘোর শত্রুতে পরিণত করিয়াছিল। যাহাদের আনুগত্য ও সহযোগিতায় সম্রাট আকবর মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ়ভাবে স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহাদের প্রতি অবিচার ও অত্যাচার করিবার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবেই মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি বিপর্যস্ত হইয়া পড়িল। এইদিক দিয়া বিচার করিলে শাহ্‌জাহানের, বিশেষভাবে ঔরংজেবের অদূরদর্শিতা মোগল সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ একথা স্পষ্টভাবে বুঝা যায়।

(৫) সম্রাট, অভিজাত-বর্গ ও সেনাবাহিনীর বিলাসপ্রিয়তা

পঞ্চমত, শাহ্‌জাহানের আমল হইতে একমাত্র ঔরংজেব ভিন্ন, মোগল সম্রাটদের মধ্যে যে বিলাসপ্রিয়তা দেখা দিয়াছিল তাহা ক্রমে অভিজাত শ্রেণী এমন কি সেনাবাহিনীর মধ্যেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ফলে সেনাবাহিনীর সামরিক দক্ষতা, শৃঙ্খলা ও দায়িত্ব-বোধ প্রভৃতি লোপ পাইয়াছিল। দীর্ঘকাল দাক্ষিণাত্যে মারাঠাদের সহিত যুঝিয়া একেই মোগল সেনাবাহিনী পর্যুদস্ত হইয়াছিল তদুপরি তাহাদের মধ্যে বিলাস-ব্যসন দেখা দিলে স্বভাবতই মারাঠাগণের আক্রমণ প্রতিহত করিবার বা বৈদেশিক আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করিবার ক্ষমতা তাহাদের রহিল না।

ষষ্ঠত, মোগল সম্রাটগণের কেহই নৌ-বাহিনী গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন নাই। নৌবলে বলীয়ান বিদেশীয় বণিক সম্প্রদায়গুলির উদ্ধত

আচরণ, পোর্তুগীজগণের জলদস্যুতা প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়াও মোগল সম্রাটগণ নৌশক্তি-গঠনে মনোযোগী হইলেন না। পরিস্থিতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যরক্ষার ব্যবস্থারও যে উন্নতি-সাধন করা প্রয়োজন, মোগল সম্রাটগণ ইহা বুঝিলেন না। মোগল সাম্রাজ্যের নৌশক্তির অভাবহেতুই ইওরোপীয় বণিকগণ ভারতবর্ষের রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল।

(৬) মোগল সম্রাটগণের নৌ-বাহিনী গঠনে অবহেলা

সপ্তমত, মোগল সাম্রাজ্যের বিশালতাও উহার পতনের অন্যতম কারণ ছিল, সন্দেহ নাই। ঔরংজেবের পরবর্তী সম্রাটগণের মধ্যে কেহই এত বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনার উপযুক্ত ছিলেন না। একে সম্রাটগণের অকর্মণ্যতা তদুপরি সিংহাসনের জন্য অন্তর্দ্বন্দ্ব ও ঘন ঘন সম্রাট-পরিবর্তন ঔরংজেবের পরবর্তী কালে মোগল সাম্রাজ্যের শক্তি নাশ করিয়াছিল। বাবর, আকবর বা ঔরংজেবের মতো সম্রাটগণের উত্থানের দিন শেষ হইয়া গিয়াছিল। দুর্বল উত্তরাধিকারিগণের শাসনক্ষমতার অভাবহেতু শাসনব্যবস্থা দুর্নীতিগ্রস্ত হইয়া উঠিল, সেনাবাহিনীও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িল। এমতাবস্থায় প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ যে স্ব-স্ব-প্রধান হইয়া উঠিবেন, ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। দাক্ষিণাত্যে নিজাম-উল্-মুল্ক এক স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিলেন, বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা মুর্শিদ কুলী খাঁর অধীনে একপ্রকার স্বাধীন হইয়া গেল। অযোধ্যা, রুহেলখণ্ড প্রভৃতি স্থানও স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। শিখ ও জাঠগণ স্বাধীন রাজ্য গড়িয়া তুলিল। বিদেশী বণিক ইংরেজগণও কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণে পশ্চাদপদ রহিল না। তাহারাও ভারতে এক বিশাল সাম্রাজ্যগঠনে প্রয়াসী হইল।

(৭) মোগল সাম্রাজ্যের বিশালতা—অন্তর্দ্বন্দ্ব, সেনাবাহিনীর উচ্ছৃঙ্খলতা ও প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণের স্ব-স্ব-প্রাধান্য

বহিরাগত কারণ :

আভ্যন্তরীণ কারণে মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি যখন প্রায় বিধ্বস্ত, মোগল সাম্রাজ্য যখন ধ্বংসের মুখে, এমন সময়ে পারস্য-সম্রাট নাদির শাহের ভারত-আক্রমণ এবং দিল্লীতে প্রবেশ করিয়া হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠন মোগল সাম্রাজ্যের উপর চরম আঘাত হানিয়া গেল। এই আঘাত হইতে মোগল সাম্রাজ্যকে পুনরুজ্জীবিত করা পরবর্তী মোগল সম্রাটগণের পক্ষে সম্ভব হইল না। নাদির শাহের আক্রমণ মোগল সাম্রাজ্যকে পতনের মুখে পৌঁছাইয়া

(১) নাদির শাহের আক্রমণ

দিল। কিন্তু ইহাতেই মোগল সাম্রাজ্য বহিরাক্রমণ হইতে নিস্তার পাইল না।

(২) আহ্‌ম্মদ শাহ্‌ আব্‌দালী বা দুর্‌রাণীর পুনঃপুনঃ আক্রমণ

কয়েক বৎসরের মধ্যেই আহ্‌ম্মদ শাহ্‌ আব্‌দালী বা আহ্‌ম্মদ শাহ্‌ দুর্‌রাণী পর পর নয়বার ভারত আক্রমণ করিয়া মোগল সাম্রাজ্যকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়া গেলেন। মোগল যুগের শেষভাগে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা ছিল না। এই পথেই নাদির শাহ্‌ ও আহ্‌ম্মদ শাহ্‌ আব্‌দালী ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া মোগল সাম্রাজ্যের উপর চরম আঘাত হানিতে পারিয়াছিলেন।

সীমান্ত-রক্ষার ব্যবস্থা উপেক্ষিত

এইভাবে আভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত কারণে আকবরের অক্লান্ত চেষ্টা ও অনন্যসাধারণ দূরদর্শিতায় যে বিশাল মোগল সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার পতন ঘটিল।

চতুর্দশ অধ্যায়

স্বাধীন রাজ্যসমূহের উত্থান

(Rise of Independent States)

ধ্বংসোন্মুখ মোগল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয়-শাসন শিথিল হইয়া পড়িলে দিল্লী হইতে দূরবর্তী অঞ্চলগুলি একে একে স্বাধীন হইয়া গেল। ক্রমে দিল্লীর নিকট-বর্তী অযোধ্যা, এমন কি দিল্লীর উপকণ্ঠে জাঠগণও স্বাধীনতা ঘোষণা করিল।

হায়দরাবাদ (Hyderabad): হায়দরাবাদ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মীর কামার-উদ্দিন। ইনি নিজাম-উল্‌-মুল্‌ক নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। ঔরংজেবের রাজত্বকালে তাঁহার পিতামহ খাজা আবিদশেখ্‌-উল্‌-ইস্‌লাম ও পিতা গাজী-উদ্দিন ফিরুজ জঙ্‌ বোখারা হইতে ভারতবর্ষে আসেন এবং ঔরংজেবের অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন। মীর কামার-উদ্দিনও অল্পবয়সেই মোগল সেনাবাহিনীতে কার্য গ্রহণ করেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই তিনি নিজ ক্ষমতার পরিচয় দিয়া দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তার পদে উন্নীত হন এবং 'চীন-কিলিচ খাঁ' উপাধিতে ভূষিত হন। ঔরংজেবের মৃত্যুর পর সম্রাট

নিজাম-উল্‌-মুল্‌কের পরিচয়

বাহাদুর শাহ্ তাঁহাকে দাক্ষিণাত্য হইতে অযোধ্যার শাসনকর্তা হিসাবে বদলি করেন। তারপর কয়েক বৎসর দাক্ষিণাত্য, অযোধ্যা, মুরাদাবাদ, মালব প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানের শাসনকর্তা হিসাবে কাজ করিয়া তিনি সম্রাট মোহম্মদ শাহের ওয়াজীর বা প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই দিল্লী দরবারের অভিজাতবর্গের ষড়যন্ত্র ও স্বার্থ-দ্বন্দ্বে অতিষ্ঠ হইয়া নিজাম-উল্-মুল্ক পুনরায় দাক্ষিণাত্যে ফিরিয়া গেলেন এবং একপ্রকার স্বাধীনভাবেই শাসনকার্য চালাইতে লাগিলেন। তিনি অবশ্য মুখে মোগল সম্রাটের প্রভুত্ব স্বীকারে ত্রুটি করিলেন না। এদিকে সম্রাট মোহম্মদ শাহ্ তাঁহার সভাসদগণের প্ররোচনায় নিজাম-উল্-মুল্কের বিরুদ্ধে হায়দরাবাদের শাসনকর্তা মুবারিজ খাঁকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে আদেশ দিলেন। মুবারিজ খাঁ নিজাম-উল্-মুল্কের হস্তে পরাজিত ও নিহত হইলে (১৭২৪) মোহম্মদ শাহ্ বাধ্য হইয়াই নিজাম-উল্-মুল্কের দাক্ষিণাত্যের একপ্রকার স্বাধীন শাসনকর্তা হিসাবেই স্বীকার করিয়া লইলেন। ইহা ভিন্ন তিনি নিজাম-উল্-মুল্ককে 'আসফ্-জা' উপাধিতে ভূষিত করিলেন। এইভাবে ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে স্বাধীন হায়দরাবাদ রাজ্যের গোড়াপত্তন হইল। ইহার পর আরও দীর্ঘ চব্বিশ বৎসর দক্ষতার সহিত শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে আসফ্-জার মৃত্যু ঘটে।

নিজাম-উল্-মুল্কের স্বাধীনতা

স্বাধীন হায়দরাবাদ রাজ্যের গোড়াপত্তন (১৭২৪)

বাংলাদেশ (Bengal): সমগ্র মুসলমান যুগ ধরিয়াই বাংলাদেশে কেন্দ্রীয় শাসন অমান্য করিয়া চলিবার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। আকবরের আমল হইতে ঔরংজেবের শাসনকাল পর্যন্ত বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় শাসন মানিয়া চলিয়াছিল বটে, কিন্তু ১৭০৫ খ্রীষ্টাব্দে ঔরংজেব কর্তৃক মুর্শিদ কুলী খাঁ বাংলা সুবার শাসনকর্তা নিযুক্ত হওয়ার সময় হইতেই বাংলার স্বাধীনতার সূত্রপাত হয়।

মুর্শিদ কুলী খাঁ

মুর্শিদ কুলী খাঁ বাংলাদেশের স্বার্থরক্ষার জন্য সর্বদা চেষ্টিত ছিলেন। ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট ফারুক্‌শিয়ার ইংরেজ বণিকগণকে বাংলাদেশে বিনা-শুল্কে আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য পরিচালনার অধিকার দিয়াছিলেন। মুর্শিদ কুলী খাঁ বাংলা-দেশের প্রজাবর্গের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিয়া ইংরেজগণকে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিতে

তাঁহার স্বাধীন ও প্রজাহিতৈষী মনোবৃত্তি

দিতে অস্বীকার করেন। তিনি সম্রাট ফারুকশিয়ারের 'ফারমান' অগ্রাহ্য করিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন নাই।

মুর্শিদ কুলী খাঁর মৃত্যুর পর তাঁহার জামাতা সুজা-উদ্দিন খাঁ বাংলার শাসনভার গ্রহণ করেন (১৭২৭)। তিনি বিহার সুবা জয় করিয়া বাংলার সহিত যুক্ত করেন (১৭৩৩) এবং আলীবর্দী খাঁকে বিহারের নায়েব-নাজিম পদে নিযুক্ত করেন। সুজা-উদ্দিনের পর তাঁহার পুত্র সর্‌ফরাজ খাঁ বাংলার নবাব হইলেন (১৭৩৯)। কিন্তু পর বৎসর (১৭৪০) বিহারের নায়েব নাজিম (Deputy Governor) সর্‌ফরাজ খাঁকে পরাজিত ও নিহত করিয়া স্বয়ং বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব হইলেন।

সুজা-উদ্দিন: বিহার জয় (১৭৩৩)

সর্‌ফরাজ খাঁ

আলীবর্দী একাধারে সুদক্ষ শাসক, সমরকুশল সেনাপতি ও দূরদর্শী রাজনীতিক ছিলেন। তিনি ইংরেজ বণিকদের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং তাহাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। অবশ্য তিনি তাহাদের প্রতি অন্যায়মূলক কোন ব্যবহার করেন নাই। তাঁহার আমলে মারাঠাগণ বারবার বাংলাদেশ আক্রমণ করিতে আরম্ভ করে। শেষ পর্যন্ত ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে আলীবর্দী বৎসরে বার লক্ষ টাকা 'চৌথ' দানে স্বীকৃত হইয়া মারাঠা আক্রমণ হইতে নিস্তার পাইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন উড়িষ্যার একাংশের বাৎসরিক রাজস্বও মারাঠাগণকে দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন।

আলীবর্দী খাঁ (১৭৪০)

১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে আলীবর্দীর মৃত্যুর পর তাঁহার দৌহিত্র সিরাজ-উদ্-দৌলা বাংলার মস্‌নদে অধিষ্ঠিত হন। তাঁহার মস্‌নদ লাভের এক বৎসরের মধ্যেই পলাশীর যুদ্ধে বাংলা তথা ভারত-ইতিহাসের এক পটপরিবর্তন ঘটে।

সিরাজ-উদ্-দৌলা (১৭৫৬—৫৭)

অযোধ্যা (Oudh)ঃ বর্তমান অযোধ্যা, এলাহাবাদ ও কানপুরের একাংশ এবং বাণারস লইয়া মোগল যুগে অযোধ্যা সুবা গঠিত ছিল। অযোধ্যা রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সাদাত খাঁ। ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র সফ্‌দর জঙ্‌ অযোধ্যার শাসনকর্তাপদ লাভ করেন। তিনি দিল্লীর সম্রাটের ওয়াজীর অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে

সাদাত খাঁ, সফ্‌দর জঙ্‌ ও সুজা-উদ্-দৌলা

তাঁহার পুত্র সুজা-উদ্-দোলা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই অযোধ্যায় শাসনকার্য চালাইতে থাকেন। তিনি সম্রাট শাহ্ আলমের ওয়াজীর পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি মীর কাশিমের পক্ষে যোগদান করিয়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে বক্সারের যুদ্ধে (১৭৬৪) অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু এই যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয়ের পর তিনি ইংরেজদের আশ্রিত হইয়া পড়েন।

ইংরেজ হস্তে সুজা-উদ্-দোলার পরাজয় (১৭৬৪)

জাঠ শক্তির উত্থান (Rise of the Jats) ঃ দিল্লী এবং আগ্রার মধ্যবর্তী অঞ্চলে জাঠ নামক এক সমরকুশলী, অধ্যবসায়ী এবং দুঃসাহসী জাতির বসবাস ছিল। ঔরংজেবের রাজত্বকালের শেষভাগে জাঠগণ শক্তিশালী হইয়া উঠে এবং ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে গোকুলা নামক নেতার অধীনে মোগল সাম্রাজ্যের আনুগত্য অস্বীকার করে। রাজারাম, ভজু, চূড়ামন প্রভৃতি নেতৃগণের অধীনে জাঠগণ দিল্লী ও আগ্রার উপকণ্ঠে হানা দিতে শুরু করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জাঠগণ সংঘবদ্ধ জাতি হিসাবে সংগঠিত হয়। চূড়ামনের ভ্রাতুষ্পুত্র বদন সিংহের অক্লান্ত চেষ্টা, অপরিসীম অধ্যবসায় ও বীরত্বে মথুরা ও আগ্রা জেলার সকল স্থান জাঠগণ কর্তৃক অধিকৃত হয়। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বদন সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার পোষ্যপুত্র সুরজমলের নেতৃত্বে জাঠগণ এক বিশাল রাজ্য গঠন করিতে সক্ষম হয়। রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, জটিল সমস্যা সমাধানের অসাধারণ ক্ষমতার বলে সুরজমল জাঠ জাতিকে এক বিশাল স্বাধীন রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছিলেন। তিনি এটোয়া, হাতরস, রোটক, মীরাট, গুরগাঁও, মেওয়াট, মৈনপুর, রেওয়ারী, মথুরা, আগ্রা, ঢোলপুর প্রভৃতি স্থান জাঠরাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে জাঠ-নেতা সুরজমলের মৃত্যু হয়।

জাঠ জাতির অভ্যুত্থান

বদন সিংহ

সুরজমল

রাজপুত জাতি (The Rajputs) ; ঔরংজেবের ধর্মান্ধ অত্যাচারী নীতির ফলে রাজপুত জাতি মোগল সাম্রাজ্যের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শত্রুতে পরিণত হইয়াছিল। মেবার (উদয়পুর), মাড়বার (যোধপুর) এবং অম্বর (জয়পুর) ঔরংজেবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মোগল সাম্রাজ্য হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন হইবার চেষ্টা শুরু করে। কিন্তু মেবারের রাণা রাজসিংহের মৃত্যুর পর

রাজপুত জাতির নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন মাড়বারের অজিত সিংহ এবং অম্বরের দ্বিতীয় জয়সিংহ। সম্রাট বাহাদুর শাহ্ অবশ্য সাময়িকভাবে রাজপুতগণকে তাঁহার আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই রাজপুতগণ তাঁহার বিরোধিতা শুরু করিল। সম্রাট বাহাদুর শাহ্ শিখ অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে মোগল-রাজপুত মৈত্রীর প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া রাজপুত জাতির প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার শুরু করিলেন। রাজপুতগণের স্বাধীনতা একপ্রকার স্বীকার করিয়া লইয়া তিনি তাহাদের বিরোধিতা হইতে রক্ষা পাইলেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর মাড়বারের অজিত সিংহ মোগল সাম্রাজ্য আক্রমণ করিলেন। সৈয়দ-ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে হুসেন আলী অজিত সিংহকে দমন করিতে সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। অজিত সিংহ ও হুসেন আলীর মধ্যে বিনা যুদ্ধেই এক সন্ধি স্থাপিত হইল। অজিত সিংহ নিজ কন্যাকে মোগল সম্রাটের সহিত বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইলেন। ফলে, তিনি মোগলদের বিশ্বস্ত বন্ধুতে পরিণত হইলেন এবং তাঁহাকে আজমীর ও গুজরাটের শাসনকর্তাপদে নিযুক্ত করা হইল। অম্বরের দ্বিতীয় জয়সিংহও মোগল সম্রাটের অধীনে কার্য গ্রহণ করিলেন। দিল্লীর প্রায় উপকণ্ঠ হইতে সুরাট পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগ রাজপুত শাসনাধীনে স্থাপিত হইল। ইহা ভিন্ন অন্যান্য রাজপুত রাজ্যগুলি মোগল সাম্রাজ্য হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন হইয়া গেল। কিন্তু রাজপুত জাতি আত্মকলহে লিপ্ত হইয়া ক্রমে নিজ শৌর্য ও স্বাধীন চেতনা হারাইয়া একে একে মোগল শক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করিতে লাগিল। ঐক্যবোধ এবং স্বাধীনচেতা রাজপুত বীরের অভাবহেতু রাজপুত গৌরব লুপ্তপ্রায় হইল। রাজপুত প্রাধান্য ও স্বাধীনতার আশা ক্রমে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হইল।

রাজপুত জাতি পুনঃ-সঞ্জীবিত

রাজপুত প্রাধান্য

রাজপুতগণের আত্ম-কলহ ও শক্তিহীনতা

শিখ শক্তির উত্থান (Rise of the Sikhs): ১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দে শিখগুরু গোবিন্দ সিংহ জনৈক আফগান আততায়ীর হস্তে প্রাণ হারাইলে শিখগণ বান্দা নামে একজন নেতার অধীনে সংঘবদ্ধ হইয়া উঠে। শিরহিন্দের ফৌজদার ওয়াজীর খাঁ গুরুগোবিন্দের শিশুপুত্রদের হত্যা করিয়াছিলেন। ইহার প্রতিশোধ গ্রহণের

বান্দা

উদ্দেশ্যে বান্দা ওয়াজীর খাঁকে হত্যা করিয়া শিরহিন্দ অধিকার করেন। অল্পকালের মধ্যেই শতদ্রু ও যমুনা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলও তাঁহার অধিকার-ভুক্ত হয়। বান্দা এক শক্তিশালী ও স্বাধীন শিখরাজ্য গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে মুখ্‌লীসপুরে লৌহগড় নামে একটি দুর্গ স্থাপন করেন। মোগলবাহিনী লৌহগড় আক্রমণ করিলে বান্দা তাঁহার অনুচরবর্গ লইয়া লাহোরের উত্তরে পার্বত্য অঞ্চলে পলায়ন করেন। কিন্তু ইহার অল্পকাল পরই সম্রাট বাহাদুর শাহের মৃত্যু হইলে বান্দা লৌহগড় দুর্গটি পুনরধিকার করিতে সমর্থ হন। কিন্তু ১৭১৫ খ্রীষ্টাব্দে বান্দা গুরুদাসপুর দুর্গে মোগলবাহিনী কর্তৃক অবরুদ্ধ হন। আপ্রাণ যুদ্ধ করিয়াও শিখগণ পরাজিত হইলে বান্দা মোগলসৈন্যের হস্তে বন্দী হন। বান্দা ও তাঁহার প্রধান অনুচরগণকে বন্দী অবস্থায় দিল্লীতে প্রেরণ করা হইলে প্রথমে তাঁহার চক্ষের সম্মুখে তাঁহার পুত্রকে বর্বরোচিত অত্যাচার করিয়া হত্যা করা হয়। পরে তাঁহাকেও হাতীর পায়ের তলায় নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করা হয়।

বান্দা ও তাঁহার পুত্রের নৃশংস হত্যা

এইভাবে নেতৃহীন হইলেও শিখজাতি গুরু গোবিন্দের শিক্ষা ভুলিল না। নাদির শাহের আক্রমণের ফলে পাঞ্জাবে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে সেই সুযোগে শিখগণ পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করিল। ইহার অল্পকাল পরে আহ্‌মদ শাহ্‌ আব্‌দালী বা দুর‍্রাণীর আক্রমণের সুযোগে শিখ জাতি অধিকতর শক্তিশালী হইয়া উঠিল। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে (১৭৬১) জয়ী হইলেও আহ্‌মদ শাহ্‌ আব্‌দালী কতক পরিমাণে হৃতবল হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষ হইতে ফিরিবার পথে শিখদের আক্রমণে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। ইহার পর আহ্‌মদ শাহ্‌ আব্‌দালী আরও কয়েকবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলে শিখগণ তাঁহাকে বাধা দিতে ত্রুটি করে নাই। এইভাবে ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে আহ্‌মদ শাহের শেষ অভিযানের পর শিখগণ সমগ্র পাঞ্জাব লইয়া এক স্বাধীনরাজ্য গঠন করে।

স্বাধীন শিখ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা

মারাঠা শক্তির পুনরভ্যুদয় (Revival of the Maratha Power): মোগল সাম্রাজ্যের পতনোন্মুখতার সুযোগে যে সকল হিন্দুরাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, সেগুলির মধ্যে মারাঠারাজ্যের অভ্যুত্থান-ই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। মারাঠা রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ছত্রপতি শিবাজী। ঔরংজেব শিবাজীর পুত্র শম্ভুজীকে হত্যা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার শিশুপুত্র

শাহুকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ঔরংজেবের মৃত্যুর পর কয়েক বৎসর মারাঠাগণ আত্মকলহে লিপ্ত থাকায় মারাঠা জাতি শক্তিবৃদ্ধির কোন চেষ্টা করে নাই। কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাহারা পুনরায় সংঘবদ্ধ হইয়া মোগল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে হানা দিতে শুরু করে। এমন সময় আজম্ শাহ্ জুল্‌ফিকার খাঁর পরামর্শক্রমে শাহু বা দ্বিতীয় শিবাজীকে বন্দিদশা হইতে মুক্তি দিলেন। এই মুক্তিদানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মারাঠাজাতির মধ্যে আত্মকলহের সৃষ্টি করা। ঐ সময়ে রাজারামের বিধবা পত্নী তারাবাঈ নিজ নাবালক পুত্রের প্রতিনিধি হিসাবে শাসনকার্য পরিচালনা করিতেছিলেন। শাহুকে মুক্তি দিলে মারাঠা রাজ্যের অধিকার লইয়া গোলযোগ সৃষ্টি হইবে এই কথা উপলব্ধি করিয়াই জুল্‌ফিকার খাঁ শাহুকে মুক্তিদানের পরামর্শ দিয়াছিলেন। ফলেও হইল তাহা-ই। শাহু বা দ্বিতীয় শিবাজী স্বদেশে ফিরিয়া গেলে তারাবাঈ শাহুর দাবি অস্বীকার করিলেন। ফলে, মারাঠাদের মধ্যে এক অন্তর্দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হইল। শেষ পর্যন্ত শাহু আংশিকভাবে সাফল্য লাভ করিয়া সাতারা দুর্গে নিজ অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। ফলে, মারাঠা রাজ্য তারাবাঈ-এর পুত্র ও শাহুর মধ্যে বিভক্ত হইয়া গেল। এই সময়ে তারাবাঈ-এর পুত্রের মৃত্যু ঘটিলে রাজারামের অন্যতমা পত্নী রাজস্ বাঈ তাঁহার পুত্র শম্ভুজীকে ঐ সিংহাসনে স্থাপন করিয়া নিজে পুত্রের পক্ষে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে শাহুর রাজ্যেও নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল। সেই সময়ে শাহু কোঙ্কণের বালাজী বিশ্বনাথ নামে জনৈক দূরদর্শী, শক্তিমান চিৎপাবন ব্রাহ্মণের সহযোগিতালাভে সমর্থ হইলেন। বালাজী বিশ্বনাথ ছিলেন অনন্যসাধারণ রাজনীতিজ্ঞানসম্পন্ন দূরদর্শী নেতা। তাঁহার সুদক্ষ পরিচালনায় বিচ্ছিন্ন এবং আত্মকলহে লিপ্ত মারাঠাজাতি পুনরায় সংঘবদ্ধ ও শক্তিশালী হইয়া উঠিল।

মারাঠা জাতির আত্মকলহ: তারাবাঈ ও শাহু বা দ্বিতীয় শিবাজী

সাতারা দুর্গে শাহুর রাজ্যাভিষেক

বালাজী বিশ্বনাথ

বালাজী বিশ্বনাথ এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দে শাহু বা দ্বিতীয় শিবাজীর সেনাপতি ধনাজী যাদব কর্তৃক সামান্য 'কারকুন' অর্থাৎ রাজস্ব বিভাগের

কেরাণী হিসাবে নিযুক্ত হন। ধনাজীর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র চন্দ্রসেন যাদব বালাজী বিশ্বনাথকে 'সেনাকর্তা' অর্থাৎ সেনাবাহিনীর সংগঠক হিসাবে নিযুক্ত করেন। এই কার্যে নিযুক্ত হইয়াই বালাজী বিশ্বনাথ নিজ প্রতিভার পরিচয় দিবার সুযোগ পাইলেন। ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'পেশওয়া' বা প্রধান মন্ত্রিপদে নিযুক্ত হইলেন। বালাজী বিশ্বনাথ নিজ প্রতিভা এবং কর্তব্যনিষ্ঠা দ্বারা শীঘ্রই মারাঠা রাজ্যের সর্বেসর্বা হইয়া উঠিলেন। 'ছত্রপতি' বা রাজা পেশওয়ার উপর শুধু নামেমাত্রই অধিষ্ঠিত রহিলেন। বালাজী বিশ্বনাথের আমল হইতে 'পেশওয়াতন্ত্রের' সৃষ্টি হইল।

পেশওয়াতন্ত্রের সৃষ্টি

বালাজী বিশ্বনাথের নেতৃত্বে মারাঠাগণ ধ্বংসোন্মুখ মোগল সাম্রাজ্যের কতকাংশ দখল করিতে সমর্থ হইল। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও বালাজী বিশ্বনাথ মারাঠাজাতিকে সংঘবদ্ধ করিতে সক্ষম হইলেন। মোগল সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে বালাজী সৈয়দ-ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে হুসেন আলীর নিকট হইতে দাক্ষিণাত্যের মোগল সুবাগুলির ছয়টি হইতে 'চৌথ' ও 'সরদেশমুখী' আদায় করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইলেন (১৭১৪)। হুসেন আলীর উদ্দেশ্য ছিল কোনপ্রকারে মারাঠাদিগের মিত্রতা অর্জন করা। ইহা ভিন্ন শিবাজীর রাজ্যের যে সকল অংশ মোগলগণ কর্তৃক বিজিত হইয়াছিল সেগুলিও তিনি মারাঠাদিগকে ফিরাইয়া দিলেন। বেরার, খান্দেশ, গণ্ডোয়ানা প্রভৃতি রাজ্য যেগুলি মারাঠাগণ জয় করিয়াছিল তাহাও মারাঠা রাজ্যভুক্ত হইবে, একথাও হুসেন আলী কর্তৃক স্বীকৃত হইল। বালাজী অবশ্য প্রয়োজনবোধে পনর হাজার অশ্বারোহী সৈন্য দ্বারা মোগল সম্রাটকে সাহায্য করিতে এবং দশ লক্ষ টাকা বাৎসরিক কর হিসাবে দিতে রাজী হইলেন। মোগল সম্রাটের প্রভুত্ব স্বীকার করা মারাঠাদের আদর্শ ও নীতিবিরুদ্ধ ছিল বটে, তথাপি এইরূপ নামেমাত্র মোগল প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া দাক্ষিণাত্যে মারাঠাগণ যে শক্তি ও প্রতিপত্তির অধিকারী হইয়াছিল তাহা মারাঠা সাম্রাজ্যের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা সন্দেহ নাই। সেই সূত্রেই বালাজী বিশ্বনাথ সৈয়দ-ভ্রাতৃদ্বয়ের বিরোধী দলকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে যখন হুসেন আলীর সহিত সসৈন্যে দিল্লী প্রবেশ করিলেন তখন হইতে মারাঠাগণও দিল্লীর রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করিতে

বালাজী ও হুসেন আলীর সন্ধি (১৭১৪)

লাগিল। মারাঠাদের সাহায্যেই সৈয়দ-ভ্রাতৃদ্বয় সম্রাট ফারুকশিয়ারকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া শাহ্ আলমকে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। হুসেন আলী বালাজী বিশ্বনাথের সহিত যে চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিলেন শাহ্ আলম সেই চুক্তির শর্তগুলি মানিয়া লইলেন। এইভাবে বালাজী বিশ্বনাথের আমলে মারাঠাগণ এক দুর্ধর্ষ শক্তিতে পরিণত হইল।

মারাঠাগণ কর্তৃক দিল্লীর রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ

বালাজী বিশ্বনাথ স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি ছিলেন এইরূপ মনে করা ভুল হইবে। অন্তর্দ্বন্দ্বে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত মারাঠা জাতিকে সংঘবদ্ধ করিয়া তিনি তাহাদের মধ্যে এক নব চেতনা ও প্রাণশক্তির সঞ্চার করিয়াছিলেন। তিনি মারাঠা রাজস্ব নীতির সংস্কার সাধন করিয়া তাহাদিগকে অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রেও ঐক্যবদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি চৌথ ও সরদেশমুখী আদায় ও বণ্টনের নূতন ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সারদেশমুখী হিসাবে আদায়িকৃত রাজস্বের সবই রাজা পাইতেন ; চৌথেরও শতকরা পঁচিশ ভাগ তাঁহাকে দেওয়া হইত। অবশিষ্ট ৭৫ ভাগের মধ্যে মোট নয় ভাগ রাজা নিজ ইচ্ছামত যে-কোন অনুচর বা রাজকর্মচারীকে দান করিতে পারিতেন। ইহার পর যাহা অবশিষ্ট থাকিত তাহা মারাঠা দলপতিগণ নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইতেন। এইভাবে রাজস্বের অংশ মারাঠা দলপতিগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া লইবার ব্যবস্থা করিয়া বালাজী বিশ্বনাথ তাঁহাদের মধ্যে ঐক্যবোধ আরও বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইলেন। চৌথ ও সরদেশমুখী আদায়ের ব্যাপারে বালাজী বিশ্বনাথ রাজা টোডরমলের নীতির অনুসরণ করিয়াছিলেন।

বালাজী বিশ্বনাথ কর্তৃক মারাঠা রাজস্ব নীতির সংস্কার

মারাঠা শক্তিকে পুনঃসঞ্জীবিত করিয়া ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে বালাজী বিশ্বনাথ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বাজীরাও পেশওয়া-পদ গ্রহণ করিলেন।

বালাজী বিশ্বনাথের মৃত্যু (১৭২০)

সামরিক কৌশল, রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি এবং অক্লান্ত কর্মনিষ্ঠায় বাজীরাও তাঁহার পিতার অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ছিলেন। পতনোন্মুখ মোগল সাম্রাজ্যের উপর আঘাত হানিয়া তিনি কৃষ্ণা হইতে সিন্ধুনদী পর্যন্ত বিশাল ভূভাগে এক ঐক্য-বদ্ধ হিন্দু সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিবার স্বপ্ন দেখিতেন। সমগ্র ভারতের হিন্দু

জাতির মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগাইবার উদ্দেশ্যে এবং হিন্দু দলপতিগণকে একই আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ করিবার জন্য বাজীরাও তাঁহার 'হিন্দু-পাদ-পাদশাহী' বা হিন্দু সাম্রাজ্য গঠনের পরিকল্পনা সকলের সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন। ১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মালব আক্রমণ করিলে ঐ অঞ্চলের হিন্দু দলপতিগণ তাঁহাকে নানাভাবে সাহায্য করেন। তিনি ক্রমে মালব, গুজরাট ও বুন্দেলখণ্ডের একাংশ জয় করিতে সমর্থ হন। তারপর কর্ণাট জয় করিবার উদ্দেশ্যে এক অভিযান প্রেরণ করিয়া তিনি সেই অঞ্চল হইতেও কর আদায় করিতেও সমর্থ হইয়াছিলেন।

বাজীরাও-এর চরিত্র ও 'হিন্দু-পাদ-পাদশাহী' আদর্শ

বাজীরাও জয়পুরের 'সওয়াই' অর্থাৎ দ্বিতীয় জয়সিংহ এবং বুন্দেলারাজ ছত্রশালের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া মারাঠা শক্তিকে দৃঢ়তর করিয়া তোলেন। তিনি গঙ্গা-যমুনার দোয়াব অঞ্চল বারবার আক্রমণ করেন এবং ক্রমে দিল্লীর উপকণ্ঠে উপস্থিত হন। মোগল সম্রাট মোহম্মদ শাহ্ ইহাতে ভীত হইয়া হায়দরাবাদের নিজামকে বাজীরাও-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার জন্য অনুরোধ জানান। ভুপালের নিকট নিজাম ও বাজীরাও-এর মধ্যে এক যুদ্ধ ঘটে (১৭৩৮)। নিজাম পরাজিত হইয়া নর্মদা ও চম্বল নদীর মধ্যবর্তী যাবতীয় স্থান বাজীরাও-এর নিকট ত্যাগ করেন এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসাবে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হন। পর বৎসর (১৭৩৯) বাজীরাও-এর ভ্রাতা চিমনূজী আপ্পারাও-এর অধীনে এক মারাঠাবাহিনী পোর্তুগীজগণকে পরাজিত করিয়া সল্‌সেট ও বেসিন দখল করে। সেই সময়ে নাদির শাহের ভারত-আক্রমণের সংবাদ তাঁহার নিকট পৌঁছিলে তিনি নাদির শাহ্‌কে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তিনি প্রতিবেশী মুসলমান রাজ্যগুলির সহিত শান্তি স্থাপন করিয়া বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু প্রস্তুত হইবার পূর্বেই আকস্মিকভাবে মাত্র ৪২ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইল (১৭৪০)।

মারাঠা রাজ্যের প্রসার

বাজীরাও-এর মৃত্যু (১৭৪০)

বাজীরাও মারাঠা শক্তিকে সঞ্জীবিত করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। বস্তুতপক্ষে তিনি ছিলেন মারাঠা রাষ্ট্রের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু মারাঠা রাজ্য তথাপি সুসংহত ও সুবিন্যস্ত রাষ্ট্র হিসাবে গড়িয়া উঠিতে

পারে নাই। রাজারামের আমলে জায়গীর প্রথার পুনঃ-প্রবর্তনের ফলে কয়েকটি শাসক পরিবারের উত্থান ঘটিয়াছিল। বেরারের ভোঁসলা, বরোদার গাইকোয়াড়, গোয়ালিওরের সিন্ধিয়া, ইন্দোরের হোলকার এবং ধার নামক স্থানে পবার—এই পাঁচটি পরিবারের অধীনে পাঁচটি রাজ্য গড়িয়া উঠে। এই রাজ্য পাঁচটি মুখে পেশওয়ার অধীন ছিল বটে, কিন্তু সর্বদাই নিজেদের মধ্যে স্বার্থদ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকিত। এই রাজ্যগুলির উত্থানেই মারাঠা শক্তির পতন ঘটিয়াছিল।

আপাতদৃষ্টিতে সঞ্জীবিত মারাঠা শক্তির আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা

ভোঁসলা, গাইকোয়াড়, সিন্ধিয়া, হোলকার ও পবার রাজ্য গঠন

বাজীরাও-এর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বালাজী বাজীরাও পেশওয়া-পদ লাভ করেন। ইনি নানা সাহেব নামেও পরিচিত। ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে শাহুর মৃত্যু ঘটে। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে তিনি উইল করিয়া পেশওয়ার হস্তে মারাঠা রাষ্ট্রের সর্বাত্মক ক্ষমতা দান করিয়া গিয়াছিলেন। অবশ্য শিবাজীর বংশধরগণকে রাজপদে অধিষ্ঠিত রাখিবার শর্তও এই উইলে লিপিবদ্ধ ছিল। তারাবাঈ ও গাইকোয়াড় এই উইল অগ্রাহ্য করিয়া সাময়িকভাবে বালাজী বাজীরাওয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু বালাজী বাজীরাও এই বিদ্রোহ দমন করিয়া মারাঠা রাষ্ট্রে পেশওয়ার প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন।

বালাজী বাজীরাও-এর পেশওয়া-পদ লাভ

বালাজী তাঁহার পিতার ন্যায়ই সাম্রাজ্যবাদী ছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার পিতার অনুসৃত নীতি ত্যাগ করিয়া মারাঠাবাহিনীতে অ-হিন্দু সৈনিক গ্রহণ করিতে শুরু করেন। ফলে, মারাঠাবাহিনীর জাতীয়তাবোধ হ্রাস পাইতে থাকে। ইহা ভিন্ন তিনি তাঁহার পিতার 'হিন্দু-পাদ-পাদশাহী' আদর্শ ত্যাগ করিয়া হিন্দু রাজগণের বিরুদ্ধেও যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এই নূতন নীতির ফলে আপাতদৃষ্টিতে কোন কুফল পরিলক্ষিত না হইলেও ক্রমে এই সকল কারণেই মারাঠা সংহতি বিনষ্ট হইয়াছিল।

'হিন্দু-পাদ-পাদশাহী' আদর্শ ত্যাগ

বালাজী বাজীরাও পিতার নীতির অনুসরণ করিয়া মারাঠা রাজ্যের সীমা বিস্তার করেন। তাঁহার আমলে মারাঠা শক্তি ও মর্যাদা চরমে পৌঁছিয়া-

ছিল, এমন কি দিল্লীর সম্রাট শাহ্ আলম বালাজী বাজীরাও-এর হাতের পুতুলে পরিণত হইয়াছিলেন। তিনি উদ্গীর নামক স্থানে নিজামকে পরাজিত করিয়া এবং বিজাপুর, দৌলতাবাদ, অসীরগড় প্রভৃতি স্থান অধিকার করিয়া মারাঠাজাতিকে এক অপ্রতিহত শক্তিতে পরিণত করিয়াছিলেন। কিন্তু এই প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি অধিককাল স্থায়ী হইল না। মারাঠাগণ পাঞ্জাব অধিকার করিলে আহ্‌ম্মদ শাহ্ আব্‌দালীর সহিত তাহাদের সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া উঠিল। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে পানিপথের প্রান্তরে আহ্‌ম্মদ শাহ্ আব্‌দালীর সহিত মারাঠাগণের এক যুদ্ধ হইল। ইহা পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ নামে খ্যাত। অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ্-দৌলা, রুহেলা দলপতি নজিব খাঁও মারাঠা পক্ষে যোগদান করিয়াছিলেন। কিন্তু এই যুদ্ধে আব্‌দালীর সমরকুশলী সেনাবাহিনীর হস্তে মারাঠাগণের শোচনীয় পরাজয় ঘটিল। মারাঠা পক্ষের বহু সেনাপতি ও অগণিত সৈনিক যুদ্ধে নিহত হইল। বালাজী বাজীরাও পূর্ব হইতেই অসুস্থ ছিলেন, যুদ্ধে মারাঠাবাহিনীর শোচনীয় পরাজয়ের সংবাদ পাইয়াই তাঁহার মৃত্যু হইল (১৭৬১)।

বালাজী বাজীরাও-এর অধীনে মারাঠা শক্তির চরম বিকাশ

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ—মারাঠা শক্তির পরাজয় (১৭৬১)

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে পরাজয়ের পর আর মারাঠা শক্তিকে পুনঃসঞ্জীবিত করা সম্ভব হইল না। এই যুদ্ধে পরাজিত হইবার ফলে মারাঠা সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটিল। মারাঠা শক্তিসংঘ অর্থাৎ পেশওয়ার অধীনে গাইকোয়াড়, সিন্ধিয়া, হোলকার, ভোঁসলে প্রভৃতি লইয়া যে মারাঠা-রাষ্ট্র গঠিত ছিল উহা ক্রমেই বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। মারাঠা শক্তির পতনের ফলে পাঞ্জাবে শিখদের অভ্যুত্থান সহজ হইল। তথাপি পানিপথের যুদ্ধের পরে আংশিকভাবে মারাঠা শক্তি পুনর্গঠিত হইলেও উদীয়মান ব্রিটিশ শক্তিকে প্রতিহত করিবার মত শক্তি আর তাহারা সঞ্চয় করিতে পারিল না। সুতরাং পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের ফলে ইংরেজগণের ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য গঠনের সুযোগ বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল। ব্রিটিশ শক্তিকে বাধা দিবার মত কোন শক্তি আর ভারতবর্ষে রহিল না।

তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধের ফলাফল

বালাজী বাজীরাও-এর মৃত্যুর (১৭৬১) পর তাঁহার সপ্তদশবর্ষীয় তরুণ

পুত্র মাধবরাও পেশওয়া হইলেন। তিনি অসাধারণ রাজনৈতিক এবং সামরিক প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার নেতৃত্বে মারাঠাগণ তাহাদের হৃতগৌরব কতকাংশে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে মাধবরাও-এর মৃত্যু হইলে মারাঠা শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করিবার আর কেহ রহিল না।

পেশওয়া প্রথম মাধব রাও

পঞ্চদশ অধ্যায়

মোগল আমলে শাসন, সমাজ ও সংস্কৃতি

(Administration, Society & Culture under the Moghuls)

শাসনব্যবস্থা (Administrative System) : বাবর ও হুমায়ুনের আমলে শাসনব্যবস্থা ছিল সুলতানি আমলের শাসনব্যবস্থার অনুসরণ মাত্র। এই দুইজনের কেহই কোন নূতন শাসনব্যবস্থার উদ্ভাবনের অবকাশ পান নাই। মোগল শাসনব্যবস্থা বলিতে যাহা বুঝায় তাহা সম্রাট আকবরের আমলেই রচিত হইয়াছিল। আকবর-প্রবর্তিত শাসনব্যবস্থা মোগল আমলে কার্যকরী ছিল বটে, কিন্তু শাহ্‌জাহানের আমল হইতে আকবরের শাসনব্যবস্থার মূল-নীতির পরিবর্তন ঘটে। আকবরের উদার, সর্ব-ধর্মসহিষ্ণু, জাতীয়তাবাদী নীতির স্থলে ধর্মান্ধ সংকীর্ণ নীতির প্রয়োগের সূত্রপাত শাহ্‌জাহানের আমল হইতেই পরিলক্ষিত হয়। ঔরংজেবের অধীনে ইহা চরমে পৌঁছে এবং মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি শিথিল করিয়া দেয়। (মোগল যুগের শাসনব্যবস্থা ২৬৭-৭৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)।

আকবর—মোগল শাসনব্যবস্থার স্থাপয়িতা

সমাজ জীবন (Social Life) : ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রধানত রাজা ও সম্রাটগণের যুদ্ধ-বিগ্রহের ইতিহাস। অবশ্য মধ্যযুগীয় ইওরোপের ইতিহাসেও এই বৈশিষ্ট্যই পরিলক্ষিত হয়। জনসাধারণ ঐ সময়কার

ঐতিহাসিকদের দৃষ্টির বহির্ভূত ছিল। রাজা, মহারাজা, সুলতান বা সম্রাটের কাহিনী বর্ণনায় জনসাধারণের সম্পর্কে যতটুকু উল্লেখ করা প্রয়োজন হইত উহা ভিন্ন তাহারা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অপাংক্তেয় ছিল। একমাত্র আবুল ফজ্‌ল এবং ইওরোপীয় পর্যটকগণের বর্ণনায় সমসাময়িক জনসমাজ সম্পর্কে কিছু ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়। ইওরোপীয় পর্যটকদের মধ্যে র‍্যাল্‌ফ্‌ ফীচ্‌, উইলিয়াম হকিন্স, সার টমাস রো, ফ্রান্সিকো পেলসার্ট, বার্ণিয়ে, টেভার্নিয়ে, সেভেনো প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

ইতিহাসে জনসাধারণ সম্পর্কে বিবরণের অভাব

সমাজ ছিল সামন্ততান্ত্রিক। অভিজাত শ্রেণী এবং রাজকর্মচারী ভিন্ন অপর কেহই তেমন সম্মানিত ছিল না। অভিজাত সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার মান খুবই উন্নত ছিল। বিলাস-ব্যসন, ব্যভিচার, মদ্যাসক্তি প্রভৃতি অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। সম্রাট ভিন্ন বর্ধিষ্ণু অভিজাতগণেরও 'হারেম' থাকিত। আবুল ফজলের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, সম্রাটের হারেমে পাঁচ হাজার স্ত্রীলোক থাকিত। সে যুগে অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষ, ঈর্ষাপরায়ণতা ও ষড়যন্ত্রপ্রিয়তা অত্যধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজ : অভিজাত শ্রেণী

অভিজাত সম্প্রদায়ের নীচে মধ্যবিত্ত সমাজেরও পরিচয় পাওয়া যায়। তাহাদের সংখ্যা যেমন ছিল অল্প, তাহাদের জীবনযাত্রার মানও ছিল তেমনি সাধারণ। মাদক দ্রব্যাদিতে আসক্তি, ব্যভিচার প্রভৃতি হইতে এই সম্প্রদায় সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। ভারতের পশ্চিম-উপকূলস্থ বণিকগণ অবশ্য অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী ছিল, তাহাদের জীবনযাত্রার মানও ছিল খুব উচ্চ।

মধ্যবিত্ত শ্রেণী

সাধারণ শ্রেণীর লোকের অবস্থা উর্ধ্বতন শ্রেণীর তুলনায় অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। প্রয়োজনীয় শীতবস্ত্র, জুতা প্রভৃতি তাহাদের ক্রয়ক্ষমতা-বহির্ভূত ছিল। তাহাদের খাদ্য-দ্রব্যাদিও ছিল অতি সাধারণ। পেল্‌সার্ট (Francisco Palsaert)-এর্‌ বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, সাধারণ অবস্থায় তাহাদের খাওয়া-পরার কোন অসুবিধা না থাকিলেও দুর্ভিক্ষ বা কোনপ্রকার প্রাকৃতিক দুর্বিপাক দেখা দিলে তাহাদের দুর্দশার সীমা থাকিত না।

সাধারণ শ্রেণী

বিদেশী পর্যটক পেল্‌সার্ট ভারতবর্ষে দীর্ঘ সাত বৎসর কাটাইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা হইতে তদানীন্তন সমাজ সম্পর্কে যে বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় যে, ঐ সময়ে তিন শ্রেণীর লোক ছিল যাহারা নামেমাত্রই স্বাধীন প্রজা বলিয়া বিবেচিত হইত। বস্তুত তাহাদের অবস্থা ক্রীতদাস অপেক্ষা কোন অংশে উন্নত ছিল না। এই তিন শ্রেণী হইল : শ্রমিকশ্রেণী, দোকানদারশ্রেণী এবং বেয়ারা বা চাকর শ্রেণী। সেই সময়ে ক্রীতদাস প্রথার প্রচলন ছিল এবং খোজা ও ক্রীতদাস ক্রয়-বিক্রয় নির্বিবাদে চলিত।

নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী সম্পর্কে পেল্‌সার্টের বর্ণনা

দেশের সাধারণ লোকের অবস্থা মোটেই সন্তোষজনক ছিল না, একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহারা মাটির ঘরে বাস করিত এবং তাহাদের উপর নানাপ্রকার জুলুম চলিত। শাহ্‌জাহানের আমল হইতে সাধারণ শ্রেণী, বিশেষত কৃষকদের উপর নানাপ্রকার অত্যাচার শুরু হয়। ফলে, তাহাদের অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইয়া উঠে। প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ নানাভাবে কৃষক সম্প্রদায়ের নিকট হইতে অর্থ আদায় করিতেন।

সাধারণ শ্রেণীর দুরবস্থা

অমিতাচার, ব্যভিচার প্রভৃতি দোষ ধনীসম্প্রদাযের মধ্যেই দেখা যাইত। সাধারণ লোকের মধ্যে এই সকল দুরাচার মোটেই ছিল না। তাহারা যেমন ছিল মিতাচারী তেমনি ধর্মপরায়ণ। বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা, কৌলিন্য প্রথা, সতীদাহ প্রথা ঐ সময়কার সমাজ-জীবনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। সম্রাট আকবর বাল্য-বিবাহ এবং বলপূর্বক সতীদাহ প্রথা নিবারণের চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। বোল্ট্‌, স্ক্র্যাফ্‌টন, ক্র্যফোর্ড প্রভৃতি ইওরোপীয় লেখক তদানীন্তন সমাজের উপরোক্ত কুসংস্কারগুলির উল্লেখ করিয়াছেন। বিধবা-বিবাহ প্রথা কেবলমাত্র মারাঠা, জাঠ ও অব্রাহ্মণদের মধ্যেই প্রচলিত ছিল।

সামাজিক রীতি-নীতি

হিন্দুদের নৈতিকতা সম্পর্কে টেভার্নিয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, তখনকার হিন্দু সম্প্রদায় মিতব্যয়ী, সৎ এবং সচ্চরিত্র ছিল।

হিন্দু সমাজের নৈতিকতা

অর্থনৈতিক জীবন (Economic Life) : মোগল যুগে প্রজাবর্গের প্রধান উপজীবিকা ছিল কৃষি। দেশের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন প্রকারের শস্য উৎপাদিত হইত। বাংলা ও বিহারেই আখ বেশী জন্মাইত বলিয়াই এই দুই দেশেই চিনি প্রস্তুত হইত এবং ভারতবর্ষের অপরাপর অংশে সেই চিনি প্রেরিত হইত। পেল্‌সার্টের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, যমুনা উপত্যকা এবং মধ্য-ভারতে প্রচুর পরিমাণে নীল উৎপন্ন হইত। ইহা ভিন্ন রেশম, তুলা, তামাক প্রভৃতিও বিভিন্ন অংশে প্রচুর পরিমাণে জন্মিত। যে বৎসর ফসল ভাল হইত সেই বৎসর কৃষকদের মোটামুটি স্বচ্ছন্দেই চলিত, কিন্তু অজন্মা, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতির কালে তাহাদের দুর্দশার সীমা থাকিত না। দুর্ভিক্ষও যে না ঘটিত এমন নহে, কয়েক বৎসর পর পরই দুর্ভিক্ষ, অজন্মা প্রভৃতি দেখা দিত।

কৃষি : উৎপন্ন শস্যাদি

মোগল যুগের অর্থনৈতিক জীবনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল শিল্পোৎপন্ন সামগ্রীর প্রাচুর্য। এই সকল সামগ্রী সমগ্র দেশের চাহিদা মিটাইয়াও প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি করা উচিত। ভারতীয় সূতী বস্ত্রাদি বিদেশীয় বাজারে অতি উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হইত। ঐ সময়ে কুটির-শিল্প ভিন্ন বড় বড় সরকারী কারখানাও ছিল। বার্ণিয়ে বাংলাদেশকে রেশম ও সূতী বস্ত্রের আড়ৎ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। লাহোর ও কাশ্মীর শাল, গালিচা প্রভৃতির জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এই সকল দ্রব্যাদিও বিদেশে সমাদৃত ছিল। বাংলা ও বিহারে প্রচুর পরিমাণে সোরা (salt petre) উৎপন্ন হইত এবং বিদেশীয় বণিকগণ উহা ইওরোপে চালান দিত।

শিল্প : শিল্পোৎপন্ন দ্রব্যাদি

রপ্তানি সামগ্রীর মধ্যে নীল, সোরা, রেশম বস্ত্র, সূতী বস্ত্র, মস্‌লিন, চিনি, আফিং প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমদানি সামগ্রীর মধ্যে চীনামাটির বাসন, ঘোড়া, মূল্যবান মণিমুক্তা, কাঁচা-মাল হিসাবে রেশম এবং আফ্রিকা হইতে ক্রীতদাস প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

আমদানি ও রপ্তানি

মসুলিপট্টম, সুরাট, বোম্বাই, কালিকট, চট্টগ্রাম, ভারুচ প্রভৃতি মোগল যুগের শ্রেষ্ঠ বাণিজ্যবন্দর ছিল। দেশের অভ্যন্তরে বাণিজ্য-দ্রব্যাদি স্থল ও জল-পথে বহন করা হইত। সেই সময়ে কয়েকটি বৃহৎ রাজপথও ছিল। পথিক ও বণিকদের সুবিধার জন্য

বাণিজ্যবন্দর, জল ও স্থলপথ

সরাইখানা ও বিশ্রামঘর থাকিত। জলপথ বা স্থলপথে বণিকগণ নিরাপদে যাতায়াত করিতে পারিত।

শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালে শিল্পজীবীদের অবস্থার উন্নতি পরিলক্ষিত হইলেও কৃষিজীবীদের অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইতে থাকে। ঔরংজেবের রাজত্বকালে জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থার অধিকতর অবনতি ঘটে। তাঁহার রাজত্বের শেষভাগ হইতে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি লোপ পাইতে থাকে। ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহ, রাজনৈতিক অব্যবস্থা প্রভৃতির ফলে দেশের শান্তি বিনষ্ট হওয়ায় অর্থনৈতিক জীবন পর্যুদস্ত হইয়া পড়ে। দেশের কৃষি এবং শিল্প উভয় ক্ষেত্রেই অবনতি দেখা দেয়। ১৬৯০-৯৮ এই কয়েক বৎসর ইংরেজ বণিকগণ রপ্তানির জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ বস্ত্রাদি যোগাড় করিতে পারে নাই। ইহা হইতেই তখনকার অর্থনৈতিক অবনতির ধারণা জন্মে। বাংলাদেশ ঐ সময়ে যুদ্ধ-বিগ্রহাদি হইতে মুক্ত ছিল বটে, তথাপি ঔরংজেবের দীর্ঘকালব্যাপী দাক্ষিণাত্য যুদ্ধের ব্যয় বাংলা সুবার রাজস্ব হইতেই সংকুলান করা হইত। ফলে, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিও হ্রাস পাইয়াছিল। তদুপরি নাদির শাহের লুণ্ঠন, ইংরেজ বণিকগণের প্রতিযোগিতা দেশের অর্থনৈতিক জীবনেও এক বিপর্যয় ডাকিয়া আনিয়াছিল।

জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবনতি

শিল্প ও সাহিত্য (Art & Literature): তুর্কী-আফগান যুগে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের সূচনা হইয়াছিল আকবরের আমলে তাহা বহুগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। শাহ্‌জাহান বিশেষত ঔরংজেবের আমলে সংকীর্ণ ধর্মান্ধ নীতি এই পরস্পর সৌহার্দ্য বিনাশ করিতে পারে নাই। এই দুই শক্তিশালী সম্প্রদায়ের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের ফলে যে নব-চেতনার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা সমসাময়িক স্থাপত্য কলা ও সাহিত্যে প্রতিফলিত হইয়াছিল। হিন্দু ও মুসলমান স্থাপত্যরীতির সংমিশ্রণে সেকালে এক নূতন বলিষ্ঠ শিল্পরীতি গড়িয়া উঠিয়াছিল।

হিন্দু ও মুসলমান শিল্প ও স্থাপত্যরীতির সংমিশ্রণ

বাবর ভারতীয় শিল্পরীতি পছন্দ করিতেন না। তিনি কন্‌স্টান্‌টিনোপ্‌ল হইতে সিনা নামে জনৈক স্থপতিকে তাঁহার মস্‌জিদ ও অপরাপর সৌধাদি নির্মাণের জন্য আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। কিন্তু

পারসি ব্রাউন (Mr. Percy Brown) প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ কনস্টান্টিনোপলের শিল্পরীতির কোন পরিচয় বাবরের শিল্প-নিদর্শনে দেখিতে পান নাই। উপরন্তু বাবর যে অসংখ্য ভারতীয় স্থপতি ও প্রস্তর-শিল্পীদের নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ আছে। বাবরের আমলে শিল্প-নিদর্শনগুলির মধ্যে সম্বলের 'জামি মস্‌জিদ', আগ্রায় একটি মসজিদ এবং পানিপথের কাবুলিবাগ নামক স্থানে একটি মস্‌জিদ এখনও বিদ্যমান। মোগল সম্রাটগণ শিল্প, স্থাপত্য ও সাহিত্যের উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সেবিষয়ে সন্দেহ নাই।

বাবরের শিল্পানুরাগ

হুমায়ুনের আমলেরও দুইটি মস্‌জিদ তাঁহার স্থাপত্যানুরাগের সাক্ষ্য বহন করিতেছে। ঐ সময়কার স্থাপত্য-শিল্পের আলোচনায় শের শাহের দান নেহাৎ কম ছিল না। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত 'পুরান কিলা', 'কিলা-ই-কুহ্‌না মস্‌জিদ' এবং সাসারামে শের শাহের সমাধি-সৌধ প্রভৃতি এক অতি উন্নত এবং আলঙ্কারিক ধরণের শিল্পরীতির পরিচায়ক।

হুমায়ুন ও শের শাহের আমলে স্থাপত্য-শিল্প

সম্রাট আকবর শিল্প ও স্থাপত্যে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। আবুল ফজলের বর্ণনা হইতে আকবরের শিল্প-জ্ঞান ও নির্মাণ-কার্যাদির ব্যাপারে ব্যবসায়ীসুলভ পরিদর্শন-ক্ষমতার সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। তাঁহার আমলে পারসিক ও হিন্দু স্থাপত্যরীতির সম্পূর্ণ সংমিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়।

আকবরের আমলে পারসিক ও হিন্দু স্থাপত্যের সংমিশ্রণ

আকবরের আমলে নির্মিত প্রাসাদ-দুর্গ, মসজিদ ও সমাধি-সৌধগুলির মধ্যে ফতেপুর সিক্রি, জাহাঙ্গীরী মহল, হুমায়ুনের সমাধি, ইবাদৎখানা, বুলন্দ দরওয়াজা, পাঁচমহল প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেকেন্দ্রায় আকবরের সমাধি-সৌধটির পরিকল্পনা আকবরের জীবদ্দশায়ই প্রস্তুত হইয়াছিল।

আকবরের আমলে স্থাপত্য-শিল্প

আকবরের স্থাপত্য কীর্তির তুলনায় তাঁহার পুত্র জাহাঙ্গীরের আমলের স্থাপত্য কার্যাদি নগণ্য ছিল সন্দেহ নাই, তথাপি ইতিমাদ-উদ্‌-দৌলার সমাধি-সৌধটি তাঁহার শিল্পানুরাগের সাক্ষ্য বহন করিতেছে। তাঁহার আমলে মোগল শিল্পরীতির সহিত রাজপুত শিল্পরীতির যে সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ ইতিমাদ্‌-উদ্‌-দৌলার সমাধি দৃষ্টে বুঝিতে পারা যায়।

জাহাঙ্গীরের আমলে স্থাপত্য-শিল্প

মোগল যুগের স্থাপত্য ও শিল্পানুরাগের উৎকর্ষতার জন্য সম্রাট শাহ্‌জাহানের রাজত্বকাল সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। মৌলিকতার দিক দিয়া বিচার করিলে শাহ্‌জাহানের আমলের শিল্পকৌশল আকবরের আমলের শিল্পকৌশল অপেক্ষা নিম্নস্তরের ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু আলঙ্কারিক শিল্পকৌশলে উহা সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ। শাহ্‌জাহানের আমলে 'দেওয়ান-ই-আম',-'দেওয়ান-ই-খাস্', 'মোতি মস্‌জিদ', 'জামি মস্‌জিদ' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'তাজমহল' সমাধি-সৌধটি হইল শাহ্‌জাহানের জগদ্বিখ্যাত শিল্পকীর্তি। ইহা শাহ্‌জাহানের প্রিয়তমা পত্নী মমতাজমহলের দেহাবশেষের উপর নির্মিত। শিল্প-কৌশলেও শাহ্‌জাহানের আমল যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। তাঁহার বিখ্যাত ময়ুর-সিংহাসন এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য। পরিতাপের বিষয় এই সিংহাসনটি পারস্যের নাদির শাহ্ কর্তৃক লুণ্ঠিত হইয়াছিল। ঔরংজেবের ধর্মান্ধতা ও গোঁড়ামির ফলে মোগল স্থাপত্য ও শিল্পের অবনতি ঘটিয়াছিল। পতনোন্মুখ মোগল সাম্রাজ্যের স্থাপত্য বা শিল্পের প্রতি স্বভাবতই কোন অনুরাগ প্রদর্শিত হয় নাই। কেবলমাত্র হায়দরাবাদ ও অযোধ্যায় উন্নত ধরণের শিল্পরীতি আরও কিছুকাল ধরিয়া টিকিয়াছিল।

শাহ্‌জাহানের স্থাপত্য শিল্পানুরাগ—তাজমহল শ্রেষ্ঠ নিদর্শন

ঔরংজেবের আমলে শিল্পের অবনতি

যেমন স্থাপত্যে তেমনি চিত্রশিল্পে মোগল যুগে ভারতীয় শিল্পরীতির সহিত চৈনিক, ইরাণীয়, গ্রীক (ব্যাক্ট্রীয়) এবং মোঙ্গলীয় শিল্পরীতির এক অভূতপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল। বিশেষভাবে ভারত-পারস্য-চীন শিল্পের সংমিশ্রণে উদ্ভূত এক নূতন চিত্রশিল্প-কৌশলের পরিচয় আকবরের আমল হইতেই পাওয়া যায়। আকবর ও জাহাঙ্গীরের আমলের চিত্র-শিল্পানুরাগ শাহ্‌জাহানের আমলে কতক পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। সমসাময়িককালে রাজপুত চিত্রশিল্প বিশেষভাবে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল।

চিত্রশিল্প

একমাত্র ঔরংজেব ভিন্ন আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহ্‌জাহান প্রভৃতি মোগল সম্রাট সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন। উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত সেই সময়ে যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী তানসেন ছিলেন আকবরের সভাসদ্। মালবের শাসনকর্তা বাজবাহাদুরও

সঙ্গীতশিল্প

সঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন। ঔরংজেবের আমলে দরবারে সঙ্গীতশিল্প নিষিদ্ধ হওয়ায় উহার অবনতির সূত্রপাত হয়।

মোগল যুগে আধুনিক কালের ন্যায় কোন শিক্ষাব্যবস্থা ছিল না বটে, তথাপি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক ধরণের শিক্ষার সুযোগ যে একেবারে ছিল না একথা বলা চলে না। মক্তব, মাদ্রাসা, টোল প্রভৃতি ছিল ঐ যুগের শিক্ষায়তন। স্থানীয় শাসক এবং জমিদারগণ শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। বাবরের আমলে বিদ্যালয়ের জন্য প্রয়োজনীয় গৃহাদি নির্মাণের ভার 'সুহ্‌রৎ-ই-আম' (Public Works Department) নামে সরকারী বিভাগের উপর ন্যস্ত ছিল। ঐ সময়ে আরবী, ফার্‌সী এবং সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে অধ্যয়ন-অধ্যাপনা চলিত। বহু হিন্দু ঐ সময়ে ফার্‌সী ভাষা ও সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি অর্জন করিয়াছিলেন। উপনিষদ্, ভগবদ্গীতা এবং 'যোগবাশিষ্ট রামায়ণ' ঐ যুগে সংস্কৃত হইতে ফার্‌সী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল।

শিক্ষা

সম্রাটগণ ও যুবরাজগণের মধ্যেও শিক্ষানুরাগ যে না ছিল এমন নহে। শাহ্‌জাহান তুর্কী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। যুবরাজ দারা ছিলেন মোগল রাজপরিবারে সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্বান ব্যক্তি। অভিজাত পরিবারেও বিদ্যানুরাগ পরিলক্ষিত হয়। স্ত্রীশিক্ষাও সেই সময়ে প্রচলিত ছিল। সম্রাট আকবরের আমলে রাজপরিবারস্থ স্ত্রীলোকদের শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা ছিল। বাবরের কন্যা গুলবদন বেগম, নূরজাহান, মমতাজমহল, জাহানারা, জেব-উন্নিসা প্রভৃতি মহিলাগণ আরবী এবং ফার্‌সী ভাষা ও সাহিত্যে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

মোগল সম্রাটগণ সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আকবরের রাজত্বকালে বহুসংখ্যক বিদ্বান মনীষীর উদ্ভব ঘটিয়াছিল। চণ্ডীমঙ্গল-প্রণেতা বাঙালী কবি মাধবাচার্য আকবরের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি আকবরের সাহিত্যানুরাগের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। আকবরের পৃষ্ঠপোষকতায় ঐতিহাসিক গ্রন্থাদি, কবিতা এবং অনুবাদ সাহিত্য সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। 'তারিখ-ই-আল্‌ফি', 'আইন-ই-আকবরী', 'আকবর-নামা', 'মাসির-রহিমী' প্রভৃতি ঐতিহাসিক গ্রন্থ আকবরের আমলে রচিত হইয়াছিল। রামায়ণ, মহাভারত এবং অথর্ববেদ আকবরের

সাহিত্য

পৃষ্ঠপোষকতায় ফারসী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। কয়েকখানি গ্রীক ও আরবী গ্রন্থও ঐ যুগে ফারসী ভাষায় অনুবাদ করা হইয়াছিল। ফৈজী, ঘিজালী, হুসেন নাজিরী, জামাল-উদ্দিন উরফি ছিলেন তখনকার শ্রেষ্ঠ কবি। আকবরের রাজত্বকাল ভিন্ন বাবরের জীবনস্মৃতি, জাহাঙ্গীরের জীবনস্মৃতি, 'ইকবালনামা-ই-জাহাঙ্গীরী', 'মা-আসীর-ই-জাহাঙ্গীরী', 'জবৃদ-উৎ-তোওয়ারিখ্', 'পাদ-শাহ্নামা', 'শাহ্জাহান-নামা', 'আলমগীর-নামা', 'মুন্তাখাব-উল্-লুবাব' প্রভৃতি বহু ঐতিহাসিক গ্রন্থ ঐ যুগে রচিত হইয়াছিল।

বাংলাদেশেও মোগলযুগে সাহিত্যক্ষেত্রে যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। বৈষ্ণব সাহিত্যে ঐ সময়ে এক বিশেষ উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয়। চৈতন্যচরিতামৃত-রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ, চৈতন্যভাগবৎ-রচয়িতা বৃন্দাবন দাস, চৈতন্য-মঙ্গল-রচয়িতা জয়ানন্দ, চৈতন্যমঙ্গল-রচয়িতা ত্রিলোচন দাস, ভক্তি-রত্নাকর-রচয়িতা নরহরি চক্রবর্তী প্রভৃতি বৈষ্ণব সাহিত্যিকদের উদ্ভব ঐ যুগে ঘটিয়াছিল। চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল প্রভৃতি মঙ্গলকাব্য, কাশীদাস-রচিত মহাভারত, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী-রচিত কবিকঙ্কণ চণ্ডী প্রভৃতিও ঐ যুগের সাহিত্য-সমৃদ্ধির পরিচায়ক। বাংলার মুর্শিদ কুলী খাঁ, আলীবর্দী খাঁ, নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, বীরভূমের আসাদুল্লা প্রভৃতি বাংলা সাহিত্যের উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

পরিশিষ্ট (ক)

বংশ-পরিচয়

(১)

দাস বংশ (১২০৬—১২৯০)

(২)
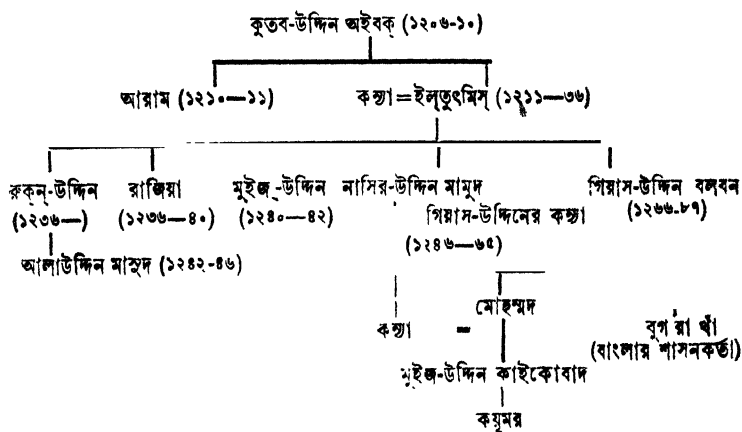
খল্‌জী বংশ (১২৯০—১৩২০)
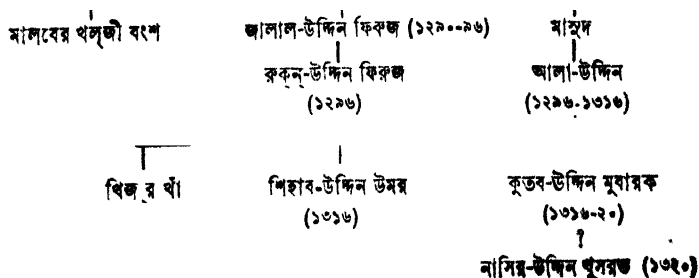
(৩)

তুঘ্লক বংশ (১৩২০—১৪১৩)
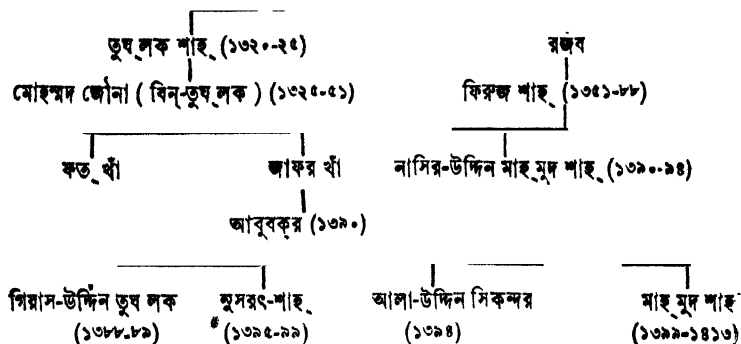
(৪)

সৈয়দ বংশ (১৪১৪—৫১)
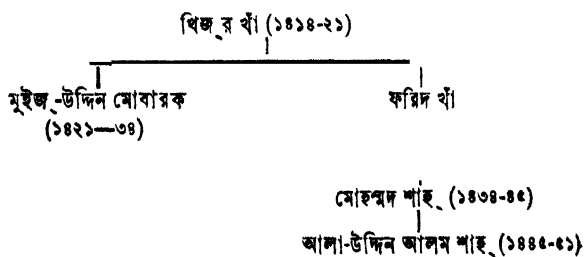
(৫)

লোদী বংশ (১৪৫১—১৫২৬)

বহ্‌লুল লোদী (১৪৫১-৮৯)
|
সিকন্দর লোদী (১৪৮৯-১৫১৭)
|
ইব্রাহিম লোদী (১৫১৭-২৬)

বাংলার স্বাধীন সুলতানি বংশ

(১)

ইলিয়াস্ শাহী বংশ

হাজী শামস্-উদ্দিন ইলিয়াস (১৩৪৫-৫৭)

সিকন্দর শাহ্ (১৩৫৭-৯৩)

(?) নাসির-উদ্দিন মামুদ শাহ্ (১) (১৪৪২-৬০)

গিয়াস-উদ্দিন আজ্‌ম (১৩৯৩-১৪১০)
|
সৈইফ্-উদ্দিন হাম্‌জা শাহ্ (১৪১০-১১)

শামস্-উদ্দিন (২) (১৪৩১-৪২)

শিহাব-উদ্দিন বায়াজিদ্ (১৪১২-১৪)

রুকন-উদ্দিন বারবক্ (১৪৬০-৭৪)
|
শামস-উদ্দিন ইযুসুফ (১৪৭৪-৮১)
(?)
সিকন্দর শাহ্ (২) (১৪৮১)

জালাল-উদ্দিন ফত্ শাহ্ (১৪৮১-৮৯)
(?)
নাসির-উদ্দিন মামুদ (২) (১৪৮৯-৯০)

রাজা গণেশ (১৪১১—?)
|
যদু : ইস্‌লাম ধর্মে ধর্মান্তরিত
—জালাল-উদ্দিন মোহম্মদ শাহ্ (১৪১৪-৩১)
*
দনুজ-মর্দন (১৪১৭)
(?)
মহেন্দ্র (১৪১৮-৩৯)

হাব্‌সী শাসন (১৪৮৬-৯৩)

বারবক্ শাহ্ (১৪৮৬)
*
ইন্দিল শাহ্ (১৪৮৬-৮৯)
*
সিদি বদর্ (১৪৯০-৯৩)

(২)

সৈয়দ বংশ

আলা-উদ্দিন হুসেন শাহ্ (১৪৯৩-১৫১৮)

নুসরৎ-শাহ্ (১৫১৮-৩৩) গিয়াস-উদ্দিন মামুদ শাহ্ (১৫৩৩-৩৮)

আলা-উদ্দিন ফিরুজ (১৫৩৩) কন্যা—খিজ্‌র খাঁ

*

মোগল সম্রাট হুমায়ুন কর্তৃক বাংলাদেশ অধিকৃত (১৫৩৮), শের শাহ্ কর্তৃক অধিকৃত (১৫৩৯)

বহ্‌মনী বংশ
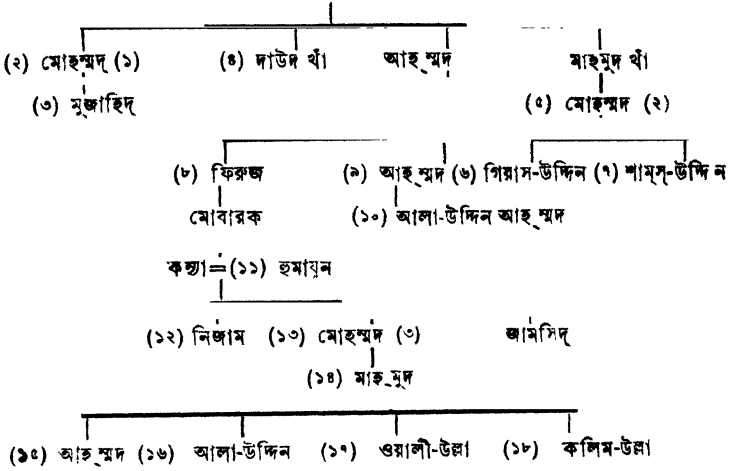
বিজয়নগর

(১)

যাদব বংশ
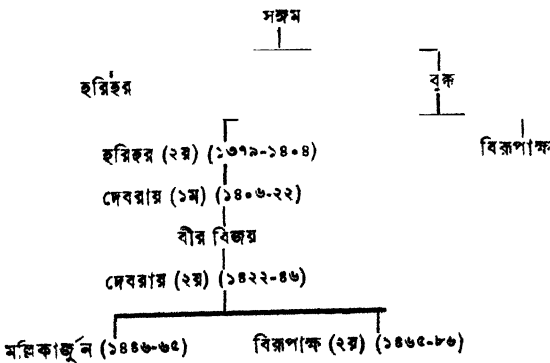
(২)

সালুভ বংশ

নরসিংহ (১৪৮৬-৯৩)
|
ইম্মদি নরসিংহ (১৪৯৩-১৫০৫)

(৩)

তুলুভ বংশ

নরস নায়ক

- বীর নরসিংহ (১৫০৫)
- কৃষ্ণদেব রায় (১৫০৫-৩০)
- অচ্যুত
  - বেঙ্কট
- রঙ্গ
  - সদাশিব
    - রামরায় (১৫৬৫)

(৪)

আরবিডু বংশ

তিরুমাল

- রঙ্গ (২য়)
- রাম
  - বেঙ্কট (৩য়)
- বেঙ্কট (২য়)

মেবারের রাণা বংশ

শূর বংশ (১৫৪০—১৫৫৫)

হাসান

ফরিদ (শের শাহ্)
(১৫৪০-৪৫)
ইস্‌লাম শাহ্ (১৫৪৫-৫৫)
ফিরুজ শাহ্

নিজাম খাঁ
মুবারিজ খাঁ

গাজী খাঁ
ইব্রাহিম খাঁ

(?)
আহ্‌ম্মদ খাঁ
(১৫৫৮-৫৯)

মোগল বংশ

জহির-উদ্দিন বাবর (১৫২৬-৩০)
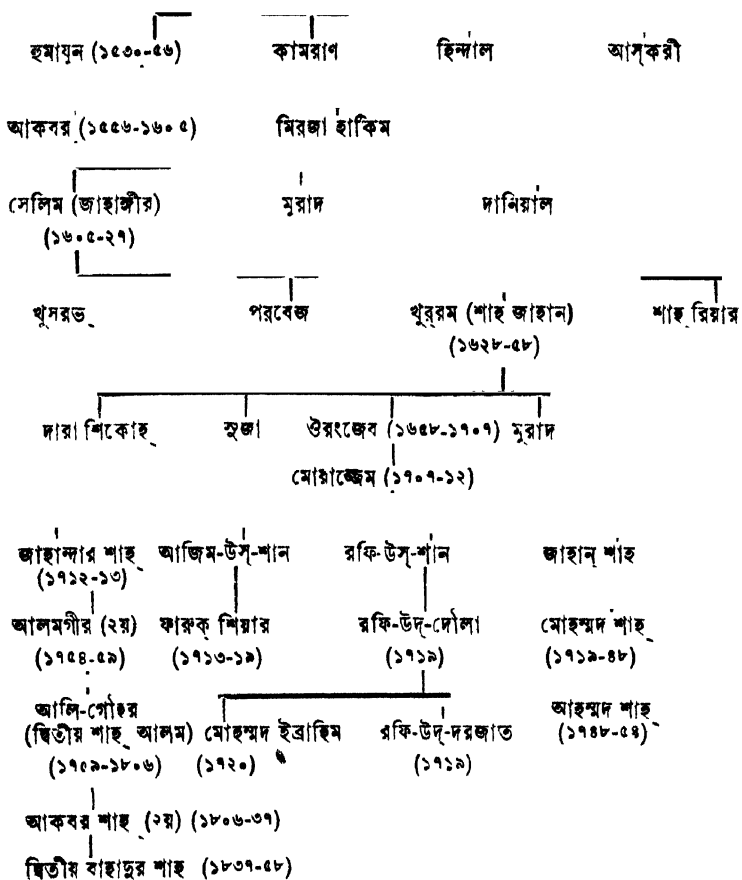
ছত্রপতি বা ভোঁসলে বংশ

মালোজী

শাহজী

শম্ভুজী শিবাজী

শাহু তারাবাঈ = রাজারাম = রাজস্ বাঈ

তৃতীয় শিবাজী শম্ভুজী (২য়)

রামরাজা

শাহু

প্রতাপসিংহ শাহজী রাজা

পেশওয়া বংশ

পরিশিষ্ট (খ)

উত্তর-সংকেত

সূচনা

Discuss the sources of information of the medieval Indian history.

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : ভারতের মধ্যযুগ তথা মুসলমান আমলের ইতিহাস রচনার উপকরণের প্রাচুর্য ঐতিহাসিককে বিভ্রান্ত করা বিচিত্র নহে। ঐ যুগের ইতিবৃত্ত লেখক, সুলতানদের সভাকবি, বিদেশী বণিক ও পর্যটকদের পরস্পর-বিরোধী উক্তির মধ্য হইতে সত্য নিরূপণ করা-ই হইল মধ্যযুগের ইতিহাস রচয়িতার গুরুদায়িত্ব। (২) পাঁচ প্রকার উপকরণ : (ক) সরকারী দলিলপত্র, (খ) সমসাময়িক ঐতিহাসিক রচনা : অল্‌বেরুণী, আমীর খুস্‌রু, মিন্‌হাজ-উস্‌-সিরাজ, হাসান্‌-উন্‌-নিজামী, ফেরিস্তা, আইন্‌-উল্‌-মুল্‌ক, বদাউনী প্রভৃতি, (গ) বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ : ইবন্ বতুতা, জিয়া-উদ্দিন বর্‌ণী, মোহন, কন্টি, আব্দুর্‌ রজাক নিকিতিন, পায়েজ, হুনিজ, জেস্যুইট্‌ যাজকগণ, ফিচ্, রো, টেরি, বার্ণিয়ে, টেভার্‌নিয়ে, মানুচি প্রভৃতি, (ঘ) মুদ্রা ও স্থাপত্য শিল্প, (ঙ) মারাঠা, রাজপুত ও শিখদের রচনা। ৬-১১ পৃষ্ঠা]

প্রথম অধ্যায়

1. Give a brief account of the principal Indian expeditions of Mahmud of Ghazni. In what respects do they differ from those of Muhammad of Ghor? (C. U. 1953)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : সুলতান মামুদ কতবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন সেবিষয়ে মতানৈক্য রহিয়াছে। সার্ হেন্‌রী ইলিয়ট-এর মতে মামুদ মোট সতরবার ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন। সার্ ইলিয়টের মতই আধুনিক ঐতিহাসিকগণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। (২) প্রধান আক্রমণগুলি : (ক) জয়পালের বিরুদ্ধে অভিযান (১০০১); (খ) আনন্দ-

পালের বিরুদ্ধে অভিযান (১০০৮) ; (গ) কাংড়া দুর্গ আক্রমণ (১০০৯) ; (ঘ) দ্বাদশ অভিযান—কনৌজ ও মথুরা আক্রমণ (১০১৮) ; (ঙ) সর্ব-প্রধান অভিযান সোমনাথের মন্দির আক্রমণ (১০২৬) ; (৩) সুলতান মামুদ ও মোহম্মদ ঘুরীর অভিযানের পার্থক্য : (ক) সুযোগ-সুবিধার পার্থক্য ; (খ) ধনরত্ন লুণ্ঠন মামুদের উদ্দেশ্য—ঘুরীর উদ্দেশ্য আধিপত্য স্থাপন ; (গ) মামুদের ধর্মান্ধনীতি—ঘুরীর ধর্মান্ধতা, রাজনৈতিক বুদ্ধি-বিবেচনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ; (ঘ) মামুদের পাঞ্জাব দখল পূর্ব-পরিকল্পনা-প্রসূত নহে—ঘুরীর রাজ্যবিস্তার পূর্ব-পরিকল্পনা-প্রসূত—উত্তর-ভারতে মুসলমান আধিপত্য দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত। ১৫-২২, ৩৬-৩৭ পৃষ্ঠা]

2. What do you know of Muhammad of Ghor? Give a short account of his exploits in India. (C. U. 1948)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : ভ্রাতা গিয়াস্-উদ্দিনের অধীনে শাসনকর্তা হিসাবে মোহম্মদ ঘুরী তাঁহার কর্মজীবন শুরু করেন ; (২) ভারত আক্রমণের আকাঙ্ক্ষা—মুলতান, উচ্ জয়, গুজরাট আক্রমণ ও পরাজয়, পেশওয়ার জয়, শিয়ালকোটে দুর্গ স্থাপন, তরাইনের প্রথম যুদ্ধে পরাজয় (১১৯১), তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে জয়লাভ (১১৯২) ; (৩) কৃতিত্ব : উত্তর-ভারতে মুসলমান অধিকার দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন। ৩০-৩৬ পৃষ্ঠা]

দ্বিতীয় অধ্যায়

1. Give an estimate of the achievements of Iltutmish and Balban. (C. U. 1954, 1958)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : ভারতে মুসলমাম সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপনে ইল্‌তুৎমিস ও বলবনের দান অপরিসীম। মুসলমান শাসনের সঙ্কটকালে এই দুইজন সুলতান তাঁহাদের কর্মনিষ্ঠা ও দক্ষতার দ্বারা মুসলমান শাসনের নিরাপত্তা রক্ষা করিয়াছিলেন। (২) ইল্‌তুৎমিস্ : (ক) তাঁহার সমস্যা, (খ) তাঁহার সাফল্য, (গ) তুর্কীশাসনের স্থায়িত্ব দান, (ঘ) অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতান, (ঙ) সাহিত্য ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা, (চ) তাঁহার গুণাবলী। (৩) বলবন : (ক) সিংহাসনে আরোহণের পূর্বের কার্যাদি, (খ) আভ্যন্তরীণ

শৃঙ্খলা, বহিরাগত শত্রু হইতে দেশ রক্ষা, (গ) আমীর ও মালিকদের দমন, (ঘ) গুপ্তচর ব্যবস্থা, (ঙ) দিল্লী সুলতানির মর্যাদা বৃদ্ধি, (চ) ব্যক্তিগত চরিত্র, (ছ) তাঁহার অবদান। ৪৫-৪৭, ৫৭-৫৯ পৃষ্ঠা]

2. **Give an estimate of Ghiyas-ud-din Balban as a ruler.**
(C. U. 1956)

[উত্তর-সংকেত : ১নং প্রশ্নোত্তরের (৩)-এর অনুরূপ। ৫৭-৫৯ পৃষ্ঠা]

তৃতীয় অধ্যায়

Give an estimate of Ala-ud-din Khalji as a conqueror and as an administrator. (C. U. 1953, 1957, 1960)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : মানুষ হিসাবে নীচতা ও সংকীর্ণতার পরিচয় দিলেও আলা-উদ্দিন বিজেতা ও শাসক হিসাবে দিল্লীর শ্রেষ্ঠ সুলতান-গণের অন্যতম ছিলেন একথা অনস্বীকার্য। (২) বিজেতা হিসাবে : রাজ্য বিস্তার : (ক) উত্তর-ভারতে গুজরাট, মালব, চিতোর, রণথম্ভোর, উজ্জয়িনী, ধারা, চান্দেরী প্রভৃতি রাজ্য, এবং (খ) দক্ষিণ-ভারতে দেবগিরি, বরঙ্গল, দ্বারসমুদ্র, মাদুরা প্রভৃতি রাজ্য জয়; (৩) শাসক হিসাবে : (ক) ধর্ম-নিরপেক্ষ শাসন, (খ) শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনের ব্যবস্থা, (গ) সাহিত্য ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা। ৭৫-৮৬ পৃষ্ঠা]

চতুর্থ অধ্যায়

1. In what way was Muhammad Tugluq responsible for the disintegration of the Delhi Sultanate ? (C. U. 1951)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : মোহম্মদ তুঘ্‌লক সুলতানি আমলের বৃহত্তম সাম্রাজ্যের সুলতান হিসাবে শাসন শুরু করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুকালে সেই সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ সুলতানি সাম্রাজ্যচ্যুত হইয়া গিয়াছিল। ইহা ভিন্ন তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব হইতেই যে রাজনৈতিক অব্যবস্থা সাম্রাজ্যের সর্বত্র দেখা দিয়াছিল তাহা দূর করিয়া দিল্লী সুলতানিকে সঞ্জীবিত করা সম্ভব হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে মোহম্মদ তুঘ্‌লকের রাজত্বের সময়

হইতেই যে দুর্বলতার সূচনা হইয়াছিল তাহাই সুলতানি সাম্রাজ্যের পতনের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সকল দিক বিচার করিলে মোহম্মদ তুঘ্‌লক দিল্লী সুলতানির পতনের জন্য যথেষ্ট দায়ী ছিলেন ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। (২) তাঁহার চরিত্র—রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা; (৩) তাঁহার পরিকল্পনা: (ক) রাজধানী পরিবর্তন, (খ) পারস্য বিজয়ের প্রস্তুতি, (গ) কারাজল আক্রমণ, (ঘ) তামার নোটের প্রচলন, (ঙ) দোয়াব অঞ্চলে বিপুল করভার স্থাপন; (৪) বিফলতা: কারণ ও ফলাফল। ১০৫-১০৬, ১০৬-১০৯ পৃষ্ঠা]

2. Give a critical estimate of Muhammad Tugluq.
(C. U. 1955)

[উত্তর-সংকেত: (১) সূচনা: মোহম্মদ তুঘ্‌লকের চরিত্র ও কৃতিত্ব সম্পর্কে মতানৈক্য; (২) তাঁহার বহুমুখী প্রতিভা, তাঁহার চরিত্রের ত্রুটি; (৩) দোয়াব অঞ্চলে কর বৃদ্ধি, রাজধানী পরিবর্তন, পারস্য অভিযানের পরিকল্পনা, কুর্মাচল বা কারাজল অভিযান, তামার নোটের প্রচলন, বিচার, ধর্ম-নিরপেক্ষ শাসন, কৃষির উন্নয়ন, (৪) বিফলতা—কারণ ও ফলাফল। ১০৬-১০৯ পৃষ্ঠা]

3. "The contemporary chroniclers describe Firuz Tugluq as an ideal Muslim ruler." What is your estimate of him as a man and an administrator? (C. U. 1952, 1958)

[উত্তর-সংকেত: (১) সূচনা: ঐতিহাসিক জিয়া-উদ্দিন বরণী ও শামস্‌-ই-সিরাজ আফিফ্‌ ফিরুজ শাহের গুণাবলীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। ডক্টর স্মিথ্‌ সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের বিশেষতঃ জিয়া-উদ্দিন বরণীর অভিমত গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করেন না। তাঁহাদের বর্ণনায় অতিশয়োক্তি রহিয়াছে, সেবিষয়ে সন্দেহ নাই। নিরপেক্ষ বিচারে তাঁহার প্রজাহিতৈষণা, ধর্মপ্রবণতা প্রভৃতি গুণের কথা স্বীকার করিলেও তাঁহার ধর্মপ্রবণতা যে কোন কোন ক্ষেত্রে ধর্মান্ধতায় পর্যবসিত হইয়াছিল ইহাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। গোঁড়া মুসলমানের দৃষ্টিতে তিনি আদর্শ সুলতান ছিলেন স্বীকার করিলেও তাঁহার ধর্মান্ধতার ফলে হিন্দু জনসাধারণ যে অসুবিধাগ্রস্ত হইয়াছিল তাহা তিনি উপলব্ধি করেন নাই। (২) তাঁহার চরিত্র; (৩) রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাব; (৪) সামরিক নেতা হিসাবে

তাঁহার কার্যকলাপ ; (৫) তাঁহার শাসন সংস্কার ; (৬) নির্মাতা হিসাবে তাঁহার কার্যাদি ; (৭) মুসলমান ধর্মজ্ঞানী ও ঐতিহাসিকদের পৃষ্ঠপোষকতা ; (৮) মানুষ হিসাবে ফিরুজ তুঘ্‌লক। ১১৮-১২১ পৃষ্ঠা]

পঞ্চম অধ্যায়

1. Give in brief the history of the Muslim conquest of Bengal.

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : বাংলাদেশে মুসলমান আধিপত্যের গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন ইখ্‌তিয়ার-উদ্দিন মহম্মদ-বিন্‌-বক্তিয়ার। (২) দক্ষিণ-বিহারের বিরুদ্ধে তাঁহার অভিযান—অভিযানের উদ্দেশ্য—বিহারে মুসলমান অধিকার স্থাপন ; (৩) নদীয়া আক্রমণ—বাংলাদেশে মুসলমান অধিকার স্থাপন—মিন্‌হাজের বিবরণ—লক্ষ্মণসেনের নদীয়া ত্যাগ—আধুনিক ঐতিহাসিকদের মত—মিন্‌হাজ ও ইসামির বর্ণনার সামঞ্জস্য—প্রকৃত মূল্য—বাংলাদেশে মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত। ১৪১—'৪৬ পৃষ্ঠা]

2. Discribe the history of Bengal under Hussain Shahi Dynasty.

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : আলা-উদ্দিন হুসেন শাহ্‌ বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করিলে বাংলাদেশের ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল যুগের সূচনা হইয়াছিল। (২) তাঁহার চরিত্র ও জনপ্রিয়তা, হাব্‌সী বিতাড়ন—প্রাসাদ-রক্ষী দমন—রাজ্যবিস্তার—শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা—পুরন্দর খাঁ, রূপ ও সনাতন গোস্বামী, মালাধর বসু—পরমেশ্বর কবীন্দ্র—আশ্রিতের প্রতি অনুকম্পা—হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয়—সত্যপীরের কল্পনা ; (৩) নুসরৎ শাহ্‌—চরিত্র, রাজ্যবিস্তার ও রাজ্যের নিরাপত্তা বিধান—মোগলদের বিরুদ্ধে কূটনৈতিক সংগ্রাম—বাবরের মৃত্যুর পর নুসরৎ শাহ্‌ কর্তৃক মোগল-বিরোধী মিত্রসংঘ গঠন—অহোম জাতির সহিত যুদ্ধ। ১৬৪—'৬৮ পৃষ্ঠা]

3. Describe the achievements of Krishnadeva Raya of Vijaynagar. What were the effects of the Battle of Talikota ? (C. U. 1956)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : কৃষ্ণদেব রায় ছিলেন তুলুভ বংশের

সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি ; (২) তাঁহার চরিত্র (সংক্ষেপে) ; (৩) তাঁহার কার্যাদি ; (৪) তাঁহার শিল্প, সাহিত্য ও সঙ্গীতানুরাগ ; (৫) তালিকোটার যুদ্ধের ফলাফল : (ক) বিজয়নগর লুণ্ঠন, বিজয়নগর ধ্বংসস্তূপে পরিণত, (খ) দাক্ষিণাত্যের হিন্দু প্রাধান্য স্থাপনের আশা চিরতরে বিলুপ্ত, (গ) দাক্ষিণাত্যের তুর্কী তথা মুসলমান প্রাধান্যের সুযোগ বৃদ্ধি, (ঘ) মারাঠা শক্তির উত্থানের পথ প্রস্তুতি। ১৮৪-১৮৮ পৃষ্ঠা]

4. Trace in brief the history of the rise and fall of the Vijaynagar Empire. (C. U. 1950)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : দাক্ষিণাত্যের হিন্দুদের জাতীয়তাবোধ এবং মুসলমান আক্রমণ হইতে নিজ ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষার আগ্রহের বিকাশ হিসাবেই বিজয়নগরের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণ তীরে সঙ্গম নামক এক ব্যক্তির পাঁচ পুত্র মাধব বিদ্যারণ্য ও বেদের ভাষ্যকার সায়নাচার্যের প্রেরণায় বিজয়নগর সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন। এই পাঁচ ভ্রাতার মধ্যে হরিহর ও বুক্ক-ই ছিলেন প্রধান। (২) সঙ্গম বংশ—দ্বিতীয় দেবরায় শ্রেষ্ঠ সম্রাট ; (৩) সালুভ বংশ ; (৪) তুলুভ বংশ—কৃষ্ণদেব রায় শ্রেষ্ঠ সম্রাট—রামরায়—তালিকোটার যুদ্ধ ; (৫) আরবিড়ু বংশ—প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের স্বার্থলোলুপতায় বিজয়নগরের পতন। ১৮০-১৮৮ পৃষ্ঠা]

5. Describe the tussle between Bahmani kingdom and Vijaynagar upto the Battle of Talikota. (C. U. 1954)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : বহ্মনী রাজ্য ও বিজয়নগরের স্থাপনের ইতিহাস (অতি সংক্ষেপে) ; (২) উভয় রাজ্যের অবিশ্রাম যুদ্ধের বর্ণনা (সংক্ষেপে)। ১৬৯-'৭০, ১৭১-১৮০ পৃষ্ঠা]

6. How far was Timur responsible for the dissolution of the Delhi Sultanate ? (C. U. 1957)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : তুঘ্‌লক বংশের রাজত্বের শেষ দিকে সুলতানি সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক সংহতি যখন বিনষ্ট হইয়াছিল সেই সময়ে তৈমুর ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন (১৩৯৮) ; (২) তাঁহার উদ্দেশ্য : পৌত্তলিক হিন্দুদের শাস্তিবিধান করা, মূল উদ্দেশ্য লুণ্ঠন ; (৩) দিল্লীতে হত্যালীলা ; (৪)

আক্রমণের ফলাফল: (ক) দিল্লী সুলতানির রাজনৈতিক দুর্বলতার উপর চরম আঘাত, (ঘ) লুণ্ঠনের ফলে অর্থনৈতিক দুর্বলতা সুলতানির পতনের অর্থনৈতিক কারণ, (গ) তৈমুরের আক্রমণের পরবর্তী কালে দিল্লী সুলতানির অব্যবস্থার সুযোগ লইয়া বিভিন্ন অংশের শাসনকর্তাদের স্বাধীনতা ঘোষণা। ১২২-'২৫ পৃষ্ঠা]।

ষষ্ঠ অধ্যায়

1. What were the effects of the impact of Islam on the Indian art, architecture and religion ?

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : দুইটি সভ্যতা পাশাপাশি বর্তমান থাকিলে পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবিত করিবে সন্দেহ নাই। মুসলমান ও হিন্দু সভ্যতা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও একথার সত্যতা পরিলক্ষিত হয়। (২) ভারতীয় তথা হিন্দু ও মুসলমান শিল্প ও স্থাপত্য রীতির সংমিশ্রণ ; (৩) ইহার কারণ— (৪) শিল্প ও স্থাপত্য নিদর্শন—(উদাহরণস্বরূপ কয়েকটির উল্লেখ করিলেই চলিবে) ; (৫) সাহিত্য—(ক) কবিতা ও সাহিত্য, (খ) ইতিহাস-সাহিত্য, (গ) সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য, (ঘ) প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্য,—বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ; (৬) ধর্ম : (ক) হিন্দু সমাজ ও ধর্মের রক্ষণশীলতা—স্মৃতিশাস্ত্রের কঠোর নির্দেশ, (খ) উদার ভক্তিবাদের উদ্ভব, (গ) বাংলাদেশে সত্যপীরের উপাসনা। ২০৯-'১৫ পৃষ্ঠা]

সপ্তম অধ্যায়

1. Give an account of Sher Shah's administrative measures. (C. U. 1952, 1958)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : মধ্যযুগীয় ভারত-ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক হিসাবে শের শাহ্ স্মরণীয়। একমাত্র মোগল সম্রাট আকবর ভিন্ন অপর কোন মুসলমান শাসক শের শাহের ন্যায় দক্ষতা প্রদর্শন করেন নাই। (২) তাঁহার সাম্রাজ্য ৪৭টি সরকার এবং সরকার পরগণায় বিভক্ত ; (৩) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসকের যোগাযোগ ; (৪) রাজস্ব-ব্যবস্থা ; (৫) বিচার-ব্যবস্থা ; (৬) জন-

কল্যাণকর-ব্যবস্থা ; (৭) শাসনের প্রকৃতি—ধর্ম-নিরপেক্ষতা ; (৮) উপসংহার : কীনি, ডক্টর স্মিথ্ প্রভৃতির মন্তব্য। ২৩৭-'৪২ পৃষ্ঠা]

2. Give an estimate of Sher Shah's character and achievements.

[উত্তর-সংকেত : (১) স্থচনা : (২) চরিত্র, (৩) পূরণমলের প্রতি ব্যবহার, মন্তব্য ; (৪) সামরিক নেতা হিসাবে কৃতিত্ব ; (৫) প্রজাহিতৈষী শাসনের আদর্শ ; (৬) ধর্ম-নিরপেক্ষ শাসন ; (৭) প্রজামাত্রের সমান অধিকার ; (৮) ঐতিহাসিকদের মন্তব্য ; (৯) জনকল্যাণকর কার্যাদি ; (১০) দানশীলতা ; (১১) প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচার। ২৪২-'৪৬ পৃষ্ঠা]

অষ্টম অধ্যায়

1. Enumerate the administrative and social reforms introduced by Akbar. To whom was he indebted for some of his measures? (C. U. 1951, 1955)

[উত্তর-সংকেত : (১) স্থচনা : মোগল শাসনব্যবস্থার প্রকৃত স্থাপয়িতা ছিলেন আকবর। ভারতীয় কাঠামোর মধ্যে আকবর নিজ প্রতিভাবলে 'পারসিক-আরবীয়' (Perso-Arabic) শাসনপদ্ধতির পুনর্গঠন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন ; (২) শাসন সংগঠন—কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসন ; (৩) পুলিশ বা শান্তি-রক্ষা-বিভাগ ; (৪) বিচার-ব্যবস্থা ; (৫) রাজস্ব বিভাগ ; (৬) সেনা বিভাগ—সকল বিভাগেই আকবর সংস্কার সাধন করিয়া এক নূতন শাসন-সংগঠন গড়িয়া তুলিযাছিলেন ; (৭) সামাজিক সংস্কার ; (৮) শের শাহের নিকট তিনি কোন কোন বিষয়ে ঋণী—রাজস্ব-নীতি, হিন্দুদের প্রতি ব্যবহার, হিন্দু কর্মচারী নিয়োগ, প্রজার কল্যাণ সাধন। ২৬৭—'৭৬ পৃষ্ঠা]

2. Give a critical account of the religious policy of Akbar. (C. U. 1953, 1957)

[উত্তর-সংকেত : (১) স্থচনা : বিভিন্ন প্রভাবাধীনে আকবরের ধর্ম-নীতি গড়িয়া উঠিয়াছিল—তৈমুর বংশসুলভ পরধর্মসহিষ্ণুতা, মাতার প্রভাব ; (২) সর্ব-ধর্মের সার-গ্রাহী ; (৩) পরধর্মসহিষ্ণুতা বা 'সুলহ্-ই-কুল' ; (৪) 'অভ্রান্ত ও সর্বময় কর্তৃত্বের ঘোষণা' (Infallible decree) ; (৫) 'দীন-ইলাহী' ; (৬) উপসংহার। ২৭৬-'৭৯ পৃষ্ঠা]

3. **Write a short essay on Akbar as an empire-builder.**

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : সাম্রাজ্য সংগঠক হিসাবে সম্রাট আকবর পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য, সন্দেহ নাই। তিনি কেবল বিশাল সাম্রাজ্য জয় করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না। উহার সুষ্ঠু শাসন এবং সংগঠনের জন্যও তিনি যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। (২) সাম্রাজ্য-সংগঠন ; (৩) শাসনদক্ষতা ; (৪) জাতীয় শাসনব্যবস্থা স্থাপন ; (৫) বিভিন্ন সংস্কার ; (৬) তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব। ২৮৩—'৮৬ (প্রয়োজনীয় অংশ) পৃষ্ঠা]

নবম অধ্যায়

1. **Sketch the character and achievements of Shah Jahan.**

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : শাহ্‌জাহানের চরিত্র ও কৃতিত্ব সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতানৈক্য রহিয়াছে ; (২) ইওরোপীয় ঐতিহাসিকদের মন্তব্য—তাঁহার ত্রুটি—নিরপেক্ষ বিচারে তাঁহার চরিত্র ; (৩) মোগল সাম্রাজ্যের চরম উন্নতির যুগ ; (৪) শাহ্‌জাহানের শাসন ও বিচার-ব্যবস্থা ; (৫) সন্তানবাৎসল্য ও পত্নীপ্রেম ; (৬) তাঁহার শিক্ষা ; (৭) স্থাপত্য-শিল্পের উৎকর্ষ ; (৮) তাজমহল, ময়ূরসিংহাসন ; (৯) চিত্র-শিল্প ; (১০) উপসংহার—বাহ্যিক সমৃদ্ধির অন্তরালে সাম্রাজ্যের পতনের বীজ উপ্ত। পৃষ্ঠা ৩১০—'১৪]

2. **Write notes on :—**
   (i) **Peacock throne,**
   (ii) **Shah Jahan's Deccan policy. (C. U. 1947)**

[(i) উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : ময়ূরসিংহাসন—শাহ্‌জাহানের শিল্পানুরাগের অপূর্ব নিদর্শন ; (২) বেবাদল খাঁ কর্তৃক নির্মিত—মণিমুক্তা-মরকত-খচিত ; (৩) আট কোটি মুদ্রা ব্যয়—আট বৎসরে নির্মাণকার্য সম্পন্ন ; (৪) পারস্য সম্রাট নাদির শাহ্‌ কর্তৃক লুণ্ঠিত। ৩১৩ পৃষ্ঠা]

(ii) উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : চিরাচরিত মোগল-নীতি অনুসরণ করিয়া শাহ্‌জাহান দাক্ষিণাত্য বিজয়ে প্রবৃত্ত ; (২) তাঁহার দাক্ষিণাত্য

নীতির মূল উদ্দেশ্য—রাজনৈতিক ও ধর্মনৈতিক ; (৩) দাক্ষিণাত্য নীতির পরিবর্তন ; (৪) গোলকুণ্ডার বশ্যতা স্বীকার ; (৫) বিজাপুরের বশ্যতা স্বীকার ; (৬) ঔরংজেব কর্তৃক বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা সম্পূর্ণভাবে দখলের চেষ্টা ; (৭) গোলকুণ্ডা আক্রমণ ; (৮) বিজাপুর আক্রমণ ; (৯) সমালোচনা। ৩০০—৩০৫ পৃষ্ঠা]

3. Give a brief account of Shah Jahan as a ruler and a builder. (C. U. 1960)

[উত্তর-সংকেত : ১নং প্রশ্নোত্তরের অনুরূপ]

দশম অধ্যায়

1. Discuss the Deccan policy of Aurangzeb. (C. U. 1954)

How far was the Deccan policy of Aurangzeb responsible for bringing disaster to the Moghul Empire? (C. U. 1952)

[উত্তর-সংকেত (১) সূচনা : পূর্ববর্তী মোগল সম্রাটদের দাক্ষিণাত্যে বিস্তার-নীতির অনুসরণ—ঔরংজেবের নীতির পরিবর্তন ; (২) দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা হিসাবে তাঁহার দাক্ষিণাত্য-নীতি ; (৩) শাহ্‌জাহান কর্তৃক বাধাদান ; (৪) শিবাজীর সহিত সংঘর্ষ ; (৫) বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা দখল ; (৬) সমালোচনা। ৩২৫—'৩০ পৃষ্ঠা]

2. Discuss the Rajput policy of Akbar and Aurangzeb. (C. U. 1954)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : যে রাজপুত জাতিকে আকবর প্রীতি ও সৌহার্দ্যবন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই রাজপুত জাতিকেই ঔরংজেব তাঁহার ধর্মান্ধ সংকীর্ণ নীতির দ্বারা মোগল সাম্রাজ্যের ঘোর শত্রুতে পরিণত করিয়াছিলেন ; (২) আকবরের রাজপুত-নীতি—দূরদর্শী, সহানুভূতিসম্পন্ন—রাজপুত কন্যা বিবাহ—রাজপুত জাতির উপর বিশ্বাস স্থাপন—রাজপুত জাতির চেষ্টায় মোগল সাম্রাজ্য বিস্তৃতি ও উহার ভিত্তি দৃঢ়ভাবে স্থাপিত ; (৩) ঔরংজেবের রাজপুত-নীতি—অদূরদর্শী নীতি—যশোবন্ত সিংহের মৃত্যুর পর ঔরংজেব কর্তৃক মাড়বার দখল—অজিত সিংহ-সংক্রান্ত ঘটনা—দুর্গাদাস ;

মেবার আক্রমণ—আকবরের বিদ্রোহ—আকবর ও রাজপুতদের মধ্যে মৈত্রী; ঔরংজেবের রাজপুত-নীতির বিফলতা। ২৭৯—'৮১, ৩২২—'২৫ পৃষ্ঠা]

একাদশ অধ্যায়

1. Briefly sketch the career of Shivaji. Discuss his place in Indian history. (C. U. 1955)

Give an estimate of Shivaji as a nation-builder. (C. U. 1957)

[উত্তর-সংকেত : (১) হিন্দুধর্ম ও হিন্দুরাষ্ট্রের আদর্শ ও অনন্যসাধারণ বীরত্বের এক অপূর্ব সমন্বয় মারাঠা বীর শিবাজীর মধ্যে প্রকাশলাভ করিয়াছিল; (২) জন্ম, বাল্যজীবন, শিক্ষা (সংক্ষেপে); (৩) বিজাপুরের সহিত যুদ্ধ; (৪) মোগলদের সহিত সংঘর্ষ (সংক্ষেপে); (৫) শাসনব্যবস্থা, সামরিক ও বেসামরিক সংগঠন (সংক্ষেপে); (৬) চরিত্র ও কৃতিত্ব। ৩৩৬—'৪৯ পৃষ্ঠা]

দ্বাদশ অধ্যায়

1. Write notes on :
(a) Barabhuiyas of Bengal
(b) Isha Khan
(c) Pratapaditya of Jessore
(d) Kedar Roy
(e) Musa Khan

[উত্তর-সংকেত : (a) ৩৬১ পৃষ্ঠা; (b) ৩৫৯—'৬০ পৃষ্ঠা, (c) ৩৬২ পৃষ্ঠা; (d) ৩৬০—'৬১ পৃষ্ঠা; (e) ৩৬৩ পৃষ্ঠা]

ত্রয়োদশ অধ্যায়

1. What were the principal causes of the downfall of the Moghul Empire? (C. U. 1953, 1960)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : উত্থান ও পতনের চক্রবৎ আবর্তন, ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। মোগল সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রেও এই প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম হইল না। আভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত, উভয় প্রকার কারণে মোগল সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়াছিল; (২) আভ্যন্তরীণ কারণ : (ক) প্রজাবর্গের স্বাভাবিক আনুগত্যের অভাব, (খ) আকবরের আমলে অনুসৃত জনকল্যাণের

নীতি পরিত্যক্ত, (গ) ঔরংজেবের দাক্ষিণাত্য-নীতি, (ঘ) অনুদার ও পরধর্ম অসহিষ্ণুতার নীতি, (ঙ) সম্রাট, অভিজাতবর্গ ও সেনাবাহিনীর বিলাসপ্রিয়তা, (চ) মোগল সাম্রাজ্যের বিশালতা, (ছ) প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণের স্ব-স্ব-প্রাধান্য ; (৩) বহিরাগত কারণ : (ক) নাদির শাহের আক্রমণ, (খ) আহ্মদ শাহ্ দুর্রাণীর আক্রমণ। ৩৭৮-'৮২ পৃষ্ঠা]

চতুর্দশ অধ্যায়

1. Trace the growth of the Maratha power under the first three Peshwas. (C. U. 1954)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : মারাঠা জাতির উত্থানে শিবাজীর পরবর্তী কালে বালাজী বিশ্বনাথ, বাজীরাও এবং বালাজী বাজীরাও—এই তিনজন পেশওয়ার দান উল্লেখযোগ্য ; (২) বালাজী বিশ্বনাথ : (ক) পেশওয়া-তন্ত্রের সৃষ্টি, হুসেন আলীর সহিত সন্ধি (১৭১৪), (গ) দিল্লীর রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ, (ঘ) আভ্যন্তরীণ উন্নয়ন ; (৩) বাজীরাও : (ক) আদর্শ—হিন্দু-পাদ-পাদশাহী, (খ) মারাঠা রাজ্যের প্রসার ; (৪) বালাজী বাজীরাও : (ক) 'হিন্দু-পাদ-পাদশাহী' আদর্শ ত্যাগ, (খ) মারাঠাশক্তির চরম বিকাশ, (গ) পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ—ফলাফল। ৩৮৭-'৯৪ পৃষ্ঠা]

পঞ্চদশ অধ্যায়

1. What light do the accounts of the foreign travellers in Moghul India throw on the social and economic conditions of the country ? (C. U. 1952)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : ইওরোপীয় পর্যটকদের মধ্যে র‍্যাল্‌ফ ফিচ্, উইলিযাম হকিন্স, সার্ টমাস রো, ফ্রান্সিস্কো, পেল্‌সার্ট, বার্নিয়ে, টেভার্নিয়ে, সেভেনো প্রভৃতির বর্ণনা হইতে সমসাময়িক সামাজিক ও অর্থনৈতিক চিত্র লাভ করা যায় ; (২) সামাজিক : অভিজাত, মধ্যবিত্ত, সাধারণ ও নিম্নশ্রেণী ; (৩) অর্থনৈতিক : কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবনতি। ৩৯৭-'৯৮ পৃষ্ঠা]
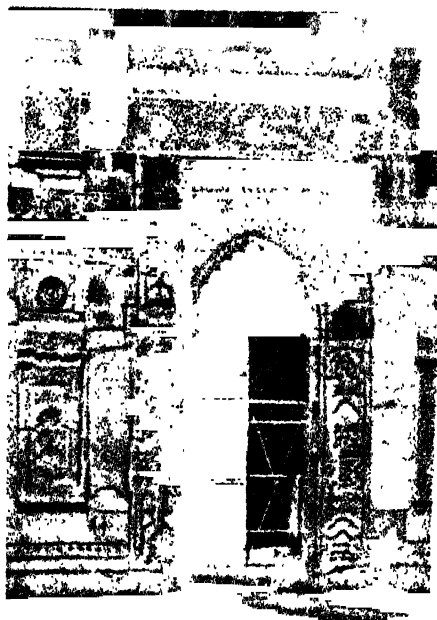
ছোট সোনা মসজিদের কারু শিল্প (গৌড়)

বড় সোনা মসজিদ (গৌড়)

আদিনা মস্‌জিদের অলিন্দ (পাণ্ডুয়া)

একলাখী সমাধিসৌধ (পাণ্ডুয়া)